গান্ধী-মানস

সংকলন ও সম্পাদনা

আর. কে. প্রভু ● ইউ. আর. রাও

প্রাককথন ও মুখবন্ধ

আচার্য বিনোবা ভাবে ● ড. এস. রাধাকৃষ্ণণ

অনুবাদ

মহাশ্বেতা দেবী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নবজীবন পাব্লিশিং হাউস, আহমেদাবাদ কর্তৃক প্রকাশিত The Mind of Mahatma Gandhi গ্রন্থের
এই বাংলা অনুবাদ মহাত্মা গান্ধীর একশ পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী, 2 অক্টোবর, 1994 তারিখে প্রকাশিত

The Mind of Mahatma Gandhi (*Bangla*)
মূল্য : 85.00 টাকা
নবজীবন ট্রাস্ট, আহমেদাবাদ-380014 (ভারত) প্রদত্ত অনুমতিক্রমে
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

মহাদেব দেশাই-কে
যিনি সংকলন করলে যথার্থ হতো

৪. বিশ্বাস

৫. অহিংসা

৬. সত্যাগ্রহ

৭. অপরিগ্রহ

৮. শ্রম

৯. সর্বোদয়

১০. অছিরক্ষণ

১১. ব্রহ্মচর্য

১২. স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

১৩. স্বদেশী

১৪. সৌভ্রাত্র

প্রাককথন

সংশোধিত সংস্করণ

শ্রীপ্রভু এবং শ্রীরাও সম্পাদিত ‘দি মাইন্ড অফ মহাত্মা গান্ধী’-র এক নতুন, সংশোধিত এবং বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করছেন নবজীবন ট্রাস্ট। এটা জেনে আমি আনন্দিত। এই বইয়ের প্রথম দুটি সংস্করণ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বহু ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

নতুন সংস্করণে গান্ধীজির জীবনের শেষ ক’বছরের চিন্তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এভাবে বইটি অধুনা কালকে স্পর্শ করেছে।

কবি ভবভূতির এক প্রখ্যাত উক্তি হল: ‘কে দাবি করতে পারে যে সে মহান মানুষের মনকে জানে’? গান্ধীজি ছিলেন এক মহান মানব। তৎসত্ত্বেও বিশ্বের সামনে তিনি নিজ মনকে অবারিত করে খুলে ধরেছেন। নিজের ব্যাপারে কোনও গোপনতা তিনি অনুমোদন করেননি। তবু স্বীকার করছি, তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়, যাকে আমি ‘স্বর্গারোহণ পর্ব’ বলেছি, বা ‘অ্যাসেন্ট টু হেভেন,’ তা আমার কছে এক রহস্য থেকে গেছে। বলতে-কি, আমার চোখে তা শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্ত্যপর্বের সমান। এ-রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হয়তো গান্ধীজির পুনর্জন্ম প্রয়োজন হতে পারে। তদবধি, আমার আশা, যাঁরা সর্বোদয় প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ও সত্যসন্ধান করছেন তাঁদের পক্ষে গান্ধী-মানস বুঝতে এ-বই এক প্রয়োজনীয় সহায়ক হবে।

বিশ্বের জয় হোক!

বিনোবা

কিষণগঞ্জ
পূর্ণিয়া জেলা
বিহার
১২ মে, ১৯৬৬

মুখবন্ধ

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ

সাধারণ মানুষের অনেক উপরে কোনও বিরল মানুষকে ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা যায়। ঈশ্বর বিষয়ে যিনি অনেক গভীরতর চিন্তা করেন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়—তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ অনেক বেশি সাহসের সঙ্গে কাজে রূপ দেন। এই অন্ধকার, বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে তেমন মানুষের দীপ্তি এক মহান আলোকবর্তিকার মতো বিচ্ছুরিত হয়। যে-সকল ভবিষ্যদ্বক্তার হৃদয়ে সাহস থাকে, মনে থাকে বিনয়, যাঁদের হাসিতে বোঝা যায় তাঁরা ভয়হীন—গান্ধী তাঁদের দলে। আত্মায় বিশ্বাস, তার রহস্যময়তার প্রতি শ্রদ্ধা, পবিত্রতায় সৌন্দর্য, জীবনের দায়িত্ব স্বীকার, চরিত্রের দার্ঢ্য ইত্যাদি সেই সব মূল্যবোধ, যা এ-দেশে যুগযুগান্ত ধরে বিদ্যমান, সেইসব মূল্যবোধেরই সাক্ষ্য বহন করে। এসব মূল্যবোধ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নয়, বিশ্বজনীন।

অনেকে গান্ধীকে খারিজ করে দেন এই বলে যে, তিনি এক পেশাদার রাজনীতিক, যিনি সঙ্কট মুহূর্তে গণ্ডগোল ক'রে ফেলেন। রাজনীতি, এক অর্থে, একটি পেশা। তিনিই রাজনীতিক যিনি জনগণের কাজ দক্ষতার সঙ্গে নির্বাহ করার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্য অর্থে, রাজনীতি এক দৈবনির্দেশিত মহান কর্ম। রাজনীতিক তাঁর লক্ষ্য বিষয়ে সচেতন। সে লক্ষ্য হল, দেশবাসীকে রক্ষা করা, তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসে ও মানবপ্রেমে প্রাণিত করা। এমন এক মানুষ সরকারি কাজের বাস্তবক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে পারেন। তবে স্বীয় দেশবাসীর হৃদয় ভরে দিতে পারেন সার্বিক উদ্দেশ্য বিষয়ে অবিচল আস্থায়। গান্ধী এই দ্বিতীয় অর্থে রাজনীতিক। আমরা যদি অধ্যাত্মজগতে নোঙর বাঁধতে পারি, তাহলে এমন এক পৃথিবী গড়তে সক্ষম হব, যেখানে দারিদ্র ও বেকারত্ব, যুদ্ধ ও রক্তপাত থাকবে না—এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল। তিনি বলেন: 'আগামীদিনের পৃথিবীর সমাজের বনিয়াদ হবে অহিংসা। মনে হতে পারে এ-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত এক অলীক কল্পনা। কিন্তু এটা একেবারেই অসম্ভব নয়। কেন না এখনই, এখান থেকেই এ-কাজ শুরু করা যেতে পারে। এক একক ব্যক্তিই ভবিষ্যতের অহিংসপন্থী জীবনযাত্রা শুরু করতে পারে, কারো অপেক্ষা না-করেই। একা যদি কেউ এ-কাজ পারে, ব্যক্তি নিয়ে গঠিত দলগুলি তা কেন পারবে না? সকল জাতি? মানুষ প্রায়ই কোনও কাজ শুরু করতে ইতস্তত করে, কেননা তারা মনে করে যে উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ যাথার্থ্য পাবে না। এই মানসিকতা অগ্রগতির পথে আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা। যে-বাধা অপসারিত করতে পারে প্রতিটি ব্যক্তি, যদি সে তা চায়"।[১]

একটি সমালোচনা খুব ব্যাপক যে, তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির চেয়ে গান্ধীজির ধ্যেয় কল্পনা অনেক উপরের। তিনি এই স্বস্তিদায়ক কিন্তু ভ্রান্ত ধারণায় কাজ করতেন যে, দুনিয়াটা সাধুসন্তে পূর্ণ। এটা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ব্যাখ্যা। তিনি জানেন, জীবন বড়জোর সর্বোত্তমের অব্যবহিত পরবর্তী এক দীর্ঘধারা, আদর্শ এবং সাধ্যায়ত্তের মধ্যে এক নিত্য সমঝোতা মাত্র। ঈশ্বরের রাজ্যে কোনও সমঝোতা নেই। বাস্তবতার সীমারেখা নেই। কিন্তু মাটির পৃথিবীতে আছে প্রকৃতির নির্মম আইন। মানবিক আবেগের ভিত্তিতে আমাদের গড়তে হবে এক সুশৃঙ্খল বিশ্ব। আদর্শ বাস্তবায়িত করতে কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হয়। যদিও গান্ধী মনে করেন, এক সভ্যসমাজের আদর্শ হল অহিংসা, তবু তিনি শক্তিকে কাজে লাগানো অনুমোদন করেন। "যদি কারও সাহস না থাকে, আমি বলব, বিপদ দেখলে কাপুরুষের মতো পালানোর চেয়ে সে মারতে এবং মরতে শিখুক"।[২] "পৃথিবী সবসময়ে যুক্তির দ্বারা শাসিত নয়। জীবনের সঙ্গে কোনও-না-কোনও ভাবে হিংসা জড়িয়েই যায়। আমাদের বেছে নিতে হবে ন্যূনতম হিংসার পথ"।[৩]

প্রতিটি সমাজের অগ্রগতিতে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে চলে জঙ্গলের আইন। সেখানে আমরা স্বার্থপরতা ও হিংসা দেখি। দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখি, আইন এবং আদালত-পুলিশ ও জেলখানায় নিরপেক্ষ বিচারের নিয়ম। তৃতীয়তে আছে, অহিংসা ও নিঃস্বার্থপরতা। সেখানে ভালবাসা আর আইন হরিহরাত্মা। শেষেরটি সভ্য মানবসমাজের লক্ষ্য। গান্ধীর মতো মানুষেদের জীবন ও কর্মেই এই লক্ষ্য আয়ত্তে আসে।

আজ গান্ধীর মতাদর্শ ও চিন্তাধারা নিয়ে কত ভুল বোঝাবুঝি। বিশ্বাস ও আচরণের মূলনীতিগুলি বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির সংকলন এই বইটি, আধুনিক মানসের কাছে গান্ধীর অবস্থান স্পষ্টতর করে তুলতে সাহায্য করবে।

বারাণসী
৪ এপ্রিল ১৯৪৫

এস. রাধাকৃষ্ণণ

১. 'লিবার্টি', লণ্ডন, ১৯৩১
২. 'হরিজন', ১৫.১.১৯৩৮ পৃ. ৪১৮
৩. তদেব, ২৮.৯,১৯৩৪,পৃ. ২৫৯

ভূমিকা

সংশোধিত সংস্করণ

মহামানবকে তাঁর জীবদ্দশায় বিচার করা, অথবা ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ণয় করা সহজ নয়। গান্ধীজি একদা বলেছিলেন: "কোনও মানুষের জীবদ্দশায় সে সুখী কি না তা বলা সোলোনের কাছে কঠিন বোধ হয়েছিল। কোনও মানুষের মহত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলা তাই আরও কতো কঠিন"![১] আর একবার নিজের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন: "আমি চোখ বুঁজলে, এ-দেহ আগুনে সমর্পিত হলে আমার কাজ বিষয়ে রায় দেবার যথেষ্ট সময় মিলবে"।[২] উনিশ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—এক শহীদের মৃত্যু।

তাঁর মৃত্যুতে শোকার্ত হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব, মানবেতিহাসে আর কোনও মৃত্যুর সঙ্গেই যার তুলনা চলে না। যেভাবে তাঁর জীবনাবসান হয়েছিল, তা তাঁর তিরোধানের বেদনাকে তীব্রতর করেছিল। একজন পর্যবেক্ষকের ভাষায়, গান্ধী-হত্যা আগামী শতাব্দীগুলিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের 'হার্স্ট প্রেসের' মতে, সে-সময় সমগ্র বিশ্বে ওই ঘটনা যে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের সঞ্চার করেছিল, লিঙ্কনের অনুরূপ শহীদের মৃত্যুবরণের পরবর্তী মানবেতিহাসে তার কোনও তুলনা নেই। এ-কথা গান্ধীজি সম্পর্কে বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, "তিনি এখন যুগান্তের অঙ্গীভূত"। মনে পড়বে, সেই শোকস্তব্ধ অমানিশায় জওহরলাল নেহরুর স্মরণীয় উক্তি: "আমাদের জীবন থেকে একটি আলো নিভে গেল"। এই মর্মবেদনারই প্রতিধ্বনি ক'রে ১৯৪৮-এর ৩১শে জানুআরি, 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' জোর দিয়ে মন্তব্য করেছিল, এর বাকিটা লিপিবদ্ধ করার ভার রইল ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য হাতের ওপর। তাহলে, গান্ধীজি বিষয়ে ইতিহাস কী রায় দেবে?

সমসাময়িক মতামতকে যদি শ্রদ্ধা করি, তাহলে মানবেতিহাসের মহত্তম ব্যক্তিদের পাশেই গান্ধীজির স্থান নির্দিষ্ট। ই. এম. ফর্স্টার বিশ্বাস করতেন, গান্ধীজি আমাদের শতাব্দীর মহত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতে পারেন। আরনল্ড টয়েনবির তো তা-নিয়ে কোনও দ্বিধাই ছিল না। ডক্টর জে. এইচ. হোম্স-এর বক্তব্য আরও স্পষ্ট, যখন তিনি বলেন, গান্ধীজি "গৌতম বুদ্ধের পর মহত্তম ভারতীয়, এবং যীশু খ্রীস্টের পর শ্রেষ্ঠ মানব"। তবে, স্বদেশবাসী খুব সম্ভবত তাদের হৃদ্মন্দিরে 'মহাত্মা' রূপেই তাঁকে স্থাপন করবে, কিংবা আরও আদরের নাম, 'বাপু'—'জাতির জনক'-রূপে। যিনি জাতিকে স্বাধীনতার পথে নিয়ে যান রক্তপাতহীন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

কোন গুণাবলী গান্ধীজিকে মহত্ত্ব দান করেছিল? তিনি শুধুই এক মানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন না, বরং বলা যায়, একাধারে শ্রেষ্ঠ এবং ভালোমানুষ ছিলেন তিনি। একজন সমালোচক বলেছেন, এমন সম্মিলন কদাচিৎ ঘটে, আর কদাচিৎ তা সমাদর পায়। মনে পড়বে জর্জ বার্নার্ড শ'র সংক্ষিপ্ত উক্তি, "অতি ভালো হওয়া বিপজ্জনক"।

ইতিহাসও সাক্ষ্য দেবে, ছোটখাট এই মানুষটি তাঁর দেশবাসীর মনে এক বিপুল, প্রায়-তুলনারহিত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। খুবই বিস্ময়কর, কেননা তাঁর এই প্রভুত্বের পিছনে কোনও পার্থিক ক্ষমতা বা অস্ত্রশক্তির প্রণোদনা ছিল না। এটা যদি প্রহেলিকা হয়, তবে তার রহস্যভেদের সূত্র নিহিত ছিল গান্ধীজির ব্যক্তিচরিত্রে ও আদর্শে। গান্ধীজির লবণ-সত্যাগ্রহ কালে যিনি বড়লাট ছিলেন, সেই লর্ড হ্যালিফ্যাক্স্ তাই মনে করতেন। ইনি গান্ধীজিকে অনেকটা বুঝতে পেরেছিলেন। চরিত্র এবং জীবনচর্যার বলিষ্ঠতা, যা নিছক কর্মবিধির চেয়ে পৃথক, তাই তাঁকে তাঁর প্রজন্মের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিল। প্রফেসর এল. ডবলিউ. গ্রেনস্টেডের মতে, গান্ধীজির মহত্ত্ব নিহিত ছিল চরিত্রে, তাঁর সিদ্ধিতে নয়। ফিলিপ নোয়েল-বেকার এর সঙ্গে যোগ করেন উদ্দেশ্যের পবিত্রতা, এবং যাতে বিশ্বাস করতেন সেই কর্মে তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মদান।

কিন্তু এগুলি নিশ্চয়ই গান্ধীজির অভূতপূর্ব উত্তরণের সম্পূর্ণ কাবণ নয়। সমসাময়িক সাক্ষ্য মতে, রেজিনাল্ড সোরেনসেন বিশ্বাস করতেন, গান্ধীজি আত্মার শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই শক্তিকেই রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। আর সেই কারণেই শুধু ভারতে নয়, আমাদের আধুনিক যুগের ওপর এমন অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাহলে বলতে হয়, মানবাত্মায় গান্ধীজির অনাহত বিশ্বাস তথা পার্থিব বস্তুতে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও কলাকৌশল প্রচলনের মধ্যেই রয়েছে গান্ধীজির অনন্যতা। এই প্রেক্ষাপটেই ড. ফ্রান্সিস নীলসন বলেন, গান্ধীজি: "কর্মে ডায়োজিনিস, বিনয় দীনতায় সেন্ট ফ্রান্সিস, জ্ঞানে সক্রেতিস। যে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়, তিনি তাদের কর্মপদ্ধতির অসার তুচ্ছতা বিশ্বের সামনে অবারিত করে দেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রশক্তির দৈহিক-বিরোধিতা পরাজিত হয় আত্মশক্তির বিশুদ্ধতার কাছে"।[৩]

রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজি অহিংসা ও সত্যের শুদ্ধ শক্তিকে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে দেন, এবং তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু অহিংসা ও সত্যের যে বাণী তিনি প্রচার করেন, নিজেও আচরণ করেন, তা কোনও নতুন দর্শন নয়। তিনি স্বীকার করেছিলেন, শুধু স্বীকার কেন, দাবিও করেছিলেন, এ বাণী "পাহাড়ের মতোই প্রাচীন"। তিনি শুধু এই দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এক নতুন প্রেক্ষিতে একে ব্যবহার কবেন। 'সত্য এক জীবন্ত নীতি, তাই তার বৃদ্ধি আছে'—তাঁর এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলা যায়, একনিষ্ঠ উপাসকের কাছে সত্য তার নিত্য নব নব রূপ নিয়ে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করবেই। গান্ধীজির দাবি, অহিংসার নীতির মধ্যেও তিনি নতুন ব্যাপ্তি ও নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন। এ-কথা সত্য যে,

অহিংসা-নীতি সত্যের উলটো পিঠ। আর সেই কারণেই পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। অহিংসা ও সত্যের পথ অনুসরণ না করলে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা জাতি কারোই মুক্তি নেই—আবিশ্ব তাঁর সহযাত্রীদের মনে এই অঙ্গীকার মুদ্রিত করার কাজই গান্ধীজি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

একজন সমালোচকের মতে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ওই পথের অর্থই ছিল—এবং এখনও তাই—যে-কোনও বিপ্লবের চেয়ে আমূল সংস্কারকামী বিপ্লব। কারণ, এর মানে, হয় আমাদের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক জীবনধারার সামগ্রিক পরিবর্তন নতুবা স্থিতাবস্থা। কিন্তু গান্ধীজির কাছে ব্যক্তিজীবন ও জনজীবন, অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মধ্যে কোনও ব্যবধান-প্রাচীর ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়। এদিক থেকে তিনি বিশ্বের অধিকাংশ রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিকদের থেকে স্পষ্টতই আলাদা এবং তাদের অনেক ওপরে স্বমহিমায় ভাস্বর। আর, তাঁর শক্তির গোপন কথা এরই মধ্যে নিহিত।

গান্ধীজি নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন, যে-শক্তির তিনি অধিকারী, যে-প্রভাব তিনি বিস্তার করেন, তা ধর্ম থেকেই উৎসারিত। বোধহয় এই কথা মনে রেখেই স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স বলেছেন, আমাদের সমকালে গান্ধীর চেয়ে বড় আধ্যাত্মিক নেতা নেই। গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের এই দিকটি নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ১৯৪৮সালের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে লেখে, "সর্বোপরি, তিনিই সেই মানুষ যিনি ধর্মের অর্থ ও সারবত্তার বোধ আমাদের মধ্যে পুনরায় জাগিয়েছেন ও সঞ্জীবিত করেছেন। কোনও নতুন দর্শন বা ধর্মের প্রণেতা হতে গেলে যে সর্বত্রগামী মননশীলতা ও ভাবৈশ্বর্যের প্রয়োজন তা অবশ্য তাঁর ছিল না, তথাপি তাঁর নৈতিক প্রণোদনার শক্তি ও পবিত্রতা স্পষ্টতই গভীর ধর্মবোধ থেকে উৎসারিত"...

পৃথিবী আজ এমন এক ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে তাকে ফেরানো অসম্ভব—এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ: অবিরাম আদর্শগত সংঘাত, তীব্র জাতিবর্ণ বিদ্বেষ, যার ফলে এমন ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে যেতে পারে, ইতিহাসে যার নজির খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসারের বিপদ তো সর্বদাই থেকে যাচ্ছে, যার সঙ্গে জড়িত অকল্পনীয় ধ্বংসের সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে, *অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই মানুষকে নৈতিক শক্তি ও জড়বাদী শক্তির মধ্যে একটিকে বেছে নিতেই হবে।* জড়বাদী শক্তি মানুষকে আত্মবিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। গান্ধীজি দেখান অন্য পথটি। কেননা তিনি নৈতিক শক্তিসমূহের প্রতিনিধি। হয়তো নতুন কোনও পথ এটা নয়। কিন্তু এ হল সেই পথ, যা পৃথিবী হয় দীর্ঘদিন ভুলে গেছে, নতুবা এই পথ অনুসরণের সাহস পায়নি। আর আজ, কেবল আপন অস্তিত্বের মূল্যেই এ-পথকে সে উপেক্ষা করতে পারে।

এই গ্রন্থে মহাত্মা নিজের ভাষায় নিজের কথা বলছেন। তাঁর ও পাঠকের মধ্যে কোনও ব্যাখ্যাতা নেই। তার দরকারও নেই। তাঁকে বুঝতে পাশ্চাত্যের মানুষের মাঝে মাঝে অসুবিধা হয়েছে। যেমন, হোরেস অলেকজাণ্ডার-এর এই উক্তিটি : গান্ধীজির গভীর, আধিবিদ্যক যুক্তিগুলি অ্যাংলো-স্যাক্সন মানসে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।

এই গ্রন্থে গান্ধীজির সামাজিক, রাজনীতিক এবং আধ্যাত্মিক মানসিকতা অনুধাবনের মূল উপাদানগুলি পাওয়া যাবে। মনস্তত্ত্বের অগ্রসর ছাত্রকে হয়তো গান্ধীজির কর্মপ্রেরণা ও জীবনাচরণের মৌলিক সূত্র ও উৎস-বিষয়ে আরও গভীরে অনুসন্ধান চালাতে হবে। তার কাছে এই গ্রন্থ শুধু উৎস-সন্ধানে সহায়তা করবে।

এই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণটি প্রকাশিত হল পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির কুড়ি বছরেরও বেশিকাল পরে। এই সংস্করণে এমন অনেককিছু সংযোজিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী 'সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না : ১৯৪৬-৪৮ সালে, জীবনের সংকটময় অন্ত্যপর্বে গান্ধীজির চিন্তা ও দর্শন : যখন তিনি জাতিবর্ণ, ধর্মমত, পার্টি, এমনকি দেশকেও ছাপিয়ে মানবাত্মার সীমাতিক্রমী উচ্চতায় আরোহণ করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আগের চেয়েও অনেক বেশি সত্যতায় সমগ্র মানবতার প্রতিভূ হয়ে যান। কারণ, ওই অন্ত্যপর্ব, যখন তাঁকে তাঁর সত্যরক্ষার্থে আত্মবলিদানের পরম উপসংহারের দিকে অমোঘভাবে আকর্ষণ করছিল, তখনও তিনি প্রচার ও অনুশীলন করেছিলেন মানবধর্ম, একমাত্র যেই ধর্মের মধ্যেই অন্তর্লীন হয়ে আছে মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষার বরাভয়। আর সেই জন্য ওই শেষ-পর্বে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ব্যক্ত করেছেন তা আমাদের ও উত্তরসূরীদের কাছে এতো পবিত্র। তাতে আছে বিদায়বাণীর পূর্ণতা। তাঁর মনকে সমগ্রতায় বুঝতে গেলে এগুলি অপরিহার্য। বর্তমান গ্রন্থে ওইসব তথ্য যোগ করার ফলে কয়েকটি নতুন অধ্যায় সন্নিবেশ করতে হয়েছে, বেশকিছু পুরনো অধ্যায়কে বাড়াতে হয়েছে।

পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে কিছু অপূর্ণতা থেকে গিয়েছিল। কেননা নিছক ভারতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাবিষয়ক তাঁর চিন্তাধারার অধিকাংশ বাদ পড়েছিল। গ্রন্থের আয়তন ও বহির্ভারতে বিস্তৃত পাঠকদের কথা ভেবে এ-কাজ করা হয়েছিল। এই ত্রুটি সংশোধন জরুরি ছিল। অন্যথায়, গান্ধীজিব ব্যক্তিত্ব ও সত্যদর্শন তাদের সমগ্রতায় উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর চোখে, বিশ্বের প্রতি ভারতের এক পালনীয় ব্রত ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ভারত অবিলম্বে তাঁর দর্শনের দৃষ্টান্ত ও প্রবক্তা হয়ে উঠুক। তাঁর স্বপ্নের এই ভারতের আত্মপরিচয় এখন বলতে গেলে প্রায় এক সম্পূর্ণ নতুন বিভাগে বিধৃত, যার নাম: "স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র"।

এই গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরও ভালোভাবে পূর্ণ করার অভিপ্রায় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেই বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন করা হয়েছে।

এই সংকলন প্রস্তুত করতে গিয়ে বিভিন্ন পুস্তক ও সাময়িক পত্রপত্রিকা ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রকাশকগণ সংকলকদ্বয়ের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁরা কৃতজ্ঞচিত্তে সেই ঋণ স্বীকার করছেন। আচার্য বিনোবা ভাবে এই নতুন সংস্করণের জন্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। সংকলকদ্বয় তাঁর কাছেও অশেষ কৃতজ্ঞ। সবশেষে, একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। এই ভূমিকার নিচে একজন সংকলকের নাম দেখা যাবে। কেননা অপরজন আর ইহলোকে নেই। আর. কে. প্রভু আজীবন গান্ধীজির শিক্ষার ছাত্র ও বিশ্বস্ত প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর সহযোগী সংকলয়িতা-সহ বহুজনেরই

তিনি বন্ধু, দার্শনিক, পথ-প্রদর্শক। ৪ঠা জানুআরি তিনি প্রয়াত হন। নতুন সংস্করণের ভূমিকা লেখা তখনও বাকি, বইটিও প্রকাশিত হয়নি। তাই, এখানে যা লেখা হল, তার দায় একজন সংকলকেরই। ঠিক তেমনি, যা বলা উচিত ছিল অথচ বলা হয়নি সে-ত্রুটিও তাঁরই। তবে দায়, কিংবা ত্রুটির ক্ষেত্রে একটাই সান্ত্বনা, প্রভুর ভাষায়, তাঁর ছোট ছোট লেখা, নৈশ-অধ্যয়নের ফসল, জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত, তিনি চিঠিতে লিখে রেখে গেছেন।

ত্রিশ বছর ধরে প্রভুর বন্ধুত্ব পাবার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক সময়ে তাঁকে পেয়েছে সক্রিয় সহযোগী হিসেবে। কাজেই একজন ভক্ত হিসেবে যত প্রশংসাই সে তাঁকে জানাক, তার চোখে তা যথেষ্ট বলে মনে হবে না। সে জন্যই, সে যা-ই বলুক, পাঠকদের কাছে তা পুরোপুরি পক্ষপাতহীন বলে মনে না-ও হতে পারে।

প্রভু ছিলেন 'বিপুলায়তন' গান্ধী প্রকল্পের মূল উদ্ভাবক। তাতে বর্তমান এই গ্রন্থসহ, গান্ধীজির চিন্তা ও দর্শন নিয়ে বেশ কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত হবার কথা ছিল। দ্বৈত পরিশ্রমে মাত্র তিনটি বই প্রকাশ করা গেল। সৌভাগ্যবশত, প্রভু নিজে বড় ও ছোট বেশ কয়েকটি প্রকাশ করেছেন। সবই নবজীবন থেকে প্রকাশিত। গান্ধী-সাহিত্যের কোনও তদ্গত ছাত্র এই ক্ষেত্রে প্রভুর অবদানের মূল্যায়ন করতে পারেন। যিনি তাকে প্রেরণা, দীক্ষা ও সঙ্গ দিয়ে গেছেন, তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেই তাঁর সহযোগীকে সান্ত্বনা পেতে হবে।

গান্ধী রচনা সংকলনের ক্ষেত্রে প্রভুর স্থান বিষয়ে দুটি বিশিষ্ট, স্বতপ্রণোদিত মন্তব্য এখানে উদ্বৃত করছি। ১৯৪৪ সালের ২৭শে জুন, পুণের 'নেচার কিওর ক্লিনিকে' গান্ধীজি বলেন, "আমার রচনার মর্মার্থ তোমার মধ্যে সঞ্চারিত"। গান্ধীজির প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারী-দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রভুর মৃত্যুর পর শোকবার্তার লেখেন, "গান্ধীজি বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত রচনাই আমাদেব সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেবে তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় আকর্ষণের কথা"।

ইউ. আর. আর.

নিউ দিল্লি
১৩ জানুআরি, ১৯৬৭

১. হরিজন, ১০.১২.১৯৩৮, পৃ-৩৭৭

২. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪.৪.১৯২৯,পৃ-১০৭

৩. এস রাধাকৃষ্ণ: *মহাত্মা গান্ধী: এসেজ অ্যাণ্ড রিফ্লেকশন্‌স্ অন হিজ লাইফ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক,* জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন, (১৯৪৯). পৃ ৫৩৭

ভূমিকা

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ

"গান্ধীজি এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা"—এ কথা বারবার শোনা যায়। যাঁরা তাঁর উক্তি ও কাজের বিরোধী শুধু তাঁরা নয়, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যাঁরা, এ তাঁদেরও উক্তি। এটা খুব বিস্ময়কর। কেননা বিগত পঞ্চাশ বছরকাল গান্ধীজির ব্যক্তিজীবন বলে কিছু নেই। কচিৎ তিনি একা থাকেন। তাঁর অনুগামীদের সাহচর্যেই কাজ করেন, কথা বলেন, ধ্যান করেন, প্রার্থনা করেন, আহার করেন। ঘুমোন, সে-ও নিজের ঘরে কদাচিৎ—খোলা জায়গায়, ডর্মিটরিতেই।

তাঁর জীবনে যে অনেক দ্বন্দ্ব আছে, তা গান্ধীজি নিজে প্রায়ই স্বীকার করতেন। সে-জন্য সাফাই গাওয়ার বদলে তিনি বলেছেন: "আমি কখনও নিরবছিন্ন সঙ্গতির অন্ধ ভক্ত ছিলাম না। আমি সত্যের উপাসক। কোনও প্রসঙ্গে, আমি সে মুহূর্তে কী ভাবছি বা চিন্তা করছি, সেটা বলবই। আগে সে-বিষয়ে যা-ই বলে থাকি না কেন। ... আমার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন যেমন পরিষ্কার হতে থাকে, প্রত্যহ চর্চা ক'রে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকেও তেমনি স্বচ্ছ করতে হবে'।[১] তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর অসঙ্গতিগুলিও দিব্যি বোঝা যায়। লিখেছেন: 'মনে হয়, আমার অসংগতিগুলি কোনও নিয়ম মেনে চলে'।[২] তাঁর অধ্যাত্মভাবনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল আপসধর্মিতা, যা থেকে কিছু কিছু অসঙ্গতি উদ্ভূত হতো। তিনি বলেছেন, 'সারাটা জীবন সত্যের উপর জোর দিয়েছি। তাই আমাকে শিখিয়েছে আপস করার সৌন্দর্য'।[৩] সত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করেন বলে অন্যের মতাদর্শে যা সত্য, তা চিনতে পারেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, কিছু নীতি চিরকালীন। তাতে আপসরফার জায়গা নেই। এ কাজ করার জন্য প্রয়োজনে মানুষের জীবন দান করা উচিত। গান্ধী-মানসের প্রহেলিকা, তাঁর আত্মার প্রহেলিকাও বটে। *Le coeur a ses raison, que la raison ne connalit point.*[৪] ছড়ানো-ছেটানো লেখা ও উক্তি থেকে তাঁর দর্শনকে সংশ্লেষিত করতে হবে। নিজ বিশ্বাস বিষয়ে, বসে একটি পূর্ণ বিবরণী তিনি কদাচ লিখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীর নাম "সত্য নিয়ে আমার পরীক্ষানিরীক্ষার কাহিনী" বলে দেয় যে, তিনি নিজেকে এক অনুসন্ধানকারী মনে করেন মাত্র। অন্যাদের সঙ্গে স্বীয় অভিজ্ঞতা আলোচনা করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত; উদ্বিগ্নও বটেন। তবে কখনও দাবি করেন না যে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। রাজনীতিক কারণে যে সময়ে এক জাতীয় নেতার নীরব থাকা, বা অন্য কোনও মত প্রকাশ করা দরকার ছিল, সে-সময়ে তিনি যেভাবে মনের কথা বলেছেন, তাতে তাঁকে

অনেকসময়েই দায়িত্বহীনতার দোষে দোষী করা হয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন, যা সত্য বলে বুঝেছে, তা বলা প্রত্যেক লোকের কর্তব্য। উদ্দেশ্য যদি খাঁটি হয়, তবে তা থেকে কোনও ক্ষতি হতে পারে না। 'আমি বিশ্বাস করি, সকল সদিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ ভুল করে বসে, সে ভুল থেকে পৃথিবীর কেন, কোনও ব্যক্তিরও ক্ষতি হয় না'।[৫] বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ ও ভুল করার যে নীতি, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সেই নীতিই তিনি অনুসরণ করতেন। যদিও শেষ উত্তরে তিনি পৌঁছতে পারেননি তথাপি, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের পরেও যে-মহাকাশচারী অকুতোভয়ে বলেন, চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যদূরত্ব ২,৩৮,৮৫৭ মাইল—ঠিক তারই মতো গান্ধীও সত্য নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার পর এমন একটা স্তরে পৌঁছন, যখন তাঁর নৈতিক রায় হয়ে ওঠে কঠোর ও আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ। তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি সত্য, প্রেম ও শ্রম, এই তিন নক্ষত্রের নির্দেশে চলেন। তিনি বলেছেন, 'আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য যতিহীন প্রচেষ্টা চালাবার পর আমার সামান্য ক্ষমতা জন্মেছে, অন্তরতম অন্তরের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই'।[৬] আর সে-কণ্ঠস্বর তাঁর ক্ষেত্রে সত্য, প্রেম ও ঈশ্বর— এ-ওর অঙ্গাঙ্গী। 'আমার লক্ষ্য, বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন'।[৭] 'মানব চরিত্রকে সন্দেহ করতে আমি নারাজ। যে কোনও বন্ধুত্বপূর্ণ মহান কাজে তা সাড়া দিতে বাধ্য।'[৮] শেষ অবধি তাঁর বিশ্বাস, 'কর্মময়তার উপর যত গুরুত্বই দেওয়া হোক, কখনওই তা যথেষ্ট নয়'।[৯] 'সবাই যদি নিজের রুটির জন্যই শুধু কাজ করত, আর কিছু নয়, তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য, যথেষ্ট অবসর সময় থাকত'।[১০] 'আমাদের চাহিদা হতো ন্যূনতম, খাবার হতো সাদাসিধা। বাঁচার জন্যে খাওয়া উচিত, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। ব্যক্তি-আত্মার মুক্তির জন্য গান্ধীজি উদ্বিগ্ন। তাঁর মতে, অনাড়ম্বর জীবনযাপনের থেকে উচ্চ চিন্তা পৃথক করা চলে না। 'আমি বৃদ্ধি চাই, আমি দৃঢ় আত্মসংকল্প চাই। আমি স্বাধীনতা চাই। তবে এসবকিছুই চাই আত্মার জন্য।'[১২]

এই রচনা সংকলন কিভাবে করা হল তা লেখা দরকার। বারো বছরেরও আগে আমাদের একজনের মনে হল, গান্ধীজি তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় যে-সব 'চিরকালীন সত্য' প্রকাশ করেছেন, তার একটি সুষ্ঠু সংকলন করা উচিত। যাতে সেগুলিতে নিহিত দার্শনিক চিন্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গান্ধীবাদী জীবনদর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে জানা যায়। বারোটি খণ্ডের কথা ভাবা হয়। তাতে সত্য, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, প্রেম, বিশ্বাস, ত্যাগ, স্বাধীনতা, অনশন, প্রার্থনা, ব্রহ্মচর্য, শ্রম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধীজির চিন্তা জানা যাবে। আবার একটি স্বতন্ত্র খণ্ডের কথাও ভাবা হয়, যাতে ওই সকল প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তার সারসংক্ষেপ থাকবে। উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। কয়েকবছরেই বোঝা গেল এ কাজ বিশাল। একজন সহকর্মীকে নেওয়া দরকার হল। সেই থেকে দু'জনেই অক্লান্ত খেটে গেছি। শেষ দু'বছরে পরিস্থিতির চাপে দু'জনেই বাধ্য হলাম শেষ খণ্ডটির বিষয়ে মনোনিবেশ করতে। এতে গান্ধীজির সকল শিক্ষার

সারাংশ আছে। এবং এটিই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হল। মূল পরিকল্পনার চেয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে।

এ বইয়ের প্রুফ গান্ধীজিকে দেওয়া হতো, তিনি দেখতেন। এ-কাজ অনুমোদন করেছেন, তাঁকে, এবং নবজীবন ট্রাস্টি গান্ধীজির লেখা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা শ্রী কানু-গান্ধীর কাছেও কৃতজ্ঞ, তিনি তাঁর তোলা গান্ধীজির একখানি ছবি এ-গ্রন্থে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

আর. কে. পি.

ইউ. আর. আর.

১. হরিজন, ২৮.৯.১৯৩৪,পৃ. ২৬০
২. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩.২.১৯৩০,পৃ. ৫২
৩. অ্যান অটোবায়োগ্রফি, পৃ. ১০৭
৪. পাসকাল, পেঁসীজ, পৃ. ২৭৭; 'হৃদয়ের যুক্তি থাকে, যে বিষয়ে যুক্তি কিছু জানে না'।
৫. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩.১.১৯২৯, পৃ. ৬
৬. দি এপিক ফাস্ট, পৃ. ৩৪
৭. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০.৩.১৯২০, পৃ. ৫
৮. তদেব, ৪.৮.১৯২০,পৃ. ৫
৯. হরিজন, ২.১১. ১৯৩৫, পৃ. ২৯৮
১০. তদেব, ২৯.৬.১৯৩৫, পৃ. ১৫৬
১১. তদেব
১২. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩.১০. ১৯২১, পৃ. ৩২৫

পাঠকদের উদ্দেশে

আমার লেখার নিষ্ঠ পাঠক এবং অন্যান্য যাঁরা এই রচনায় আগ্রহী, তাঁদের আমি বলে নিতে চাই যে সুসঙ্গতি বজায় রাখার জন্য আমার আদপেই কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার সত্যানুসন্ধানের পথে বহু ধারণাকে আমি বিসর্জন দিয়েছি এবং নতুন অনেক কিছু শিখেছি। বয়সের হিসেবে বৃদ্ধ হলেও আমার এমন কখনওই মনে হয় না যে অন্তরের অন্তস্তলে আমার বিকাশ স্তব্ধ হয়েছে, বা এই দেহের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বিকাশ বন্ধ হবে। আমার শুধু চিন্তা, সত্যের, আমার ঈশ্বরের আদেশ প্রতি মুহূর্তে পালন করার জন্য আমি সদাপ্রস্তুত থাকতে পারব কি-না। তাই, কেউ যদি আমার যে-কোনও দুটি রচনার মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে পান, পাবার পরেও আমার প্রকৃতিস্থতায় তাঁর যদি আস্থা থাকে, তাহলে একই বিষয়ে আমার দুটি রচনার মধ্যে পরেরটি নির্বাচন করলে তিনি ঠিক করবেন বলে মনে হয়।

মো. ক. গান্ধী

হরিজন, ২৯.৪.১৯৩৩, পৃ. ২

১. নিজের প্রসঙ্গে

১. না সন্ত, না পাপী

আমার মনে হয় যে বর্তমান জীবন থেকে "সন্ত" শব্দটি একেবারে খারিজ করে দেওয়া উচিত। হেলাফেলা করে কারও নামের সঙ্গে তকমার মতো লাগিয়ে দেবার পক্ষে শব্দটি বড় বেশি পবিত্র। এবং আমার মতো একজনের ক্ষেত্রে এটা করা তো আরও-ই অনুচিত। যার দাবি এইটুকু, যে সে একজন বিনম্র সত্যানুসন্ধানী, সে জানে নিজের সীমাবদ্ধতা, ভুল করে, যখন করে তখন তা স্বীকার করতে ইতস্তত করে না। এবং অকপটে স্বীকার করে, যে-কোনও বিজ্ঞানীর মতোই সে জীবনের "চিরন্তন সত্যে"র মাত্র কয়েকটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। কিন্তু সে নিজেকে একজন বিজ্ঞানী বলে দাবি অবধি করতে পারে না, কেননা তার পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ততা নিয়ে কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ, আধুনিক বিজ্ঞানের দাবি অনুযায়ী তার পরীক্ষার কোনও সুস্পষ্ট ফল সে দেখাতে পারে না।[১]

আমার ওপরে সন্তের পোশাক চাপিয়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু এখনও তার সময় আসেনি। আকারে বা প্রকারে নিজেকে আমার আদৌ কোনও সন্ত বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি অনুভব করি, কাজ-করার এবং কাজ-বাদ-দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার নিজের নানা ভুলভ্রান্তি ঘটলেও, আমি সত্যের উপাসক।

সত্যের নীতি

আমি "সন্তের পোশাক-পরা রাজনীতিক" নই। কিন্তু সত্যই যেহেতু প্রজ্ঞার শেষ কথা, তাই কখনও কখনও আমার (সত্যাশ্রয়ী) ক্রিয়াকলাপ সর্বোত্তম রাজনীতিক প্রজ্ঞার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমার ধারণা, আমার মধ্যে সত্য ও অহিংসার নীতি ব্যতীত অন্য কোনও নীতি নেই। এমন কি, ধর্ম বা দেশোদ্ধারের জন্যও আমি সত্য ও অহিংসাকে বর্জন করতে পারব না। অর্থাৎ ওইভাবে দুইয়ের কোনওটিকেই উদ্ধার করা সম্ভব নয়।[২]

আমার জীবনে বৈপরীত্য বা অপ্রকৃতিস্থতা আমার চোখে পড়ে না। অবশ্য এ-কথা সত্য, একজন মানুষ যেমন তার পিঠের দিকটা দেখতে পায় না, তেমনি নিজের ভুলভ্রান্তি

ও অপ্রকৃতিস্থতাও বুঝতে পারে না। প্রাজ্ঞজনেরা প্রায়শই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে বাতুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু আমি এই বিশ্বাসই আঁকড়ে রয়েছি যে, বোধ হয় আমি পাগল নই এবং হয়তো আমি যথার্থ ধর্মপ্রাণ। দুইয়েব মধ্যে সত্যই আমি কী, তা নির্ধারিত হবে আমার মৃত্যুর পর।[৩]

আমার মনে হয়, অহিংসার তুলনায় সত্যের আদর্শকেই আমি ভালো বুঝি। আর আমার অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে, সত্যের প্রতি আমার যে আনুগত্য, তাকে যদি আমি শিথিল হতে দিই, তাহলে কোনওদিনই অহিংসার দুরূহ জটিল রহস্য ভেদ করতে পারব না..... অন্যভাবে বললে হয়তো বলা যায়, সোজা পথ অনুসরণ করার সাহস আমার নেই। দুটোরই অর্থ অবশ্য শেষপর্যন্ত এক এবং অভিন্ন। কাবণ, সন্দেহ সর্বদাই বিশ্বাসের অভাব ও দুর্বলতার পরিণাম। তাই আমার দিবারাত্রির প্রার্থনা, "ঈশ্বর, আমাকে বিশ্বাস দাও।"[৪]

আমার দাবি, শৈশব থেকেই আমি সত্যের উপাসক। আমার কাছে ওটা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। "ঈশ্বরই সত্য" এই প্রচলিত নীতিবাক্যের বদলে আমার প্রার্থনা এবং অন্বেষণের ফলে আমি এই মহান নীতিতে পৌঁছেছি যে, "সত্যই ঈশ্বর"। এই নীতিবাক্যের জন্যই আমি ঈশ্বরকে যেন মুখোমুখি দেখার শক্তি পেয়েছি। আমার সত্তার প্রতিটি কণায় আমি তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি।[৫]

সত্যে অবিচল বিশ্বাস

সত্যের যে জয় হবে সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ হয়তো আমি দেখাতে পারি না। তবু আমার অটল বিশ্বাসের পরিণামে সত্যই যে বলীয়ান হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আমি আশাবাদী .... আমাদের প্রেরণা আসতে পারে একমাত্র এই বিশ্বাস থেকেই যে শেষ অবধি সত্যেরই জয় হবে।[৬]

যে কারণেই হোক, মানবজাতির মধ্যে আমি মহত্তম ব্যক্তিদের আকর্ষণ করতে পারি বলে ঈশ্বর ও মানব চরিত্রে আমার বিশ্বাস ধরে রাখার শক্তি পাই।[৭]

আমি সন্ন্যাসী নই

কখনওই সন্ন্যাসী বলে আমি নিজেকে বর্ণনা করিনি। সন্ন্যাসের জন্য অনেক কঠোরতর বস্তুর প্রয়োজন। নিজেকে আমি একজন গৃহী বলে মনে করি, যে সেবাকর্মের সরল জীবন যাপন করে। আমার সহকর্মীদের মতোই, আমিও বন্ধুবান্ধবের দানধ্যানের ওপর নির্ভর করে বাঁচি।..... যে জীবন আমি যাপন করছি, তা খুবই সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, অবশ্য সরলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বলতে একটি মানসিক অবস্থাকেই বোঝায়। ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে আমার তিলমাত্র ভাবনা নেই। যা কিছু দরকার, তার সবই আমার আছে।[৮]

আমার কৌপীন আমার জীবনের ক্রমবিকাশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। এটা ঘটেছে খুব স্বাভাবিকভাবে, বিনা চেষ্টায়, আগে থেকে ভাবনাচিন্তা না করেই।[৯]

বিশেষ সুযোগসুবিধা নেওয়া, আর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করাকে আমি ঘৃণা করি। যা জনগণের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না, তাই আমার কাছে নিষিদ্ধ।[১০]

আমাকে সন্ন্যাসী বললে ভুল বলা হবে। যে আদর্শগুলি আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, তা সাধারণভাবে সব মানুষই ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারে। আমার জীবনের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আমি এই আদর্শগুলিতে পৌঁছেছি। অনেক ভাবনাচিন্তার পর, নানা দিক বিবেচনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল।

ইন্দ্রিয়সংযম এবং অহিংসা, দুটোই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত এবং সর্বসাধারণের প্রতি কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়েই এগুলির প্রয়োজন হয়েছিল। গৃহী, আইনজীবী, সমাজসংস্কারক, বা রাজনীতিক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বিচ্ছিন্ন জীবন আমাকে কাটাতে হয়েছিল, তাব দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার জন্য দরকার ছিল যৌনজীবনেব কঠোরতম নিয়ন্ত্রণ তাছাড়া, কী আমার দেশবাসী, কী ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোবভাবে অহিংসা ও সত্যের আদর্শ পালন করার প্রয়োজন হয়েছিল।[১১]

আমাব জীবন নিরন্তর কর্মেব মধ্যে আনন্দে পরিপূর্ণ। আগামীকাল আমার জন্য কী নিয়ে আসবে তা ভাবি বলে মনে হয় না। আমি এক বিহঙ্গের মতোই স্বাধীন .... ইন্দ্রিযলালসার চাহিদাব বিরুদ্ধে আমি নিবন্তর সততার সঙ্গে সংগ্রাম করছি, এই চিন্তাই আমাকে শক্তি জোগায়।[১২]

প্রত্যয়হীন কর্ম হল সেই খাদেব তলদেশ, যা অতলান্ত।[১৩]

অহং বিসর্জন

আমি জানি যে, আমার সামনে এখনও কঠিন পথ পড়ে আছে অতিক্রম করার জন্য। নিজেকে নিঃশেষে অহং-মুক্ত করতেই হবে। যতদিন না মানুষ স্বেচ্ছায় তার সকল সহযাত্রীব একেবারে পিছনে নিয়ে গিয়ে নিজেকে দাঁড় করাতে পারছে, ততদিন তার মুক্তি নেই। বিনয়ের শেষ সীমা হল অহিংসা।[১৪]

আমবা যদি ধর্ম, বাজনীতি, অর্থনীতি থেকে "আমি", "আমার" শব্দগুলি মুছে ফেলতে পারি, তাহলে অচিরেই মুক্ত হতে পারব, পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপনে সক্ষম হব।[১৫]

মহাসাগরের এক বিন্দু জলেও তার ধারয়িত্রীব মহানতা আছে, যদিও সে তা জানে না। কিন্তু মহাসাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেই সে সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়। যখন বলি, জীবন এক বুদ্বুদ মাত্র, আমবা কিছু বাড়িয়ে বলি না।

সত্যসন্ধানীর অহংসর্বস্ব হওয়া চলবে না। যে পরস্য পরের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবে, খ্যাতনামাদের তালিকায় নিজের নাম খোদাই করবার সময় তার কোথায়![১৬]

ব্যক্তির ক্ষমতা সীমিত। যে মুহূর্তে সে আত্মস্তুতি করবে যে, তার দ্বারা সব কাজই সম্ভব, তখনই ঈশ্বর তার দর্প চূর্ণ করবেন। তবে আমার নিজের মধ্যে বিনয়ের অভাব নেই। বরং এতটাই আছে যে, আমি ছোট ছেলেমেয়ে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর কাছেও সাহায্য চাইতে পারি।[১৭]

ভবিতব্যই আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়। আমি নিজে তা খুঁজতে যাই না। না চাইলেও সেগুলি যেন এসে হাজির হয়। সারা জীবন আমার ভাগ্যে তা-ই ঘটেছে, কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর।[১৮]

যৎসামান্য পুঁথিগত বিদ্যা

আমার সীমাবদ্ধতা আমি স্বীকার করি। বলবার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমার নেই। হাই স্কুল জীবনেও আমি সাধারণদের চেয়ে উচ্চমানের ছিলাম না। পরীক্ষায় পাস করতে পারলেই আমি ধন্য হয়ে যেতাম। স্কুলে উল্লেখযোগ্য ফল করা আমার কাছে ছিল আশাতীত।[১৯]

ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বলতে গেলে কিছুই আমি পড়িনি। এবং তার পরে, কর্মময় জীবনে যখন প্রবেশ করলাম, তখন পড়ার সময় খুব কমই থাকত। তাই, পুঁথিগত জ্ঞানের দাবি আমি বেশি করতে পারি না। তবুও আমি বিশ্বাস করি যে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই বাধার ফলে খুব বেশি কিছু আমি হারাইনি। বরং ওই সীমিত পড়াশোনার ফলে, যতটুকু পড়েছিলাম, তা বোধ হয় সবই আত্মস্থ করতে পেরেছিলাম।

এই সব বইয়ের মধ্যে যে বইটি পড়ামাত্রই কার্যত, আমার জীবনে এক পরিবর্তন এনে দেয়, তা হল 'আনটু দিস লাস্ট'। পরে আমি এটি গুজরাটিতে অনুবাদ করি, নাম দিই "সর্বোদয" (সার্বিক মঙ্গল)। মনে হয়, রাস্কিনের এই মহৎ গ্রন্থের মধ্যে আমার নিজস্ব কিছু গভীর বিশ্বাসের প্রতিফলন আবিষ্কার করেছিলাম, আর সেই জন্যই বইটি আমাকে অমন অভিভূত ক'রে নিজের জীবন পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল।[২০]

তখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতাম। ১৯০৪ সাল। আমার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। রেলগাড়িতে ডারবান যাবার পথে "আনটু দিস লাস্ট" পড়ার ফলে, আমাকে নিজের সমগ্র বহির্জীবন পালটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রাস্কিনের কথাগুলি আমাকে বিমোহিত করেছিল, আর কিছু ব'লে এটা বোঝানো যাবে না। বইটি আমি একবারে টানা পড়ে শেষ করি, পরের রাতটা জেগেই শুয়ে থাকি, আর তখনই ঠিক করি, জীবনের সমগ্র ছকটা পালটে ফেলব। তলস্তয় আমি অনেক আগেই পড়েছিলাম। তিনি আমার অন্তর্সত্তাকে প্রভাবিত করেন।[২১]

দরিদ্রনারায়ণের সেবা

হৃদয়ের ঐকান্তিক ও শুদ্ধ অভীপ্সা সবসময়ই চরিতার্থ হয়। নিজের অভিজ্ঞতায় আমি প্রায়ই এই নিয়মের প্রমাণ পেয়েছি। বরাবরই আমার গরিবের সেবা করার গভীর, আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তা সবসময়ে গরিবদের মধ্যেই ঠেলে দিয়েছে আমাকে, ওদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করার ক্ষমতা দিয়েছে।[২২]

গরিবদের জন্য অপরিসীম ভালবাসা আমার সারাজীবন ধরেই রয়েছে। আমার অতীত জীবন থেকে একের পর এক উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাতে পারি যে, এটা ছিল আমার

সহজাত। কখনও মনে হয়নি, একজন গরিব ও আমার মধ্যে কোনও ব্যবধান আছে। সবসময়ে মনে হয়েছে ওরা যেন আমার আপনজন।[২৩]

পৃথিবীর এই নশ্বর রাজ্যপাট আমাকে আকর্ষণ করে না। আমি স্বর্গের সাম্রাজ্য কামনা করেছি, যার নাম মোক্ষ। এ-লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনও গুহার আশ্রয়ের আমার দরকার নেই। হয়তো তা নিজের সঙ্গেই বহন করে চলি, শুধু যদি তা জানতাম!

গুহাবাসী কেউ বাতাসে দুর্গ গড়তে পারে। কিন্তু জনকের মতো এক প্রাসাদবাসীর কোনও দুর্গ গড়ার প্রয়োজন নেই। মনের ডানায় ভর করে যে গুহাবাসী দুনিয়াময় ঘুরে বেড়ায়, তার কোনও শান্তি মেলে না। অথচ, একজন জনক, "আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের" মধ্যে থেকেও হয়তো সেই শান্তি পান, যা বোধের অতীত।

দেশসেবা, ও তার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির জন্য নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করে চলাই আমার কাছে মোক্ষলাভের পথ। প্রাণীমাত্রের সঙ্গেই আমি একাত্ম হতে চাই।[২৪]

আমার জীবন হল এক অবিভাজ্য সমগ্র, আমার সকল কাজকর্মই একে-অপরের পরিপূরক, এবং এই সব কিছুর মূলে আছে মানবজাতির প্রতি আমার তৃপ্তিহীন ভালবাসা।[২৫]

আমাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার ব্যাপারটা সারা জীবন সহ্য করতে হয়েছে। প্রতি জনসেবকের কপালেই এটা জোটে। তার গায়ের চামড়া পুরু হওয়া দরকার। প্রতিটি মিথ্যা রটনাব যদি জবাব দিতে হয়, তাহলে জীবন এক বোঝায় পরিণত হবে। আমার জীবনের এক নীতি হল, যদি ভুল শোধরাবার দরকার না-হয়, তবে মিথ্যা রটনার বিরুদ্ধে জবাবদিহি না-করা। এই নীতি মেনে চলার ফলে আমার অনেক সময় ও দুশ্চিন্তা বেঁচেছে।[২৬]

আমাকে অনেকে জানে ছিটেল, বাতিকগ্রস্ত, পাগল হিসেবে। স্পষ্টতই এ-সুনাম আমার প্রাপ্য। কাবণ আমি যেখানেই যাই, আমার কাছে ছিটেল, বাতিকগ্রস্ত, পাগলরা এসে জোটে।[২৭]

বাস্তববাদী স্বপ্নবিলাসী

আমি চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বে, তথা-মানবজাতির একত্বে বিশ্বাসী। অসংখ্য দেহে আমরা বিভক্ত হলে কী হবে? আমাদের একই আত্মা। প্রতিসরণের ফলে সূর্যের তো কতই রশ্মি, কিন্তু তাদের উৎস তো একটাই। অতএব আমি জঘন্যতম পাপাত্মার সঙ্গেও সম্পর্ককে অস্বীকাব করতে পারি না (তেমনিই যেন মহত্তম পুণ্যাত্মার সঙ্গেও আমার একাত্মতা অস্বীকার না করা হয়)। তাই, চাই বা না-চাই, আমার পরীক্ষার সঙ্গে আমার সমগ্র স্বজাতিকে জড়িয়ে না-ফেলে পারি না। ওদিকে, পরীক্ষা না-চালানোও আমার পক্ষে অসম্ভব। জীবন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক অন্তহীন ধারা।[২৮]

আমার সকল দোষত্রুটি নিয়েই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আমি এক সত্যান্বেষী। সেরা সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হিমালয় অভিযানগুলির চেয়ে আমাব কাছে আমার পরীক্ষাগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[২৯]

আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে এটা দুনিয়াকে চমকে দেবার ব্যাপার হয়েছে। নতুন পরীক্ষা, অথবা নতুন ভঙ্গিতে পুরাতনের পরীক্ষাতে অবশ্যই মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে।[৩০]

আমি সত্যিই এক বাস্তববাদী স্বপ্নবিলাসী। আমার স্বপ্নগুলি বায়বীয় অলীক নয়। যতদূর সম্ভব আমার স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়িত করতে চাই।[৩১]

আমার কোনও কাজ, যা আত্মিক বলে দাবি করে, তা যদি অবাস্তব বলে প্রমাণ হয়, তাকে ব্যর্থ বলেই ঘোষণা করতে হবে। আমার বিশ্বাস, যে কাজ সর্বাধিক আধ্যাত্মিক তা সবচেয়ে বাস্তবোচিতও বটে।[৩২]

আমার ভ্রান্তিপ্রবণতা

নিজেকে এক সামান্য ব্যক্তি বলে মনে করি। যে অপরাপর যে-কোনও নশ্বর মানুষের মতোই ভুল করতে পারে। তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করব, ভুল স্বীকার করার, এবং সে-পথ থেকে সরে আসার মতো পর্যাপ্ত বিনয় আমার আছে। এটাও স্বীকার করি, ঈশ্বর ও তাঁর মঙ্গলময়তায় আমার অবিচল বিশ্বাস আছে, আছে সত্য ও প্রেমের জন্য অপরিমেয় তৃষ্ণা। তবে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই কি এগুলি নিহিত নেই?[৩৩]

যাঁরা খুব ভাসা-ভাসা ভাবেও আমার কর্মকৃতির পরিচয় রেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয় এটা দেখতে ভোলেননি যে, কোনও ব্যক্তি বা জাতির ক্ষতি করার জন্য আমার জীবনে একটি কাজও করা হয়নি। ...কখনওই এ দাবি করি না যে, আমি অভ্রান্ত। পর্বতপ্রমাণ ভুল করেছি সে আমি জানি। কিন্তু সেগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, অথবা কোনও ব্যক্তি বা জাতির প্রতি, কিংবা মানব অথবা মানবেতর প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষবশত করেছি বলে আমার জানা নেই।[৩৪]

আমার বহু পাপ আমি অকপটে স্বীকার করেছি। কিন্তু সে পাপের ভার আমি বহন করি না। আমার যাত্রা যদি ঈশ্বরের অভিমুখেই হয়ে থাকে, আমার তা-ই মনে হয়, তাহলে আমাকে ঘিরে আছে ববাভয়। কেননা তাঁব অস্তিত্বের সূর্যকিরণের তাপ আমি অনুভব করেছি।

আমি জানি যে, আমার কৃচ্ছ্রসাধন, অনশন ও প্রার্থনার কোনও মূল্য থাকবে না যদি নিজেকে সংশোধনের জন্য এগুলির উপর নির্ভর করি। কিন্তু এর মূল্য তখনই অপরিমেয়, যখন তা সৃষ্টিকর্তার কোলে ক্লান্ত মাথা রাখার জন্য একটি আত্মার প্রার্থনার পরিচয়বাহী হয়। আশা করি, এগুলি সত্যিই তাই।[৩৫]

'বসুধৈব কুটুম্বকম্'

যখনই দেখি কোনও মানুষ ভুল করছে, আমি নিজেকে বলি, আমিও ভুল করেছি। যখন দেখি কেউ কামুক, নিজেকে বলি, আমিও এক সময়ে অমনই ছিলাম। এইভাবে বিশ্বের সঙ্গে আমি একাত্মতা অনুভব করি, এবং ভাবি, আমাদের মধ্যে যে দীনস্য দীন, সে আনন্দ না পেলে আমিও আনন্দিত হতে পারব না।[৩৬]

যদি কাউকে আমি তার প্রাপ্যের চেয়ে কম দিই, তাহলে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে আমার ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্তার কাছে। তবে আমি নিশ্চিত যে, তিনি যদি জানেন, কাউকে দিয়েছি তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি, তাহলে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন।[৩৭]

আমি যে প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, তার অসম্পূর্ণতাগুলি সম্বন্ধে আমি এত বেশি সচেতন

যে তার কোনও একটি সদস্যের সম্বন্ধে বিরক্তি পোষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার পদ্ধতি হল, যেখানেই অন্যায় দেখি, তার মোকাবিলা করি, অন্যায়কারীকে আঘাত করি না। একইভাবে, নিজে ক্রমাগত যে অন্যায়গুলি করে চলি, তার জন্য আমাকে আঘাত করলে আমার ভালো লাগবে না।[৩৮]

আমি সততার সঙ্গে বলতে পারি, অপরাপর মানুষের মধ্যে যে দোষত্রুটি রয়েছে, সেগুলি চোখে পড়তে অনেক সময় লাগে আমার। কেননা নিজের মধ্যেই ওইসব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অতএব সবসময়েই আমি তাদের করুণাপ্রার্থী। আমি শিখেছি, কাউকে রূঢ়ভাবে বিচার করতে নেই এবং তাদের মধ্যে যে দোষত্রুটি দেখতে পাই, তা দেখি উদার মনে।[৩৯]

প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা

মতানৈক্যের অর্থ কখনওই বৈরিতা নয়। তা যদি হতো, আমি ও আমার স্ত্রী পরস্পরের চরম শত্রু হতাম। দুনিয়ায় এমন দু'জন মানুষকেও চিনি না যাদের মতানৈক্য হয়নি। যেহেতু আমি 'গীতা' অনুসরণকারী, সবসময়ে চেষ্টা করেছি যাদেব সঙ্গে আমার মতানৈক্য ঘটে, আমার প্রিয়জনদেব মতো তাদেরও সমান স্নেহের চোখে দেখতে।[৪০]

যাদের নীতি ও কার্যপ্রণালীর আমি বিরোধী, সাধারণত তাদের স্নেহ ও আস্থা আমি পেয়ে থাকি, এটা আমাকে অশেষ তৃপ্তি দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীরা ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল।

ব্রিটিশ নীতি ও ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আমি হাজার হাজার ইংরেজ নাবী ও পুরুষেব স্নেহভাজন। আধুনিক জড়বাদী সভ্যতাকে নির্বিচার অভিশাপ দেওয়া সত্ত্বেও ইউবোপীয় ও আমেরিকান বন্ধুদেব সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এটাও সেই অহিংসারই জয়।[৪১]

যা কিছু প্রাণময় তাকে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করতে পারি না, সাথী মানুষদেব তো নয়-ই, যদিও তারা হয়তো আমার বা আমার আপনজনের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করে বসল।[৪২]

বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমার একটি কাজের দিকেও আঙুল তুলে কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়, যে কাজটি কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রোশবশত করা হয়েছে। কোনও মানুষকে কখনও শত্রু বলে ভাবিনি। আমার বিশ্বাসের নির্দেশেই কাউকে শত্রু ভাবব না। যা-কিছু প্রাণময় তার অনিষ্ট কামনা করব না।[৪৩]

২. আমার মহাত্মা পর্ব

মহাত্মা নই

আমি নিজেকে তা (মহাত্মা) ভাবি না। তবে জানি, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে দীনাতিতম দীনদের মধ্যে আমি আছি।[৪৪]

প্রায়ই ওই উপাধি আমাকে গভীর যন্ত্রণা দিয়েছে। এমন একটি মুহূর্তও মনে পড়ে না, যখন ওই উপাধি স্মরণ করে আমি পুলকিত হয়েছি।[৪৫]

আমার মহাত্মাগিরি একেবারে মূল্যহীন। আমার বাইরের কাজকর্ম, আমার রাজনীতির জন্যই এ-উপাধি, কিন্তু সেগুলি আমার সামান্যতম এক অংশ। অতএব এর বিলয় অনিবার্য। যার স্থায়ী মূল্য রয়েছে, তা হল সত্য, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য বিষয়ে আমার বক্তব্য, যা আমার প্রকৃত এক অংশ। আমার এই অংশটি যতই ক্ষুদ্র হোক, কিন্তু নিন্দার্হ নয়। এটাই আমার সব। আমার বিফলতা ও মোহভঙ্গের ঘটনাগুলিকেও আমি মূল্যবান মনে করি। কারণ এগুলি সাফল্যের পথে সোপান।[৪৬]

পুরুষ তথা নারীসহ নীরব, নিষ্ঠাবান দক্ষ ও নিষ্পাপ কর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও নীরস কাজ ক'রে চলার ওপর আমাব তথাকথিত মহত্ত্ব যে কতখানি নির্ভরশীল, সে খবর পৃথিবী সামান্যই রাখে।[৪৭]

মহাত্মাগিরি আমার কাছে নিছক একটি বোঝা। তার চেয়ে সত্য আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয়। স্বীয় সীমাবদ্ধতা ও অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে আমি সম্যক অবহিত। এ পর্যন্ত সেটাই আমাকে মহাত্মাগিরির গুরুভার থেকে বাঁচিয়েছে।[৪৮]

স্তুতিতে বিরক্তি

অবিবেচক অসংখ্য মানুষের স্তুতি শুনতে শুনতে আক্ষরিক অর্থেই আমি বিরক্ত। বরং ওরা যদি আমার গায়ে থুথু দিত, তাতেও পায়ের নিচে জমি আছে ভেবে ভরসা পেতাম। তাহলে পর্বতপ্রমাণ ও অন্যান্য ভুলের কথা আমাকে স্বীকার করতে হতো না, আবার পিছু-হাঁটতে হতো না, সব কাজ ঢেলে সাজাতে হতো না।[৪৯]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আমার গুণগান করতে গিয়ে এমন কিছু বিশেষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা বহন করার সামর্থ্য আমার নেই। এগুলির প্রয়োগ না লেখকদের মঙ্গল করে, না আমার। এটা অকারণে আমাকে অপমান করার সামিল, কেননা আমি এর যোগ্য নই। যখন এর পিছনে সঙ্গত কারণ থাকে, তখনও তার প্রয়োগ নিতান্ত অনাবশ্যক। কারণ, আমার যে গুণাবলী আছে, তাতে এগুলি কোনও নতুন শক্তি সঞ্চার করে না। বরঞ্চ আমি সতর্ক না থাকলে এই স্তুতি সহজেই আমার মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। কোনও মানুষ যখন কোনও ভালো কাজ করে, তখন সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেয়। অনুকরণের চেয়ে অকৃত্রিম চাটুকারিতা আর কিছু নেই।[৫০]

মহাত্মাটিকে, তার নিজের ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে না দিয়ে আমার উপায় নেই। এমন একটি আইন যদি প্রণীত হয়, কেউ আমাকে মহাত্মা বললে এবং পায়ে হাত দিলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবে, তাহলে একজন অসহযোগী হয়েও আমি সানন্দে সে আইন সমর্থন করব। আশ্রমে, অর্থাৎ আমি যেখানে নিজে আইন জারি করতে পারি, সেখানে এ-হেন আচরণ অপরাধ বলে গণ্য।[৫১]

যথার্থ সম্মান

আমার বন্ধুরা আমাকে সর্বোচ্চ যে সম্মান দিতে পারে, তা হল, আমি যে কর্মসূচীর সমর্থক, তাদের স্ব-জীবনে তার বাস্তবায়ন, অথবা যদি তারা এতে বিশ্বাস না করে, তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ।[৫২]

কোনও মানুষের, মাটি বা ধাতুর মূর্তিস্থাপন...অর্থের অপচয়। মানুষটাই তো মাটির তৈরি। একগাছা হাতের চুড়ির চেয়েও ভঙ্গুর। চুড়িটি সযত্নে সংরক্ষণ করলে হাজার বছর অটুট থাকতে পারে। অন্যদিকে মানব দেহ প্রত্যহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নির্দিষ্ট আয়ুঃসীমা পেরোলে নিঃশেষে লয় পায়। আমাব নিজেব মূর্তি ও আলোকচিত্রের প্রতি এই বিরাগ...আমি শিখেছি আমাব সেই সব মুসলিম বন্ধুদেব কাছে, যাঁদের সঙ্গে আমি জীবনেব শ্রেষ্ঠ সময়কাল কাটিয়েছি।

যাবা আমাব মূর্তি ও প্রতিকৃতি স্থাপন করে আমাকে সম্মান জানাতে চায়, ওই পংক্তিগুলি পড়ে তাবা যেন মনে রাখে, আমি মনেপ্রাণে এই সব প্রদর্শনী অপছন্দ কবি। যারা আমাকে বিশ্বাস করে, তারা যদি অনুগ্রহ ক'রে আমার আরব্ধ কর্মকাণ্ডেব শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়, তাহলেই আমি কৃতার্থ হব।[৫৩]

আমি 'অবতার' নই

আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলে বর্ণনা কবলে, তাকে আমি ঈশ্বরনিন্দা বলে মনে করি। এক মহান লক্ষ্যের পথে অনেকেব মতো আমিও নিজেকে এক সাধারণ কর্মী বলে মনে কবি। এ-কাজেব নেতাদেব মহিমান্বিত কবলে অভীষ্টলাভের সাধনা এগোবে না, বরং ক্ষতিগ্রস্তই হবে। একটি আদর্শ তখনই সফল হওয়া সম্ভব, যখন তা নিজস্ব গুণাবলীর ভিত্তিতেই যাচাই এবং অনুসবণ করা হয়। এক প্রগতিশীল সমাজে, কার্যপ্রণালীকে সর্বদা মানুষের ওপরে স্থান দিতে হবে। কারণ, মানুষ তো শেষ বিশ্লেষণে ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্র মাত্র, যাবা ওই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কাজ করে।[৫৪]

সত্য ও অহিংসা—কেবল এই দুটি গুণ আমি দাবি করি। কখনও বলি না, আমি কোনও অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী। তা আমি চাইও না। আমার আশেপাশের দুর্বলতম মানুষের দেহে যা আছে, সেই একই কলুষসম্ভব রক্তমাংস দিয়ে আমারও দেহ গঠিত। অতএব যে-কোনও লোকের মতো আমিও ভুলভ্রান্তি করতে পারি। আমার কাজে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু সকল অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এযাবৎ তা ঈশ্ববের আশীর্বাদ পেয়ে আসছে।[৫৫]

আমার মধ্যে অনন্য কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে, এমন দাবি আমার নেই। আমি কোনও ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব নই। শুধু এক তুচ্ছ সত্যানুসন্ধানী, এর সন্ধান পেতে বদ্ধপরিকর। মুখোমুখি ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়ার জন্য কোনও আত্মত্যাগই আমাব পক্ষে যথেষ্ট নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবহিতৈষী বা নৈতিক,—আমার সকল কর্মধাবাই ওই লক্ষ্যের প্রতি প্রবাহিত।

আব, যেহেতু আমি জানি, তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে, উচ্চ ক্ষমতাশালীদের বদলে

যাঁরা দুর্বল, যাঁরা অকিঞ্চন, তাঁদের মধ্যেই ঈশ্বরকে বেশি করে পাওয়া যায়, তাই আমি শেষোক্তদের স্তরভুক্ত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। এদের সেবা না করলে আমার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব নয়। তাই নিপীড়িত মানুষের সেবার প্রতি আমার এই তীব্র অনুরাগ। রাজনীতিতে প্রবেশ না করলে এই সেবা আমি করতে পারব না বলে রাজনীতিতে আছি। অর্থাৎ আমি কোনও অর্থেই কেষ্টবিষ্টু নই। ভারত তথা মানবজাতির সেবক এক দাস মাত্র, যে মুখ বুজে, ভুলভ্রান্তিসহ সংগ্রাম করে চলেছে।[৫৬]

কী অদ্ভুতভাবেই না আমরা নিজেদের ঠকাই। মনে করি, এ নশ্বর দেহটি অবিনাশী করে তোলা যায়, ভাবি, আত্মার গুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা সম্ভব নয়। আমি তো এটাই দেখাতে চেষ্টা করছি যে, এমন কোনও ক্ষমতা যদি আমার থেকেও থাকে, তবু, যে-কোনও মরণশীল মানুষের মতো আমিও দুর্বল, আমার মধ্যে অসাধারণ কিছু আগেও ছিল না, এখনও নেই।[৫৭]

ঈশ্বরপ্রেরিত অতিমানবদের নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসে আমার নামও উচ্চারিত হবার যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করি না। আমি নগণ্য এক সত্যানুসন্ধানী। আত্মোপলব্ধির জন্য অধীর, এই জন্মেই মোক্ষ লাভ কবতে চাই। দেহের দাসত্ব থেকে আত্মাকে মুক্ত করার যে কর্মপন্থা, আমার জাতির প্রতি সেবা হল তারই একটি অংশ। এ-ভাবে দেখলে আমার সেবাকার্যকে নিছক স্বার্থপবতা বলে মনে হতে পাবে। বিশ্বের নশ্বর রাজ্যপাটের ওপর আমাব বিন্দুমাত্রও আসক্তি নেই। আমি স্বর্গবাজ্যেব বা মোক্ষের অভিলাষী।[৫৮]

আমি নিজেকে সাধাবণ মানুষ বলেই মনে করি, যার ক্ষমতা গড়পড়তার চেয়েও কম। কষ্টকর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে অহিংসা ও আত্মসংযম আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি, তার জন্য বিশেষ গুণাবলীর দাবিও আমাব নেই। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আমি যা অর্জন করেছি, তা যে-কোনও নব-নারী আয়ত্ত করতে সক্ষম, যদি অবশ্য তারা সমানভাবে সচেষ্ট হয় ও একইভাবে মনের মধ্যে আশা ও বিশ্বাসেব শিখা জাগরূক রাখে।[৫৯]

আমার কয়েকজন পত্রবন্ধু বোধহয় মনে করেন যে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি। সত্যের পূজারী হিসেবে আমি বলি, সে রকম কোনও ক্ষমতাই আমার নেই। আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে, তা ঈশ্বরেরই দান। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে কিছু করেন না। তিনি কাজ করেন তাঁর অগণন প্রতিনিধির মাধ্যমে।[৬০]

সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা

নিজেকে আমি একজন বিচক্ষণ কর্মী বলে মনে করি। আমার বিচক্ষণতার অর্থ, স্বীয় সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সূক্ষ্মবোধ, এর বেশি বা কম, কিছুই নয়। আশা করি কখনও মাত্রা ছাড়াব না। সচেতনভাবে আমি তা কখনওই করিনি।[৬১]

আমার নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সচেতন। এই সচেতনতাই আমার একমাত্র শক্তি। জীবনে আমি যতটুকু কাজ করতে পেরেছি তা নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই উপলব্ধির দৌলতেই কবেছি, অন্য কোনও কিছুর জন্য নয়।[৬২]

যা হতে চাই, তা যদি হতাম, তাহলে অনশনের প্রয়োজন হতো না। তাহলে কারো সঙ্গে তর্ক করার প্রয়োজনও হতো না। আমার কথা লক্ষ্যভেদ করত। প্রকৃতপক্ষে কথাগুলি উচ্চারণেরও দরকার হতো না। আমার ইচ্ছাশক্তিই প্রয়োজনীয় প্রতিফল আনয়নে যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমি আমার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বেদনাদায়কভাবে সচেতন।[৬৩]

জনগণ যতবার ভুলভ্রান্তি করবে, ততবার আমি তা স্বীকার করব। এ-জগতে একমাত্র যে স্বৈরাচারীকে আমি মেনে চলি, তা হল অন্তরের অন্তস্তলের সেই "শান্ত, মৃদু কণ্ঠস্বর"। এবং এমন সম্ভাবনা যদি কখনও দেখা দেয় যে, আমি একা এক সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছি, তাহলে সেই আশাহীন একাকীত্বে থাকার মতো সাহস আমার থাকবে—সবিনয়ে এই বিশ্বাস আমি ব্যক্ত করছি।[৬৪]

আমার ধারণা, আমি মানবপ্রকৃতির মোটামুটি একজন অনুগত ছাত্র এবং আপন ব্যর্থতাব নির্ভুল ব্যবচ্ছেদকারী। মানুষ তার নিজের প্রবর্তিত ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেয়তর, এ-আমি আবিষ্কার করেছি।[৬৫]

আশা করি, আমার মধ্যে অহংকার বলে কিছু নেই। মনে করি, স্বীয় দুর্বলতা বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত। কিন্তু ঈশ্বরে, তাঁর শক্তি ও প্রেমে আমার আস্থা অবিচল। কুমোরের হাতে যেমন কাদার তাল, আমিও তাই।[৬৬]

কোথাও কোনও সম্মানলাভেব অভীপ্সা আমার নেই। এ-সব হল আসবাবপত্র, রাজসভা সাজাতে লাগে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, পাবসী ও ইহুদী—সকলেরই দাস আমি। দাসের প্রয়োজন ভালবাসা, সম্মান নয়। যতদিন আমি এক বিশ্বস্ত দাস থাকব, ততদিন ওই ভালবাসা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।[৬৭]

শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত

এমন কিছু ব্যাপার থাকে, যাকে এড়িয়ে চললেও শেষ পর্যন্ত তার হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে না। দেহের যে নশ্বর খাঁচায় আমি বন্দী, এটাই হল আমার বিনাশের হেতু। কিন্তু একে নিয়ে চলতে, এমন কি প্রশ্রয় দিতেও আমি বাধ্য।[৬৮]

আমি ঐকান্তিকভাবে এই সত্যে বিশ্বাস করি যে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একটি ঘাসও নড়ে না। এ-দেহ দিয়ে তিনি যদি আবো কাজ করাতে চান, তাহলে একে (আমার জীবন) তিনি রক্ষা করবেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ জীবনধারণ করতে পারে না।[৬৯]

আমাকে বক্ষা করতে চেষ্টা কোর না। সর্বক্ষমতাময় আছেন, তিনি সর্বদা আমাদের সকলকে রক্ষা কববেন। তোমরা নিশ্চিত জেনো, যখন আমার যাবার সময় হবে তখন কেউ, এমন কি বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তিও, তাঁর এবং আমার মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারবে না।[৭০]

আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাকে সৎ থাকতে হবে এবং যে মুহূর্তে আমি উপলব্ধি কবব যে আমার কাছে এ-জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে, আশা করছি, তখন হাজির হতে দেরি করব না। এ-দেহ যখন সাড়া দিতে অক্ষম হবে, সত্যের পথ অনুসন্ধানের কাজে

প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে, তখন স্বেচ্ছায় এ-দেহ সমর্পণের চেয়ে ভালো প্রতিদান আর কী হতে পারে?[৭১]

শহীদ হওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল নই। কিন্তু আমার বিশ্বাসের নিরিখে যাকে আমি সর্বোচ্চ কর্তব্য বলে মনে করি, তা করতে গিয়ে (শহীদ হওয়া) যদি অবশ্যম্ভাবী হয়....আমি তা বরণ করব।[৭২]

দেশবাসীর অসীম ভালবাসার মূল্য আমার কাছে অপরিসীম। তবে তাদের বোঝা উচিত, আমার জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা যদি জাতির মনোযোগকে লক্ষ্যচ্যুত করে তাহলে এ-জীবন রক্ষা করার কোনও দরকার নেই।[৭৩]

অতীতে আমার জীবনের উপর আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন এবং আক্রমণকারীরা অনুতপ্তও হয়েছে। তবে, একটা বজ্জাতকে মারছি এমন বিশ্বাসে যদি কেউ আমাকে গুলি করে, সে আসল গান্ধীকে হত্যা করবে না। হত্যা করবে তাকে, যাকে তার বজ্জাত মনে হয়েছিল।[৭৪]

আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা ঈশ্বর। ক্ষুদ্র মানুষ, যে আগামীকাল কী ঘটবে তা-ই নিশ্চিত করে জানে না, সে কি-ভাবে অপরকে রক্ষা করার কথা ভাবতে পারে? ঈশ্বর আমাকে দেখছেন, এতেই আমি নিশ্চিন্ত। তিনি রক্ষা কবতে পারেন, আবার সংহারও। তাঁর যেমন অভিপ্রায়। আমি জানি, কখনও কখনও তিনি রক্ষা করবার জন্যও সংহার করেন।[৭৫]

তিলে তিলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে, অশক্ত, পরাজিত মানুষের মতো....আমি মরতে চাই না। আততায়ীর বুলেট আমার জীবনের অবসান ঘটাতে পারে। আমি তাকে স্বাগত জানাব। কিন্তু আমার সব চেয়ে ভালো লাগবে, যদি অন্তিম নিশ্বাস অবধি কাজ করতে করতে আমি চলে যেতে পারি।[৭৬]

ভাগ্যে যদি তা-ই থাকে, তবে আমার কাজের জন্য মরতে আমার ভয় নেই।[৭৭]

ক্রোধ পরিহার করা

তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে সর্বোত্তম শিক্ষাটি আমি গ্রহণ করেছি, তা হল, ক্রোধকে সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষিত তাপ যে-ভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তেমনই নিয়ন্ত্রিত ক্রোধ এমন এক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, যা পৃথিবীকে টলিয়ে দিতে সমর্থ।[৭৮]

সত্যের শর্ত থেকে বিচ্যুতি ঘটলে আমি বন্ধু বা শত্রু কাউকেই রেয়াত করি না।[৭৯]

আমি ক্রুদ্ধ হই না, তা নয়। তবে ক্রোধ প্রকাশ করি না। ক্রোধশূন্য হবার জন্য আমি ধৈর্যের চর্চা করি। সাধারণত সফলও হই। তবে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করি তখনই যখন তা জাগে। এ নিয়ন্ত্রণ করা কেমন করে আমার পক্ষে সম্ভব হয়, সে প্রশ্ন অবান্তর। কেন না এটা একটা অভ্যাস, যা সকলেরই চর্চা করা উচিত। নিরন্তর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এ-গুণ অর্জনে সফল হতে হবে।[৮০]

আমার যদি কৌতুকবোধ না থাকত, তাহলে অনেকদিন আগেই আমি আত্মহত্যা করতাম।[৮১]

আমি এক অদম্য আশাবাদী। কেন না আমার আত্মবিশ্বাস আছে। বড় বেশি উদ্ধত শোনাল? কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই আমি কথাটি বলছি। আমি ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতায় বিশ্বাসী। আমি সত্যে বিশ্বাসী। তাই স্বদেশের বা মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনও সংশয় আমার নেই।

আমি আশাবাদী, কেন না নিজের কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা আছে। সেগুলি উপলব্ধ হয়নি। এখনও আমি ত্রুটিমুক্ত নই। যদি তা হতাম, তাহলে তোমার সঙ্গে তর্ক করার কোনও দরকারই হতো না। যেদিন ত্রুটিমুক্ত, নিখুঁত হবো, সেদিন যা বলব, জাতি তা শুনবে। সেবার মাধ্যমে আমি সেই সম্পূর্ণতা অর্জন করতে চাই।[৮২]

আমার দর্শন বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাব বিশেষত্ব হল, বহিরাগত কোনও শক্তির জন্য কারো আদর্শ বিঘ্নিত হবার কোনও সম্ভাবনাকে আমল না-দেওয়া। আদর্শটি খারাপ হলে, কিংবা ভালো হলেও এর প্রবক্তারা যদি অসৎ, দুর্বলমনা বা কলঙ্কময় হয়, তখন ওই বিঘ্ন সঙ্গতভাবেই এসে হাজির হয়।[৮৩]

---

৩. পথ আমি চিনি

পথ আমি চিনি। তা ঋজু ও সংকীর্ণ। অসির ধারালো দিকের মতো। এ-পথে হাঁটতে আমার আনন্দ হয়। পা পিছলে গেলে আমি কাঁদি। ঈশ্বরের বাণী, "যে চেষ্টা করে সে কখনও বিনষ্ট হয় না"—। এই প্রতিশ্রুতিতে আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস রয়েছে। তাই, দুর্বলতার কারণে হাজার বার ব্যর্থ হলেও আমি বিশ্বাস হারাব না। বরং আশা বাখব, যখন দেহকে সম্পূর্ণ বশ করা যাবে তখন সেই আলোকশিখা দেখতে পাব। একদিন এটা সম্ভব হবেই।[৮৪]

আমার আত্মা যতক্ষণ কোনও একটি অন্যায় বা একটি দুঃখের অসহায় দর্শক হয়ে থাকে ততক্ষণ তা শান্তি পায় না। কিন্তু আমার মতো দুর্বল, ভঙ্গুর ও হতভাগ্য এক ব্যক্তির পক্ষে প্রতিটি অন্যায়ের সুরাহা করা সম্ভব নয়। আবার, যত অন্যায় দেখি তার জন্য নিজেকে দায়ী না করেও পারি না।

অন্তরাত্মা আমাকে একদিকে টানছে, দেহ টানছে উল্টোদিকে। এই দুই শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যে মুক্তি আছে। কিন্তু ধীর, কষ্টকর এক একটি স্তর পেরিয়ে তবেই ওই মুক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব।

যান্ত্রিকভাবে কাজের পথ প্রত্যাখ্যান করলে আমি স্বাধীনতা পাব না। নির্মোহভাবে বুদ্ধিদীপ্ত কাজের মধ্য দিয়েই তা অর্জন করা সম্ভব। এই সংগ্রামের পথে দেহ নিরন্তর ক্রুশবিদ্ধ হয়, যাতে আত্মা সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে পারে।[৮৫]

সত্যানুসন্ধান

আমি একজন সত্যসন্ধানী। আমি মনে করি, এই পথের সন্ধানও আমি পেয়েছি। আমার

দাবি, সত্যকে খুঁজে পাওয়ার জন্য অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছি। তবে স্বীকার করি, এখনও তার সন্ধান আমি পাইনি। সত্যকে তার পূর্ণতায় পাওয়ার অর্থ হল, স্বীয় আত্মা ও নিয়তিকে উপলব্ধি করা, অর্থাৎ ত্রুটিশূন্য হওয়া। আমার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমি গভীরভাবে অবহিত। এবং এরই মধ্যে আমার সকল শক্তি নিহিত। কারণ, আপন সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত থাকা মানুষের পক্ষে এক বিরল ঘটনা।

যদি আমি ত্রুটিমুক্ত মানুষ হতাম, স্বীকার করছি, এখন যেমন করে প্রতিবেশীদের দুর্দশার কথা অনুভব করি তাহলে তেমন করতাম না। সম্পূর্ণ এক মানুষ হিসেবে সেগুলিকে আমি লক্ষ্য করতাম, সমাধানের উপায় বলে দিতাম, এবং নিজের ভিতরের অপ্রতিরোধ্য সত্যের শক্তির সাহায্যে ওই উপায় গ্রহণ করতে প্রতিবেশীদের বাধ্য করাতাম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি যেন কাচের ভেতর দিয়ে অস্বচ্ছভাবে সব দেখতে পাই। মন্দগতি, শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যয় নির্মাণের কাজটি চলে। আর তা-ও সবসময়ে সফল হয় না।

এই যখন ঘটনা, তখন তো আমি মনুষ্যপদবাচ্যই হতাম না, যদি ভারতের এই দুর্দশাক্লিষ্ট কোটি কোটি মূক মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ না করতাম। কেন না দেশব্যাপী দুর্দশা যে প্রতিকার করা সম্ভব, আমার সে জ্ঞান আছে। আব বিশ্বপিতার পায়ের তলাতেই আছে কঙ্কালসার মানুষের দৃশ্য।[৮৬]

ঈশ্বরে আস্থা

"দুর্যোগের ঘনঘটার" মধ্যে এই বিশ্বে আমি আলোর সন্ধানে চলেছি। প্রায়ই আমি ভুল কবি ও হিসাবে গণ্ডগোল হয়...তবু আমার আস্থা একমাত্র ঈশ্বরে। ঈশ্ববে বিশ্বাস করি বলেই মানুষকে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করার জন্য কোনও ঈশ্বর না থাকলে আমি মানববিদ্বেষী টিমন-এর মতোই হতাম।[৮]

সমগ্র বিশ্বকে সন্তুষ্ট কবার জন্যও আমি ঈশ্ববেব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কবব না![৮৮]

জীবনে উল্লেখযোগ্য যা কিছু করেছি, তা যুক্তির তাড়নায় নয়। বরং স্বতঃস্ফূর্ততায়, সহজাত স্বাভাবিকতায়। আমি বলি, ঈশ্বরের প্রেরণায়।[৮৯]

আমি আস্তিক মানুষ। ঈশ্বরে আমার অচল আস্থা। একটি পদক্ষেপই আমাব পক্ষে যথেষ্ট। যখন সময় আসবে, তিনি আমাকে পরবর্তী পদক্ষেপটি দেখিয়ে দেবেন স্পষ্টভাবে।[৯০]

গোপনীয়তা বলে কিছু নেই

আমার কোনও গোপন পন্থা নেই। সত্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও কূটনীতি আমি জানি না। অহিংসা ছাড়া অন্য অস্ত্র আমার নেই। নিজের অজ্ঞাতে আমি কিছুকাল ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হতে পারি, কিন্তু চিরকাল নয়।[৯১]

আমার জীবন এক খোলা খাতা। কোনও গোপনীয়তা নেই আমার, তাকে আমি প্রশ্রয়ও দিই না।[৯২]

আমি এক দুর্বল, সংগ্রামরত প্রাণ,—যে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হতে চাইছে, চিন্তায়,

কথায় ও কাজে সর্বতোভাবে সৎ ও অহিংস হতে চাইছে। কিন্তু যে আদর্শকে আমি সত্য বলে জানি, সেখানে কিছুতেই পৌঁছতে পারছি না। এই আরোহণ যে কষ্টকর তা আমি মানি। কিন্তু এই কষ্টও আমার কাছে পরম আনন্দময়। এক একটি ধাপ উঠলেই নিজেকে আমার আরো শক্তিশালী মনে হয়, পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আরো বেশি প্রস্তুত।[১৩]

একদিকে আমার ক্ষুদ্রতা ও আমার সীমাবদ্ধতা, অন্যদিকে আছে আমার সম্বন্ধে প্রত্যাশা—একথা যখন ভাবি, তখন সাময়িকভাবে আমি বিবশ, মুহ্যমান হয়ে পড়ি। কিন্তু যখনই উপলব্ধি করি, এ প্রত্যাশা আমাব কাছে—অর্থাৎ জেকিল ও হাইডের এক আজব সংমিশ্রণের কাছে নয়,—বরং যত অসম্পূর্ণই হোক, আমার মধ্যে তুলনায় বেশি মূর্ত দুই গুণ, সত্য ও অহিংসার কাছে—তখন আমি আবার ধাতস্থ হই। অতএব প্রতীচ্যে যে সত্যসন্ধানী সতীর্থবা আছে, তাদের সাধ্যমত সহায়তা করবার দায়িত্ব আমি এড়াব না।[১৪]

পথনির্দেশ

কোনও অভ্রান্ত পথ নির্দেশ বা প্রেরণা দেবার দাবি আমি করিব না। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কোনও মানুষেব অভ্রান্ততার দাবি টেকে না। কেন না প্রেবণা শুধুমাত্র সে-ই পেতে পারে যে বৈপবীত্যেব টানাপোড়েন থেকে মুক্ত। কোনও নির্ধারিত পরিস্থিতিতে এটা বিচাব কবা কঠিন যে দুই বৈপবীত্যেব টানাপোড়েন থেকে মুক্তির দাবি যথার্থ কি না। অতএব অভ্রান্ততাব দাবি চিরকালই বিপজ্জনক থেকে যাবে। তার মানে এই নয় যে আমরা কোনও নির্দেশই পাচ্ছি না। বিশ্বেব ঋষিদের অভিজ্ঞতার সমগ্র সঞ্চয় আজ যেমন আমাদের আয়ত্তে, চিবকালই তেমনই থাকবে।

এ ছাড়াও, মৌলিক সত্য তো একাধিক নয়। একটি সত্যই মৌলিক, যা পরম সত্য, যা অহিংসা নামেও পরিচিত। সত্য ও প্রেম সীমাহীন। তাই সীমাবদ্ধ মানুষ তাকে সমগ্রতায় কখনও জানতে পাবে না। তবে পথ নির্দেশের জন্য যতটুকু জানা যথেষ্ট তা আমরা জানি। প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হবে, কখনও কখনও সে ভুল অত্যন্ত গুরুতরও হতে পারে। মানুষ নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্ব-নিয়ন্ত্রণের এই শক্তির মধ্যে বারবার ভুল করার ক্ষমতা যেমন আছে, তেমনই আছে, যতবার খুশি সে-ভুল সংশোধন করার ক্ষমতা।[১৫]

আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই। সন্ত বলে কোনও দাবিও আমি করি না। আমি এই পৃথিবীরই, পার্থিব...যে-সব দুর্বলতা তোমাদেব মধ্যে আছে, আমিও তা থেকে মুক্ত নই। কিন্তু আমি এই বিশ্ব দেখেছি। চোখ খোলা রেখে এই পৃথিবীতে জীবনধারণ করেছি। মানুষের কপালে যে-সব দুরূহতম অগ্নিপরীক্ষা আসে, তার মধ্য দিয়ে পথ হেঁটেছি। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাকে এগোতে হয়েছে।[১৬]

আত্মত্যাগ

আমি ভারতে আমার দেশবাসীদের আত্মত্যাগের বেদবাক্য ব্যতীত অন্য কোনও বেদবাক্য অনুসরণ করতে বলি না—যে-কোনও যুদ্ধের পূর্বেই এর দরকার হয়। হিংসা, বা অহিংসা, যে-কোনও মতেই বিশ্বাসী হও না কেন, তোমাকে ত্যাগ ও শৃঙ্খলার আগুনে পা রেখেই হাঁটতে হবে।[৯৭]

আজ আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে নির্দেশ উৎসারিত হচ্ছে, বিশ্বের কাছে আমি তা ঘোষণা করতে চাই। আমি নতমস্তকে বলি, যদিও পশ্চিমের বহু বন্ধুর শ্রদ্ধা আমি হারিয়েছি, তবু, তাদের ভালবাসা ও বন্ধুত্বের খাতিরেও আপন বিবেকের কণ্ঠ আমি রোধ করতে পারি না। কিছু একটা আমাকে অন্তর থেকে আমার যন্ত্রণার কথা চীৎকার করে বলতে বাধ্য করছে। মানবজাতিকে আমি চিনেছি। মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিছু পড়াশুনোও করেছি। তাই আমি জানি ব্যাপারটা আসলে কী? কিভাবে তোমরা একে বর্ণনা করবে, তা নিয়ে আমি ভাবছি না। আমার অন্তরস্থ কণ্ঠস্বর বলছে, "সমগ্র দুনিয়ার বিরুদ্ধে, একা হলেও তোমাকে দাঁড়াতে হবে। বিশ্ব তোমার দিকে রক্তচক্ষু হানলেও তোমাকে তার মুখের দিকে তাকাতে হবে নির্নিমেষ চোখে। ভয় পেও না। তোমার হৃদয়ে যে অস্ফুট কণ্ঠটি কথা বলছে, তাতে আস্থা রাখো।" সে বলছে, "মিত্র, জায়া সকলকে ত্যাগ করো। শুধু, যে-জন্য তুমি বেঁচে আছ, যে-জন্য তোমাকে প্রাণ দিতে হবে, তার পক্ষে দাঁড়াও।[৯৮]

পরাজয়বাদের স্থান নেই

পরাজয় আমাকে নিরুদ্যম করতে পারে না। এ শুধু আমাকে পরিশুদ্ধ করে...জানি, ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাবেন। মানুষের প্রজ্ঞার চেয়ে সত্য শ্রেয়।[৯৯]

কখনওই আশাবাদ হারাইনি। এমন কি গাঢ়তম অন্ধকারের সময়েও আশার আলো আমার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে। এ আলোক আমি নির্বাপিত করতে পারি না। এটাও বলা দরকার, এ আশার সমর্থনে কোনও দৃশ্যগ্রাহ্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। কিন্তু আমার মধ্যে পরাভব বলে কিছু নেই।[১০০]

ভবিষ্যৎ-দর্শন আমি করতে চাই না। বর্তমানের দায়িত্ব পালন নিয়েই আমার চিন্তা। আগামী মুহূর্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করার কোনও অধিকার ঈশ্বর আমাকে দেননি।....

আস্থা

বারবার অন্যরা আমাকে আশাহত করেছে, এ সত্য অস্বীকার করতে পারি না। অনেকে ঠকিয়েছে, অনেকের মধ্যে দেখেছি খামতি। কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশেছি বলে আমি অনুতাপ করি না। আমি জানি, সহযোগিতা বা অসহযোগিতা কেমন ক'রে করতে হয়। এই দুনিয়াতে চলার সবচেয়ে বাস্তব ও সম্মানজনক উপায় হল, যখন বিশ্বাস-না-করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই তখন মানুষের কথায় বিশ্বাস করা।[১০১]

আমি আস্থা স্থাপনে বিশ্বাসী। আস্থা থেকেই আস্থার জন্ম হয়। সন্দেহপ্রবণতা এক

পচাগলা ব্যাপার, যা কেবল দুর্গন্ধই ছড়ায়। যে আস্থা রাখে সে আজও এ পৃথিবীতে পরাজিত হয়নি।[১০২]

প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ঘটলে তা আমার ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দেয়। বিশেষ করে আমি যদি কোনওভাবে প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীর সঙ্গে জড়িত থাকি। পবিত্র ও মহান কোনও প্রতিজ্ঞার জন্য যদি আমাকে প্রাণও দিতে হয়, সাগ্রহে তা দিতে আমি রাজি। বিশেষত, এই সত্তর বছর বয়সে, যখন জীবনবীমার কোনও দাম নেই।[১০৩]

জ্ঞানত, আমার ব্যক্তিজীবনে বা জনজীবনে কখনও কোনও প্রতিশ্রুতি আমি ভঙ্গ করিনি।[১০৪]

আমার নেতৃত্ব

অনেক বলে, মানবপ্রকৃতি আমি যেমন বুঝি, তেমন আর কেউ বোঝে না বলে নাকি আমি দাবি করি। আমার স্থির বিশ্বাস, আমি ভুল করছি না। কারণ নির্ভুলতা ও স্বীয় পদ্ধতিতে বিশ্বাস না থাকলে আমি শীর্ষে থাকার যোগ্য হতাম না।[১০৫]

আমার নেতৃত্ব বিষয়ে বলতে পারি, আমার মধ্যে যদি তা থেকে থাকে, তবে আমি চেয়েছি বলেই তা পাইনি। বিশ্বস্ত সেবাকার্যেব পরিণাম এটা। নিজের ত্বকের বর্ণের মতোই এরকম নেতৃত্ব পরিহার করা যায় না। যেহেতু আমি জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছি, সেহেতু জাতিকে আমার সকল দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাসহ মেনে নিতে হবে। আমাব ওই দোষত্রুটির কয়েকটি বিষয়ে আমি খুবই সচেতন। মুক্তমনা সমালোচকদের ধন্যবাদ, তাঁবা বাকি দোষত্রুটি বিষয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিতে কখনও ভোলেন না।[১০৬]

অদক্ষ ছুতোরই তার যন্ত্রপাতির সঙ্গে কলহ করে। এক অযোগ্য সেনাধ্যক্ষই ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য তার সেনাদেব দোষ দেয়। আমি জানি, আমি অযোগ্য সেনাধ্যক্ষ নই। নিজের সীমাবদ্ধতা বোঝাব মতো জ্ঞান আমার আছে। ভাগ্যে যদি তা-ই থাকে, তাহলে নিজের দেউলিয়াপনা ঘোষণা করার মতো শক্তি ঈশ্বর আমাকে দেবেন। প্রায় অর্ধশতক ধরে যে-কাজ আমাকে কবতে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমাকে যদি আর প্রয়োজনীয় মনে না হয়, তাহলে নিশ্চয় তিনিই আমাকে সরিয়ে নেবেন। কিন্তু আমি এই আশাই পোষণ করি যে, এখনও আমার করার মতো কাজ রয়েছে। যে অন্ধকার আমাকে ঘিরে রেখেছে তা দূর হয়ে যাবে। ডাণ্ডি অভিযানেব চেয়েও আসামান্য কোনও সংগ্রামের সাহায্যে, অথবা তা ছাড়াই, অহিংস উপায়ে ভারত বিশ্বের সামনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। আমি সেই আলোর জন্য প্রার্থনা করি, যা তমোঘ্ন। অহিংসার আদর্শে যাদেব জীবন্ত বিশ্বাস, তারা আমার সঙ্গে এ প্রার্থনায় যোগদান করতে পারে।[১০৭]

আমার কাজ

আমার সামনে যে কাজটি রয়েছে, সেটি করেই আমি তৃপ্ত। কোনও ব্যাপারের "কেন এবং কী-জন্য" ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হই না।....যুক্তিজ্ঞান আমাদের এই শেখায়, যাব

পরিমাপ করতে আমরা অক্ষম, আমাদের তাতে হাত দেওয়া উচিত নয়।[১০৮]

আমার কাজ তখনই শেষ হবে, যখন আমি মানবপরিবারে এই বিশ্বাস পৌঁছে দিতে পারব যে, দৈহিকভাবে যতই দুর্বল হোক, প্রতিটি পুরুষ বা নারী তার নিজ আত্মসম্মান ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অভিভাবক। একজন প্রতিরোধকারীর বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের বিরোধিতা চালিত হলেও এ-ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে।[১০৯]

আমার চোখ চিরনিদ্রায় নিমীলিত, এ দেহমন্দির অগ্নিতে সমর্পিত হবাব পর আমার কাজের বিষয়ে রায় দেবার যথেষ্ট সময় থাকবে।[১১০]

৪. আমার জীবনব্রত

আমি কোনও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই। আমি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন আদর্শবাদী। অহিংসার ধর্মটি কেবল ঋষি ও সন্তদের জন্য নয়। এই ধর্ম সাধারণ মানুষের জন্যও। অহিংসা আমাদের মানবপ্রজাতির আইন, পশুদের যেমন হিংসা। বর্বর পশুর মধ্যে আত্মা থাকে সুপ্ত। দেহ-বল ব্যতীত কোনও আইনই সে জানে না। মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন। তাব প্রয়োজন কোনও মহত্তর আইন মেনে চলা। যাতে আত্মার শক্তি প্রকাশ পায়।[১১১]

আমার জনজীবনে এমন একাধিকবার ঘটেছে, যখন পালটা আঘাত হানাব ক্ষমতা থাকলেও আমি তা করিনি এবং বন্ধুদেরও অনুরূপ আচরণ কবায় উপদেশ দিয়েছি। এই মতাদর্শ প্রচারের জন্যই আমার জীবন। এই পাঠ আমি নিয়েছি জরাথুস্ত্র, মহাবীর, দানিয়েল, যীশু, মহম্মদ, নানক এবং বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদেব শিক্ষা থেকে।[১১২]

আমার বিশ্বাসের প্রথম অনুচ্ছেদই হল অহিংসা। আমার বিশ্বাসের শেষ অনুচ্ছেদও তাই।[১১৩]

অহিংসা-বিজ্ঞানের আমি এক সামান্য সন্ধানী মাত্র। এব অন্তর্নিহিত গভীরতা আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে, আমার সহকর্মীদের করে বিচলিত।[১১৪]

সত্যাগ্রহের জীবনাদর্শ

আমার জীবনের ব্রত হল, উদাহরণ ও ভাষণের মাধ্যমে সত্যাগ্রহের অতুলনীয় অস্ত্রটিকে যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করতে শেখানো, যা অহিংসা ও সত্যের এক প্রত্যক্ষ উপসিদ্ধান্ত। অহিংসা ব্যতীত জীবনের নানা দুর্যোগের মোকাবিলা করার অন্য পন্থা নেই। এটা দেখাবার জন্য আমি উদ্বিগ্ন। খানিকটা অধৈর্যও বটে।

যখন আমার দ্বারা কোনও পাপ করা সম্ভব হবে না এবং যখন ক্ষণিকের জন্যও আমার চিন্তার জগতে কোনও রূঢ়তা, কোনও ক্রোধ স্থান পাবে না, কেবল তখনই আমার অহিংসা বিশ্বের সকল হৃদয়কে স্পর্শ করবে। নিজের এবং পাঠকের সামনে কোনও সম্ভবাতীত আদর্শ বা পরীক্ষা আমি রাখিনি। অহিংসা মানুষের জন্মস্বত্ব, এবং অবশ্য পালনীয়।

আবাব ফিরে পাবার জনাই স্বর্গকে আমরা হারিয়েছি। এ জন্য যদি সময়ও লাগে,

সে-সময় মহাকালচক্রে এক নগণ্য বিন্দু মাত্র। 'গীতা'য় দৈবী শিক্ষক এটা জানতেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের কোটি কোটি দিন, ব্রহ্মার একটি দিবসের সমতুল।[১১৫]

অহিংসা আমার ঈশ্বর, সত্য আমার ঈশ্বর। যখন আমি অহিংসার সন্ধান করি, সত্য আমাকে বলে, "আমার মধ্য দিয়ে তাকে খোঁজো।" যখন সত্যের সন্ধান করি, অহিংসা বলে, "আমার মধ্য দিয়ে তাকে খোঁজো।"[১১৬]

আমি বিশ্বাস করি, অহিংসার দ্বাবা আমি সম্পৃক্ত। অহিংসা ও সত্য আমার দুটি ফুসফুস। এদের বাদ দিয়ে আমি বাঁচতে পারি না। অহিংসার ক্ষমতা কত অসীম, মানুষ কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। এটা প্রতি মুহূর্তে ক্রমেই আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এমন কি অপার করুণা থাকা সত্ত্বেও অরণ্যবাসী সম্পূর্ণ হিংসামুক্ত হতে পারে না। প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গেই সে কিছুটা হিংসার কাজ করে।

এ দেহ এক কসাইখানা, তাই মোক্ষ ও চিরশান্তি সম্পূর্ণ সম্ভব শুধুমাত্র দেহমুক্তিতে। অতএব মোক্ষেব আনন্দ বাদে আর সব আনন্দই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। এ-ই যখন ঘটনা, তখন দৈনন্দিন জীবনে আমাদেব বারবার পান করতে হয় হিংসার তিক্ত গরল।[১১৭]

অহিংসার প্রয়োগ

সত্য ও অহিংসাকে শুধু ব্যক্তিব অনুশীলনের ব্যাপার করে তুললে হবে না। একে আমাদের গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতিসমূহের অনুশীলনীয় করে তুলতে হবে। যাই হোক না কেন, এই আমার স্বপ্ন। এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্যই আমার জন্ম, এর জন্যই আমি মৃত্যুববণ করব।

আমার বিশ্বাসের ফলে প্রতিদিনই আমি নতুন নতুন সত্য আবিষ্কার করতে পারি। অহিংসা, আত্মার এক বিশেষ গুণ। তাই সকলের জীবনের সকল ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা উচিত। সকল ক্ষেত্রে যদি এর ব্যবহার না হয়, তাহলে এর কোনও ব্যবহারির মূল্য নেই।[১১৮]

সত্য এবং অহিংসায় আমার বিশ্বাস বেড়েই চলেছে। জীবনেও এর অনুসরণের জন্য আমি নিরন্তব প্রয়াস চালাচ্ছি। প্রতিটি মুহূর্তে আমারও বিকাশ ঘটছে। সত্য ও অহিংসার নতুন নতুন দিক আমি দেখতে পাচ্ছি। প্রতিদিনই এদের আমি দেখছি নতুনতর এক আলোকে। এক নতুন অর্থ প্রতিভাসিত হচ্ছে আমার কাছে।[১১৯]

আমার জীবনের লক্ষ্য মধ্যযুগের সেই ভ্রাম্যমান নাইটের মতো নয়, যে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সংকটাপন্নকে উদ্ধার করি, আমার সামান্য কাজ হল লোককে বোঝানো, কী ভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে।[১২০]

আমার অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতাগুলি আমার সাফল্য ও ধী-শক্তিব মতোই, ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এ-সবই আমি তাঁর পদপ্রান্তে নিবেদন করি। কেন তিনি এই সুমহান পরীক্ষার জন্য আমার মতো এক ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রকে বাছলেন? আমার মনে হয়, ইচ্ছা করেই তিনি এটা করেছেন। দরিদ্র, মূক, অজ্ঞ লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবার কাজটা ছিল ঈশ্বরের। সেক্ষেত্রে এক নিখুঁত, সম্পূর্ণ মানুষ এলে হয়তো তাদেব নিরাশই হতে হতো। তাবা

যখন দেখল তাদের মতোই দুর্বল এক মানুষ অহিংসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারাও তাদের নিজ-ক্ষমতায় আস্থা ফিরে পেল। কোনও দেবদুর্লভ মানুষ যদি আমাদের নেতা হয়ে আসতেন, চিনতে না পেরে আমরা হয়তো তাঁকে তাড়িয়ে গুহাবাসী করে ছাড়তাম। আমাকে যে অনুসরণ করছে, সে হয়তো আরও ত্রুটিমুক্ত হবে। তোমরা তার বাণী মেনে নিতে সক্ষম হবে।[১২১]

কোনও গান্ধীবাদী সম্প্রদায় নয়

আমি শুধু বলি, ভারত ও মানবজাতির আমি এক বিনম্র সেবক, এবং এই সেবা করতে করতেই আমি মৃত্যুবরণ করতে চাই। কোনও সম্প্রদায়ের পত্তন করা আমার লক্ষ্য নয়। অনুসরণ করার জন্য একটি সম্প্রদায় স্থাপন করে তৃপ্ত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চাভিলাষী আমি। কারণ, আমি কোনও নতুন সত্যের প্রতিভূ নই। সত্যকে আমি যেমন চিনেছি, সে-ভাবেই তাকে অনুসরণ করি এবং তার প্রতিনিধিত্ব করি। তবে, বহু প্রাচীন সত্যের ওপর নতুন আলোকপাতের দাবি আমার আছে।[১২২]

আমি কোনও নতুন নীতি প্রবর্তন করিনি। প্রাচীন আদর্শকে পুনরায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি।[১২৩]

"গান্ধীবাদ" বলে কিছু নেই এবং আমি আমার পরে তেমন কোনও সম্প্রদায় রেখে যেতে চাই না। কোনও নতুন নীতি বা মতবাদ সৃষ্টি করেছি, এমন দাবি করি না। আমি শুধু, আমার মতো করে চিরকালীন সত্যগুলিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি...

বিশ্বকে শেখাবার মতো নতুন কোনও সম্বল আমার নেই। সত্য ও অহিংসা পাহাড়ের মতোই প্রাচীন। আমি কেবল চেষ্টা করেছি, সত্য ও অহিংসাকে যতটা সম্ভব ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে। এই কাজ করতে গিয়ে আমার ভুল হয়েছে। সে ভুল থেকে আমি শিক্ষালাভ করেছি। জীবন ও তার নানা সমস্যা এ-ভাবেই আমার কাছে সত্য ও অহিংসা প্রয়োগের বহু পরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

সততা আমার সহজাত ছিল, কিন্তু অহিংসা নয়। জনৈক জৈন মুনি একদা ঠিকই বলেছিলেন, আমি সত্যের যেমন, অহিংসার তেমন উপাসক ছিলাম না। এবং আমি প্রথমে স্থান দিয়েছিলাম সত্যকে, পরে অহিংসাকে। তাঁর ভাষায় সত্যের জন্য অহিংসাকে আমি বলি দিতে পারতাম। প্রকৃতপক্ষে সত্য-সন্ধানের পথেই আমি অহিংসাকে আবিষ্কার করেছিলাম।[১২৪]

গান্ধীবাদী বর্গ বলতে কী বোঝায়, আমার নিজের জানা নেই। আমি এক অজানা সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছি। পথের জন্য বারবার আমাকে দিশা খুঁজতে হয়।[১২৫]

"গান্ধীবাদী" কোনও নামের মতো নাম নয়। তার চেয়ে, অহিংসবাদী নয় কেন? গান্ধী তো সু ও কু, দুর্বলতা ও শক্তি, হিংসা ও অহিংসার এক সংমিশ্রণ। কিন্তু "অহিংসায়" কোনও ভেজাল নেই।[১২৬]

গান্ধীবাদী মতাদর্শ ও তার প্রচারের উপায় প্রসঙ্গটিতে এবার আসছি। সত্য ও অহিংসার

নীতিগুলিকে জীবনে মূর্ত করলে বইয়ের চেয়ে বেশি প্রচার করা সম্ভব। যথার্থ জীবনযাপন, বইয়ের চেয়ে বেশি মূল্যবান।[১২৭]

আমার সমস্ত উপদেশের একটি সুবিধাব দিকও আছে। আমার উপদেশ যদি মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে প্রভাব না ফেলে, তাহলে এগুলিকে অনুসরণ করার দরকার নেই। অবশ্য যারা সত্যই অন্তর থেকে বাণী শুনেছে, আমি উপদেশ দিচ্ছি বলে তা মানা থেকে নিবৃত্ত হবার দরকার নেই। অন্যভাবে বলা যায়, এগুলি তাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন, যারা অন্তরের বাণী সম্বন্ধে সচেতন নয় ; এবং আমার পরিপক্বতর অভিজ্ঞতা এবং বিচারের যথার্থতার ওপর যাদের আস্থা বয়েছে।[১২৮]

গান্ধীবাদ যদি ভ্রান্তির সপক্ষে দাঁড়ায় তবে ধ্বংস হয়ে যেতে দাও। সত্য ও অহিংসার বিনাশ নেই। তবে গান্ধীবাদ যদি সংকীর্ণতাবাদের আর এক নাম হয়, তার ধ্বংসই কাম্য। যদি জানতে পাবি, যা আমার সর্বস্ব, তা সংকীর্ণতাবাদে পর্যবসিত হয়েছে আমার মৃত্যুব পর, তাহলে আমি গভীর বেদনা বোধ করব...।

কেউ যেন না বলে, সে গান্ধীর অনুগামী। আমি যদি আমার অনুগামী হতে পারি তাহলেই যথেষ্ট হবে। আমি যে আমারই কতখানি অক্ষম অনুসারী তা আমি জানি। কেন না যে-সব বিশ্বাসেব কথা বলি, আমি নিজেই তাব উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারিনি। তোমরা অনুগামী নও। তোমরা সতীর্থ, সহ-অনুসন্ধানী, সহকর্মী।[১২৯]

যদি একজনকেও গান্ধীবাদী হতে হয, তাহলে তা আমাকেই হতে হবে। আশা করি, এই দাবির মধ্যে কোনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে না ; কারণ সে বিনয়টুকু আমার আছে। গান্ধীবাদী মানে গান্ধীর পূজারী। পূজাব জন্য এক দেবতা আবশ্যক। আমি সে দাবি করার মতো দাম্ভিক নই। অতএব আমার কোনও ভক্ত থাকতে পারে না।[১৩০]

কষ্টসহিষ্ণুতার নীতি

আমি....ভারতেব সামনে প্রাচীন আত্মত্যাগের নীতিটি উপস্থাপন করার চেষ্টা কবেছি। সত্যাগ্রহ, তার শাখা-উপশাখা হিসেবে অসহযোগিতা ও গণপ্রতিরোধ আন্দোলন—কষ্টসহিষ্ণুতার নীতিরই নতুন নতুন নাম মাত্র।

হিংসার মধ্যে থেকেই যাঁরা অহিংসা-নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই ঋষিরা নিউটনের চেয়েও অধিকতর প্রতিভাধর ছিলেন। তাঁরা নিজেরা ছিলেন ওয়েলিংটনের চেয়ে মহত্তর যোদ্ধা। নিজেরা অস্ত্রের ব্যবহার জেনেছিলেন। তার অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এক রণক্লান্ত বিশ্বকে শিখিয়েছিলেন—তার মুক্তি অহিংসাব পথেই সম্ভব, হিংসায় নয়।

অহিংসার সক্রিয় অবস্থা বলতে বোঝায়, সচেতন মনে কষ্ট সহ্য করা। এর অর্থ অন্যায়কারীর ইচ্ছার কাছে মূক আত্মসমর্পণ নয়। বরঞ্চ নিজের সমগ্র আত্মশক্তিকে অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপন করা। আমাদের এই নীতির ফলে, একজন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে, তার সম্মান, ধর্ম ও আত্মাকে বাঁচাবার জন্য এক ন্যায়হীন সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতাকে অস্বীকার করা সম্ভব। এর ফলে, ওই সাম্রাজ্যের পতনের অথবা তার পুনর্জন্মের ভিত্তি স্থাপিত হবে।

ভারতের ভূমিকা

ভারত দুর্বল, সে জন্য আমি ভারতকে অহিংসা অনুশীলন করতে বলছি না। আমি চাই যে ভারত তার ক্ষমতা ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অহিংসা অনুশীলন করুক। নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করার জন্য তার অস্ত্র-শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আমরা নিজেদের নিছক মাংসপিণ্ডমাত্র ভাবি বলেই হয়তো মনে করি অস্ত্রশিক্ষা প্রয়োজন।

আমি চাই, ভারত উপলব্ধি করুক যে তার আত্মা কখনওই ধ্বংস হতে পারে না এবং তা যে-কোনও দৈহিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম। সক্ষম সমগ্র বিশ্বের দৈহিক ক্ষমতার সমাহারকে অস্বীকার করতে।[১৩১]

দম্ভ পরিহার করে সবিনয়ে আমি বলতে চাই, আমার বাণী ও পন্থার সারবস্তু সমগ্র বিশ্বের জন্যই। এটা জেনে আমি গভীরভাবে পরিতৃপ্ত যে, এই বাণী ও পন্থা পশ্চিমে অসাধারণ সাড়া পেয়েছে পুরুষ ও নারীর কাছ থেকে, যাঁদের সংখ্যা প্রত্যহ বেড়ে চলেছে।[১৩২]

মানুষের সৌভ্রাত্র

শুধু ভারতের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপনই আমার কাজ নয়। শুধু ভারতের স্বাধীনতাই আমার লক্ষ্য নয়। যদিও বর্তমানে নিঃসন্দেহে আমার সমগ্র জীবন ও সময় সেই উদ্দেশ্যেই অতিবাহিত হচ্ছে। আমি আশা করি যে, ভারতের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতির সৌভ্রাত্র স্থাপনের আদর্শ রূপায়ণের দিকে এগোতে পারব।

আমার দেশপ্রেম কোনও বিচ্ছিন্ন, একাত্ম ব্যাপার নয়। এই দেশপ্রেম সর্বস্পর্শী। যে-দেশপ্রেম অন্য জাতির দুর্দশা, বা তাকে শোষণের ওপর নির্ভরশীল সে দেশপ্রেমকে আমি স্বীকাব করি না। আমাব দেশপ্রেমের ধারণা সর্বদা অবিচলভাবে সমগ্র মানবজাতির ব্যাপকতম মঙ্গলেব চিন্তায় জড়িত। তা না হলে এর কোনও মূল্যই নেই।

এ ছাড়াও আমার ধর্ম, সেই ধর্ম থেকে উদ্ভূত আমার দেশপ্রেম, নিখিল প্রাণকেই আপন বলে গ্রহণ করে। যাদের মানুষ বলা হয়, তাদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র এবং সহমর্মিতাই শুধু নয়, জীবিত সকল প্রাণী, এমন কি যারা সরীসৃপ, তাদের সঙ্গেও আমি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়তে চাই। একই ঈশ্বর থেকে আমরা সকলে উদ্ভূত এ যদি মনে রাখি তাহলে আকার যা-ই হোক, সব প্রাণই আসলে এক।[১৩৩]

আমার কর্মোদ্যোগে এই ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে যে, এ-যদি সফল হয়—সফল তা হবেই, সফল একে হতেই হবে—ইতিহাস তাহলে একে চিহ্নিত করবে পৃথিবীর সকল মানুষকে ঐকবদ্ধ করার অভিযান রূপে। কেউ কারও শত্রু হবে না, বরং এক অখণ্ড সমগ্রের এক-একটি অংশ হবে।[১৩৪]

অহিংসার পথ

আমার উচ্চাশা সীমিত। বিশ্বকে অহিংসার পথে চালনা করার শক্তি ঈশ্বর আমাকে দেননি। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিয়েছি যে, ভারতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য অহিংসাকে

উপস্থাপনা করার মাধ্যম হিসেবে তিনি আমাকে নির্বাচিত করেছেন। যতটুকু অগ্রগতি এ পর্যন্ত ঘটেছে তা বিশাল, কিন্তু এখনও অনেক কিছুই করা বাকি।[১৩৫]

শঠতা ও মিথ্যা আজ বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় আমি অসহায় দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না.... জগৎ জুড়ে যে আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে আমি যদি আজ নীরব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকি, তাহলে, ঈশ্বব আমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা কাজে না লাগানোর জন্য তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করবেন।[১৩৬]

আমি আমাব ব্যক্তিগত বিশ্বাস অন্যদের ওপর, বিশেষত কোনও জাতীয় সংগঠনের ওপর কখনওই চাপাতে চাই না। আমি শুধু জাতিকে এর সৌন্দর্য ও উপযোগিতা বোঝাবার চেষ্টা করতে পাবি.....

নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্যে যদি দেশেব অগ্রগতিব অন্যান্য পথেব প্রতিবন্ধক হয়ে উঠি, তাহলে তার ফল হবে বিধ্বংসী। অন্য পন্থা চলতে পারে যতক্ষণ না সেগুলি কোনওভাবেই অমঙ্গলকব ও ক্ষতিকাবক হয়ে ওঠে। উদাহবণ হিসেবে বলা যায়, হিংসার প্রকৃত নীতির বিরুদ্ধে একা হলেও আমার দাঁড়ানো উচিত। তবে জাতিব ইচ্ছা হলে, প্রকৃত হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের অধিকাব ত'র আছে—এ আমি মেনে নিয়েছি। শুধু, ভারত তখন আমার জন্মভূমি হলেও আমার ভালবাসাব দেশ আর থাকবে না। আমার মা যদি বিপথে চলে যান, তাঁকে নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করব না।[১৩৭]

বিশ্বব্যাপী অহিংসা প্রচারের যোগ্যতা আমার নেই। অতএব, আমি যখন অহিংসার কথা বলি, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যের ক্ষেত্রেই তাকে সীমাবদ্ধ রাখি। এর মাধ্যমে হয়তো অহিংস উপায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটিও এসে পড়ে। বিশ্বব্যাপী অহিংসা প্রচাবেব আগে আমাকে সম্পূর্ণ ভাবাবেগ-মুক্ত হতে হবে, এমন হতে হবে, যে তখন কোনও পাপকাজ করা আমাব পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।[১৩৮]

আমার প্রচাব ও শিক্ষা ভাবাবেগতাড়িত বা অবাস্তব নয়। আমি তা-ই শেখাই যা সুপ্রাচীন এবং কথায় যা বলি কাজেও তা করতে চেষ্টা করি। আমার দাবি, আমি যা অনুশীলন করি, তা সকলের দ্বারাই সম্ভব। কেন না আমি অতি সাধারণ এক নশ্বর মানুষ। আমাদের মধ্যে যে মানুষ নগণ্যতম, তার মতোই আমারও প্রবণতা সেই একই প্রলোভন ও দুর্বলতার প্রতি।[১৩৯]

বিশ্বব্যাপী অহিংসার কথা বললেও, আমার পরীক্ষা ভারতের মধ্যেই সীমিত। এটা যদি সফল হয়, তবে পৃথিবী অক্লেশে এটি গ্রহণ করবে। তবে একটা মস্তবড় "কিন্তু" আছে। বিলম্ব আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে না। নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেই আমার বিশ্বাস সব চেয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠে।[১৪০]

ইউরোপ ও আমেরিকা যাবার কথা উঠলে কেন জানি আমার আতঙ্ক হয়। নিজের দেশবাসীকে আমি যতটা অবিশ্বাস করি, তার চেয়ে ওই সব মহাদেশের মানুষকে যে বেশি অবিশ্বাস করি, তা নয়। আসলে অবিশ্বাস করি নিজেকে। স্বাস্থ্যের কারণে, বা দেশ দেখার জন্য পশ্চিমে যাবার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। জনসভায় বক্তৃতা দেবার বাসনা নেই। নিজেকে হোমরা-চোমবা ভাবতে ঘৃণা হয়। জনসমক্ষে ভাষণদান ও জনসভা

করার ভয়ংকর চাপ সইবার মতো শরীর স্বাস্থ্য আর কোনওদিন ফিরে পাব কি না কে জানে!

ঈশ্বর যদি কখনও আমাকে পশ্চিমে পাঠান, তাহলে আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত: জনগণের অন্তরে প্রবেশ করা, পশ্চিমের তরুণদের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করা, সমধর্মা সেই মানুষদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাওয়া, যাঁরা এক সত্য ছাড়া, অন্য যে-কোনও মূল্যে শান্তি কামনা করেন।

তবে মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমকে দেওয়ার মতো কোনও বার্তা এখনও আমার নেই। বিশ্বাস করি যে, আমার বার্তা বিশ্বের জন্য। তবু এখনও মনে হয় স্বদেশে আমার কাজের মধ্য দিয়ে তা আমি সবচেয়ে ভাল প্রকাশ করতে পারব। ভারতে যদি দেখাবাব মতো সাফল্য অর্জন করতে পারি, তাতেই আমাব বাণীর প্রচার পূর্ণতা পাবে।

যদি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, ভারতের কাছে আমার বাণীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তখনও এতে আমার বিশ্বাস অটুট থাকবে। যদি বাইরে যাবার সাহস কখনও করি, তো এ-জন্য করব যে, আমার বিশ্বাস, ধীরে হলেও ভারত আমার মর্মবাণী গ্রহণ করছে—যদিও সকলকে সন্তুষ্ট করার মতো এর কোনও প্রমাণ আমি দিতে পারব না।[১৪১]

যখন আমাব মধ্যে পাপকাজ কবার কোনও ক্ষমতা থাকবে না, যখন মুহূর্তের জন্যেও আমার চিন্তাজগতে কোনও রূঢ়তা বা দাম্ভিকতা ঠাঁই পাবে না, একমাত্র তখনই আমার অহিংসা বিশ্বের সকল হৃদয়কে আলোড়িত করবে। তার আগে নয়।[১৪২]

আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের নিজেদের জীবনে সত্যের প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু সে হবে ব্যক্তির অক্ষমতা। কখনওই চিরসত্যের ব্যর্থতা নয়।[১৪৩]

৫. অন্তরের আহ্বান

আমাদের জীবনে এমন কতগুলি মুহূর্ত আসে, যখন কোনও কোনও বিষয়ে বাইরের প্রমাণ দরকার হয় না। অন্তর থেকে একটি অস্ফুট কণ্ঠস্বর বলে দেয়, "তুমি ঠিক পথেই চলেছ। বাঁয়ে বা ডাইনে যেও না। সিধা ও সংকীর্ণ রাস্তা ধরে চলো।"[১৪৪]

জীবনে এমন কতগুলি মুহূর্ত আসে যখন তুমি অন্তরঙ্গ বন্ধুদেব সঙ্গী পাবে না, অথচ কাজ তোমাকে করতেই হবে। যখন কর্তব্য বিষয়ে মনে দ্বিধা জাগে, তখন তোমার অন্তরের "অস্ফুট ও ক্ষীণ কণ্ঠস্বব"-ই শেষ বিচারক—তার বায়-ই মাথা পেতে নিতে হয়।[১৪৫]

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য ক্লান্তিহীন প্রয়াস চালাবার ফলে আমি "অন্তরের অস্ফুট, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর"টি শোনার সামান্য ক্ষমতা অর্জন করেছি।[১৪৬]

যে মুহূর্তে আমি অন্তরের অস্ফুট আহ্বানের কণ্ঠরোধ করব, তখনই আমার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলব।[১৪৭]

কৃচ্ছ্রসাধন আমার কাছে কোনও যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ নয়। অন্তরের কণ্ঠস্বরের নির্দেশ মেনেই এগুলি করা।[১৪৮]

কোনও অসার দাবি নয়

যার অন্তর্নিঃসৃত কোনও কণ্ঠস্বর নেই, সে যদি এই অসার দাবি করে যে, সে দৈবী প্রেরণায় বা ওই আহ্বানের নির্দেশে কাজ করছে, তাহলে তার দুর্দশা সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি হবে, যে বিশ্বের কোনও নৃপতির আদেশে কাজ করছে বলে মিথ্যা দাবি করছে। দ্বিতীয় জন ধরা পড়লে হয়তো দৈহিক প্রহারের পর পার পেয়ে যাবে। প্রথমজনের দেহ ও আত্মা দুই-ই বিনষ্ট হবে।

সদাশয় সমালোচকরা আমাকে প্রতারণার দায় থেকে অব্যাহতি দিলেও এমন ইংগিত কবেন, যে আমি সম্ভবত কোনও অলীক স্বপ্নের বশে কাজ করছি। তেমন যদি হতো, তাহলেও আমার কাজকর্মের ফলাফল, আমি মিথ্যা দাবি জানালে যা হতো, তার চেয়ে অন্যরকম কিছু হতো না। আমি নিজেকে যা বলি, সেই বিনম্র সত্যান্বেষীব খুবই সাবধান থাকা দবকার। মনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ঈশ্বর তাকে পরিচালনা করার আগে নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছে পর্যবসিত করা দরকার। এ ব্যাপারে আর বেশি কিছু আমি বলব না।

অলীক স্বপ্নের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি একটি সবল ও বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা বলেছি, যা সকলেই পরীক্ষা করতে পারে, যদি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য যা দরকার, সেই ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্য তার থাকে। এই সত্য অনুধাবন করা অতীব সহজ, এবং মানসিক দৃঢ়তা থাকলে একে আয়ত্ত করা কঠিন নয়।[১৪৯]

আর কাউকে নয়, তোমরা নিজেদের বিশ্বাস করো, তাহলেই হবে। অন্তরের কণ্ঠস্বর শোনাব জন্য তোমাদের সচেষ্ট হতে হবে, তবে, ওই "অন্তরের কণ্ঠ" শব্দ দুটি অচেনা মনে হলে "যুক্তিবুদ্ধির আদেশ" শব্দদুটি ব্যবহার করতে পারো, যা তোমাদের মেনে চলতে হবে। যদি ঈশ্বরের কথা না-ই বলো অন্য কিছুব কথা তো বলবে। আমি নিঃসন্দেহ যে, যা-ই বলো না কেন, শেষ পর্যন্ত তা ঈশ্বব বলেই প্রমাণিত হবে। কেন না সৌভাগ্যবশত এই মহাবিশ্বে তিনি ছাড়া আর কিছু নেই।

এটাও আমি মনে করি যে, যাবা দাবি করছে তারা অন্তরের কণ্ঠের তাগিদেই কাজ করছে, তাদের সকলের মধ্যেই ওই তাগিদ নেই। অন্য যে-কোনও ক্ষমতার মতোই অন্তরের কণ্ঠস্বর শোনার ক্ষমতার বেলাতেও অনেক দিনের প্রশিক্ষণ ও প্রয়াস দরকার। হয়তো অন্যবিধ গুণাবলী অর্জনের তুলনায় এর জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা দরকার। তবুও, হাজার হাজার দাবিদারের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনও যদি তাদের দাবির যথার্থতা প্রমাণে সক্ষম হয়, তাহলেও সন্দেহভাজন দাবিদারদের উপস্থিতি ও তাদের সহ্য করার ঝুঁকি নেওয়া চলে।[১৫০]

কারও অন্তরের কণ্ঠস্বর তার সঙ্গে কথা বলছে, এ-রকম সম্ভাবনার সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তুলেছে এমন কথা আমার জানা নেই। অন্তরের কণ্ঠস্বরের আদেশানুসারে যে কথা বলে, এমন একজন ব্যক্তির দাবিও যদি প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি পায়, তাহলে সেটা হবে বিশ্বের এক বড় প্রাপ্তি। অনেকে অনুরূপ দাবি করতে পাবে, কিন্তু সকলে এর

প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে না। তবু, ভুয়া দাবিদারদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ধরনের দাবির কণ্ঠরোধ করা কখনও উচিত নয়। কোনও মতেই নয়।

বহু মানুষ যদি গভীর সততায় অন্তরের কণ্ঠস্বরকে মূর্ত করে তুলতে পারে, তাতে কোনও বিপদ নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে মিথ্যাচারের কোনও প্রতিষেধক নেই। অনেকে পুণ্যের ভান করবে বলে পুণ্যকেই নিষিদ্ধ করা চলে না। বিশ্বের নানা স্থানে নানা ব্যক্তি সর্বকালেই দাবি করেছে যে, অন্তরের কণ্ঠস্বরই তাদের মুখে বাঙ্ময় হয়েছে। কিন্তু তাদের সেই স্বল্পায়ু ক্রিয়াকলাপের ফলে বিশ্বের কোনও ক্ষতি হয়নি।

এই কণ্ঠস্বর শ্রবণের ক্ষমতা অর্জনের আগে একজনকে দীর্ঘ ও কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাহলে, যখন ওই কণ্ঠস্বর সরব হবে, তখন তা চিনতে কোনও ভুল হবে না। ইচ্ছে করলেই চিরকাল পৃথিবীকে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। তাই, আমার মতো কোনও সাধারণ মানুষের কণ্ঠ যদি রোধ করা না হয়,— তার যদি বিশ্বাস থাকে যে সে অন্তরের কণ্ঠস্বর শুনেছে, তার নির্দেশেই সে চলে, সে-ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বার কোনও আশঙ্কা থাকবে না।[১৫১]

ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনার এই দাবি, আমার নতুন কোনও দাবি নয়। দুর্ভাগ্যবশত, ফলাফল প্রদর্শন করা ছাড়া এ-দাবি প্রমাণ করার কোনও পথ আমার জানা নেই। ঈশ্বর যদি নিজেকে তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের দ্বারা প্রমাণযোগ্য কোনও বস্তু হতে দেন, ঈশ্বর তাহলে ঈশ্বর থাকেন না। কিন্তু তিনি তাঁর স্বেচ্ছাদাসকে কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবার শক্তি জোগান।

গত অর্ধশতকেরও বেশি সময়কাল ধরে আমি এই কঠোর শিক্ষকের স্বেচ্ছাদাস হয়ে আছি। যত দিন কাটছে, ততই তাঁর কণ্ঠস্বর আরো জোরাল হয়ে উঠছে। জীবনের অন্ধকারতম লগ্নেও তিনি আমাকে ত্যাগ করেননি। অনেক সময়ে আমাকে রক্ষা করেছেন আমার হাত থেকেই। এতটুকু স্বাধীন হতে দেননি আমাকে। তাঁর কাছে নিজেকে যত বেশি সমর্পণ করি, তত বেশি আনন্দ পাই।[১৫২]

ঈশ্বরের আহ্বান

আমার কাছে ঈশ্বর, বিবেক বা সত্যের কণ্ঠস্বর, অথবা অন্তরের কণ্ঠস্বর, অথবা "অস্ফুট, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর", সবই এক। আমি ঈশ্বরকে সাকার দেখিনি। কখনও চেষ্টাও করিনি। কেন না আমি সর্বদাই বিশ্বাস করেছি ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু যা শুনেছি তা এক কণ্ঠস্বর, খুব দূরের, আবার বেশ কাছেরও। কোনও মানুষ যেন আমার সঙ্গে কথা বলছে এমনই অভ্রান্ত তা, এবং অপ্রতিরোধ্যও। যখন তা শুনি, তখন আমি স্বপ্ন দেখছিলাম না। সে কণ্ঠস্বর শোনার আগে আমার মধ্যে এক দুরন্ত সংগ্রাম চলেছিল। সহসা শুনলাম সে আহ্বান। শুনলাম, নিশ্চিত হলাম এ তাঁর কণ্ঠস্বর। সংগ্রাম গেল থেমে। আমি তখন শান্ত। সেই অনুসারে সংকল্প নিলাম। অনশনের তারিখ ও সময় ধার্য হল........

আমি কি আর কোনও প্রমাণ দিতে পারি যে এটা ছিল সত্যই সেই কণ্ঠস্বর, আমার

উত্তপ্ত কল্পনার কোনও প্রতিধ্বনি নয়। অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করাবার মতো আর কোনও প্রমাণ আমার কাছে নেই। একথা অবাধে বলার স্বাধীনতা তার আছে যে, এটা আত্মপ্রতারণা বা দুঃস্বপ্ন। তা হতেই পারে। এর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ আমার নেই। কিন্তু আমি বলতে পারি, গোটা দুনিয়ার রায় যদি আমার বিরুদ্ধে একবাক্যে ধ্বনিত হয়, তাতেও আমাব এ বিশ্বাস টলবে না: যা শুনেছি তা সত্যই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।

কেউ কেউ মনে করে, স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের কল্পনাব সৃষ্টি। তা যদি সত্য হয়, তবে কিছুই বাস্তব নয়, সবকিছুই আমাদের কল্পনা। তবুও যখন আমি কল্পনার বশীভূত, সে সময়ে তার জাদুতেই আমি কাজ কবতে পারি। বাস্তবতম যা কিছু, তা-ও আপেক্ষিকভাবে অনুরূপ। আমার কাছে এ কণ্ঠস্বর, আমার অস্তিত্বের চেয়েও অধিকতর বাস্তব। কখনই এই কণ্ঠস্বর আমাকে, বা সত্যি বলতে, কাউকেই নিবাশ করেনি। যে দৃঢ়পণ হবে, সে-ই এ স্বর শুনতে পাবে। এ প্রত্যেকের অন্তবেই বিরাজমান। তবে সব কিছুর মতো এব জন্যও দরকাব সুনির্দিষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি।[১৫৩]

ঠিক বা ভুল যা-ই হোক, আমি জানি যে, এক সত্যাগ্রহী হিসেবে, সম্ভাব্য সবরকম সংকটে ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতীত আমাব আর কোনও সহায় নেই। আমার যে-সব কাজেব ব্যাখ্যা মেলে না, সেগুলি অন্তবেব তাগিদেই করা হয়, আমি চাই সবাই এ-ভাবেই বিশ্বাস করুক। হয়তো এটা আমার উত্তপ্ত কল্পনার ফসল। তা যদি হয়ও, তবু আমি এই কল্পনাকে অমূল্য মনে করি। বিগত পঞ্চান্ন বছরব্যাপী উত্থান ও পতন-বন্ধুর জীবনে এই কল্পনাই আমাকে সাহায্য করেছে। কেননা, পনেব বছর বযসও যখন হয়নি, তখন থেকেই আমি সচেতনভাবে ঈশ্ববের উপর নির্ভর করতে শিখেছি।[১৫৪]

৬. আমার উপবাস

আমার ধর্ম আমাকে শিখিয়েছে: যখনই দুরপনেয় দুরবস্থা আসে, তখনই উপবাস ও প্রার্থনা করা উচিত।[১৫৫]

এ [উপবাস] আমাব সত্তাবই এক অংশ। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, চোখ ছাড়া যদি কাজ চালাতে পারি, তবে উপবাস ছাড়াও পারি। বহির্জগতের জন্য চোখের যে ভূমিকা, অন্তর্জগতের জন্য উপবাসের সেই একই ভূমিকা।[১৫৬]

উচ্চতর আদেশ

এ উপবাসের জন্য আমি দায়ী নই। মজা পাওয়ার জন্য এ আমি করি না। যশের মোহে দেহকে কষ্ট দিতে আমি নারাজ। উপবাসকালে ক্ষুধাব জ্বালা ও অন্যান্য বহু অস্বস্তি যদিও আমি সানন্দে সহ্য করি, তবু কেউ যেন না ভাবে যে আমার কষ্ট হয় না। এক উচ্চতর শক্তি আমার উপর উপবাসগুলি চাপিয়ে দেয় বলে তা সইতে পারি। এর কষ্ট সইবার ক্ষমতাও সেই শক্তির কাছ থেকেই পাওয়া।[১৫৭]

কারো হুকুমে আমি উপবাস করতে পারি না। আমরণ অনশন ব্যাপারটা হালকা মেজাজে করাও যায় না। চিন্তাভাবনা করলে মনে হয়, এগুলি করাই ঠিক নয়। ক্রোধের বশে অনশন করা যায় না। ক্রোধ এক ক্ষণস্থায়ী উন্মত্ততা। অতএব আমি তখনই উপবাস শুরু করতে সক্ষম যখন অন্তরের ক্ষীণ, অস্ফুট কণ্ঠস্বরটি আমাকে নির্দেশ দেয়।[১৫৮]

উপবাস ও প্রার্থনা

প্রকৃত উপবাস দেহ, মন ও আত্মাকে নির্মল করে। উপবাস দেহকে করে ক্রুশবিদ্ধ, একই সঙ্গে সে অনুপাতে আত্মাকে করে মুক্ত। এক আন্তরিক প্রার্থনা আশ্চর্য ফল দিতে পারে। এই প্রার্থনা হল, অধিকতর শুদ্ধতার জন্য আত্মার আর্তি। এইভাবে লব্ধ শুদ্ধতাকে কোনও মহান উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে তা প্রার্থনার রূপ লাভ করে।[১৫৯]

আমি বিশ্বাস করি যে উপবাস ভিন্ন কোনও প্রার্থনা এবং প্রার্থনা বাদে কোনও প্রকৃত উপবাস সম্ভব নয়।[১৬০]

সম্পূর্ণ উপবাস হল, আক্ষরিক অর্থে আপন সত্তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা। এই হল সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনাও। "আমার প্রাণ গ্রহণ করো। নিয়ত যেন তা শুধু তোমারই থাকে"—এই প্রার্থনা যেন কখনও শুধু শব্দোচ্চারণ বা বাকভঙ্গিমা না হয়। একে হতে হবে অকুণ্ঠ, অকুতোভয় ও আনন্দময় এক নিবেদন। খাদ্য এমন কি জলও গ্রহণ না করা, প্রাথমিক পর্যায় মাত্র, এই আত্মসমর্পণের সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর অংশ।[১৬১]

দেহকে বশে আনা

ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল না হলে, উপবাস নিছক অর্থহীন অনাহাব, অথবা তার চেয়েও মন্দ কিছু।[১৬২]

আমি জানি যে মানসিক অবস্থাটাই সব। পাখির ডাক যেমন, প্রার্থনাও তেমনই হতে পারে, ইচ্ছা বা চেষ্টাশূন্য স্বরনিক্ষেপ মাত্র। উপবাসও তেমনই হতে পারে, শরীরকে যান্ত্রিকতায় নিপীড়ন করা। ....(উপবাস বা প্রার্থনা) দুটির কোনওটিই আত্মাকে স্পর্শ করে না।[১৬৩]

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি দেহকে যতটা বশ করবে, তদনুপাতে তোমার আত্মার শক্তিও বৃদ্ধি পাবে।[১৬৪]

শরীর যখন বিদ্রোহ করে, তখন তাকে কষ্ট দেওয়া আবশ্যক হতে পারে। শরীর যখন পরাভূত, যখন তাকে সেবার কাজে ব্যবহার করা যায়, তখন তাকে কষ্ট দেওয়া পাপ। অন্যভাবে বলা যায়, শরীরকে কষ্ট দেওয়া কোনও নিজস্ব গুণ নয়।[১৬৫]

শরীরকে আনন্দলাভে বঞ্চিত করার মধ্যে কিছু একটা আছে। দেহকে যতক্ষণ না ক্রুশবিদ্ধ করো, ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখতে পাও না। শরীর ঈশ্বরের মন্দির হিসেবে তার প্রতি যা করণীয় তা করা এক ব্যাপার, আর শরীরের শারীর চাহিদা প্রত্যাখ্যান করা ভিন্ন ব্যাপার।[১৬৬]

আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং সহমর্মী ছিটগ্রস্তদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি নির্দ্বিধায়

বলতে পারি যে তোমার যদি ১. কোষ্ঠবদ্ধতা, ২. রক্তাল্পতা, ৩. জ্বরভাব, ৪. হজমের গোলমাল, ৫. মাথা ধরা, ৬. বাতের ব্যথা, ৭. গেঁটেবাত, ৮. ক্রোধ ও খিটখিটে ভাব, ৯. মানসিক বিমর্ষতা, ১০. আনন্দাধিক্য হয়, তুমি উপবাস কর। ডাক্তারী বিধান ও পেটেন্ট ওষুধ ছাড়াই তোমার চলে যাবে।[১৬৭]

প্রতিরোধে উপবাস

যে ভালবাসে শুধুমাত্র তার বিরুদ্ধেই উপবাস করা যায়। তার কাছ থেকে অধিকার আদায়ের জন্য নয়, তাকে সংশোধন করবার জন্য। যেমন, পিতা মদ্যপান করবার কারণে পুত্রের উপবাস। বোম্বাই ও পরে বারদোলিতে আমার উপবাস ছিল ওই জাতের। যারা আমাকে ভালবাসে, তাদের সংশোধন করবার জন্যই আমি উপবাস করি। তবে জেনারেল ডায়ারের মতো মানুষকে সংশোধন করার জন্য আমি উপবাস করব না। তিনি আমায় ভালবাসেন না। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেকে আমার শত্রু বলে মনে করেন।[১৬৮]

এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, উপবাস বলপ্রয়োগমূলক হতে পারে। স্বার্থ-সাধনের জন্য তেমন উপবাস করা হয়। কোনও ব্যক্তির কাছে টাকা আদায়, বা অনুরূপ ব্যক্তিগত কারণে উপবাস করলে তা বলপ্রয়োগ, বা অন্যায় প্রভাব বিস্তারের সমতুল হয়। ও রকম অন্যায় প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় আমি প্রতিরোধ চালাতে বলব।

এমন উদ্দেশ্যে যখন উপবাস করা হয়েছে, বা করার হুমকি দেওয়া হয়েছে আমাকে, আমি তার সফল প্রতিরোধ করেছি। যদি তর্কের খাতিরে বলা হয় যে, শেষ লক্ষ্য স্বার্থপর, না নিঃস্বার্থ তার বিভাজন রেখা প্রায়ই বড় সূক্ষ্ম,—আমি বলব, যে-ব্যক্তি মনে করে উপবাসের উদ্দেশ্যটি স্বার্থসম্পর্কিত, অথবা মন্দ, তার উচিত দৃঢ় চিত্তে এর বিরোধিতা করা। বিরোধিতা করতে গিয়ে পরিণামে যদি অনশনকারীর মৃত্যু হয়, তবুও। মানুষ যদি, তাদের মতে যা অসাধু তেমন উদ্দেশ্যে কৃত উপবাসকে উপেক্ষা করার অভ্যাস করে,—তাহলে ওই উপবাস-ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা অন্যায় প্রভাব খাটানোর ব্যাপারটিও লোপ পাবে।

সকল মানবীয় কাজকর্মের মতো উপবাসও বৈধ বা অবৈধ, দুইভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সম্ভাব্য অসৎ ব্যবহারের কথা ভেবে সত্যাগ্রহ-অস্ত্রাগারের এই মহা আয়ুধটিকে বিসর্জন দেওয়া চলে না।[১৬৯]

উপবাস অস্ত্রটিকে লঘুভাবে ব্যবহার করা ঠিক নয় আমি জানি। উপবাসশিল্পে দক্ষ না হলে এর ব্যবহারে হিংসার গন্ধ এসে যেতে পারে। এ-বিষয়ে আমি নিজেকে একজন দক্ষ শিল্পী বলে মনে করি।[১৭০]

৭. আমার

আমি যা বুঝি না, বা নৈতিক ভিত্তিতে যা সমর্থন করতে পারি না, তেমন কোনও ব্যবহার বা আচরণের দাসত্ব করতে আমি নারাজ।[১৭১]

স্বীকার করছি, আমার মধ্যে নানা অসঙ্গতি আছে। তবে যেহেতু আমাকে "মহাত্মা" বলা হয়, তাই আমি এমার্সনের এই বক্তব্যের প্রতিও সমর্থন জানাতে পারি—"নির্বোধ সঙ্গতি হল ক্ষুদ্রমনাদের তৈরি ছোট ছোট ভূত।" আমি মনে করি আমার অসঙ্গতিগুলির মধ্যেও একটা পদ্ধতি রয়েছে। আমার মতে, আমার আপাত-অসঙ্গতির মধ্যেও আছে সঙ্গতি, যেমন প্রকৃতির দৃশ্যমান বৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে ঐক্য।[১৭২]

যে বন্ধুরা আমাকে চেনে, তারা বলেছে, আমি যতটা নরমপন্থী, ততটাই চরমপন্থী। যতটা সংরক্ষণশীল ততটাই আমূল পবিবর্তনকামী। এমন চূড়ান্ত বৈপরীত্যে-ভরা মানুষরা সৌভাগ্যবশত আমার বন্ধুদের মধ্যেই পড়েন। এই সংমিশ্রণ আমার মধ্যে ঘটেছে হয়তো অহিংসা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই।

শুধু অসঙ্গতিই চোখে দেখা যায়, আমার অনেক বন্ধুই এ-কথা বলে থাকে। তাব কারণ, বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনার প্রতি আমাব প্রতিক্রিয়া। ওপব ওপব যা সঙ্গতি বলে মনে হয, তা কিন্তু আদপে নিছক একগুঁয়েমিও হতে পারে।[১৭৩]

সুসঙ্গতি নিয়ে বাড়াবাড়ি

সুসঙ্গত বলে প্রতীয়মান কবা নিয়ে আমার কোনও চিন্তাই নেই। সত্যানুসন্ধানের পথে বহু চিন্তাভাবনা আমি বর্জন কবেছি, বহু নতুন কিছু শিখেছি। বৃদ্ধ হলেও আমার এমন মনে হয় না যে আমার অন্তবস্থ বিকাশ থেমে গেছে, বা এই দেহ অবসিত হওয়ার পরেও এই বিকাশ স্তব্ধ হবে। আমার একমাত্র উৎকণ্ঠা, প্রতিমুহূর্তে আমার ঈশ্বব, অর্থাৎ সত্যেব আহ্বান পালন করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি কি না।[১৭৪]

সঙ্গতিরক্ষা নিয়ে আমি অযথা উচ্ছ্বাস দেখাইনি কখনও। আমি সত্যের উপাসক। যে কোনও প্রসঙ্গেব প্রশ্নে, সে বিষয়ে আমি আগে কী বলেছি তাব পবোয়া না করেই, সেই মুহূর্তে আমি কী অনুভব করছি ও ভাবছি, তা আমাকে বলতে হবে....দৈনন্দিন অনুশীলনের ফলে আমার দেখার চোখ যে-হারে স্পষ্ট হচ্ছে, সে-অনুপাতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিও স্বচ্ছতর হয়ে ওঠা দরকার। যেখানে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মতামত পালটেছি, সেখানে পরিবর্তন চোখে পড়বেই। সতর্ক চোখে দেখলে দেখা যাবে, ক্রমান্বয় এবং অতি সূক্ষ্ম এক বিবর্তন ঘটে গেছে।[১৭৫]

কোনও বিশেষ প্রশ্নে, আমার অতীত বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করা আমার লক্ষ্য নয়। কোনও বিশেষ মুহূর্তে সত্য আমার কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়, তার সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষাই আমার অভিষ্ট। এর ফলে সত্য হতে সত্যে আমার বিকাশ ঘটেছে।[১৭৬]

স্বার্থসাধন নয়

রাজনৈতিক সুবিধালাভের জন্য কোনও নীতি আমি বিসর্জন দিইনি।[১৭৭]

ব্যক্তিগত স্বার্থে একটি কাজও করেছি জীবনে এমন আমার মনে পড়ে না। আমি বরাবরই মনে করি যে সর্বোচ্চ নৈতিকতার মাধ্যমেই সর্বোত্তম স্বার্থ সাধন সম্ভব।[১৭৮]

আপস

আমার বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠেছে, আমাব স্বভাব অনমনীয়। বলা হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের সামনে আমি মাথা নোয়াই না। স্বৈরাচারী বলে অভিযুক্ত হয়েছি। ....একগুঁয়েমি বা স্বৈরাচারের অভিযোগ আমি কখনওই মেনে নিতে পারিনি। বরং, অতীব গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমন ব্যাপারে নমনীয় স্বভাবের জন্য আমি গর্ব অনুভব করি। স্বৈরাচারিতা আমি ঘৃণা করি। নিজের মুক্তি ও স্বাধীনতাকে মূল্যবান মনে করি বলে অন্যের বেলায়ও এগুলিকে আমি সমান মূল্য দিই। আমি যদি কোনও পুরুষ বা নারীর যুক্তিবুদ্ধির কাছে আবেদন না রাখতে পারি, তাহলে আমার সঙ্গে একজনকেও রাখার ইচ্ছা নেই।

গতানুগতিকতার প্রতি আমার বিবোধিতাকে আমি এতদূর নিয়ে যেতে রাজি যে, আমি প্রাচীনতম শাস্ত্রের গরিমাও খারিজ কবতে পারি। যদি তা আমার যুক্তিবুদ্ধিতে বিশ্বাস সৃজনে ব্যর্থ হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছি, যদি একই সঙ্গে সমাজে বাস করতে ও স্বীয় স্বাধীনতাকে বক্ষা করতে চাই, তাহলে চূড়ান্ত স্বাধীনতার বিষয়গুলিকে প্রাথমিক প্রাসঙ্গিক গুরুত্বগুলির মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। অপর যে-সব বিষয়ে ব্যক্তিগত ধর্ম ও নীতি থেকে সরে আসতে হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে।[১৭৯]

সারাজীবন ধরে সত্যকে আঁকড়ে আছি বলেই আপস ও সমঝোতার সৌন্দর্য তারিফ করতে শিখেছি। পরবর্তী জীবনে দেখলাম, এই মনোভাব, সত্যাগ্রহেব আবশ্যিক এক অঙ্গ। এ-জন্য বহুবাব আমার জীবন বিপন্ন হয়েছে, বন্ধুদের বিরক্তি ঘটেছে। কিন্তু সত্য যেমন বজ্র-কঠোর তেমনি কুসুম-কোমল।[১৮০]

নিরন্তর আপস করে চলার নামই জীবন। তত্ত্বে যা সত্য বলে প্রতীয়মান, কাজে তার বাস্তবায়ন মানুষের পক্ষে সবসময়ে সহজ নয়।[১৮১]

কয়েকটি শাশ্বত নীতির ক্ষেত্রে কোনও সমঝোতা চলে না। এগুলি বাস্তবায়িত করতে গিয়ে যদি প্রাণবিসর্জন দিতে হয়, সে জন্যও প্রস্তুত থাকা উচিত।[১৮২]

৮. আমার লেখালেখি

কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত করার ব্যাপারটা এক সময়ে বেশ বিরক্তিকর ছিল। এখন তা সানন্দে উপভোগ করি। এর সবচেয়ে লাভজনক দিক হল, এর ফলে আমি শব্দের মিতব্যবহার শিখেছি। স্বাভাবিকভাবেই আমি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস রপ্ত করেছি। আজ চিন্তা ব্যতিরেকে একটি শব্দও আমার মুখ বা কলম থেকে নির্গত হয় না—এজন্য আমি নিজেই নিজের তারিফ করতে পারি। আমার কোনও ভাষণ বা রচনার জন্য পরে কখনও অনুশোচনা করতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এর ফলে বহু বিপত্তি ও সময়ের অপচয়ের হাত থেকে আমি অব্যাহতি পেয়েছি।[১৮৩]

'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান' প্রকাশের প্রথম মাসেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সাংবাদিকতার

একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সেবা। সংবাদপত্র ও সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠান এক বিশাল শক্তি। কিন্তু যেভাবে অবাধ জলস্রোত গ্রামাঞ্চল ডুবিয়ে দেয়, শস্যহানি ঘটায়, সে-ভাবেই অনিয়ন্ত্রিত কলম ধ্বংসের সেবায় নিয়োজিত হয়। নিয়ন্ত্রণ যদি বাইরে থেকে আসে, দেখা যায় নিয়ন্ত্রণের অভাবের চেয়ে তা অনেক বেশি বিষাক্ত। শুধুমাত্র ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ হলেই তার ফল শুভঙ্কর হয়। এ-যুক্তি যদি ঠিক হয়, তাহলে বিশ্বের ক'টি পত্রপত্রিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে? কিন্তু যেগুলি একেবারেই বাজে, সেগুলি বন্ধ করবে কে? সাধারণত সৎ ও অসৎ-এর মতোই আবশ্যক ও অনাবশ্যক পাশাপাশি চলে। মানুষ নিজেই এর মধ্যে একটিকে বেছে নেবে।[১৮৪]

আমার লেখায় অসত্যের কোনও স্থান থাকতে পারে না। কেননা আমার অটল বিশ্বাস, সত্য ভিন্ন আর কোনও ধর্ম নেই। কেননা, সত্যের মূল্যে যা কেনা যায় তেমন যে-কোনও ব্যাপারই প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার আছে।

আমার লেখা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ থেকে মুক্ত না হয়ে পারে না, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভালবাসাই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে।[১৮৫]

আমার সাংবাদিকতা

শুধু সাংবাদিকতা করার জন্য আমি সাংবাদিকতা গ্রহণ করিনি। জীবনে যা আমার উদ্দেশ্য বলে স্থির করেছি, তা সাধনের সহায়ক হিসেবেই একে আমি গ্রহণ করেছি। আমার উদ্দেশ্য, কঠোর সংযমের শাসনে, উদাহরণ ও কর্মবিধির দ্বারা সত্যাগ্রহ-রূপ অতুলনীয় আয়ুধের ব্যবহার শেখানো। এটি অহিংসা ও সত্যের প্রত্যক্ষ অনুসিদ্ধান্ত...স্ব-বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হলে, ক্রোধ বা ঘৃণার বশে আমার কলম ধরা চলবে না। অলসভাবে লিখলেও হবে না। শুধু আবেগ জাগাবার জন্যও লেখা চলবে না আমার।

পত্রিকার জন্য বিষয় নির্বাচন ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে যে সংযম আমাকে মেনে চলতে হয়, সে বিষয়ে পাঠকের কোনও ধারণাই নেই। এটা আমার এক প্রশিক্ষণই বটে। এর ফলে আমি নিজের অন্তরে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি। নিজের দুর্বলতাগুলি আবিষ্কার করি। অনেক সময়ে, আমার অহং একটি কেতাদুরস্ত ভাষা, এবং আমার ক্রোধ একটি রূঢ় বিশেষণ ব্যবহার করতে বলে। এ এক বিষম পরীক্ষা। তবে এই সব আগাছা উপড়ে ফেলার এক ভালো অভ্যাসও বটে।[১৮৬]

লেখার সময়ে, ঈশ্বর আমাকে যে-ভাবে চালিত করেন, আমি সে-ভাবে লিখি। আমার সকল সচেতন চিন্তা ও কর্ম ঈশ্বরের নির্দেশে হচ্ছে বলে সঠিক জানি, এমন দাবি আমি করি না। কিন্তু জীবনে যে মহত্তম পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, সেই সঙ্গে যেগুলি ক্ষুদ্রতম,—এই সবগুলিকে পরীক্ষা করলে আমার মনে হয়, সব পদক্ষেপ নিয়েছি ঈশ্বরের নির্দেশে, এটা বলা অসঙ্গত হবে না।[১৮৭]

ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমার কিছুটা মৌলিকত্ব আছে। তবে লেখার ব্যাপারটা আনুষঙ্গিক। নিজ চিন্তাভাবনা প্রচারের জন্য আমি লিখি। সাংবাদিকতা আমার পেশা নয়।[১৮৮]

যা আমি করেছি, তাই টিকে থাকবে। যা বলেছি বা লিখেছি, তা নয়।[১৮৯]

২. সত্য

১. সত্য সুসমাচার

সত্য.....আসলে কী? একটি জটিল প্রশ্ন। কিন্তু নিজের মতো করে আমি এ প্রশ্নের এই সমাধান করে নিয়েছি যে, তোমার অন্তরের কণ্ঠস্বর যা বলে তা-ই সত্য। তুমি বলবে, তাহলে কেমন করে পৃথক পৃথক মানুষ পৃথক ও পরস্পরবিরোধী সত্যের কথা চিন্তা করে? বেশ, যখন দেখা যাচ্ছে যে মানুষের মন অসংখ্যভাবে কাজ করে,—যখন মানবমনের বিকাশ সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়,—তখন এটা বোঝাই যায় যে, যা একের বেলায় সত্য, তা অপরের বেলায় সত্য না-ও হতে পারে। তাই যাঁরা বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই পরীক্ষানিরীক্ষা করার সময়ে কয়েকটি শর্ত মেনে চলা উচিত....

এর কারণ এই মুহূর্তে দেখছি, কোনওরকম নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে না গিয়েই প্রত্যেকে বিবেকের অধিকার দাবি করছে। এক বিভ্রান্ত বিশ্বের সামনে পরিবেশিত হচ্ছে অনেক অসত্য। সবিনয়ে আমি তোমাদের এ-টুকুই বলতে পারি যে, নম্রতার বোধ যার যথেষ্ট নেই, তেমন কেউ সত্যের সন্ধান পাবে না। সত্যরূপ সমুদ্রের বুকে তোমাকে যদি সন্তরণ করতে হয়, তাহলে নিজেকে তোমায় শূন্যে পর্যবসিত করতে হবে।[১]

সত্য এবং প্রেম—অহিংসা—হল একমাত্র বস্তু যা গণ্য করার যোগ্য। যেখানেই এর অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে শেষ অবধি সব মঙ্গলজনক হয়। এই নিয়মের কখনও অন্যথা হয় না।[২]

সার্বভৌম নীতি

আমার কাছে সত্য হল সার্বভৌম নীতি, অসংখ্য অন্য নীতি যার অন্তর্ভুক্ত। এই সত্যের সত্যতা শুধু বাচনের ক্ষেত্রে নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও। এ-শুধু আমাদের ধারণার আপেক্ষিক সত্য নয়, এ হল পরম সত্য, শাশ্বত নীতি, ঈশ্বর স্বয়ং। ঈশ্বরের সংখ্যা অগণন, কেননা তাঁর প্রকাশও গণনাতীত। এগুলি আমাকে বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত করে ও ক্ষণেকের তরে হতবুদ্ধি ক'রে দেয়।

তবে, আমি শুধু সত্য হিসেবেই ঈশ্বরের উপাসনা করি। তাঁকে এখনও খুঁজে পাইনি,

তাঁর সন্ধান করছি। এই সন্ধানের জন্য, যা কিছু আমার প্রিয়তম,—তা যদি ত্যাগ করতেও হয়, আমি প্রস্তুত। এ ত্যাগের জন্য যদি জীবনও দিতে হয়, আশা করি আমি সে জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু যতক্ষণ না এই শাশ্বত সত্যকে আমি উপলব্ধি করছি, ততক্ষণ, আমার ধারণায় যা আপেক্ষিক সত্য, তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে। ইত্যবসরে এই আপেক্ষিক সত্যকেই হতে হবে আমার আলোকবর্তিকা, আমার বর্ম, আমার ঢাল। যদিও এ-পথ ঋজু, অপরিসর ও অসিফলকের মতো ক্ষুরধার, তবু আমার পক্ষে এটিই দ্রুততম, সহজতম পথ। এ-পথই শুধু আঁকড়ে থেকেছি, তাই আমার পর্বতপ্রমাণ ভুলভ্রান্তিকেও মনে হয়েছে তুচ্ছ। এ-পথ আমাকে দুঃখবেদনা থেকে বাঁচিয়েছে, আর আমার আলোকবর্তিকা অনুসরণে আমি এগিয়ে গেছি। প্রায়শই এই এগিয়ে চলার সময়ে আমি শাশ্বত সত্যের, ঈশ্বরের অস্পষ্ট রূপ দেখেছি এবং প্রত্যহ এ বিশ্বাসই আমার দৃঢ়তর হচ্ছে যে, তিনি একাই অস্তি, বাকি সব কিছুই নাস্তি।

সত্যানুসন্ধান

...ক্রমশই এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়তর হচ্ছে যে, আমার পক্ষে যা সম্ভব, একটি ছোট শিশুর পক্ষেও তা অসম্ভব নয়। এ-রকম বলার অকাট্য কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি। সত্যানুসন্ধানের সহায়ক উপায়গুলি যত সবল, ততই জটিল। এক দাম্ভিক ব্যক্তির কাছে ওগুলি অসম্ভব মনে হতে পারে। এক নিষ্পাপ শিশুর কাছে মনে হতে পারে সম্ভব।

সত্যানুসন্ধানীকে পথের ধুলোর চেয়েও দীন হতে হবে। দুনিয়া ধুলোকে দু'পায়ে মাড়ায়। কিন্তু সত্যানুসন্ধানীকে এতই বিনম্র হতে হবে যে ধুলোও যেন তাকে পদদলিত করতে পারে। তখন সে সত্যকে একঝলক দেখতে পাবে, তার আগে নয়।[৩]

সত্য এক বিশাল বৃক্ষের মতো। যতই তার যত্ন করবে, ততই তাতে বেশি করে ফল ধরবে। সত্যের খনিতে যত গভীরে অনুসন্ধান চালাবে, ততই সেখানে লুক্কায়িত মণিরত্নের খোঁজ পাবে। তার মানে, বহু বিচিত্র সেবাকার্যের পথ খুলে যাবে।[৪]

যে বিশ্বে ঈশ্বর, অর্থাৎ সত্য ভিন্ন বাকি সবই অনিশ্চিত, সেখানে নিশ্চিতি আশা করা ভুল বলে মনে করি। তবে নিশ্চিতি রূপে নিহিত আছেন পরম এক সত্তা। সে নিশ্চিতির এক ঝলক দর্শন যদি কেউ পায়, সেই ঘাটে নৌকা বাঁধে, তবে সে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য। সত্যানুসন্ধানই হচ্ছে জীবনের সারাৎসার।[৫]

সত্যের পানে এগিয়ে যাবার পথে, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, ঘৃণা ইত্যাদি আপনা থেকেই পথ ছেড়ে সরে যায়। তা না হলে সত্যকে আয়ত্ত করা সম্ভব হতো না। ভাবাবেগচালিত কোনও মানুষের সদিচ্ছা থাকতে পারে। সে সত্যবাদী হতে পারে, কিন্তু কখনওই সে সত্যের দেখা পাবে না। সফল সত্যানুসন্ধান বলতে বোঝায়—ভালবাসা ও ঘৃণা, সুখ ও দুর্দশা, এ সবের দ্বৈত আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ।[৬]

সত্যদর্শন

বিশ্বব্যাপী ও সর্বত্রগামী সত্যের আত্মাকে মুখোমুখি দেখতে হলে ভালবাসতে হবে নগণ্যতম

প্রাণীটিকেও, ঠিক নিজের মতো। যে ব্যক্তি সত্যপিপাসু, সে জীবনের কোনও ক্ষেত্র থেকেই দূরে সরে থাকতে পারে না। এ জন্যই, সত্যের প্রতি আনুগত্য আমাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছে। আমি নির্দ্বিধায়, সবিনয়ে বলতে পারি,—যারা বলে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই, তারা জানে না রাজনীতি বলতে কি বোঝায়।[৭]

আমার একটানা অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, সত্য ব্যতীত কোনও ঈশ্বর নেই.... আমার সেই চকিতে দেখা......সত্যের যে-টুকু আমি দেখেছি, তা সত্যের অনির্বচনীয় মহিমার সামান্য আভাসও দিতে পারে না। প্রত্যহ যে সূর্যকে আমরা দেখি, তার চেয়ে লক্ষগুণ দীপ্যমান এ সত্য।[৮]

প্রকৃতপক্ষে সেই বিশাল দ্যুতির ক্ষীণতম দীপ্তিই আমার কাছে দৃশ্যমান হয়েছে। আমার সকল পরীক্ষার শেষে, কেবল নিশ্চিতভাবে এটুকু বলতে পারি যে, পূর্ণভাবে অহিংসা আয়ত্ত হলেই সত্যকে সম্যকরূপে দেখা একমাত্র সম্ভব।[৯]

প্রতিটি মানব হৃদয়েই সত্যের অধিষ্ঠান। মানুষকে সত্যের জন্য স্ব-হৃদয়ে সন্ধান করতে হবে। সত্যকে সে যেমন দেখে, তার দ্বারা চালিত হতে হবে। কিন্তু সত্য সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের ওপরে জোর করে চাপিয়ে দেবার অধিকার কারো নেই।[১০]

পরম সত্য

মানুষের পক্ষে সমগ্র সত্য জানা সম্ভব নয়। তার কর্তব্য, সে যে-ভাবে সত্যকে বোঝে, সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করা, আর এ-কাজ করার যা শুদ্ধতম উপায়, সেই অহিংসার সহায়তা নেওয়া।[১১]

একা ঈশ্বর জানেন পরম সত্য। তাই আমি প্রায়ই বলেছি, সত্যই ঈশ্বর। এর অর্থ হল মানুষের সত্তা সীমিত! সে পরম সত্য জানতে পারে না।[১২]

এ জগতে পরম সত্যের অধিকারী কেউ-ই নয়। এ একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব। আমরা যা জানি, সবই আপেক্ষিক সত্য। তাই আমরা বড়জোর, সত্যকে যেমন দেখি, তেমনি অনুসরণ করতে পারি। অনুরূপ সত্যানুসন্ধান কাউকে বিপথে চালিত করতে পারে না।[১৩]

সত্য এবং আমি

যা বিশ্বাস করিনি তা বলার অপরাধে জীবনে অপরাধী হইনি। আমার স্বভাবই হল সরাসরি হৃদয়ে প্রবেশ করা। সাময়িকভাবে তা করতে যদি ব্যর্থও হই, তবু আমি জানি যে শেষ পর্যন্ত সত্যকে শোনা ও অনুভব করা যাবে। আমার অভিজ্ঞতায় বারবার এ রকম ঘটেছে।[১৪]

আমার মতো শত শত মানুষ বিলুপ্ত হোক, কিন্তু সত্য শাশ্বত থাকুক। আমার মতো ভ্রমশীল, মরণশীল মানুষকে বিচারের জন্য আমরা যেন সত্যের আদর্শ একচুলও ক্ষুণ্ণ না করি ।[১৫]

নিজেকে বিচার করার সময়ে আমি সত্যের মতোই কঠোর হতে চেষ্টা করব। আমি

চাই, অন্যেরাও তাই করুক। সেই মানদণ্ডে নিজেকে পরিমাপ করে আমি সুরদাসের মতোই বলতে চাই,

আমার মত দুর্জন ও ঘৃণ্য
আর কোন্ হতভাগ্য আছে?
এমনই বিশ্বাসহীন আমি,
যে স্রষ্টাকেই ত্যাগ করেছি।[১৬]

আমার ভুল

আমি নিন্দনীয় ব্যক্তি হতে পারি, কিন্তু যখন সত্য আমার মধ্য দিয়ে কথা বলে, তখন আমি অপ্রতিরোধ্য।[১৭]

আমি সত্য ব্যতীত আর কারো অনুগামী নই, এবং সত্য ভিন্ন আর কারো বাধ্যতা মানবার দায় আমার নেই।[১৮]

সত্য ভিন্ন আর কোনও ঈশ্বরের সেবা আমি করি না।[১৯]

সত্য আঁকড়ে থাকলে যেটুকু পাই, তা ছাড়া অন্য কোনও শক্তি আমার নেই। ওই একই উৎস থেকে আসে অহিংসাও।[২০]

আমি অতি নগণ্য, কিন্তু ঐকান্তিক সত্যসন্ধানী। এই সন্ধানে, গভীরভাবে বিশ্বাস করি সহ-সন্ধানীদের, যাতে আমার ভুলগুলি জানতে ও শুধরে নিতে পারি। স্বীকার করছি, মূল্যায়ন ও বিচার করতে গিয়ে অনেক সময়ে আমি ভুল করেছি.... প্রতি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে এসেছি, কোনও স্থায়ী ক্ষতি হয়নি। বরং এব ফলে অহিংসার মৌলিক সত্যটি বহুগুণে বেশি প্রকাশিত হয়েছে, দেশেরও কোনও স্থায়ী ক্ষতি হয়নি।[২১]

আমি নিজে এক শিক্ষার্থী। আমার কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। যেখানেই একটিমাত্র সত্যকেও দেখি, তা গ্রহণ করি, তদনুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা করি।[২২]

আমি বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগত সদিচ্ছা থাকলেও, কেউ যখন ভুল করে, তার ফলে বিশ্বের, বা কোনও ব্যক্তিরও ক্ষতি হয় না। যাদেরই ঈশ্বরের ভয় রয়েছে, তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের পরিণামের হাত থেকে ঈশ্বর সবসময়েই বিশ্বকে রক্ষা করেন।

আমার উদাহরণ দেখে যাদের বিপথগামী হবার সম্ভাবনা আছে, তারা যদি আমার কাজের কথা না-ও জানত, তবুও ওই একই পথে যেত। কারণ, শেষ বিশ্লেষণে, মানুষ অন্তরের নির্দেশ অনুসারেই কাজ করে। যদিও এক এক সময়ে মনে হয় যে অপরের উদাহরণ দ্বারা সে চালিত হচ্ছে। সে যাই হোক, আমি জানি যে আমার ভুলের কারণে বিশ্ব কখনওই কষ্টভোগ করেনি। কেননা আমার ভুলগুলি ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত। আমার যে ভুলগুলির কথা সবাই জানে, তার একটিও ইচ্ছাকৃত নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।[২৩]

এটা হতেই পারে যে, একজনের কাছে যেটা স্পষ্টতই ভুল বলে মনে হবে, অন্যে তাকেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বলে মনে কববে। মোহাবিষ্ট হলেও সে নিজেকে এর থেকে মুক্ত করতে পারবে না। সত্যই, তুলসীদাস যেমন বলেছিলেন, "ঝিনুকে যদিও রুপো নেই, বা সূর্যরশ্মিতে জল, কিন্তু যতক্ষণ চকচকে ঝিনুকে রূপো, বা সূর্যরশ্মিতে জলের মায়াভ্রম থাকবে, ততদিন বিশ্বেব কোনও শক্তি বিভ্রান্ত মানুষকে ওই মায়াজাল থেকে

মুক্ত করতে পারবে না।" আমার মতো যে মানুষেরা মায়ার মোহে কাজ করে চলেছে, তাদের বেলায়ও নিশ্চয় ওই কথা খাটে। নিশ্চয় ঈশ্বর তেমন লোকদের ক্ষমা করবেন, পৃথিবী তাদের মেনে নেবে। সবশেষে সত্য নিজেকে প্রকাশ করবে।[২৪]

যে আদর্শ ন্যায়সঙ্গত, সত্য কখনও তার ক্ষতি করে না।[২৫]

জীবনের অন্য নাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এর লক্ষ্য, সেই সম্পূর্ণতার প্রয়াসী হওয়া, যা আত্মোপলব্ধি। আমাদের দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতার জন্য আদর্শের অবনমন অনুচিত। উপরোক্ত দুটি খামতি সম্পর্কেই আমি বেদনাদায়কভাবে সচেতন। প্রত্যহ আমার নীরব আর্তি সত্যের কাছে নিবেদিত হচ্ছে—সে যেন আমার দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করতে আমাকে সাহায্য করে।[২৬]

সত্যকে পরিহার করা নয়

ষাট (৬০) বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি তোমাদের বিশ্বাস করতে বলব যে, সত্যের পন্থা বর্জন করার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নেই। এটা যদি তোমরা উপলব্ধি করো, তাহলে সত্যানুসন্ধানের পথে যে-কোনও পরীক্ষা বা বাধা আসুক না কেন, অকুতোভয়ে সেগুলি অতিক্রম করার জন্য ঈশ্বরের কাছে তোমাদের একটি প্রার্থনাই সাহায্য কববে।[২৭]

শুধু সত্যই টিকে থাকবে। বাকি সব কিছুই সময়ের স্রোতে বিলীন হয়ে যাবে। তাই, সকলে যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তাহলেও আমাকে সত্যানুসরণ করে চলতেই হবে। আজ হয়তো আমার কণ্ঠস্বর অরণ্যে রোদন মাত্র। কিন্তু এ যদি সত্যের কণ্ঠস্বর হয়, তাহলে অন্য সব কণ্ঠ নীরব হয়ে গেলেও একে শোনা যাবে।[২৮]

যদি সমগ্র বিশ্ব মিথ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাহলেও বিশ্বাসী মানুষ সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।[২৯]

যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন,—যখন প্রাসঙ্গিক, তখন সত্য বলতেই হবে। যা অপ্রাসঙ্গিক, তা সবসময়েই অসত্য, এবং উচ্চারণযোগ্য নয়।[৩০]

১০. সত্যই ঈশ্বর

ঈশ্বর আছেন

অব্যক্ত এক নিগূঢ় শক্তি সব কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমি একে দেখতে না পেলেও অনুভব করি। এই অদৃশ্য শক্তিই নিজেকে অনুভব করতে দেয়, কিন্তু সব প্রমাণ এড়িয়ে চলে। কারণ, আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে যে ক্ষমতাগুলি অনুভব করি, এ তার চেয়ে একেবারে অন্যরকম। এর শক্তি ইন্দ্রিয়াতীত। এতদসত্ত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কিছুদূর পর্যন্ত সম্ভব।

অস্ফুটভাবে হলেও আমি উপলব্ধি করি, আমার চারপাশে সবকিছুই যখন নিত্য পরিবর্তনশীল, নিত্য মৃত্যুবরণ করছে,—তখন এই সব পরিবর্তনের অন্তরালবর্তী এমন এক জীবন্ত শক্তি রয়েছে যা অপরিবর্তনীয়, যা সব কিছুকে ধারণ করে আছে, সৃষ্টি করছে, বিনাশ করছে, পুনরায় সৃষ্টি করছে। সেই নিত্য-শক্তি বা আত্মাই হল ঈশ্বর। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুই অনিত্য, কেবল তিনিই নিত্য।

এই ক্ষমতা কি শুভঙ্কর না অশুভ? আমি মনে করি সম্পূর্ণ শুভঙ্কর। কেননা, দেখতে পাই মৃত্যুব মধ্যে বিরাজ করছে জীবন, অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে আলো। তাই আমি মনে করি, ঈশ্বরই জীবন, সত্য, আলো। তিনিই প্রেম। তিনি পরম মঙ্গলময়।

আমি স্বীকার করছি... যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বাস উৎপাদন করাব, এমন কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই। বিশ্বাস, যুক্তিকে অতিক্রম করে যায়। আমি শুধু পরামর্শ দেব...... অসম্ভবকে সম্ভব কবাব চেষ্টা কোব না। কোনও যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে আমি পাপের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে অপারগ। তেমন করতে চাইলে আমাকে ঈশ্বরের সমকক্ষ হতে হয়। তাই, পাপ যে আছে তা মেনে নেবার মতো বিনয় আমার আছে। আমি মনে করি, ঈশ্বর অনন্তকাল ধরেই যন্ত্রণার্ত ও ধৈর্যশীল, কেননা তাঁর সম্মতিতেই পৃথিবীতে পাপের আগমন। আমি জানি যে তাঁর মধ্যে কোনও পাপ নেই। যদি থাকেও, তিনি এরও স্রষ্টা। যদিও তিনি অপাপবিদ্ধ।

আমি এ-ও জানি, যদি জীবন পণ করেও পাপের সঙ্গে লড়াই না করি, কোনওদিনই ঈশ্বরকে জানতে পারব না। আমাব নিজস্ব বিনম্র ও সীমিত অভিজ্ঞতা আমাকে এই বিশ্বাসে দৃঢ়মূল করে রেখেছে। যতই আমি শুদ্ধতর হবার চেষ্টা করি, ততই আমি ঈশ্বরের নিকটতর সান্নিধ্য অনুভব করি। আজকে আমার বিশ্বাস যেমন অগভীর, তেমন না হয়ে যদি হিমালয়ের মতো অটল, তার শিখরমালার তুষারের মতো শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত তাহলে আমি তাঁর কত কাছেই না যেতে পারতাম![৩১]

আমার বিশ্বাস

এই বিশ্বকে অস্বীকার করে আমি সহজেই বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু আমার ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান আমার কাছে অচিন্তনীয়।[৩২]

জানি, নিজে আমি কিছুই করতে পারি না। তিনি সবই পারেন। হে ঈশ্বর! আমাকে তোমার যোগ্য 'যন্ত্রে' পরিণত করো। যদৃচ্ছা ব্যবহার করো আমাকে।[৩৩]

ঈশ্বরকে আমি দেখিনি, জানতেও পারিনি তাঁকে। সারা বিশ্বের ঈশ্বরবিশ্বাসকে আমি নিজ বিশ্বাসে পরিণত করেছি এবং যেহেতু আমার বিশ্বাসকে নির্মূল করা যাবে না, তাই আমি এ-বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতার সমতুল বলে মনে করি। কেউ হয়তো বলবে, বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করাটা সত্যের অপলাপ। হয়তো এই কথা বলা আরো সমীচীন হবে যে, আমার ঈশ্বরে-বিশ্বাস বর্ণনা করি, তেমন ভাষা আমি জানি না।[৩৪]

এই যে তুমি আর আমি এই ঘরে বসে আছি, তার চেয়েও নিশ্চিত করে জানি যে ঈশ্বর আছেন। এ কথাও হলফ করে বলতে পারি, বাতাস ও জল ছাড়া হয়তো বাঁচব, তাঁকে ছাড়া বাঁচব না। তুমি আমার চোখ উপড়ে নিতে পারো, কিন্তু তাতে আমি মরব না। আমার নাক কেটে নিতে পারো, তাতেও মরব না। কিন্তু আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস চূর্ণ করে দাও, আমার মৃত্যু হবে।

তোমরা হয়তো বলবে এটা কুসংস্কার। স্বীকার করি, এই কুসংস্কারটিকে আমি আঁকড়ে থাকি। শৈশবে বিপদে আপদে বা ভয়েব মুখে যেমন রামের নাম আঁকড়ে ধরতাম। এক বুড়ী ধাই আমাকে তা-ই করতে শিখিয়েছিল।[৩৫]

আমি বিশ্বাস করি যে আমবা সকলেই ঈশ্বরের বার্তাবহ হতে পারি যদি আমরা মানুষকে ভয় না পাই, কেবল ঈশ্বরের সত্যেরই সন্ধান করি। আমার বিশ্বাস, আমি কেবল ঈশ্ববের সত্যই খুঁজছি, এবং মানুষে সব ভয় হারিয়েছি।

....ঈশ্বরের ইচ্ছার কোনও বিশেষ প্রকাশ আমি দেখিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি প্রত্যহ প্রত্যেকটি মানুষের কাছে প্রকাশ পান। কিন্তু আমরা সেই "ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠস্বর"-এর প্রতি কান বন্ধ করে রাখি। আমাদের সামনে রয়েছে অগ্নিস্তম্ভ। আমরা চোখ বুঁজে থাকি। আমি তাঁর সর্বময় উপস্থিতি *টের* পাই।[৩৬]

আমাকে যাঁরা পত্র লেখেন, তাঁদের কয়েকজন মনে করেন, হয়তো আমি অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারি। সত্যের পূজারী হিসেবে বলতে পারি, অমন কোনও ক্ষমতা আমার নেই। আমার যদি কোনও ক্ষমতা থাকে, তা এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। তবে তিনি তো প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন না, করেন তাঁর সংখ্যাতীত প্রতিনিধির মধ্য দিয়ে।[৩৭]

ঈশ্বরের প্রকৃতি

ঈশ্বর আমার কাছে সত্য ও প্রেম; নীতিবোধ ও নৈতিকতা; তিনিই ভয়হীনতা। ঈশ্বরই আলো ও প্রাণের উৎস। তবু তিনি এ-সবের ঊর্ধ্বে। এ-সবের নাগালের বাইরে। ঈশ্বরই বিবেক। নাস্তিকের নাস্তিক্যও তিনি। অসীম করুণায় তিনি নাস্তিককে বাঁচতে দেন। তিনি হৃদয়ান্বেষী। তিনি বাক্ ও যুক্তির সীমায় বাঁধা পড়েন না। আমাদের ও আমাদের অন্তরের পরিচয় আমরা যতটুকু জানি, তিনি জানেন তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের কথার ভিত্তিতে তিনি আমাদের গ্রহণ করেন না, কেননা তিনি জানেন, আমরা যা বলি, প্রায়ই তা বিশ্বাস করি না, কেউ জ্ঞাতসারে, কেউ অজ্ঞাতসারে।

তাঁর ব্যক্তি-উপস্থিতি যাদের প্রয়োজন, তিনি তাদের কাছে ব্যক্তিগত ঈশ্বর। তাঁর স্পর্শ যাদের প্রয়োজন, তাদের কাছে তিনি মূর্ত। তিনি শুদ্ধতম সারাৎসার। যাদেরই বিশ্বাস আছে, তাদের কাছেই তিনি *বিরাজমান*। তিনি সকল মানুষের সবকিছু। তিনি আমাদের অন্তরে, তবু তার ঊর্ধ্বে, আমাদের নাগালের বাইরে......

তাঁর নামে জঘন্য অনৈতিক কাজ ও অমানবিক নিষ্ঠুরতা করা হয় বলেই তিনি অস্তিত্বহীন হয়ে যান না। দীর্ঘকাল ধরে তিনি যাতনা সহ্য করছেন। তিনি সর্বংসহা, আবার ভয়ালও বটে। তিনি এই বিশ্বের, ভাবীকালের বিশ্বের, কঠোরতম ব্যক্তিত্ব। আমরা

আমাদের প্রতিবেশী মানব ও মানবেতর প্রাণীদের যে মানদণ্ডে বিচার করি, তিনিও আমাদের বেলায় তা-ই করেন।

অজ্ঞতার অজুহাত তাঁর কাছে খাটে না। সর্বোপরি তিনি নিত্য ক্ষমাশীল, কেননা সর্বদা আমাদের অনুতাপ করার সুযোগ দেন।

ইহজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রী তিনি। কেননা পাপ ও পুণ্যের মধ্যে আমরা যাতে একটিকে বেছে নিতে পারি সে জন্য তিনি আমাদের "শৃঙ্খলমুক্ত" রেখেছেন। তাঁর মতো নির্দয় স্বেচ্ছাচারীও কেউ নয়। প্রায়ই তিনি আমাদের ঠোঁটের কাছ থেকে পেয়ালাটি টান মেরে ফেলে দেন। স্বাধীন ইচ্ছার নামে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা মঞ্জুর ক'রে তিনি যেন আমাদেব নিয়ে কৌতুক করেন।

সেজন্যই হিন্দুধর্ম বলে, এ সবই তাঁর খেলা, *লীলা*, অথবা এক অধ্যাস, মায়া। আমরা *'নাস্তি'*, একা তিনি *'অস্তি'*। আমবা যদি থাকি, তাহলে অনন্তকাল ধরে তাঁর গুণগান গাইতে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ কবতে হবে। এসো, সবাই তাঁর *বংশী-ব* সুরে নাচি। তাহলে সর্ব-কল্যাণ হবে।[৩৮]

পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠোর শিক্ষক বলে আমি ঈশ্বরকে চিনেছি। তিনি বাববার তোমার পরীক্ষা নেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। যখন দেখ তোমাব বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ছে, তোমার শরীর আর পারছে না, তুমি অতলে তলিয়ে যাচ্ছ, তখন তিনি কোনও-না-কোনও ভাবে তোমার সহায়তা কববেন। প্রমাণ করবেন যে তাঁব প্রতি বিশ্বাস হারানো তোমাব কোনওমতেই উচিত নয়। সবসময়ে তিনি তোমাব সাহায্যার্থে প্রস্তুত, তবে তাঁর শর্তে, তোমার শর্তে নয়। আমি তাই দেখেছি। এমন একটি উদাহরণও আমি মনে করতে পারি না, যখন চরমলগ্নে তিনি আমায় ত্যাগ করেছেন।[৩৯]

যৌবনের গোড়ায় আমাকে হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বরেব সহস্র নাম বলতে শেখানো হয়েছিল। কিন্তু সে নামাবলী তো সম্পূর্ণ নয়। আমাদের বিশ্বাস এবং আমিও তা সত্য বলে মনে করি—যত প্রাণী আছে, ঈশ্বরের নামও তত। আমরা এ-ও বলি যে, ঈশ্বর অনামা। যেহেতু তাঁর বহু রূপ আছে, তাই আমাদেব কাছে তিনি নিরাকার। যেহেতু তিনি নানা ভাষায় কথা বলেন, সেহেতু তিনি বাক্যের অতীত, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইসলাম চর্চা করতে এসে দেখলাম, ইসলামেও ঈশ্বরের নানা নাম রয়েছে।

যারা বলে ঈশ্বরই প্রেম তাদের সঙ্গে আমিও গলা মেলাই। কিন্তু মনের গভীরে আমি বলতাম ঈশ্বর প্রেম হতে পারেন, কিন্তু সর্বোপরি তিনি হলেন সত্য। মানুষের ভাষায় তাঁর পূর্ণ রূপেব বর্ণনা যদি সম্ভব হয়, তাহলে নিজের জন্য অন্তত আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ঈশ্বর হলেন সত্য।

কিন্তু দু'বছর আগে আরো এক ধাপ এগিয়ে আমি বলতে শুরু কবলাম, সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বরই সত্য, এবং সত্যই ঈশ্বর—দুটি বক্তব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ রয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সত্যের জন্য যে বিরামহীন, অক্লান্ত অন্বেষণ শুরু করেছিলাম, তারই পরিণামে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

তারপর আমি দেখলাম সত্যে পৌঁছবার নিকটতম পথ হল প্রেম। এটাও দেখলাম

যে ইংরাজিতে প্রেম শব্দের নানা অর্থ হয়। রিপুতাড়িত মানুষী আসক্তিও ওই একই নাম বহন করে, যদিও ব্যাপারটি নিন্দার্হ। দেখলাম, অহিংসা অর্থে প্রেম বলতে যা বোঝায়, বিশ্বে তার প্রবক্তা মুষ্টিমেয়। কিন্তু সত্যের ক্ষেত্রে কোনও দ্ব্যর্থকতা আমি পাইনি। এমন কি নিরীশ্বরবাদীরাও সত্যের প্রয়োজনীয়তা ও শক্তি সম্বন্ধে দ্বিমত নন।

কিন্তু সত্য আবিষ্কারের উৎসাহে এই নিরীশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বই নাকচ করে দিয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটা অবশ্য ঠিকই। এই ধরনের যুক্তির ফলেই আমি দেখলাম, ঈশ্বরই সত্য না ব'লে, আমার বলা উচিত সত্যই ঈশ্বর।[৪০]

ঈশ্বরই সত্য। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে আরো অনেক কিছু। তাই আমি বলি, সত্যই ঈশ্বর.... মনে রেখো, সত্যকে আমরা তাঁর বহু গুণের মধ্যে একটি, এ-ভাবে দেখি না। সত্য হল প্রাণবন্ত ঈশ্বররূপ, একমাত্র সত্যই হল জীবন। সত্যকে আমি পূর্ণতম জীবন বলে মনে করি। এইভাবেই তা বাস্তবে মূর্ত হয়ে ওঠে। কারণ, ঈশ্বর হলেন তাঁর সমগ্র সৃষ্টি, সকল অস্তিত্ব এবং অস্তিত্ববান সবকিছুর সেবা—সত্যই—ঈশ্বরের সেবা।[৪১]

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বলা হয় পূর্ণ-গুণান্বিত, অথচ কি মহান গণতন্ত্রী তিনি! আমাদের অন্যায় ও আত্মম্ভরিতার জন্য কত কষ্টই না পান! এমন কি আমাদের মতো নগণ্য দেহধারীর এমন আস্ফালনও তাঁকে দেখতে হয় যে, আমরা তাঁর অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলি। অথচ তিনি আমাদের চারপাশের, অন্তরের প্রতিটি অণুতে বিদ্যমান। তিনি নিজেকে কার কাছে প্রকাশ করবেন, তা নিজেই জানেন। তাঁর না-আছে হাত, না-আছে পা, বা অন্যান্য দেহাঙ্গ,--কিন্তু যার কাছে মূর্ত হবেন মনস্থ করেন, তার কাছেই দৃশ্যমান হন।[৪২]

সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমার মধ্যে উপলব্ধি না করলে প্রত্যহ আমাকে যে পরিমাণ দুঃখদুর্দশা ও হতাশা দেখতে হয়, তাতে আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতাম এবং আমাকে গঙ্গাযাত্রা করতে হতো।[৪৩]

ভারতে যারা তুচ্ছতম, তাদের বেদনার সঙ্গে যদি একাত্ম হতে পারি, যদি আমার সে ক্ষমতা এ-বিশ্বে ন্যূনতমও হয়, তাহলে যারা আমার রক্ষণাধীনে আছে সেই নগণ্যদের পাপের সঙ্গে যেন একাত্ম হতে পারি। সার্বিক বিনম্রতার সঙ্গে এ-কাজ করতে করতে আশা করি একদিন আমি মুখোমুখি ঈশ্বরকে—সত্যকে—দেখতে পাব।[৪৪]

আমি মানবজাতির সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর দর্শনের প্রয়াসী, কেননা আমি জানি তিনি প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, স্বর্গে বা পাতালে নয়।[৪৫]

আমি সমগ্রেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মানবজাতি ব্যতিরেকে আর কোথাও তাঁকে খুঁজে পাব না। আমার দেশবাসীই আমার নিকটতম প্রতিবেশী। তারা এতই অসহায়, সম্পদহীন, জড়বৎ হয়ে পড়েছে যে তাদের সেবাতেই আমাকে আত্মনিয়োগ করতে

হবে। যদি নিজেকে বোঝাতে পারতাম যে, হিমালয়ের কোনও গুহাতে তাঁকে পাব, তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে যেতাম। কিন্তু আমি জানি মানবজাতি বাদে অন্য কোথাও তাঁকে খুঁজে পাব না।[৪৬]

আমি আমার কোটি কোটি দেশবাসীকে চিনি। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই আমি তাদের সঙ্গে আছি। তারাই আমার প্রথম ও শেষ সেবার পাত্র। কারণ, মূক, আপামর জনগণের হৃদয়ে যে ঈশ্বর থাকেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বরকে আমি স্বীকার করি না। তারা হয়তো তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারে না, আমি পারি। এবং এই অসংখ্যের সেবার মধ্য দিয়ে আমি তাঁরই উপাসনা করি, যিনি ঈশ্বররূপী সত্য, ও সত্যরূপী ঈশ্বর।[৪৭]

পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকর্তা

আমাকে যেতেই হবে... এবং ঈশ্বর হবেন আমার একমাত্র পথপ্রদর্শক। তিনি এক ঈর্ষাপরায়ণ প্রভু। তাঁর কর্তৃত্ব তিনি কারো সঙ্গে ভাগ কবে নেবেন না। তাই তাঁর সামনে দাঁড়াতে হলে নিজেব সকল দুর্বলতা নিয়ে, অকিঞ্চন হয়ে, পূর্ণ সমর্পণের মনোভাব নিয়ে দাঁড়াতে হবে। তখনই তিনি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের সামনে দাঁড়াবার শক্তি দেবেন। সর্ববিধ বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন।[৪৮]

এই একটি শিক্ষা আমি গ্রহণ করেছি,—মানুষের পক্ষে যা অসাধ্য, ঈশ্বরের কাছে তা ছেলেখেলা মাত্র। তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও যিনি ভাগ্যনিয়ন্তা, তাঁর ওপবে আমাদেব বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে সবই সম্ভব। এই শেষ আশা নিয়েই আমি বেঁচে আছি এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলার চেষ্টা করছি।[৪৯]

তমসাবৃত হতাশার মধ্যে, যখন মনে হয়, এই বিশাল, অপার বিশ্বে আমাব পাশে এমন কেউ নেই যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, সান্ত্বনা দেবে, তখন তাঁর নাম আমাদের শক্তি জোগায় এবং সব সংশয় ও নিরাশা দূর করে। আকাশ হয়তো আজ মেঘাবৃত কিন্তু তাঁর কাছে একটি ঐকান্তিক প্রার্থনাই তা দূর করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রার্থনা করি বলেই কখনও আমি নৈরাশ্য বোধ করিনি।

...হতাশা কী, তা আমি জানি না। তাহলে কেন তোমরা এর কাছে নতিস্বীকার করো? এসো আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হৃদয় থেকে ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও মিথ্যাচার দূর করেন। অবশ্যই তিনি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন। আমি এমন অনেককেই জানি, যারা শক্তির ওই অব্যর্থ উৎসের কাছে সবসময়েই আশ্রয় নেয়।[৫০]

আমি দেখেছি এবং বিশ্বাস করি, ঈশ্বর কখনওই নররূপ ধারণ করে তোমার কাছে আসেন না। তিনি আসেন সেই কর্মময়তার রূপ ধ'রে যার সহায়তায় তুমি নিবিড় তমসাচ্ছন্ন দুঃসময়েও মুক্তি পাও।[৫১]

ব্যক্তিগত উপাসনা কী, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। এই উপাসনা নিরবচ্ছিন্ন চলতে থাকে, এমন কি অচেতনভাবেও। এমন একটা মুহূর্তও অতিবাহিত হয় না,

যখন আমি এমন একজনের উপস্থিতি উপলব্ধি করি না—কিছুই যাঁর চোখে এড়ায় না। তাঁর সঙ্গেই আমি নিজেকে এক সুরে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করি।

তিনি সাড়া দেননি, এমন কখনও ঘটেনি। কারাবাসের দুঃসময়ে যখন ভাগ্যাকাশ কৃষ্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন,—আমার জীবনের সব ছন্দের তাল যখন কেটে গিয়েছে, তখনই আমি সবচেয়ে নিকট সান্নিধ্য পেয়েছি তাঁর। জীবনের একটা মুহূর্তও আমি স্মরণ করতে পারি না, যখন মনে হয়েছে যে ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।[৫২]

আত্মোপলব্ধি

আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষেই সেই পবিত্র, অনির্বচনীয়, নিষ্পাপ অবস্থায় পৌঁছনো সম্ভব, যখন সে অন্য সব কিছু বাদে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব কববে।[৫৩]

আমি যা অর্জন করতে চাই, যা অর্জন কবার জন্য আমি চেষ্টা করেছি, কষ্ট পেয়েছি, তা হল আত্মোপলব্ধি, মুখোমুখি ঈশ্বরকে দেখা, মোক্ষ লাভ করা। আমার প্রাণধারণ, চলাফেরা, সত্তা, সবই ওই একই লক্ষ্যে চালিত। আমার ভাষণ, আমার রচনা, এবং রাজনীতিক ক্রিয়াকর্মেবও ওই একই লক্ষ্য।[৫৪]

আমি এখনো তাঁর থেকে কতদূবে পড়ে রয়েছি আমার কাছে এটা নিরন্তর বেদনার বিষয়। যদিও আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন যে, তিনি আমার প্রতিটি নিশ্বাসের নিয়ন্তা, আমি তাঁরই সন্তান। আমি জানি, আমার মধ্যে যে অশুভ রিপু রয়েছে, তা-ই আমাকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু তবু আমি এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি না।[৫৫]

এই ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তি হবে এমন এক আস্থা যা যুক্তিব নাগালের বাইরে। মনে রাখতে হবে, তথাকথিত উপলব্ধির তলেও রয়েছে বিশ্বাসের এক উপাদান, যা না থাকলে উপলব্ধিকে ধরে রাখা যায় না। এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার, এব অন্যথা হতে পারে না। কে আর তার সত্তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে?

আমি মনে করি এই ঐহিক জীবনে পূর্ণ উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। এর প্রয়োজনও নেই। মানুষের পক্ষে যে সম্ভাব্য আত্মিক উচ্চতায় পৌঁছনো সম্ভব, তার জন্য দরকার শুধু জীবন্ত এক অটল বিশ্বাস। ঈশ্বর আমাদের এই মর্ত্যকায়ার বাইরে নেই। অতএব বাহ্যিক প্রমাণেরও কোনও দরকার নেই।

ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে তাঁকে আমরা স্পর্শ করতে পারব না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। ইন্দ্রিয়াদি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিলে আমরা তাঁকে অনুভব করতে পাবি। ঐশ্বরিক সংগীত আমাদের মধ্যে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে কিন্তু সরব ইন্দ্রিয়গুলি ওই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল সংগীত শুনতে দেয় না। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা-কিছু টের পাই বা শুনি, ওই স্বর্গীয় সংগীত তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং শ্রেয়তর।[৫৬]

১১. সত্য ও সৌন্দর্য

শিল্পের অন্তর্মুখিতা

সব কিছুরই দুটো দিক আছে—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক... অন্তর্বস্তুকে সহায়তা করা ছাড়া বহিরঙ্গের কোনও অর্থ নেই। তাই, সব প্রকৃত শিল্পই হল আত্মার প্রকাশ। মানুষের অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করার মধ্যেই বহিরঙ্গের মূল্য সীমাবদ্ধ।[৫৭]

আমি জানি যে, অনেকেই নিজেদের শিল্পী বলে দাবি করেন এবং তদনুযায়ী স্বীকৃতিও পান। কিন্তু তাঁদের শিল্পকর্মে আত্মার ঊর্ধ্বমুখী আবেগ ও আলোড়নের লেশমাত্র নেই।[৫৮]

সব প্রকৃত শিল্পেরই কাজ হচ্ছে, আত্মাকে তার অন্তর্সত্ত্বা উপলব্ধিতে সহায়তা করা। আমার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে, আত্মোপলব্ধির জন্য বহিরঙ্গের কোনও প্রয়োজনই আমার নেই। অতএব আমি দাবি করতে পারি যে, আমার জীবনে সত্যকার নিপুণ শিল্প রয়েছে। যদিও তুমি যাকে শিল্পকর্ম বলো, তা আমার কাছে দেখতে পাবে না।

আমার ঘরের দেওয়ালগুলি চিত্রশোভিত না হতে পারে। এমন কি ছাদটাকেও আমি বাতিল করতে রাজি, যাতে করে নিঃসীম মহাশূন্যে তারকাখচিত স্বর্গলোক আমি দেখতে পাই। যখন আমি উজ্জ্বল নক্ষত্রশোভিত আকাশের দিকে তাকাই, তখন যে অসামান্য দৃশ্য আমার সামনে উন্মোচিত হয়, মনুষ্যসৃষ্ট সচেতন শিল্প কি আমায় তা দিতে পারে?

এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে সচরাচর যা স্বীকৃত, আমি তার মূল্য দিতে চাই না। আমি শুধু ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, প্রকৃতিব সৌন্দর্যের চিরন্তন প্রতীকগুলির তুলনায় এগুলি কতই না অসম্পূর্ণ। যতক্ষণ মানুষের শিল্পসৃষ্টি আত্মার স্ব-উপলব্ধিতে সাহায্য করে, ততক্ষণই তা মূল্যবান।[৫৯]

সত্যই প্রথমে

প্রথমেই সত্যের সন্ধান করতে হবে, পরে সৌন্দর্য ও শুভবোধ তোমার সঙ্গে যুক্ত হবে। আমার মতে যীশু ছিলেন একজন মহত্তম শিল্পী, যিনি সত্যের সন্ধান করেছিলেন, সত্যকে দেখেছিলেন। মহম্মদও তাই, এবং কোবান হচ্ছে সমগ্র আরবিক সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা নিখুঁত রচনা। অন্তত বিশেষজ্ঞরা তাই বলেন। এঁরা দুজনেই সত্যের সন্ধান করেছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই ভাবপ্রকাশের সৌন্দর্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। যদিও মহম্মদ বা যীশু কেউ-ই শিল্প সম্বন্ধে কিছু লিখে যাননি। এই সত্য ও সৌন্দর্যেব জন্যই আমি বেঁচে আছি, আমি এরই সন্ধান করি, এবং এর জন্য মৃত্যুও আমি ববণ করব।[৬০]

লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য শিল্প

অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনই লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা আমাকে ভাবতে হবে। এবং এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেই প্রশিক্ষণ দিতে আমরা অক্ষম, যাতে তাদের সৌন্দর্যবোধ জন্মায়, তার মধ্যে সত্যকে দেখতে পায়। আগে ওদের সত্যকে দেখতে দাও, পরে ওরা সৌন্দর্য দেখবে.....বুভুক্ষু এই লক্ষ লক্ষ মানুষের যা কাজে লাগবে তা-ই আমার মতে সুন্দর। জীবনের প্রয়োজনীয়তম যা, তা দিতে হবে ওদের। জীবনের সকল সুললিত লাবণ্য ও অলঙ্কার পরে আসবে আপনা থেকেই।[৬১]

আমি চাই সেই শিল্প ও সাহিত্য যা লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারে।[৬২]

শিল্পকে যদি শিল্প নামের যোগ্য হতে হয়, তাকে সান্ত্বনাও দিতে হবে।[৬৩]

মনে রাখতে হবে, ব্যাপক উৎপাদনেব জন্য নির্মিত, শক্তিচালিত, প্রাণহীন যন্ত্রের সাহায্যে শিল্প প্রকাশিত হয় না। এব জন্য দরকার পুরুষ ও নারীর হাতের সুললিত পরশ।[৬৪]

অন্তর্শুদ্ধি

প্রকৃত শিল্প শুধু বহিরঙ্গ নিয়েই ভাবিত হয় না, এর গভীরে যা আছে তা নিয়েও ভাবে। এক শিল্প সংহাব করে, আবাব এক শিল্প দেয় প্রাণ.....প্রকৃত শিল্পকে তার স্রষ্টার আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও শুদ্ধতার প্রমাণ হতে হবে।[৬৫]

হৃদয়ের শুদ্ধতা থেকেই প্রকৃত শিল্প গড়ে ওঠে।[৬৬]

আমি সংগীত এবং অপর সকল শিল্পকলা ভালবাসি, কিন্তু ওগুলিকে তত মূল্য দিই না, যেমন সাধারণত দেওয়া হয়। উদাহবণস্বরূপ, সেই ধরনের কাজেব আমি মূল্য দিই না, যা বোঝার জন্য খুঁটিনাটি জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

জীবন, সব শিল্পের চেয়েই মহান। আমি আরো এগিয়ে এই ঘোষণা করব, যে-মানুষের জীবন, পূর্ণতার সব চেয়ে নিকটে যেতে পারে সে-ই হল মহত্তম শিল্পী। মহান জীবনের দৃঢ় ভিত্তি ও কাঠামো বাদ দিলে শিল্প কোথায়?[৬৭]

আমরা এই বিশ্বাসে নিজেদেব অভ্যস্ত করে ফেলেছি যে, ব্যক্তিগত জীবনের শুদ্ধতার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নেই। আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাব ভিত্তিতে বলব, এর চেয়ে অসত্য কিছু হতে পারে না। পার্থিব জীবনের অন্তিম পর্বে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই, জীবনের শুদ্ধতাই হচ্ছে সর্বোত্তম অকৃত্রিম শিল্প। রেওয়াজ করা কণ্ঠ থাকলে সুন্দর সংগীত সৃষ্টির শিল্প অনেকেই আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ জীবনের সুরসঙ্গতি থেকে সংগীতসৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন বিরলতম ঘটনা।[৬৮]

সত্যের মধ্যে সৌন্দর্য

সত্যের মধ্যে বা সত্যের মাধ্যমে আমি সৌন্দর্য দেখি ও খুঁজি। শুধু সত্য ভাবনাই নয়, সৎ মুখশ্রী, সত্যনিষ্ঠ ছবি ও গান প্রভৃতি সব সত্যই অতীব সুন্দর। মানুষ সচবাচর

সত্যের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পায় না, সাধারণ লোক তো এর থেকে পলায়ন করে এবং এর সৌন্দর্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে। যখনই মানুষ সত্যের মধ্যে সুন্দরকে দেখতে পায় তখনই প্রকৃত শিল্পের সৃষ্টি হয়।[৬৯]

প্রকৃত শিল্পীর কাছে শুধু সেই মুখই সুন্দর, যা বহিরঙ্গ বাদ দিলেও আত্মিক সততায় উদ্‌ভাসিত। সত্য ছাড়া সুন্দর নেই। অপরপক্ষে, সত্য নানা আকারে প্রকাশ হতে পারে, বাইরে থেকে যা মোটেই সুন্দর নয়। আমরা জানি যে তাঁর কালে, সক্রেতিস ছিলেন সবচেয়ে সৎ ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর চেহারা ছিল গ্রীসে সর্বাপেক্ষা কুৎসিত। আমার মতে তিনি সুন্দর ছিলেন, কারণ সারাজীবন ধরে তিনি সত্যানুসন্ধান করেছিলেন। তোমাদের হয়তো মনে আছে, তাঁর বাইরেব চেহারা, ফিদিয়াসকে নিবৃত্ত করতে পারেনি তাঁর সত্যের সৌন্দর্য দর্শনে। যদিও, শিল্পী হিসেবে, ফিদিয়াস বহিরঙ্গের সৌন্দর্য দেখতেও অভ্যস্ত ছিলেন।[৭০]

সত্য ও অসত্য প্রায়ই সহাবস্থান কবে। পাপ ও পুণ্য অনেক সময়ই এক সঙ্গে দেখা যায়। এক শিল্পীব মধ্যেও অনেক সময়ে, বস্তু বিষয়ে সঠিক ও ভুল ধারণা সহাবস্থান করে। সুন্দর সৃষ্টি হয় তখন, যখন সঠিক ধাবণাটি কাজ করে। এই ধবনেব ঘটনা জীবনে তো বটেই, শিল্পক্ষেত্রেও বিবল।[৭১]

(এক সূর্যাস্ত, অথবা রাতের তাবাব মধ্যে উজ্জ্বল এক বাঁকা চাঁদ,) এই সব সৌন্দর্য, এর পেছনে যে স্রষ্টা আছেন, তাঁর কথা আমার মনে যতটা জাগ্রত কবে, ততটাই সত্য। অন্য কী ভাবে এগুলি সুন্দর হতে পারে, যখন সৃষ্টির মর্মমূলেই সত্য রয়েছে? যখনই আমি সূর্যাস্তের মহিমা, বা চন্দ্রমার সৌন্দর্যেব তাবিফ কবি, আমাব আত্মা স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়। এই সকল সৃষ্টিব মধ্যেই আমি ঈশ্বর এবং তাঁর করুণা দেখতে চেষ্টা কবি। তবে তাঁব কথা ভাবতে আমার সহায়তা যদি না কবত, তবে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ও শুধুমাত্র প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াত। যা-কিছুই আত্মার অবাধ অধিবোহণে বাদ সাধে, তা প্রহেলিকা ও ফাঁদ সদৃশ। এ অনেকটা দেহেবই মতো, যা প্রায়শই তোমার মুক্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।[৭২]

তরিতরকারির বঙে কেন তুমি সৌন্দর্য দেখতে পাও না? নিঃসীম আকাশেও তো সৌন্দর্য রয়েছে। কিন্তু তা নয়, তুমি চাও রামধনুর বর্ণালী, যা দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে যে, যা সুন্দর তা দরকারি না হতে পারে, যা দরকারি তা হয়তো সুন্দর নয়। আমি দেখাতে চাই, যা উপযোগী, তা সুন্দরও হতে পারে।[৭৩]

৩. ভয়হীনতা

১২. নির্ভীকতা সুসমাচার

আত্মিক জীবনেব প্রথম আবশ্যিকতা হচ্ছে ভয়হীনতা। কাপুরুষরা কখনওই নৈতিক গুণের অধিকারী হতে পারে না।[১]

যেখানে ভীতি আছে, সেখানে কোনও ধর্ম থাকতে পারে না।[২]

'গীতা'ব প্রতিটি পাঠকই জানে, ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব গুণাবলীব যে বিববণ রয়েছে, তার শীর্ষে আছে নির্ভীকতা। ছন্দের প্রয়োজনে এটা করা হয়েছে, না ইচ্ছাকৃতভাবেই সেরা জায়গাটি নির্ভীকতাকে দেওয়া হয়েছে, সে আমি বলতে পাবব না। আমার মতে, নির্ভীকতা নিঃসন্দেহে প্রথম স্থানটিব অধিকারী, যদিও এ-ক্ষেত্রে প্রথম স্থানটি হয়তো নিছক কাকতালীয়।

অন্যান্য মহৎ গুণ বিকাশের জন্যও নির্ভীকতা অপবিহার্য। নির্ভীকতা ব্যতিরেকে কে সত্যকে খুঁজতে, বা প্রেমকে মর্যাদা দিতে পারে? প্রীতম যেমন বলেছেন, "হরির (ঈশ্ববের) পথ হচ্ছে সাহসীদের, ভীরুদেব নয়।" হরির অর্থ এখানে সত্য, এবং সাহসীরা নির্ভীকতার অস্ত্রে সজ্জিত। তাদের তববারি, রাইফেল বা অন্যান্য হিংস্র অস্ত্র নেই, যা কাপুরুষদেরই মানায়।[৩]

নির্ভীকতার অর্থ, সর্ববিধ বহিরাগত ভয় থেকে মুক্তি। যার মধ্যে আছে ব্যাধিভয়, আঘাত বা মৃত্যুভয়, সম্পদহানি ভয়, নিকটাত্মীয় ও প্রিয়জন হারাবার ভয়, সুনামহানি ভয়, অন্যায় করার ভয়, ইত্যাদি।[৪]

নির্ভীকতা অর্জন

যিনি ঈশ্বর উপলব্ধি করেছেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক। সর্বোচ্চ স্তরে তিনি মায়া-মুক্ত। দৃঢ়চিত্ত নিত্য চেষ্টা এবং নিজের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ক'বে এই লক্ষ্যে সবসময়ই অগ্রসর হতে পারে কেউ......

অভ্যন্তরীণ শত্রু বিষয়ে সবসময়েই ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। জান্তব রিপু, ক্রোধ, ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের ভয় সঠিক। নিজ শিবিরের এইসব বিশ্বাসঘাতকদের জয় করতে

পারলে বাহ্যিক ভয় আপনা থেকেই হার মানবে। সকল প্রকার ভীতিই দেহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাই দেহশক্তি থেকে মুক্ত হলে ভয়ও থাকে না।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে সর্বপ্রকার ভীতিই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব ভিত্তিহীন ভাবনার সৃষ্টি। ঐশ্বর্য, পরিবার, দেহ—এসব বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করতে পারলে অন্তরে ভয় ঠাঁই পাবে না। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" (ত্যাগের সহিত ভোগ করা) একটি মহীয়ান বাক্য। ধন, পরিবার ও দেহ যেমন আছে, থাকবে, শুধু এদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হবে। এ কিছুই আমাদের নয়, সবই ঈশ্বরের। এই জগতের কিছুই আমাদের নয়। এমন কি আমরা নিজেরাও তাঁরই। তাহলে কেন ভয়কে আমরা আমল দেব?

অতএব উপনিষদ আমাদের এই নির্দেশ দেয় যে, "কোনও কিছু উপভোগ করার সময়ে সে বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করো।" এর মানে, ওগুলির মালিক আমরা, এ-মনোভাব থেকে যেন প্রত্যাশী না হই। আমরা ওগুলির অছি-মাত্র, আমাদের কাছে এগুলি গচ্ছিত রাখা আছে। যাঁর হয়ে আমরা এগুলি অধিকারে রেখেছি, তিনিই আমাদেব শক্তি ও অস্ত্র জোগাবেন এগুলিকে আমাদেব হাত থেকে রক্ষা করবার।

যখন আমরা আর প্রভু থাকব না, এবং পদধূলির চেয়েও দীন সেবকে পরিণত হব, তখন সর্ববিধ ভয়-ই কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাবে। আমরা অনন্ত শান্তি ভোগ করব এবং (সত্যের দেবতা) সত্যনারায়ণকে মুখোমুখি দেখতে পাব।[৫]

ঈশ্বরের ভয়

এসো, আমরা ঈশ্বরকে ভয় করি। তাহলে আর মানুষকে ভয় পাব না।[৬]

চারপাশে এত কুসংস্কার ও মিথ্যাচার, যে সঠিক কাজ করতেও অনেকে ভয় পায়। কিন্তু ভয়কে জায়গা দিতে গেলে সত্যকে চাপা দিতে হবে। এ ব্যাপারে সেরা উপায় হচ্ছে, নিজের বিশ্বাসে যা সঠিক মনে হয়, তার ভিত্তিতে নির্ভীকভাবে কাজ করে চলা।[৭]

নির্ভীকতা মানে দাম্ভিকতা বা আগ্রাসী ভাব নয়। এগুলি ভীতিরই নামান্তর। নির্ভীকতার প্রাক্‌শর্ত, শান্ত মনোভাব ও মানসিক শান্তি। ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রাণবন্ত করে তুলতে এর দরকার।[৮]

ভয়কে আমি পছন্দ করি না। কেন একজন মানুষ আর একজনকে ভয় পাবে? মানুষের থাকবে শুধু ঈশ্বরে ভয়। তবেই সে অন্য সব ভয়কে জয় করতে পারবে।[৯]

আত্মার সাহসিকতা

প্রতিটি ব্যক্তিকেই আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো দরকার। এটা, দেহকে প্রতিআক্রমণ করতে শেখানোর চেয়ে বেশি, এব অর্থ বিশেষ মানসিক অবস্থা আয়ত্ত করা। আমাদের নিজেদেরকে অসহায় মনে করতে শেখানো হয়েছে। সাহসিকতা দেহের গুণ নয়, আত্মার গুণ। আমি এমন মানুষ দেখেছি যে পেশীবলে বলীয়ান, অথচ কাপুরুষ। দেখেছি দুর্বলতম শরীরে দুর্জয় সাহস... আমাদের মধ্যে যারা দৈহিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল, তাদের শেখাতে

হবে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কৌশল। যাতে করে আমরা দরকারে সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারি।[১০]

আমরা এক সন্ধিলগ্নের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি। এই সন্ধিক্ষণ উষার, না সন্ধ্যার, আমরা জানি না। একটির পরে আসে রাত্রি, আর একটির পরে প্রভাত। এখন যদি বিষণ্ন রাত্রির পরিবর্তে আমাদের নতুন দিন দেখতে হয় তাহলে....আমাদের সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে, সর্ব বাধার বিরুদ্ধে তার পক্ষে দাঁড়াতে হবে, এবং অটল অনড়ভাবে এর প্রচাব কবতে হবে। আচরণের ক্ষেত্রেও একে ব্যবহার করতে হবে।[১১]

স্বাধীনতার জন্য আমাদের সমরাভিযানে আমরা সত্য ও অহিংসার সুপ্রাচীন পথ বেছে নিয়েছি। ঈশ্বরের সেই বাণী যেন আমাদের আশা ও সাহস জোগায় যে, যারা ঋজু ও বিপদসংকুল পথে চলবে, তাবা কখনও ব্যর্থ হবে না।[১২]

আত্ম-দমন ও প্রায় কাপুরুষতা-সদৃশ ভীরুতার এই দেশে আমাদের খুব বেশি সাহস, খুব বেশি আত্মত্যাগ সম্ভব নয়....আমি চাই....বিনয়ী, নম্র ও অহিংস মানুষের মহত্তর সাহসিকতা, যে সাহসিকতা কাউকে আঘাত না ক'রে, কারো প্রতি প্রত্যাঘাত হানার চিন্তাও না ক'রে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াবে।[১৩]

যত বড়ই হোক-না-কেন, কোনও পার্থিব ক্ষমতার কাছে নতজানু হতে দৃঢ় প্রত্যাখ্যানের চেয়ে বড় সাহসিকতাব কাজ আব নেই। এটাও করতে হবে মনে কোনও তিক্ততা না রেখে এবং এই পূর্ণ বিশ্বাসে, যে, আত্মা ছাড়া কিছুই প্রাণময় নয়।[১৪]

আমাদেব সামনে দুটি পথ। আমরা একটি বৃহৎ সামরিক শক্তি হয়ে উঠতে পারি, অথবা আমাব পথ অনুযায়ী এক মহান অহিংস অপরাজেয় শক্তিরূপে পরিগণিত হতে পারি। উভয়ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শর্ত হল, সর্ববিধ ভীতি মন থেকে দূর করতে হবে।[১৫]

৪. বিশ্বাস

১৩. বিশ্বাস বিষয়ক সুসমাচার

বিশ্বাসই আমাদের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে পথ দেখায়, টলিয়ে দেয় পর্বত, পার ক'রে দেয় মহাসাগর। এই বিশ্বাস, অন্তরে সপ্রাণ ও সদাজাগ্রত ঈশ্বরচেতনা ছাড়া আর কিছু নয়। যে এই বিশ্বাস অর্জন করেছে, আর কিছুই তার চাই না। দেহ অসুস্থ হলেও আত্মিকভাবে সে স্বাস্থ্যবান। পার্থিব ঐশ্বর্যে দাবিদ্র থাকলেও আত্মিক সম্পদ তার অন্তহীন।[১]

বিশ্বাস না থাকলে এই পৃথিবী এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে। যাঁরা প্রার্থনা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত পবিত্র জীবন যাপন করেছেন, তাঁদের যুক্তিসিদ্ধ অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করাই হল প্রকৃত বিশ্বাস।

অতীতকালে যে-সব মহাপুরুষ বা অবতার ছিলেন, তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখা অলীক কুসংস্কার নয়, অন্তরতম এক আত্মিক চাহিদা এর দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়।[২]

বিশ্বাস এমন কোনও কোমল-কুসুম নয় যে ঈষৎ ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটাতেই ঝরে যাবে। বিশ্বাস পাহাড়ের মতো, যা সম্ভবত, অপরিবর্তিতই থাকবে। কোনও ঝড়ই সম্ভবত হিমালয়কে তার ভিত্তিমূল থেকে টলাতে পারবে না....এবং আমি চাই যে তোমরা সকলেই ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাস নিয়ে অনুশীলন করো।[৩]

যুক্তির সীমাবদ্ধতা

যুক্তির নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে অভিজ্ঞতা আমাকে বাধ্য করেছে। বস্তু যেমন ভুল জায়গায় রাখলে আবর্জনায় পরিণত হয়, তেমনই যুক্তির অপব্যবহার উন্মাদাচরণেরই সমার্থক।

যুক্তিবাদীরা প্রশংসার্হ কিন্তু যখন যুক্তিবাদ সর্বশক্তিমান বলে দাবি করে, তখন তা বিকট এক দানবে পরিণত হয়। যুক্তিকে সর্বশক্তিমান বলে অভিহিত করা, ঈশ্বর ভেবে গাছের গুঁড়ি বা পাথরের পূজার মতোই পৌত্তলিকতার নামান্তর।[৪]

আমি যুক্তিকে দমন করতে বলি না। বলি, আমাদের মধ্যে যা যুক্তিকে পবিত্র করে তোলে, তাকে যোগ্য স্বীকৃতি দিতে।[৫]

বর্শার দণ্ডটির মতোই এটা আমার কাছে সোজা, যখনই অকলুষ ও নির্ভেজাল যুক্তির

প্রতি আবেগ অনুভূত হবে, তখন যত বড় কর্তৃপক্ষই হোক-না-কেন, কারো কাছে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।[৬]

এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যেখানে যুক্তি আমাদের বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না। তখন বিশ্বাসের ভিত্তিতে ব্যাপারটি গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বাস তখন যুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে না, বরং তাকে অতিক্রম করে যায়। যে-সব ব্যাপার যুক্তির সীমাতীত, সেখানে বিশ্বাস ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে।[৭]

ধর্মের অর্থ

ধর্ম বলতে আমি কি বুঝি সেটা ব্যাখ্যা করা যাক। অন্য সব ধর্মের চেয়ে যাকে আমি শ্রেয়তর বলে মনে করি, সেই হিন্দুধর্ম নয়, বরং তা হল হিন্দুধর্ম অতিক্রমী এক ধর্ম যা মানুষের চবিত্র পালটে দেয়, অন্তরের সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে মানবকে জড়ায়, এবং সদা পবিত্র করে। সেই ধর্ম হল মানবচরিত্রেব এক অবিনাশী অংশ, যা পূর্ণতা লাভের পথে যে কোনও মূল্য দিতে রাজি। তা আত্মাকে অশান্ত অস্থির করে রাখে যতক্ষণ না আত্মা নিজেকে খুঁজে পায়, আপন স্রষ্টাকে জানতে পারে, এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টিব মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপিত হয়।[৮]

ধর্ম বলতে আমি আনুষ্ঠানিক বা প্রথাসিদ্ধ ধর্মকে বোঝাই না। ধর্ম হল সে-ই, যা সকল ধর্মের ভিত্তি, যা আমাদের স্রষ্টার মুখোমুখি দাঁড় করায়।[৯]

আমার ধর্ম

আমার ধর্মের কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। এই ধর্মে আমার বিশ্বাস যদি জীবন্ত হয়, তাহলে তা ভারতেব প্রতি আমার ভালবাসাকেও ছাড়িয়ে যাবে।[১০]

বন্দীশালাব ধর্ম আমার নয়। এই ধর্মে, ঈশ্বরের নগণ্যতম সৃষ্টিরও স্থান আছে। কিন্তু দম্ভ, এবং জাতি-ধর্ম ও বর্ণ নিয়ে দর্প একে স্পর্শ করতে পাবে না।[১১]

যখন আমি বলি, আমার ধর্ম আমার কাছে দেশের থেকেও প্রিয়, অর্থাৎ প্রথমে আমি হিন্দু ও পবে একজন জাতীয়তাবাদী, তখন এক অর্থে এই বক্তব্য সত্য। এই কথা বললে, সেরা জাতীয়তাবাদীদের থেকে আমি পেছিয়ে পডি না। মুক্ত মনে সরলভাবে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, আমার দেশ ও আমার ধর্মের স্বার্থ অভিন্ন।

একইভাবে আমি যখন বলি যে সব কিছু, এমন কি ভারতের মুক্তির চেয়েও আমার মুক্তিকে আমি মূল্যবান মনে কবি, তার অর্থ এই নয় যে, আমার ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য ভারতের রাজনৈতিক বা অন্যবিধ স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হবে। এব অর্থ হল, উভয়েই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[১২]

জীবনে এই আদর্শই আমি গ্রহণ করেছি যে, যত মহানই হোন-না-কেন, কোনও ব্যক্তিব কোনও কাজই ধর্মের সহায়তা ভিন্ন সম্যক সফলতালাভ করতে পারে না।[১৩]

স্বীয় আদর্শে এবং মানবতায় আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। ভারতের মানুষ অন্য কাবো থেকে মন্দ নয়, সম্ভবত ভালোই। বস্তুতই, এই আদর্শের পূর্বশর্ত হল মানবতার

প্রতি আস্থা। আমার যদি ঈশ্বরের নির্দেশাবলীতে আস্থা থাকে, তাঁর নির্ভুল নির্দেশ ছাড়া আমি অসহায়, এ-কথা স্বীকার করার মতো বিনয় থাকে, তাহলে পথ যতই আঁধার হোক-না-কেন, ঈশ্বর একে আলোকিত করে আমার পা-ফেলার পথ দেখিয়ে দেবেন।[১৪]

আমার এই কথাটা উদ্ভট শোনাতে পারে, কিন্তু আমি স্থির-নিশ্চিত যে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহ তাঁর নামে কেউ যদি কোনও কাজ শুরু করে, তা ব্যর্থ হয় না। এমন কি জীবনসায়াহ্নে শুরু করলেও নয়। নিশ্চিত জানি, যে কাজ আমি হাতে নিয়েছি, তা আমার নয়, ঈশ্বরের।[১৫]

যা পবিত্র ধর্মপুস্তকে বর্ণিত, ঋষিগণ কর্তৃক অনুসৃত, পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং হৃদয়স্পর্শী, তা-ই হল *ধর্ম*। প্রথম তিনটি শর্ত পূরণ করলে তবেই চতুর্থটি ঘটে। তাই ধর্মপ্রণেতা বলে কোনও অজ্ঞ বা ভণ্ড আস্ফালন করলেও তাকে অনুসরণ করার অধিকার কারো নেই। অপরের ক্ষতিসাধন না করা, শত্রুতা না করা এবং ত্যাগস্বীকার করা,—এই প্রথম কাজগুলি নিষ্ঠাভরে যে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, আইনপ্রণেতা বা ধর্মপ্রণেতা হবার প্রথম অধিকার তার।[১৬]

বলপ্রয়োগের ব্যর্থতা

আমার গভীর বিশ্বাস, আসুরিক শক্তির দ্বারা কোনও ধর্মকেই ধরে রাখা যায় না। বরং যারা অসি ধারণ করবে, তারা চিরকাল অসির আঘাতেই মরে।[১৭]

জাতির মতো ধর্মও তুলাদণ্ডে মাপা হচ্ছে। অন্যায়, অসত্য, বা হিংসার ওপরে যে জাতি বা ধর্ম নির্ভরশীল, তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।[১৮]

নৈতিকতা

আমার ক্ষেত্রে নৈতিকতার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত...সংস্কারক হিসেবে আমার জীবনে সবকিছুকেই আমি নৈতিক অবস্থান থেকে বিচার করেছি। আমি যখন রাজনৈতিক বা সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক প্রশ্নের মোকাবিলা করতে চাই, তখন সর্বদা এর নৈতিক দিকটি বড় হয়ে ওঠে এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করে।[১৯]

সর্বকালের জন্য অমোঘ নৈতিকতা বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এক আপেক্ষিক নৈতিকতা আছে, যা আমাদের মতো অসম্পূর্ণ নশ্বরদের পক্ষে পর্যাপ্ত। যেমন, ওষুধ হিসেবে—ওষুধের মাপে—চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত সুরাপান সম্পূর্ণ অনৈতিক। একই ভাবে, নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনও স্ত্রীলোকের দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকানো চূড়ান্ত অন্যায়। সহজ যুক্তির দ্বারাই এ-দুটি প্রমাণিত। এর পালটা যুক্তিও সব সময়েই দেখানো হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখানো হয়েছে। —এই হল মোদ্দা ব্যাপার। যুক্তি ছাপিয়ে যে বিশ্বাস বিদ্যমান, তাই হল আমাদের যুগযুগান্তরের অচল পর্বত স্বরূপ। আমার বিশ্বাসই আমাকে রক্ষা করেছে এবং এখনও নানা পদস্খলন থেকে আমাকে রক্ষা করে চলেছে। এই বিশ্বাস কখনও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কাউকে করেছে বলেও শোনা যায়নি।[২০]

যত নর, তত ধর্ম

বাস্তবে, মানুষ যত, ধর্মও তেমনি অনেক।[২১]

ধর্ম হল বিভিন্ন পথ, যা একই গন্তব্যে উপনীত হয়। যদি আমরা একই গন্তব্যে পৌঁছই, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন পথে হাঁটলে ক্ষতি কি?[২২]

আমি এ-বিশ্বাসের অংশীদার নই যে, পৃথিবীতে একটিমাত্র ধর্মই আছে, বা থাকবে। আমি তাই একটি সাধারণ উপাদানের সন্ধান করছি, চেষ্টা করছি পারস্পরিক সহিষ্ণুতা বাড়াবার।[২৩]

মূলগত ঐক্য

ধর্মের আত্মা অভিন্ন, যদিও তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। এই বহুরূপত্ব শেষ অবধি থাকবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বহিরঙ্গকে উপেক্ষা করে নানা রূপেব মধ্যে অভিন্ন আত্মাটিরই সন্ধান করবেন।[২৪]

আমার মতে বিশ্বের সব ক'টি মহান ধর্মই মোটের উপর সত্য। "মোটের উপর" বলার কারণ, আমি বিশ্বাস করি, মানুষমাত্রেই ত্রুটিপূর্ণ বলে সে যা কিছু স্পর্শ করে তাই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ত্রুটিহীনতা কেবল ঈশ্বরের এক্তিয়ারভুক্ত, তা অবর্ণনীয়, ভাষায় প্রকাশ কবা যায় না। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের অনুরূপ ত্রুটিমুক্ত সম্পূর্ণ হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ওই সম্পূর্ণতা অর্জনেব জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। যখনই সেই পবিত্র অবস্থায় পৌঁছনো যাবে, তখন তা হবে অনির্বচনীয়, ব্যাখ্যাতীত। আমি অত্যন্ত বিনয়েব সঙ্গে স্বীকার করছি, এমন কি বেদ, কোবান এবং বাইবেলও ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ রচনা। আমবা তো সকলেই অসম্পূর্ণ। নানা ভাবাবেগে ইতস্তত দোলায়িত হই। ঈশ্ববের বাণীর পূর্ণতা বোঝাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।[২৫]

আমাব উচিত সকল মানুষকে ভালবাসা, —শুধু ভারতে নয়, বিশ্বেব সর্বত্র,—বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসেব মানুষকে ভালবাসা,—যাতে পরস্পর মেলামেশাব মাধ্যমে মানুষ আরো ভালো হয়। এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে বিশ্ব বর্তমানের তুলনায় অনেক উত্তম ও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। আমি সর্বব্যাপক সহিষ্ণুতার প্রচাবক এবং সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। আমি সকলকে বলি, কোনও ধর্মকে বিচার করার সময়ে সেই ধর্মাবলম্বীদেব অবস্থান থেকে করবে। আমি চাই না যে আমাব স্বপ্নের ভারত একধর্মাবলম্বী, অর্থাৎ সম্পূর্ণ হিন্দু, বা খ্রীস্টান বা মুসলমান হয়ে উঠবে। আমি চাই, ভারতে সহিষ্ণুতা বিরাজ করবে, এর বিভিন্ন ধর্ম পাশাপাশি কাজ করবে।[২৬]

উপাসনাভিত্তিক অন্বেষণ, অধ্যয়ন এবং যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে আমি এই সিদ্ধান্তে দীর্ঘদিন আগেই উপনীত হয়েছি যে, সব ধর্মই সত্য, এবং সব ধর্মের মধ্যেই কিছু-না-কিছু ভুল আছে। আমি এটাও জানি, নিজের ধর্মকে আঁকড়ে থাকার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অন্য ধর্মকেও হিন্দুধর্মের মতোই নিকট বলে ভাবতে হবে। এর যুক্তিসহ পরিণতি হল, সকলকেই আমাদের নিকটাত্মীয় হিসেবে ভালবাসা উচিত এবং তাদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করা উচিত নয়।[২৭]

একেশ্বরে বিশ্বাস সকল ধর্মের প্রারম্ভিক শর্ত। কিন্তু আমি এমন কোনও সময়ের কথা চিন্তা করতে পারি না যখন পৃথিবীতে একটিমাত্র ধর্মই থাকবে। তত্ত্ব বলে, ঈশ্বর যখন এক, ধর্মও একটিই, কিন্তু বাস্তব আচরণে আমি দুটি লোককেও দেখিনি, যাদের ঈশ্বরধারণা অভিন্ন। সেইজন্য হয়তো, মনোভাব ও জলবায়ুর ভিন্নতার কারণে সবসময়ই নানা ধর্ম বিরাজ করবে।[২৮]

বিশ্বের সকল মহান ধর্মের মৌলিক সত্যে আমি বিশ্বাসী। আমি মনে করি এ সকলই ঈশ্বর প্রদত্ত,—যে জনগণেব কাছে ওইসব ধর্ম প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের জন্য ওগুলি আবশ্যিক ছিল। আমি বিশ্বাস করি, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের ধর্মগ্রন্থ যদি আমরা সেই ধর্মাবলম্বীর অবস্থান থেকে পাঠ করি, তাহলে দেখব যে ভিত্তিমূলে এরা সব অভিন্ন এবং পরস্পরের সহায়ক।[২৯]

মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানা ধর্ম নয়, এদের লক্ষ্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা।[৩০]

ধর্মগ্রন্থাদি

আমার কাছে বেদ ঈশ্বরীয়, শ্রুতি। "অক্ষর হনন করে।" আত্মাই দেয় আলো। এবং বেদের আত্মা হচ্ছে বিশুদ্ধতা, সত্যনিষ্ঠা, নিষ্পাপতা, পবিত্রতা, নম্রতা, সরলতা, ক্ষমা, সাত্ত্বিকতা ও সেই সব কিছু, যা পুরুষ বা নারীকে মহান ও নির্ভীক করে তোলে।[৩১]

চতুর্বেদের অনন্য ঐশ্বরিকতায় আমাব বিশ্বাস নেই। আমি মনে করি, বাইবেল, কোরান এবং জেন্দ্-আবেস্তার উৎসেও বেদের মতোই ঐশ্বরিক প্রেরণা আছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আমি আস্থাশীল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এর প্রতিটি শব্দ বা ছত্র ঐশ্বরিক প্রেরণাপূর্ণ......যুক্তি বা নৈতিক বোধেব প্রতিকূল হলে কোনও ব্যাখ্যানই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তা সে যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক-না-কেন।[৩২]

আমি বাক্সর্বস্বতায় বিশ্বাসী নই। তাই আমি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মূল আত্মাটি বুঝতে চেষ্টা করি। বাস্তবায়নের জন্য এগুলির মধ্যে সত্য ও অহিংসার যে পরীক্ষাবলী রয়েছে, আমি তা ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে খতিয়ে দেখি। যা এই পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা আমি বর্জন করি,—গ্রহণ করি তা-ই, যা সঙ্গতিপূর্ণ।[৩৩]

বাইবেলের 'পর্বতে প্রদত্ত উপদেশ' এবং 'ভাগবদ্গীতা'-র মধ্যে কোনও পার্থক্য আমি দেখতে পাইনি। বাইবেলের ধর্মাদেশের মধ্যে যা চিত্রলেখের নকশার মতো বর্ণিত হয়েছে, ভাগবদ্গীতায় তা-ই সংক্ষেপিত হয়ে বৈজ্ঞানিক সূত্রের রূপ নিয়েছে। প্রচলিত অর্থে এটা হয়তো বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়, কিন্তু এর যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে প্রেমের সূত্রের ওপর। একে আমি বলি অনন্তসূত্র। এর উপস্থাপনাও বৈজ্ঞানিক। পর্বতে প্রদত্ত ধর্মাদেশে একই সূত্রের কথা সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। 'নতুন নিয়ম' পড়ে আমি অসীম আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছি। 'পুরাতন নিয়ম'-এর কিয়দংশ আমার কাছে অসহ্য লেগেছিল। আজ যদি আমার কাছ থেকে 'গীতা' কেড়ে নেওয়া হয়, এর সবটা আমি ভুলে যাই,—তখন পর্বতে প্রদত্ত ধর্মাদেশ পড়তে দিলে আমি 'গীতা' পাঠের আনন্দের সমতুল আনন্দ পাব।[৩৪]

আমার স্বভাবই হল কোনও জিনিসের ভালো দিকটা দেখতেই ভালবাসি, মন্দ দিকটা নয়। তাই যে কোনও মহান ধর্মের কোনও মহান গ্রন্থ থেকে আমি তৃপ্তি ও প্রেরণা পেতে পারি। 'গীতা' বা 'নতুন নিয়মে'র একটি স্তোত্রও হয়তো আমি মুখস্থ বলতে পারব না। কোনও হিন্দু বা খ্রীস্টান শিশু হয়তো এগুলি অনেক ভালো বলতে পারবে। কিন্তু এই দুই গ্রন্থের মর্মার্থ যে-ভাবে আমাব মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে, তা থেকে ওই বুদ্ধিমান শিশুরা আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।[৩৫]

অতএব, একজনের অভিজ্ঞতাই হবে শেষ নির্দেশ। ভাষা নিঃসন্দেহে সহায়তা করে। কিন্তু তারও তো ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যখন ব্যাখ্যাগুলি পরস্পরের বিরোধী হয়, তখন সত্যসন্ধানীই হচ্ছে চূড়ান্ত বিচারক।[৩৬]

আমার মধ্যে কোনও কুসংস্কার আছে বলে মনে হয় না। সত্য, সুপ্রাচীন বলেই সত্য নয়। আবার যেহেতু তা সুপ্রাচীন, অতএব এর সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হতে হবে, এমনও নয়। এমন কিছু মৌলিক জীবনসত্য আছে, যেগুলি নিজের জীবনে প্রয়োগ করা কঠিন। কিন্তু সেগুলিকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[৩৭]

ধর্মীয় শিক্ষা

ভারতকে যদি আত্মিক দেউলিয়াপনা ঘোষণা করতে না হয়, তাহলে তার যুবসমাজকে ধর্মনিরপেক্ষতাব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষাও দিতে হবে। এটা ঠিকই, যে ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান ধর্মজ্ঞানের সমকক্ষ নয়। কিছু ধর্ম যদি আমরা না-ই দিতে পারি, তবে, তার পর যা সবচেয়ে ভালো, আমাদের ছেলেমেয়েদের তা অবশ্যই দিতে হবে। বিদ্যালয়ে অনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হোক বা না-হোক, উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের, অন্যান্য বিষয়ের মতো ধর্মীয় ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হতে হবে। যেমন তারা বিতর্ক ও চরকা কাটবার ক্লাব খুলেছে, এ-ব্যাপারেও ক্লাস খুলবে।[৩৮]

ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাবার বা এর ব্যবস্থা করার কোনও দরকার রাষ্ট্রের আছে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে ধর্মশিক্ষার বিষয়টি ধর্মীয় সংঘগুলির অধীনে চলাই ভালো। ধর্মের সঙ্গে নীতিবোধকে গুলিয়ে ফেলো না। আমার বিশ্বাস, মৌলিক একটা নীতিবোধ সব ধর্মেই বর্তমান। মৌলিক নীতিবোধ শেখানো নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। ধর্ম বলতে এখানে আমি মৌলিক নীতিবোধের কথা বলছি না। বলছি, প্রকৃত, স্বাধীন ধর্মের কথা। রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় গির্জার শিক্ষা আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। কোনও সমাজ বা গোষ্ঠী যদি পূর্ণ বা আংশিকভাবে, তার ধর্মকে বজায় রাখার জন্য বাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে তার ধর্ম, বা ধর্ম বলতে যা বোঝায়, তা থাকতেই পারে না।[৩৯]

নিজস্ব ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের কিছু সূত্রও ধর্মশিক্ষার পাঠক্রমে থাকা একান্ত দরকার। এই উদ্দেশ্যেই ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও উদার সহিষ্ণুতাসহ বিশ্বের বিভিন্ন মহান ধর্মের সারবাক্য বোঝার ও উপলব্ধি করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।[৪০]

১৪. ঈশ্বর কী

আইনপ্রণেতা ও আইন

ঈশ্বরকে যে-নামেই ডাকা হোক-না-কেন, যতক্ষণ তা জীবনের জীবন্ত আইনকে বোঝায়, বা অন্যভাবে বললে, একাধারে আইন ও আইনপ্রণেতাকে বোঝায়, ততক্ষণ সে-নামে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।[৪১]

ঈশ্বর একাধারে আইন ও আইনপ্রণেতা। অতএব কারো তাঁকে সৃষ্টি করার কথাই ওঠে না। বিশেষত মানুষের মতো নগণ্য প্রাণীর পক্ষে তো নয়ই। মানুষ একটি বাঁধ বানাতে পারে, কিন্তু একটি নদী সৃষ্টি করতে পারে না। চেয়ার সে বানাতে পারে, কাঠ তার সাধ্যাতীত। সে তাব মনে নানাভাবে ঈশ্বরের ছবি আকঁতে পারে। কিন্তু যে-মানুষ নদী বা কাঠ সৃষ্টি করতে অপারগ, সে কি করে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করবে? অতএব, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এটাই অনাবিল সত্য। এর উলটোটা নিছক ভ্রান্তি। অবশ্য কেউ ইচ্ছা করলে বলতে পারে, ঈশ্বর না-কর্তা, না-কারণ। দুটোই তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য।[৪২]

ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর নন

আমি ঈশ্বরকে কোনও ব্যক্তি মনে করি না। সত্য আমার কাছে ঈশ্বর। যে অর্থে পৃথিবীর এক রাজা এবং তাঁর আইন পৃথক ব্যাপার, সে অর্থে ঈশ্বরের আইন ও ঈশ্বর পৃথক বস্তু, বা ঘটনা নন। ঈশ্বর হলেন এক ধারণা, নিজেই তিনি আইন। তাই ঈশ্বরেব সম্বন্ধে তাঁকে আইনভঙ্গকারী বলে কল্পনাও করা যায় না। তিনি আমাদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন না, নিজেকে গুটিয়ে নেন না। যখন আমরা বলি, তিনি আমাদের কর্মের নিয়ন্তা, আমরা মানুষের ভাষা ব্যবহার করছি। তাঁকে সীমিত করার চেষ্টা করছি। তা না হলে তিনি এবং তাঁর আইন সর্বত্র বিরাজিত। তিনি সর্বনিয়ন্তা।

তাই আমি মনে করি না যে তিনি আমাদের অনুরোধের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির জবাব দেন। তবে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি আমাদের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্তা.... জাহাজের ডেকে বহুযাত্রীর ভিড়ের মধ্যে কোনও একজন ব্যক্তির যতটুকু স্বাধীন ইচ্ছা হতে পারে, আমাদের ইচ্ছা, স্বাধীনতা তার চেয়েও কম।

....যদিও আমি জানি, আমার স্বাধীনতা ওই যাত্রীর চেয়েও কম, তবু আমি এই স্বাধীনতার গুণগ্রাহী। মানুষ কীভাবে তার স্ব-স্বাধীনতাকে ব্যবহার করবে, তা বেছে নেবার স্বাধীনতা তার আছে, এই অর্থে মানুষ তার আপন ভাগ্যের স্রষ্টা—'গীতা'র এই মূল শিক্ষায় আমি বিশ্বাসী। কিন্তু মানুষ কদাচ পরিণামকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যে মুহূর্তে মনে করে তা সে পারবে তাকে দুঃখ পেতে হয়।[৪৩]

এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সর্বশক্তিমান আমাদের মতো একজন ব্যক্তি নন। তিনি বা তাঁ-ই হলেন বিশ্বের মহত্তম নিত্যশক্তি বা আইন। তাই তিনি খামখেয়ালীপনা

করেন না। ওই আইনকে সংশোধিত বা উন্নত করার উপায় নেই। সব কিছুই প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছাই স্থির ও অমোঘ।[৪৪]

তাঁর ব্যক্তিত্ব

ঈশ্বরকে মুখোমুখি আমি দেখিনি। দেখলে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার আর দরকার হতো না। আমার চিন্তাই তখন এত শক্তিমান হতো যে আমার পক্ষে কিছু বলা বা করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠত। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস অবিনাশী। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার এই বিশ্বাসের অংশীদার। যিনি সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত, তিনিও লক্ষ লক্ষ নিরক্ষরের বিশ্বাস টলাতে সক্ষম হবেন না।[৪৫]

ঈশ্বর সর্বশুভময়। তাঁর মধ্যে কোনও কলুষ নেই। ঈশ্বর নিজ কায়াকল্পেই মানুষকে গড়েছেন। এটা আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক যে মানুষ নিজের মাপেই তাঁকে গড়ে নিয়েছে। এই অসঙ্গতির ফলে মানবজাতি এক সমস্যার সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ অপরাসায়নিক। তাঁর উপস্থিতি সর্ববিধ ধাতুমল ও লোহাকে বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করে। অনুরূপভাবে সব পাপ পর্যবসিত হয় পুণ্যে।

পুনরায়, ঈশ্বর বাঁচেন। কিন্তু আমাদের মতো করে নয়। তাঁর সৃষ্ট প্রাণীরা মৃত্যুবরণ করবে বলেই বাঁচে। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই প্রাণ। তাই, শুভত্ব এবং তাব সকল ব্যাখ্যা, তাঁর কোনও গুণ নয়।

যা সর্বশুভ, তা-ই হল ঈশ্বর। তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুভ-র কথা ভাবলে সে হবে এক প্রাণহীন বস্তু। তার আয়ু ততদিন, যতদিন তা প্রাপ্য আদায়ের এক নীতি হয়ে দাঁড়ায়। সকল নীতিবোধও তাই। আমাদের মধ্যে এই গুণগুলিকে যদি প্রাণবান কবে তুলতে হয়, তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে সেগুলিকে বিচার বিবেচনা ও পরিপোষণ করতে হবে। আমরা ভালো হতে চেষ্টা করি, কেননা আমরা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে ও তাঁকে উপলব্ধি করতে চাই। বিশ্বের সকল শুষ্ক নীতিবোধই ধূলায় পরিণত হয়, কারণ ঈশ্বরবিছিন্ন অবস্থায় সেগুলি নেহাতই নিষ্প্রাণ। যখন তা ঈশ্বরপ্রেরিত, তখন তা প্রাণবন্ত। ক্রমে তারা আমাদের অংশ হয়ে ওঠে ও আমাদের মহীয়ান করে তোলে।

বিপরীত অর্থে, শুভবোধ-বর্জিত ঈশ্বরের কল্পনায় প্রাণ নেই। আমাদের অসার কল্পনায় আমরা তাঁকে প্রাণবন্ত করে তুলি।[৪৬]

"মুখোমুখি ঈশ্বরকে দেখা" এবং "বহুদূর থেকে সত্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে তাঁকে দেখার" মধ্যে বিশাল এক ব্যবধান রয়েছে। আমার মতে দুটি বক্তব্যই পরস্পরবিরোধী নয় এবং একের দ্বারা অন্যটির ব্যাখ্যা মেলে। আমরা বহুদূর থেকে হিমালয় পর্বতমালা দেখতে পাই এবং যখন পর্বতশীর্ষে উঠি, তখনই হিমালয়কে পুরোপুরি দেখা হয়। দৃষ্টি-ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে থাকলে লক্ষ লক্ষ লোক বহুদূর থেকে হিমালয় দেখতে পায়। কয়েকজন মাত্র বছরের পর বছর যাত্রার পর পর্বতশীর্ষে উপনীত হয়ে তাকে পুরোপুরি দেখতে পায়।[৪৭]

আমার এ বিষয়ে (তিলমাত্র সন্দেহ) কখনও হয়নি যে ঈশ্বর নিত্যবর্তমান এবং তাঁর সবচেয়ে অর্থবহ্ নাম হল সত্য।[৪৮]

ঈশ্বরের শক্তি

শুরু থাকলেই তার শেষ-ও থাকতে হবে। একদিন এই সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী ধ্বংস হবে, যদিও তা অগণন বছরের পরে ঘটতে পারে। একা ঈশ্বর অমর, অবিনাশী। মানুষ কী ক'রে তাঁকে বর্ণনার ভাষা খুঁজে পাবে?[৪৯]

বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব নয়। বুদ্ধির দৌড় একটি নির্দিষ্ট সীমা অবধি এবং ওই পর্যন্তই। ঈশ্বরোপলব্ধি হল বিশ্বাস এবং বিশ্বাসজনিত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। কেউ তার চেয়ে শ্রেয়দের অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভর করবে, অথবা নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা তৃপ্ত হতে পারে। বিশ্বাস যখন পূর্ণ, তখন অভিজ্ঞতার অভাব অনুভূত হয় না।[৫০]

পরম সত্য একমাত্র ঈশ্বরের অধিগম্য। তাই আমি বারংবার বলেছি যে সত্যই ঈশ্বব। এবং তদনুযায়ী, সীমিত সত্তা নিয়ে মানুষ পরম সত্য জানতে অক্ষম।[৫১]

সেই মহান শক্তিকে আমি আল্লাহ্ নামে ডাকি না, খুদা বা ভগবান বলি না, বরং ডাকি সত্যের নামে। আমাব কাছে সত্যই ঈশ্বর এবং সত্যই আমাদেব সকল ভাবনাচিন্তাকে প্রভাবিত করে। সমগ্র সত্য শুধুমাত্র সেই মহান শক্তির অন্তবে বিরাজমান, যার নাম হল সত্য। ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেখানো হয়েছিল যে সত্যসমীপে যাওয়া যায় না—এ এতই দূর যে তুমি পৌঁছতে পারবে না। জনৈক মহান ইংবেজ আমাকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন, ঈশ্বর অজ্ঞেয়। কিন্তু তাঁকে জানা যায়। যদিও আমাদেব সীমাবদ্ধ বোধবুদ্ধির পক্ষে যতটুকু জানা সম্ভব, ততটুকুই।[৫২]

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষের অন্তর্লোকে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেব মধ্যে যথার্থ শান্তি আনতে পারেন।[৫৩]

তাঁর শাসন

অধুনা পাশ্চাত্যের মানুষ মুখে খ্রীস্টের নাম বলে কিন্তু তাদের জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা হল খ্রীস্টশত্রু। একইভাবে, কিছু লোক আছে যারা ইসলামের কথা বলে কিন্তু আদপে তারা শয়তানের পথ অনুসরণ করে। এটা খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতি....মানুষ যদি ঈশ্বরকে অনুসরণ করত, তাহলে বর্তমানে এই বিশ্বজোড়া দুর্নীতি ও মুনাফাবাজি আমাদের দেখতে হতো না। ধনী ক্রমেই আরো ধনী হচ্ছে, আর দরিদ্ররা দরিদ্রতর। চারদিকে ক্ষুধা, নগ্নতা ও মৃত্যুর অপলক ভ্রূকুটি। এ-সব ঈশ্বরের রাজ্যের লক্ষণ নয়। এ হল রাবণ ও শয়তানের হুকুমত। কেবল ঈশ্বরের নাম মুখে আউড়ে আমরা বিশ্বে তাঁর রাজত্ব স্থাপন করতে পাবব না। আমাদের কাজকর্মকেও শয়তানের বদলে ঈশ্বরের অনুগামী করে তুলতে হবে।[৫৪]

মানুষ তখনই ক্রোধ পরিহারে সক্ষম হবে, যখন তাদের হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজ করবেন।[৫৫]

ঈশ্বরের নির্দেশাবলী বলে পরিচিত বিশ্বজনীন ব্যবহারবিধিগুলি খুবই সরল এবং ইচ্ছা

থাকলে সেগুলিকে বোঝা ও অনুকরণ করা সহজ। মানবজাতি নিরুদ্যমে আচ্ছন্ন বলেই এগুলি কঠিন মনে হয়। মানুষ অগ্রগতিশীল প্রাণী। প্রকৃতির মধ্যে কিছুই স্থাণু নয়। শুধু ঈশ্বরই স্থির, কেননা তিনি অতীতে-বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন এবং সেই সঙ্গেই তিনি নিত্য গতিশীল। যাই হোক, ঈশ্বরের গুণাবলী নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রতিনিয়ত আমরা এগিয়ে চলেছি। তাই আমি মনে করি যে মানবজাতিকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে তাকে অধিকমাত্রায় সত্য ও অহিংসার ছত্রছায়ায় আসতে হবে। ব্যবহারবিধির এই মৌলিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতেই তোমাকে ও আমাকে কাজ করে চলতে হবে, বাঁচতে হবে।[৫৬]

যে-মন ঈশ্বরে অবিচল নয়, তা যত্রতত্রগামী এবং উপাসনা মন্দিরের গুণ তার মধ্যে নেই।[৫৭]

পাপের উৎপত্তি

বিশ্বে পাপ আছে কেন? —এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। আমি যা বলতে পারি, তা বড়জোর নিছক গেঁয়ো মানুষের উত্তর হবে। পুণ্য যদি থাকে, তাহলে পাপও থাকবে। যেমন, যেখানে আলো, সেখানে আঁধারও থাকে। তবে এ ব্যাপারটা আমাদের মতো নশ্বর মানুষের ক্ষেত্রেই সত্য। ঈশ্বরের সামনে পাপও নেই, পুণ্যও নেই। আমরা, গাঁয়ের গবিবরা তাঁর গুণাবলী নিয়ে মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি, কিন্তু আমাদের ভাষা তো ঈশ্বরের ভাষা নয়।

বেদান্তে বলা হয় যে, এ-জগৎ মায়াময়। এই ব্যাখ্যাও কিন্তু অসম্পূর্ণ মানবজাতির প্রলাপ মাত্র। আমি তাই বলি, এ নিয়ে মাথা ঘামাব না। এখন আমাকে যদি ঈশ্বরের প্রাসাদের সবচেয়ে গোপন কক্ষটিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, আমার সেখানে না যাওয়াই ভালো। কারণ, সেখানে কি করতে হবে তা-ই আমি জানি না। আমাদের আত্মিক বিকাশের জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট, যে ভালো কাজ করে, ঈশ্বর সবসময়ে তার সঙ্গেই থাকেন। জানি, কথাটা গেঁয়ো মানুষের কথার মতোই শোনাল।[৫৮]

কোনও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আমি পাপের ব্যাখ্যা করতে পারি না। এটা করতে হলে ঈশ্বরেব সমকক্ষ হতে হয়। পাপ যেমন রয়েছে তেমনই তা মেনে নিই আমি সবিনয়ে। ঈশ্বর বিশ্বে পাপকে থাকার অনুমতি দিয়েছেন ব'লে আমি মনে করি, তিনি দীর্ঘকাল ধরে কষ্ট পেয়ে আসছেন এবং তাঁর ধৈর্য সীমাহীন। আমি জানি যে তাঁর কোনও পাপ নেই। তিনি এর স্রষ্টা, কিন্তু এগুলি তাঁকে স্পর্শ করে না।

আমি এটাও জানি, জীবনপণ রেখে যদি না পাপের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বসংঘাতে লিপ্ত হই তাহলে কখনওই ঈশ্বরকে জানতে পারব না। যতই শুদ্ধ হবার চেষ্টা করি, ততই অনুভব করি যে তাঁর দিকে চলেছি। আমার বিশ্বাস যদি আজকের মতো অকিঞ্চিৎকর না হয়ে হিমালয়ের মতোই অটল, তার শীর্ষের তুষারের মতো শুভ্র ও উজ্জ্বল হত, তাহলে ঈশ্বরের কত কাছেই না আমি যেতে পারতাম![৫৯]

কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পাপ ও পুণ্য উভয়ের গভীরেই ঈশ্বর রয়েছেন। হত্যাকারীর

ছুরি ও অস্ত্রচিকিৎসকের শল্যকে তিনি সমভাবে চালনা করেন। মানুষের কাছে পুণ্য ও পাপ হচ্ছে পৃথক ও বিরোধী, আলো ও অন্ধকার, ঈশ্বর ও শয়তানের প্রতীক স্বরূপ....[৬০]

এটা হয়তো শুনতে ভালো লাগে না যে, ঈশ্বর এ, বিশ্বে পাপকে টিকে থাকার অনুমতি দেন। কিন্তু যদি তিনি পুণ্যের জন্য দায়ী, তাহলে অনুরূপভাবে বলা চলে যে তিনি পাপের জন্যও দায়ী। ঈশ্বর কি রাবণকে অমিত শক্তি প্রদর্শনের অনুমতি দেননি? হয়তো ঈশ্বর কী, সে সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধির অভাবের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বের কারণ রয়েছে। ঈশ্বর কোনও ব্যক্তি নন। তিনি অনির্বচনীয়। তিনি একাধারে আইন, আইনপ্রণেতা ও আইন প্রয়োগকর্তা। কোনও মানুষই এই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। যদি সে তা করে, তবে তাকে নির্ভেজাল একনায়ক বলে মনে করা হবে। এটা শুধু তাঁকেই মানায় যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলে পূজা করি। এটাই যে বাস্তবতা তা স্পষ্ট ভাবে বুঝলে ওই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ('ঈশ্বর কি পাপকে অনুমোদন করেন?')[৬১]

এ রকম একটি কথা বলা হয়ে থাকে যে, বহিরঙ্গটি হল অন্তরের প্রতিফলন। তুমি ভালো হলে সমগ্র বিশ্ব তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। অপর পক্ষে, তুমি যদি কাউকে পাপী ভাবতে চাও, তাহলে হয়তো তোমার মধ্যেই পাপ রয়েছে.....

অন্যদের সম্বন্ধে খারাপ ভাবা আমাদের উচিত নয়। এবং এ-রকম সন্দেহও করা অনুচিত যে, কেউ আমাদের সম্বন্ধে কু-চিন্তা করছে। কু-কথায় কান দেবার প্রবণতা, বিশ্বাসের অভাবের চিহ্ন।[৬২]

অলৌকিকতা

আমি (অলৌকিকতায়) বিশ্বাস করি এবং করি না। ঈশ্বর অলৌকিকতার মাধ্যমে কাজ করেন না। কিন্তু ঈশ্বরের মন চকিতে প্রতিভাসিত হয়ে মানুষের কাছে অলৌকিকের রূপ নেয়। আমরা ঈশ্বরকে জানি না। আমরা শুধু তাঁর আইনের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তাঁকে জানতে পারি। তিনি এবং তাঁর আইন এক। তাঁর আইনেব বাইরে কিছু নেই। তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন ভূকম্পন বা ঝড় সম্ভব নয়,—তিনি না চাইলে একটি ঘাসও অঙ্কুরিত হতে পারে না। তাঁর সহিষ্ণুতার 'মধ্যেই শয়তান রয়েছে, তাঁরই ইচ্ছায়।[৬৩]

রাতারাতি মানুষকে খারাপ থেকে ভালো করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর ভোজবাজি দেখান না। তাঁকেও তাঁর আইনের মধ্যেই কাজ করতে হয়। তাঁর আইন কিন্তু রাষ্ট্রের আইনের থেকে আলাদা। রাষ্ট্রের আইনে ভুল থাকতে পারে কিন্তু ঈশ্বর ভুল করতে পারেন না। তিনি যদি তাঁর আইনের সীমা লঙ্ঘন করতেন, তবে বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।[৬৪]

ইতিহাসে আমরা এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখতে পাই, যেখানে বহু মানুষ চোখের পলকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে অন্যটি গ্রহণ করছে। বুয়র যুদ্ধের কথা ধরা যাক। এই যুদ্ধ থেকেই ইংরেজি ভাষায় "মাফেকিং" শব্দটি এসেছে। মাফেকিং দিবসে লোক পাগল হয়ে যেত। কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই সমগ্র ব্রিটিশ জাতির মধ্যে এক পরিবর্তন এল। হেনরি ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং বস্তুতপক্ষে

যুদ্ধে অর্জিত যা-কিছু সবই ত্যাগ করা হল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে শ্রমিক দলের জয় আর একটি উদাহরণ। অত ভালো বক্তা ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, চার্চিল আর ব্রিটিশ জনগণের প্রিয় নায়ক নন—এটা আমার কাছে যথেষ্ট অলৌকিক ঘটনা। অথচ কদিন আগেই তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতিটি কথা শুনত। এই সব উদাহরণ থেকে আমার মতো আস্তিক ব্যক্তির এই বিশ্বাসই পুষ্ট হয় যে, সব শক্তির ওপরেও এক মহাশক্তি রয়েছে—তাকে তোমরা ভগবান, প্রকৃতি বা যে-নামেই ডাক-না-কেন।[৬৫]

অবতার

দেহধারী সমস্ত প্রাণ-ই বাস্তবে ঈশ্বরের অবতার-স্বরূপ। কিন্তু সচরাচর প্রতিটি জীবিত প্রাণীকেই অবতার বলে মনে করা হয় না। পরবর্তী প্রজন্ম এই সম্মান তাঁকেই জানায়, যিনি তাঁর নিজের প্রজন্মে, তাঁর আচরণে অনন্যসাধারণ ধার্মিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে আমি কোনও ভুল দেখি না। এতে ঈশ্বরের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ন হয় না এবং সত্য-ও অনাহত থাকে...

অবতারে বিশ্বাস, মানুষের সমুন্নত আধ্যাত্মিক আকুতির প্রমাণস্বরূপ। যতক্ষণ না ঈশ্বরোপম হয়ে উঠছে, ততক্ষণ মানুষ মনে শান্তি পায় না। এই পর্যায়ে পৌঁছবার প্রচেষ্টা হল সর্বোচ্চ, তথা একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, যা থাকা উচিত। আর এটাই হল আত্মোপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধিই 'গীতা' এবং অন্য ধর্মগ্রন্থের বিষয়।[৬৬]

অতএব সুপ্রাচীন অতীতে যে ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব বা অবতাররা এসেছেন, তাঁদের বিশ্বাস করা অলীক কুসংস্কার নয়। বরং আন্তরিকতম আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার প্রয়াস।[৬৭]

ঈশ্বরের আইন

মানুষের ভাষা ঈশ্বরের লীলা কতটুকুই বা বর্ণনা করতে পারে! আমি বিলক্ষণ জানি যে ঈশ্বরের কর্মধারা বর্ণনাতীত ও দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু নশ্বর মানুষ যদি এর বর্ণনা করার সাহস সঞ্চয় করে, তাহলে তার নিজের অস্ফুট ভাষা ছাড়া অন্য উপায় নেই।[৬৮]

আমরা জানি না ঈশ্বরের সকল আইন কী, কী ভাবে সেগুলি কাজ করে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বা মহত্তম আধ্যাত্মিকের জ্ঞানও ধূলিকণার সমতুল। ঈশ্বর যদি আমার কাছে আমার জাগতিক পিতার মতো ব্যক্তিগত কেউ না হন, তাহলেও তিনি এর বহুগুণ বেশি আর কিছু। আমার জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর ইচ্ছাধীন। আমি আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বাস করি, তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে একটি গাছের পাতাও নড়ে না। তাঁর সহিষ্ণুতার জন্যই আমি প্রতিটি নিশ্বাস নিতে পারি।

তিনি এবং তাঁর আইন এক। এই আইনই ঈশ্বর। তাঁর কোনও বিভূতির কথা বলাই যথেষ্ট নয়। তিনি নিজেই সব গুণের অধীশ্বর। তিনি সত্য, প্রেম, আইন এবং মানুষের উদ্ভাবনীশক্তিতে যে লক্ষ লক্ষ নাম করা যায়, সবই তিনি।[৬৯]

প্রকৃতির নিয়মাবলী শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতির নিয়মকে ভেঙে বা তাতে ছেদ ঘটিয়ে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে না। কিন্তু আমাদের সত্তা সীমাবদ্ধ। আমরা নানা

কথা কল্পনা করি। ঈশ্বরকেও আমাদের মত সীমাবদ্ধ বলে মনে করি। আমরা তাঁর অনুকরণ করতে পারি, কিন্তু তিনি আমাদের অনুকরণ করেন না। তাঁর সময়কালকে বিভাজিত করার সাহস আমাদের না দেখানোই ভালো, কারণ অনন্তকাল হচ্ছে তাঁর সময়। আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আছে। শত বছরের মানব জীবন, অনন্তকালে এক নগণ্য বিন্দু ছাড়া আর কী?[৭০]

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সভ্য ও অ-সভ্য, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করি, বিহারের (ভূমিকম্পের) মতো বিপর্যয় মানবজাতির নিজেরই পাপের শাস্তি। এই বিশ্বাস যখন হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, তখন মানুষ উপাসনা করে, অনুশোচনা করে ও নিজেদের শুদ্ধতর করে তোলে....

তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার ধারণা সীমাবদ্ধ। ওই ধরনের বিপর্যয় কোনও দেবতা বা প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা নয়। গ্রহগুলি যেমন তাদের সঞ্চার সম্পর্কে নিয়ম মেনে চলে, তেমনই ওই বিপর্যয়গুলিও নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। এই ঘটনার নিয়ন্তা যে আইন, সেটা আমরা জানি না বলেই একে বিপর্যয় ও গোলযোগ বলে অভিহিত করি।[৭১]

মেয়েরা যে কাচের চুড়ি পরে, আমাদের জাগতিক অস্তিত্ব তার চেয়েও ভঙ্গুর। একটা সিন্দুকে বন্ধ করে, কেউ হাত না দিয়ে রেখে দিলে তুমি কাচের চুড়িও হাজার বছর ধরে অটুট রাখতে পারো। কিন্তু এই জাগতিক অস্তিত্ব এতই তুচ্ছ যে চোখের পলক না পড়তে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তাই ভূমিকম্প বা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়েব সময়ে, অথবা সাধারণভাবে মৃত্যু যে-ভাবে আসে তখন, নিশ্বাস নেওয়ার সময় থাকতে থাকতে আমাদের উচিত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ মন থেকে মুছে ফেলে, হৃদয় পরিশুদ্ধ ক'রে সৃষ্টিকর্তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা।[৭২]

প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পেছনেই কোনও-না-কোনও ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান আজ বলে দেয় কখন গ্রহণ হবে, হয়তো সেভাবেই একদিন আগাম বলে দেবে কখন ভূমিকম্প হবে। এ খুবই সম্ভব। মানব-মেধার এ হবে আর এক বিজয় বৈজয়ন্তী। কিন্তু এ-রকম লক্ষ কোটি জয়ও আত্মার বিশুদ্ধিকরণ ঘটাতে পারে না, যা না হলে সকলই অসার।

যারাই অন্তরের বিশুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তার গুণগ্রাহী, তাঁদের আমি এই প্রার্থনায় যোগ দিতে বলব, যাতে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পিছনে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি, তা আমরা বুঝতে পারি। এই বিপর্যয়গুলি যেন আমাদের আরো বিনয়াবনত করে। ডাক এলেই যেন নির্মাতার মুখোমুখি হবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে। যে-ই হোক-না-কেন, অন্যের দুঃখকষ্ট ভাগ করে নেওয়ার জন্য যেন আমরা সদাপ্রস্তুত থাকি।[৭৩]

ঈশ্বরের নামাবলী

ঈশ্বরের সহস্র নাম, অথবা তিনি নামহীন। যে নামটিই ভালো লাগে, সে নামেই আমরা তাঁকে পূজা করতে পারি,—প্রার্থনা জানাতে পারি। কেউ তাঁকে বলে রাম, কেউ কৃষ্ণ,

আবার কেউ বলে রহিম, অন্যেরা বলে 'গড'। সকলেই এই মহান আত্মার উপাসনা করে। কিন্তু সব খাদ্য যেমন সকলের সয় না, তেমন সব নামও সকলের ভালো লাগে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী নাম বেছে নেয় এবং অন্তরস্থ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী তিনি আমাদের গভীরতম অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে জানেন এবং আমাদের আন্তরিকতা অনুযায়ী সাড়া দেন।

অতএব মৌখিক মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে পূজা বা প্রার্থনা নয়, তা করতে হবে হৃদয় দিয়ে। সেই কারণেই বোবা ও তোতলা, অজ্ঞ ও মূর্খ সকলেই এগুলি করতে পারে। যাদের মুখে মধু, অন্তরে বিষ, তাদের কথা তিনি শোনেন না। কাজেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হলে অন্তর শুদ্ধ কবতে হবে।

হনুমানের ঠোঁটেই শুধু রামের নাম ছিল না। তাঁব হৃদয়ে তা বিরাজ করত। রাম হনুমানকে দিয়েছিলেন অমিত শক্তি। এই শক্তিবলে হনুমান পাহাড় তুলে নিয়ে গিয়ে সাগর পেরোতে পেরেছিলেন।[৭৪]

ঈশ্বরকে আমি যে-ভাবে বিশ্বাস কবি, সে-ভাবেই তাঁর কথা বলি...আমার বিশ্বাস তিনিই স্রষ্টা, আবার সৃজনে অক্ষমও তিনিই। এই ধারণার মূলে রয়েছে বাস্তবতার বহুরূপতার তত্ত্ব। জৈন ধর্মের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি প্রমাণ করি, ঈশ্বরের সৃষ্টি করার অক্ষমতার দিক। আবার রামানুজের অবলম্বী হয়ে তাঁর সৃষ্টিশীলতার দিকটি তুলে ধরি। প্রকৃতপক্ষে আমরা তাঁরই চিন্তা করছি যিনি অচিন্তনীয়, বর্ণনা করছি অনির্বচনীয়কে, জানাব চেষ্টা কবছি অজ্ঞেয়কে। এই কাবণেই আমাদেব ভাষা থতমত খাচ্ছে, অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে, এমন কি পরস্পববিরোধীও শোনাচ্ছে। এইজন্য ব্রহ্মাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বেদ-এ বলা হচ্ছে, 'এহো বাহ্য', 'এহো বাহ্য'।[৭৫]

আমাব মতে রাম, রহমান, আহুর মাজদা, 'গড' বা কৃষ্ণ, এ সবই হচ্ছে, সেই অদৃশ্য শক্তিকে নাম দেওয়াব চেষ্টা মানুষের, যা অন্য সব শক্তির চেয়ে মহান। অসম্পূর্ণ হলেও নিরন্তর সম্পূর্ণতাব জন্য প্রয়াস চালানো মানুষের সহজাত। এই প্রয়াস চালাতে গিয়েই সে কল্পনাবিলাসেব মধ্যে গিয়ে পড়ে। শিশু যেমন দাঁড়াতে চেষ্টা করে, পড়ে যায়, আবার চেষ্টা করে এবং শেষ অবধি হাঁটতে শেখে, তেমনি মানুষও তার সব বোধবুদ্ধি নিয়েও অনন্ত ও চিরনবীন ঈশ্বরের কাছে শিশুরই সমতুল। মনে হতে পারে এটা অতিকথন, কিন্তু তা নয়। মানুষের সাধ্য কেবল এইটুকু যে, সে তার দুর্বল ভাষায় ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করতে পারে।[৭৬]

১৫. রামনাম

আমার রক্ষাকর্তা

আমার বোধবুদ্ধি ও হৃদয় অনেক দিন আগেই এটা উপলব্ধি করেছিল যে, ঈশ্বরের পবম গুণ ও নাম হল সত্য, আমি সত্যকে রাম নামে ডাকি। জীবনপরীক্ষার গাঢ়

অন্ধকার মুহূর্তে ওই একটি নামই রক্ষা করেছে আমাকে, এখনও রক্ষা করে চলেছে। হয়তো এর কারণ আমার শৈশবের অভিজ্ঞতা, হয়তো তুলসীদাস-পাঠের মুগ্ধতা। সেই প্রভাবই এর জন্য দায়ী।

কিন্তু আসল ঘটনা অন্যরকম। এই অংশটি লিখতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে শৈশবের ঘটনাবলী। তখন আমি প্রতিদিন আমাদের পিতৃপুরুষের বসতবাড়ির কাছে, রামজীমন্দিরে যেতাম। আমার রাম তখন সেখানেই থাকতেন। তিনি আমাকে বহু ভয় ও পাপ থেকে রক্ষা করেছেন। রাম আমার কাছে কোনও কুসংস্কার ছিলেন না। হয়তো সেই রামমূর্তির রক্ষক মন্দ লোক ছিল। তার সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। হয়তো সেই মন্দিরে অন্যায় কাজও হয়েছে। পুনরায় বলি, সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। অতএব সে-সব আমাকে স্পর্শও করে না। আমার পক্ষে যা সত্য ছিল, সত্য আছে, তা কোটি কোটি হিন্দুর জীবনসত্য।"[৭৭]

শৈশবে আমার পরিচারিকা আমাকে শিখিয়েছিলেন, যখনই ভয় করবে বা মন খারাপ হবে, তখনই রামনাম করতে। এবং এর পরে, বয়স, ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রামনাম করাটা আমার প্রায় নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়। আমি বলতে পারি যে শব্দটি আমার ঠোঁটে না হলেও হৃদয়ে সারাক্ষণ, দিবারাত্র ধ্বনিত হয়। এই নামই আমার রক্ষাকর্তা এবং সেই থেকে আমি এই নাম আঁকড়ে রয়েছি। বিশ্বের আধ্যাত্মিক সাহিত্যে তুলসীদাসের রামায়ণের স্থান খুবই উঁচুতে। এর মধ্যে যে সৌন্দর্য রয়েছে তা আমি মহাভারতে, এমন কি বাল্মীকির রামায়ণেও পাই না।"[৭৮]

সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা

আমি নিজে শৈশব থেকে তুলসীদাসের ভক্ত, তাই সর্বদা রাম-নামে ঈশ্বরের ভজনা করেছি। কিন্তু আমি জানি, যদি কেউ ওঁ-কার থেকে শুরু ক'রে, সকল জলবায়ু, সকল দেশ ও ভাষায় প্রচলিত ঈশ্বরের নামাবলী উচ্চারণ ক'রে তাঁর ভজনা করে তাহলে ফল সেই একই হবে। ঈশ্বর ও তাঁর আইন অভিন্ন। অতএব, তাঁর আইন মেনে চলাই হল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা।"[৭৯]

ঈশ্বর এক

যখনই কেউ আপত্তি তোলে রাম, বা রামনাম কেবল হিন্দুদেরই ব্যাপার, মুসলিমরা কী করে এতে অংশ নিতে পারে, তখন আমি মনে মনে হাসি। মুসলিমদের জন্য কি এক আলাদা ঈশ্বর আছেন, এবং হিন্দু, পারসিক বা খ্রীস্টানদের জন্য অন্য? না। সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর একই। তাঁকে নানা নাম দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে পরিচিত যে নাম, আমরা তাতেই তাঁকে স্মরণ করি।

আমার রাম, আমার প্রার্থনার রাম, দশরথপুত্র ও অযোধ্যার রাজা সেই ঐতিহাসিক রাম নন। এই রাম হলেন চিরন্তন, যিনি অজাত এবং অদ্বিতীয়। একমাত্র তাঁকেই আমি পূজা করি। তাঁর সহায়তাই খুঁজি এবং তোমাদেরও তাই চাওয়া উচিত। তিনি সমভাবে সকলের। তাই মুসলমানদের বা অন্য কারো তাঁর নাম নিতে আপত্তি কোথায়, আমি

বুঝি না। কিন্তু ঈশ্বরকে রামনামে ডাকতে সে বাধ্য নয়। সে নিজের যা শুনতে ভালো লাগে, সেই আল্লাহ্ বা খুদা বলতে পারে।[৮০]

আমার কাছে....রাম —যাঁকে সীতার প্রাণনাথ এবং দশরথের পুত্র বলা হয়েছে—সেই সারভূত সর্বশক্তিমান, যাঁর নাম হৃদয়ঙ্গম করলে মানসিক, নৈতিক ও কায়িক,—সকল যাতনা দূর হয়।[৮১]

নিরাময় ক্ষমতা

যে ব্যক্তি নিয়মিত রামনাম করে ও শুদ্ধজীবন যাপন কবে, সে কেন অসুস্থ হয়, এ-এক সঙ্গত প্রশ্ন। মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই অসম্পূর্ণ। চিন্তাশীল মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে কিন্তু কখনওই তা পাবে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাকে হোঁচট খেতে হয়। ঈশ্বরের সকল আইনই শুদ্ধ জীবনেব মধ্যে মূর্ত হয়।

প্রথমেই প্রয়োজন, নিজের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করা। এটা নিশ্চিত, যে-কেউ যে মুহূর্তে এই সীমা লঙ্ঘন কববে, অমনি সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই, নিজের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সুষম খাদ্য খেলে একজন ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে পাবে। কী কবে সে বুঝবে তার জন্য সুষম খাদ্য কী? এ রকম বহু সমস্যাই কল্পনা করা যায়। মোদ্দা ব্যাপাবটা হল, প্রত্যেককে হতে হবে তাব নিজের চিকিৎসক এবং জানতে হবে তার সীমাবদ্ধতা। যে এই নিয়ম মেনে চলবে, সে ১২৫ বছর পর্যন্ত নিশ্চয়ই বাঁচবে।[৮২]

তোমার কোনও বিকল অঙ্গকে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা রামনামের নেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনাও রামনাম ঘটাতে পারে। সেটা হল, অঙ্গহানি সত্ত্বেও জীবৎকালে তুমি অপার শান্তি উপভোগ করবে, এই শ্রেয়তর অলৌকিক ঘটনা রামনাম ঘটাতে পাবে। মৃত্যুর দংশন-জ্বালা অপসারিত হবে, যাত্রাশেষে সমাধির বিজয়গর্বকে ম্লান করবে। আজ না হোক কাল, মৃত্যু যেহেতু আসবেই, তখন তার কথা ভেবে লাভ কি?[৮৩]

প্রাকৃতিক চিকিৎসা করার জন্য উচ্চমানেব শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অগাধ পাণ্ডিত্যেব দবকার নেই। বিশ্বজনীনতার সারমর্মই হল সারল্য। লক্ষ কোটি মানুষের হিতার্থে যা দরকার তার জন্য প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা নেই। বেশি পাণ্ডিত্য অল্প কয়েকজনের মাত্র থাকে। অতএব তা থেকে ধনীদেরই কেবল উপকার হতে পারে।

ভারত বেঁচে আছে তার সাত লক্ষ নামপরিচয়হীন প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে কোথাও কোথাও অধিবাসীর সংখ্যা কয়েক শতর বেশি নয়। প্রায়শই তারও কম, কয়েক গণ্ডা মাত্র।

আমি সেরকম একটি গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে চাই। সেই গ্রামই হল সত্যকার ভারত, আমার ভারত। এই সরল মানুষদের কাছে তুমি বড় বড় ডিগ্রিধারী ডাক্তার, হাসপাতালের ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে যেতে পারবে না। তাদের সব আশা ভরসা সহজ প্রকৃতিজ ওষুধে ও রামনামের মধ্যে।[৮৪]

চিন্তার শুদ্ধতা

মুখে রামনাম জপ করলেই আরোগ্যলাভ হবে, কথাটা তা নয়। যদি আমার বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে তাহলে, নামমাহাত্ম্যে রোগারোগ্যের ব্যাপারটিকে আমার বন্ধুরা 'মূর্খের নিরাময়' বলে বর্ণনা করে। এইভাবে তারা জীবন্ত ঈশ্বরের প্রাণবন্ত নামকে হেয় করছে। এর উৎসার হবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে।

ঈশ্বরে সচেতন বিশ্বাস এবং তাঁর আইন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে কোনওরকম বাইরের সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। এই আইন মতে, শরীরকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখার দায়িত্ব, সুস্থ মনের। বিশুদ্ধ মন আসে নির্মল হৃদয় থেকে। চিকিৎসকের হৃদ্স্পন্দমাপক যন্ত্র এ-হৃদয়ের সন্ধান জানে না, এ-হৃদয় হল ঈশ্বরের আসন। বলা হয়, হৃদয়ে ঈশ্বরের উপলব্ধি ঘটলে কোনও অপবিত্র বা অলস চিন্তা মনে জাগ্রত হয় না।

যেখানে চিন্তায় বিশুদ্ধতা বয়েছে, সেখানে ব্যাধির উদ্রেক অসম্ভব। অবশ্য ওই পর্যায়ে পৌঁছনো কঠিন। কিন্তু চিন্তাশুদ্ধিব ব্যাপাবটি মেনেই স্বাস্থ্যলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপটি নিতে হয়। তদনুযায়ী চেষ্টা করার সঙ্গে নিতে হয় পরবর্তী পদক্ষেপটি। নিজের জীবনে আমূল এই পবিবর্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই মানুষের এযাবৎ আবিষ্কৃত প্রকৃতির অন্যসব নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়। এগুলিকে হেলাফেলা কবে শুদ্ধ হৃদয়েব অধিকার দাবি করা যায় না।

ন্যায়সঙ্গত কারণেই এটা বলা চলে যে, রামনাম ছাড়াও শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী ঠিক পথে চলবে। আমিই শুধু শুদ্ধতা অর্জনের জন্য অন্য কোনও পথ জানি না। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রাচীন ঋষিরা এই পথেই গমন করেছেন। তাঁরা ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিভূ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি বা ভণ্ড বুজরুক নন।[৮৫]

অন্য যে কোনও শক্তির মতো আধ্যাত্মিক শক্তিও মানুষের সেবায় নিয়োজিত। যুগ যুগ ধরে কম-বেশি সাফল্যের সঙ্গে এই শক্তিকে ব্যাধির নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু সে কারণেই নয়, যদি সাফল্যের সঙ্গে একে দৈহিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা যায়, তাহলে সেটা না-করাটা খুবই ভুল। কারণ মানুষ একাধারে বস্তু ও আত্মা। একে অপরের ওপর ক্রিয়াশীল, একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে।

লক্ষ লক্ষ লোক যারা কুইনিন পায় না, তাদের কথা না ভেবে তুমি যদি কুইনিন খেয়ে ম্যালেরিয়া সারাতে পারো তাহলে তোমার মধ্যেই যে ওষুধটি আছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অজ্ঞতার কারণে তাকে কাজে লাগাতে পারবে না বলে তুমি কেন তাকে কাজে লাগাবে না?

লক্ষ লক্ষ মানুষ অজ্ঞতার কারণে বা নিছক নষ্টামি করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ-সবল থাকে না বলে কি তুমিও থাকবে না? মানবহিতৈষণা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশে তুমি যদি নিজেকে পরিচ্ছন্ন না রাখ, তাহলে অসুস্থ ও অপরিচ্ছন্ন থেকে তুমি ওই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেবা করার কর্তব্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে। এটা অবশ্য মানতে হবে, দৈহিক সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতাকে অবহেলা করার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ হল আত্মিকভাবে পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ থাকতে আপত্তি জানানো।[৮৬]

মুখে রামনাম জপ করা ও কাজে রাবণের পথে চলা ফলপ্রসূ তো নয়ই বরং অনেক বেশি ক্ষতিকারক। এটা নিছক ভণ্ডামি। নিজেকে বা বিশ্বকে ভাঁওতা দেওয়া যায়, সর্বশক্তিমানকে প্রতারিত করা যায় না।[৮৭]

১৬. প্রার্থনা আমার আত্মার অন্নজল

আমি ধর্ম ও প্রার্থনায় বিশ্বাসী। আমাকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, তাহলেও আমি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর তাঁকে অস্বীকার না করার ও তাঁর অস্তিত্ব জোর দিয়ে ঘোষণা করার শক্তি আমাকে দেবেন।[৮৮]

আমার কোনও কাজই প্রার্থনা ছাড়া সম্পন্ন হয় না। মানুষ ভ্রমপ্রবণ প্রাণী। সে কখনওই তার পদক্ষেপ বিষয়ে নিশ্চিত নয়। সে যাকে তার প্রার্থনাব প্রত্যুত্তর মনে করে, তা তার দম্ভের প্রতিধ্বনিও হতে পারে। ঈশ্বরের অভ্রান্ত নির্দেশ পেতে হলে মানুষকে এক সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে, যার পক্ষে পাপ করা অসম্ভব। তেমন কোনও দাবি আমি করতে পারি না। আমি এক সংগ্রামরত, সচেষ্ট, ভ্রমপ্রবণ, ও অসম্পূর্ণ আত্মার অধিকারী।[৮৯]

আমাকে হত্যা করলেও আমি রাম ও রহিমের নামোচ্চারণ বন্ধ কবব না। ওই নাম দুটি আমার কাছে সেই একই ঈশ্বরের তুল্য। এই নাম মুখে নিয়েই আমি সানন্দে মৃত্যুবরণ করব।[৯০]

পরীক্ষালগ্নে রক্ষাকর্তা

পরীক্ষাব প্রতিটি লগ্নে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা কবেছেন। আমি জানি "ঈশ্বর আমাকে বক্ষা করেছেন" এই বাক্যটি আজ আমার কাছে গভীর অর্থ বহন করে এবং এখনও আমি অনুভব করি যে এর সম্পূর্ণ অর্থ আজও আমার বোধগম্য হয়নি। শুধু সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতাই আমাকে পূর্ণতর উপলব্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বলতে বাধা নেই, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, আইনজীবী হিসেবে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়, এবং রাজনীতিতে, আমার প্রতিটি পরীক্ষায় ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। যখন সব আশা অন্তর্হিত, "যখন সাহায্যকারীরা বিফল ও সুখশান্তি উধাও হয়" তখন দেখি কোনও-না-কোনওভাবে সহায়তা এসে পৌঁছয়। আমি জানি না কোথা থেকে আসে।

প্রার্থনাই আমার জীবন রক্ষা করেছে। প্রার্থনা না থাকলে আমি অনেকদিন আগেই নিশ্চিত উন্মাদ হয়ে যেতাম। আমার আত্মজীবনী থেকে তোমরা জানতে পারবে, কি জনজীবনে, কি ব্যক্তিজীবনে, যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার বরাতে জুটেছে। এগুলি আমাকে সাময়িক হতাশায় আচ্ছন্ন করেছে ঠিকই, কিন্তু এর হাত থেকে যদি আমি বক্ষা পেয়ে থাকি, তবে তা প্রার্থনার জোরেই পেয়েছি।

একটা কথা তোমাদের বলতে পারি, যে-অর্থে সত্য আমার জীবনের একটি অঙ্গ, প্রার্থনা সেরকম নয়। এটা এসেছিল নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে, যখন দুর্দশাগ্রস্ত আমি, কোনওমতেই এ-ছাড়া সুখ পেতাম না। এইভাবে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস যত দৃঢ় হল ততই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল প্রার্থনার আকৃতি। প্রার্থনা ছাড়া জীবন মনে হতো, বিবর্ণ, উদাস।

দক্ষিণ আফ্রিকার খ্রীস্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছি। কিন্তু তা আমাকে টানতে পারেনি। ওদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিতে পারিনি। তারা ঈশ্বরের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানিয়েছে কিন্তু আমি তা পারিনি। আমি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হই। ঈশ্বর এবং প্রার্থনায় অবিশ্বাস নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম এবং জীবনের অনেক পরের পর্যায়ের আগে জীবনে কোনও শূন্যতা অনুভব করিনি। কিন্তু সেই পর্যায়ে পৌঁছে আমি উপলব্ধি করলাম যে দেহের পক্ষে খাদ্য যেমন, আত্মার পক্ষে প্রার্থনাও তেমনই অপরিহার্য। সত্যি বলতে আত্মার জন্য প্রার্থনা যতটা দরকার, দেহের জন্য অন্নজল ততটা নয়। দেহকে সুস্থ রাখার জন্য অনেক সময়ে উপবাস দরকার হয়, কিন্তু প্রার্থনা-উপবাস বলে কিছু নেই....

রাজনীতির জগতে হতাশার মুখোমুখি হলেও, কখনওই মনের শান্তি হাবাইনি। সত্যি বলতে কি, এমন লোক দেখেছি যারা এই শান্তির জন্য আমাকে হিংসা করে। আমি তোমাদের বলছি, এই শান্তি আসে প্রার্থনা থেকে। আমি পণ্ডিত নই, সবিনয়ে বলি, আমার একমাত্র সম্বল বলতে এই প্রার্থনা। কে, কী ভাবে এই প্রার্থনা করবে তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের মতো চলে। কিন্তু কিছু সুচিহ্নিত পথ আছে। প্রাচীন আচার্যরা যে পথে গেছেন, সেই চেনা পথে চলাই নিরাপদ।

....আমার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য আমি দিয়েছি। প্রত্যেকে এবার চেষ্টা করে দেখুক প্রাত্যহিক প্রার্থনার ফলস্বরূপ সে তার জীবনে নতুন এমন কিছুর সংযোজন ঘটাতে পারছে কি না যার তুলনা মেলা ভার।[১১]

ঈশ্বরের সাড়া

পবিত্র আদর্শের লড়াইয়ে পরাজয় ঘটলে কখনও বিমর্ষ হয়ো না এবং এবার থেকে ঠিক করো যে, তুমি শুদ্ধ হবে, ঈশ্বরের সাড়া পাবে। কিন্তু যারা দাম্ভিক, যারা দর কষাকষি করে, তাদের প্রার্থনায় ঈশ্বর সাড়া দেন না......

তুমি যদি তাঁর অনুগ্রহ চাও, তোমাকে যেতে হবে রিক্ত হয়ে, সবকিছু ত্যাগ করে। তোমার মতো অধঃপতিত মানুষকে কীভাবে তিনি অনুগ্রহ করবেন সে-বিষয়ে সকল আশঙ্কা ও সংশয় পরিহার করে। অসংখ্য প্রার্থীর প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেছেন। তিনি কি পারেন তোমাকে বিমুখ করতে? তিনি কোনও ভেদবিভেদ করেন না। দেখবে, তোমার প্রতিটি প্রার্থনা পূর্ণ হবে। সবচেয়ে যে ঘৃণ্য তার প্রার্থনাও অপূর্ণ থাকবে না। এ-আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। আমি নরকের পথ পার হয়ে গেছি। প্রথমেই প্রার্থনা কর স্বর্গের রাজ্য—দেখবে কোনও কিছুই তোমার অপ্রাপ্য থাকবে না।[১২]

কখনও দেখিনি, তিনি সাড়া না দিয়ে নিরুত্তর থেকেছেন। দিগন্ত যখন সঘন অন্ধকারে আবৃত—কারাবাসের অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলিতে যখন আমার জীবনের সমস্ত তাল ও ছন্দ কেটে গিয়েছে, তখনই আমি তাঁর নিকটতম সান্নিধ্য লাভ করেছি। জীবনে এমন একটি মুহূর্তও স্মরণ করতে পারি না, যখন মনে হয়েছে তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন।[৯৩]

প্রার্থনা কী

সনির্বন্ধ মিনতি, পূজা, প্রার্থনা, কোনও কুসংস্কার নয়। খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, হাঁটা-চলার চাইতেও এগুলি অনেক বাস্তব কাজ। যদি বলি একমাত্র এগুলিই বাস্তব, বাকি সবই অলীক, তাহলেও অত্যুক্তি হবে না।

ওই পূজা বা উপাসনা বাকনৈপুণ্যের বাহাদুরি নয়, বা নয় নিছক মৌখিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এ উৎসারিত হয় হৃদয় থেকে। আমরা যদি হৃদয়ের সেই শুদ্ধতা অর্জন করতে পারি যখন "প্রেম ছাড়া সেখানে কিছু থাকবে না," যদি সব তন্ত্রী সুরে বেঁধে বাখতে পারি তাহলে সেগুলি "অনুরণিত সংগীত হয়ে চলে যাবে দৃষ্টির বাইরে।"

প্রার্থনায় 'বাক্' নিষ্প্রয়োজন। এ নিজেই ইন্দ্রিয়গত প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন। আমার তিলমাত্র সন্দেহও নেই যে হৃদয়কে বাসনার আবেগ থেকে মুক্ত করতে প্রার্থনা এক অব্যর্থ উপায়। তবে এব সঙ্গে চূড়ান্ত বিনয়ের সম্মিলন চাই।[৯৪]

প্রার্থনাকালে নির্বাক হৃদয়, হৃদয়হীন বাক্যের চেয়ে ভালো।[৯৫]

পাথব বা ধাতুর মূর্তিকে পূজা করাব জন্য মন্দিবে যাই না; যাই ওই মূর্তিতে যে ঈশ্বর আছেন তাঁকে পূজা কবতে। মানুষ তাকে যেমন বানায় মূর্তি তেমনই হয়ে ওঠে। ভক্ত তাতে যে পবিত্রতা আবোপ কবে, তার বাইরে মূর্তির কোনও তাৎপর্য নেই। তাই শিশু-সহ সকলেরই উচিত প্রার্থনার সময়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকা।[৯৬]

অন্তরস্থ ঈশ্বরের অস্তিত্বে জীবন্ত বিশ্বাস ব্যতীত প্রার্থনা অসম্ভব।[৯৭]

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গেব মহান ও সাহসিক ব্রতটি আরব্ধ করার প্রথম ও শেষ উপায় হল প্রার্থনা। জাতির সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা যার চূড়ান্ত পর্যায়। নিঃসন্দেহে প্রার্থনার একমাত্র অন্বিষ্ট ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস।[৯৮]

মানুষ প্রায়ই তোতাপাখিব মতো ঈশ্বরের নাম আওড়ায় এবং তা থেকে ফল প্রত্যাশা করে। প্রকৃত ঈশ্বরসন্ধানীর বিশ্বাস এতই জীবন্ত হবে যে, তা শুধু তার হৃদয় থেকেই তোতা-বুলির মতো নাম আওড়াবার মিথ্যাচার দূর করবে না, করবে অন্যের হৃদয় থেকেও।[৯৯]

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা

দেহেব জন্য যেমন চাই অন্নজল, আত্মার জন্য তেমনই প্রার্থনা। মানুষ খাদ্য না খেয়ে বহুদিন চলতে পারে, ম্যাকসুইনি যেমন ৭০ দিন ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে মানুষের এক মুহূর্তও প্রার্থনা ছাড়া থাকা উচিত নয়।[১০০]

আলস্য ও বদভ্যাসের শিকার হয়ে অনেকে মনে করে, না-চাইলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তারা পাবে। কাজেই তাঁর নাম করার দরকার হবে কেন? একথা সত্য, আমাদের

বিশ্বাস থাকুক আর না-ই থাকুক, ঈশ্বর আছেন। কিন্তু ঈশ্বরোপলব্ধি নিছক বিশ্বাসের চেয়ে অনন্তগুণ মহৎ। এটা একমাত্র নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারাই সম্ভব। সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এটি সত্য, এবং সব বিজ্ঞানের যে বিজ্ঞান, সেখানে তো এর সত্যতা প্রশ্নাতীত।[১০১]

প্রার্থনা হল, "প্রভাতে দরজা খোলার চাবি ও রাতে দরজা বন্ধ করার খিল।"[১০২]

আমার ও আমার সহযোগীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি তোমাদের বলছি, প্রার্থনার আশ্চর্য ফল যে উপলব্ধি করেছে, সে দিনের পর দিন অন্নজল পরিহার করে চলতে পারে। কিন্তু একটি মুহূর্তও বিনা প্রার্থনায় সে থাকতে পারে না। কারণ প্রার্থনা ছাড়া অন্তরের শান্তি নেই।[১০৩]

আমি স্বীকার করি, কোনও মানুষ যদি দিবারাত্র ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহলে প্রার্থনার জন্য তার আলাদা সময়ের দরকার নেই। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই এটা করা সম্ভব নয়। প্রত্যহের ধূলিমলিন এই পৃথিবী তাদেব সঙ্গে বড় বেশি জড়িয়ে আছে। এদের পক্ষে খুব উপযোগী হবে, সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য হলেও বাইরের সকল বস্তু থেকে মনকে সরিয়ে আনা। ধ্যানমগ্নতার ফলে কোলাহলের মধ্যেও তারা নিরুপদ্রব শান্তি অনুভব করবে, ক্রোধ সংবরণ করতে সক্ষম হবে এবং ধৈর্যশীল হবে।[১০৪]

সাধারণ নিয়ম এটাই হওয়া উচিত যে পৃথিবীতে কারো জন্যেই প্রার্থনায় বিলম্ব করা চলবে না। ঈশ্বরের সময় কখনও থেমে থাকে না। সেই আরম্ভের মুহূর্ত থেকে তাঁর সময়ের চাকা নিরন্তর ঘুরে চলেছে। প্রকৃত অর্থে তাঁর বা তাঁর সময়ের কোনও আরম্ভ নেই....যাঁর ঘড়ি কখনও বন্ধ হয় না, তাঁকে প্রার্থনা জানাবার মুহূর্তটি ভুলে যেতে পারে কেউ?[১০৫]

ঈশোপনিষদের প্রথম যে শ্লোকটি দিয়ে প্রতিদিনের প্রার্থনা উচ্চারিত হয়, তাতে বলা হয়েছে: সব কিছুই ঈশ্বরকে উৎসর্গ করবে এবং তার পর যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেটুকু ভোগ করবে। মূল নীতি হল একে অপরের সম্পদে লোভ করবে না। এই দুটি বাণীর মধ্যেই হিন্দুধর্মের সারাৎসার নিহিত।

প্রার্থনার সারাৎসার

প্রত্যুষের প্রার্থনায় উচ্চারিত আর একটি শ্লোকে বলা হয়, "আমি ঐহিক ক্ষমতা চাই না, স্বর্গেও যেতে চাই না, এমন কি নির্বাণলাভও আমার অভীষ্ট নয়। আমি শুধু চাই, যারা কষ্টে আছে, তাদের কষ্ট লাঘব করতে।" এ কষ্ট দৈহিক মানসিক, বা আত্মিক যে-কোনওটাই হতে পারে। স্ব-রিপুর দাসত্বের কারণে যে আত্মিক কষ্ট, তা কখনও কখনও দৈহিক কষ্টের চেয়ে বেশি।

কিন্তু কষ্ট লাঘব করার জন্য ঈশ্বর সশরীরে আসেন না। তিনি মানুষের মারফৎ কাজ করেন। অতএব অন্যদের কষ্ট লাঘব কবার ক্ষমতালাভের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার অর্থ হল, এ-কাজ করার আকাঙ্ক্ষা এবং সে জন্য পরিশ্রম করতে তৎপর থাকা।

এই প্রার্থনা...একান্ত ব্যক্তিগত কিছু নয়। তা নিজের জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধও

নয়। এতে সকলেই আসতে পারে। সমগ্র মানবজাতিই এর অন্তর্ভুক্ত। সেই মহাপ্রার্থনা বাস্তবায়িত হলে মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে।[১০৬]

প্রকৃত ধ্যান হচ্ছে নিজের উপাসনার লক্ষ্য বাদ দিয়ে আর সব কিছুর প্রতি মনের চোখ ও কানকে রুদ্ধ করা। অতএব প্রার্থনার সময়ে মনঃসংযোগের জন্য চোখ বন্ধ করলে ভালো হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের ধারণা স্বভাবতই সীমিত। অতএব যে-আকারে তিনি প্রত্যেকের মনে সাড়া দেন, সেভাবেই প্রত্যেককে তাঁর কথা ভাবতে হবে। এর জন্য অবশ্য ওই ধারণাকে শুদ্ধ ও সমুন্নত হতে হবে।[১০৭]

সত্য প্রার্থনা সে-ই করতে পারে, যে বিশ্বাস করে ঈশ্বর তার অন্তরে বিরাজমান। যার এই দৃঢ়বিশ্বাস নেই, তার প্রার্থনার দরকার নেই। তাতে ঈশ্বর অখুশী হবেন না। যদিও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, প্রার্থনা যে করে না, তার ক্ষতিই হয়।

কেউ ঈশ্বরকে ব্যক্তি হিসেবে পূজা করে, কেউ-বা শক্তি হিসেবে। কী এসে যায় তাতে? নিজস্ব ধারণার আলোকে তারা তো সঠিক পূজাই করছে। কেউ-ই জানে না, হয়তো কখনওই জানবে না যে, প্রার্থনার চূড়ান্ত সঠিক পদ্ধতিটি কী। যা আদর্শ, তাকে সবসময়ই আদর্শ হিসেবে থাকতে হবে। শুধু স্মরণে রাখতে হবে যে সকল শক্তির মধ্যে ঈশ্বরই প্রধান। অন্য সব শক্তিই বস্তুনির্ভর। ঈশ্বরই হলেন সেই প্রধানশক্তি বা আত্মা, যা সর্বগামী, সর্বস্পর্শী। অতএব তা মানুষের আয়ত্তাতীত।[১০৮]

মৌনতার উপকারিতা

এটা আমাব বার বাব মনে হয়েছে, সত্যসন্ধানীকে নির্বাক হতে হবে। নীরবতার অসামান্য ফলপ্রসূতা আমি জানি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে একটি ট্র্যাপিস্ট মঠে আমি গিয়েছিলাম। জায়গাটি বড়ই মনোবম। ওখানকাব অধিকাংশ মানুষই মৌন থাকার শপথ নিয়েছিলেন। মঠের অধ্যক্ষকে এর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন যে, ব্যাপারটা সহজ,—“আমরা দুর্বল মানুষ। প্রায়শই কি বলি তা জানি না। আমাদের মধ্যে যে অতিক্ষীণ কণ্ঠটি নিরন্তর কথা বলছে, তার কণ্ঠস্বর যদি শুনতে হয়, তাহলে নিজেরা সারাক্ষণ কথা বললে সেটি শোনা যাবে না।” মূল্যবান শিক্ষাটি আমার বোধগম্য হল। মৌনতার গোপন রহস্য আমি জানি।[১০৯]

অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিখেছি যে, সত্যের উপাসকের আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার এক অঙ্গ হল মৌনতা রক্ষা। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, অত্যুক্তি করার প্রবণতা, সত্যকে চাপা দেওয়া বা তাতে রঙ চড়ানো মানুষের সহজাত দুর্বলতা। এবং এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য মৌন থাকা প্রয়োজন। স্বল্পভাষী ব্যক্তি কদাচিৎ কথার মধ্যে চিন্তাহীনতা প্রকাশ করে। প্রতিটি শব্দ সে ওজন ক'রে ব্যবহার করে।[১১০]

সেলাই করা ঠোঁটের মৌনতা কোনও মৌনতাই নয়। কেউ নিজের জিভ কেটে ফেললেও তার একই পরিণাম হবে, কিন্তু সেটাও মৌনতা নয়। সে-ই মৌন, বাক্‌শক্তি থাকলেও যে অযথা কোনও কথা বলে না।[১১১]

মৌনতা এখন আমার কাছে যুগপৎ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তায় পর্যবসিত

হয়েছে। প্রথমে এর লক্ষ্য ছিল চাপ লাঘব করা। এর পর, লেখার জন্য সময়ের চাহিদা মেটাতে এর দরকার পড়ল। আরও কিছুদিন অভ্যাস করার পর বুঝলাম এর আধ্যাত্মিক মূল্য। সহসা আমার মনে হল যে মৌনী থাকার সময়ই আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করি। এখন আমার মনে হয় নৈঃশব্দ্যের প্রয়োজনেই বুঝি আমি স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠেছিলাম।[১১২]

ঈশ্বরকে স্মরণ করার ও হৃদয়ের শুদ্ধি অর্জনের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। মৌনতা রক্ষা করার সময়েও প্রার্থনা করা যায়।[১১৩]

আমি বিশ্বাস করি, যে কোনও দৃশ্যমান আচারের চেয়ে নির্বাক প্রার্থনা মহত্তর (শক্তি)। অসহায় অবস্থায় আমি এই বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করে চলি যে শুদ্ধ হৃদয়ের প্রার্থনা কখনও অনুত্তরিত থাকে না।[১১৪]

প্রার্থনার শক্তি

ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দিয়ে বলতে পারি, মানুষের হাতে ভীরুতা ও সর্ববিধ পুরনো কুঅভ্যাস জয় করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়, আন্তরিক প্রার্থনা।[১১৫]

যতক্ষণ না আমরা নিজেদের অনস্তিত্বে পর্যবসিত করতে পারব, ততক্ষণ আমাদের ভিতরের পাপকে জয় কবতে পারব না। আমাদের বাঞ্ছিত সেই প্রকৃত মুক্তিলাভের যে দাম চান ঈশ্বর তা নিঃশেষে আত্মসমর্পণ, এর কম কিছু নয়। এ-ভাবে মানুষ যখন নিজেকে অহং-শূন্য করে ফেলে, তখনই সে দেখে সপ্রাণ সব কিছুর সেবায় সে নিয়োজিত। এতেই তার আনন্দ ও বিনোদন। তখন সে এক নতুন মানুষ, যে ঈশ্বরের সৃষ্টির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে সতত ক্লান্তিহীন।[১১৬]

মানুষের অন্তরে অন্ধকার ও আলোর শক্তির এক চিরন্তন লড়াই চলেছে। নির্ভর করার জন্য প্রার্থনার শেষ আশ্রয় যার নেই, তাকে অন্ধকারের শক্তিই গ্রাস করে নেবে। যে প্রার্থনা করে, সে অন্তরে ও বহির্বিশ্বে শান্তি খুঁজে পাবে। অন্যদিকে প্রার্থনারত অন্তর ছাড়া যে বিশ্বের কর্মকাণ্ডে বিচরণ করে, সে দুর্দশাগ্রস্ত হবে, বিশ্বকে আরও দুঃখে ফেলবে.....

আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিলাভের একমাত্র উপায় হল প্রার্থনা ...এই সার বিষয়টিতে মনোনিবেশ করো বাকি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। বর্গক্ষেত্রের একটি কোণকে সংশোধন করো, অন্য কোণগুলি আপনা হতেই শুধরে যাবে।[১১৭]

প্রার্থনা কোনও বৃদ্ধার অলস বিনোদন নয়। সঠিক প্রয়োগ করলে প্রার্থনা কর্মোদ্যোগের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।[১১৮]

মন যখন আদ্যন্ত তাঁর প্রেরণায় পরিপূর্ণ, তখন সেখানে কোনও কুচিন্তা বা অন্যের প্রতি ঘৃণা থাকতে পারে না,—অন্যদিকে শত্রুও পরিহার করে শত্রুতা, রূপান্তরিত হয় বন্ধুতে। শত্রুদের বন্ধুতে পরিণত করতে আমি সক্ষম হয়েছি, এ দাবি আমি করছি না। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখেছি, মন যখন তাঁর শান্তিতে পূর্ণ তখন সকল বিদ্বেষের অবসান ঘটে। আদিকাল থেকে বিশ্বের আচার্যদের এক অবিচ্ছিন্ন

পরম্পরা এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এতে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। জানি এ-সবই ঈশ্বরের কৃপা।[১১৯]

দুষ্ট হৃদয় যার, সে কখনও ঈশ্বরের সর্বকলুষহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে না।[১২০]

ঈশ্বর তাঁর আপন পদ্ধতিতে প্রার্থনার উত্তর দেন। আমাদের পদ্ধতিতে নয়। মর্ত্যমানবের থেকে তাঁর পদ্ধতি ভিন্ন। তাই সেগুলি দুর্জ্ঞেয়। বিশ্বাস হল প্রার্থনার প্রাকশর্ত। কোনও প্রার্থনাই বিফল হয় না। প্রার্থনা অন্য যে-কোনও কাজের মত। প্রার্থনা ফল দেয়, সে আমরা দেখতে পাই বা না-পাই। হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত প্রার্থনার ফল তথাকথিত সক্রিয় কাজকর্মের ফলের চেয়ে শক্তিশালী।[১২১]

১৭. আমার হিন্দুধর্ম, আমার একার নয়

সর্বব্যাপী ধর্ম

আমার কাছে হিন্দুধর্ম হল বনস্পতি সদৃশ। এর বিশাল ছত্রছায়ায় সব ধর্মবিশ্বাসই আশ্রয় নেয়।[১২২]

হিন্দুধর্মের প্রতি আমার মনোভাব, স্ত্রীর প্রতি আমার মনোভাবেরই মতো। তার মতো করে পৃথিবীর অন্য কোনও নারীই আমাকে বিচলিত করে না। এমন নয় যে তার কোনও দোষ নেই। বরং আমার চোখ যা ধরা পড়ে তার চেয়ে হয়তো অনেক বেশিই আছে। কিন্তু অবর্ণনেয় এক বন্ধন আমাদের মধ্যে রয়েছে। তার সর্ববিধ অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাসহ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেও আমার মনোভাব অনুরূপ বা তারও বেশি কিছু।[১২৩]

......হিন্দুধর্ম কারও একচেটিয়া ধর্ম নয়। হিন্দুধর্মে বিশ্বের সকল ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানবের আরাধনার স্থান রয়েছে। সাধারণ অর্থে এটা প্রচারভিত্তিক ধর্ম নয়। বহু গোষ্ঠী এর প্রভাবাধীন হয়েছে, কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে বিবর্তনের মাধ্যমে, নিঃশব্দে। হিন্দুধর্ম সকলকেই তার বিশ্বাস ও ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরের উপাসনা করতে বলে। তাই সব ধর্মের সঙ্গেই তার সহাবস্থান শান্তিপূর্ণ।[১২৪]

যে মুহূর্তে আমি খ্রীস্টান বা অন্য কোনও ধর্মের সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব, সেই মুহূর্তে ওই ধর্ম প্রচার করা থেকে বিশ্বের কোনও শক্তিই আমাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। যেখানে ভয়, সেখানে কোনও ধর্ম নেই...বাইবেল বা কোরানের নিজস্ব ব্যাখ্যানুযায়ী আমি যদি নিজেকে একজন খ্রীস্টান বা মুসলমান বলতে পারতাম, তাহলে ওইভাবে নিজের পরিচয় দিতে আমার কোনও দ্বিধা হতো না। সেক্ষেত্রে হিন্দু, খ্রীস্টান, বা মুসলমান সমার্থক শব্দে পরিণত হতো। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের জগতে না আছে হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রীস্টান। তাদের তকমা বা বৃত্তি দিয়ে নয়, তাদের বিচার করা হবে কাজের ভিত্তিতে। আমরা পৃথিবীতে যতদিন বাস করব ততদিন ওই

তকমা থাকবেই। তাই, যতক্ষণ না আমার বিকাশ রুদ্ধ হয়, যেখানে যা কিছু ভালো তা আত্মস্থ করতে বাধা না পাই, ততক্ষণ পূর্বপুরুষদের পরিচয়পত্র বহন করাই শ্রেয় মনে করি।[১২৫]

যখন বলি, আমি সনাতনপন্থী হিন্দু, তখন আমার বন্ধুরা ধন্দে পড়ে যায় আমি জানি। কেননা ওইরকম তকমাধারী মানুষের মধ্যে সচরাচর যা দেখা যায়, সেগুলি আমার মধ্যে তারা খুঁজে পায় না। এর কারণ, গোঁড়া হিন্দু হলেও আমার ধর্মবিশ্বাসে খ্রীস্টান, ইসলামীয় ও জরাথুস্ত্রীয় শিক্ষাকে স্থান দেওয়ার জায়গা আছে। তাই আমার হিন্দুধর্মকে কারো কারো মনে হয় এ একটা পাঁচমিশেলী ব্যাপার। কারো কারো মতে আমি তো বহু-ধর্মাবলম্বী। তা, এ-কথা কারো বিষয়ে বললে তার মানে দাঁড়ায়, কোনও ধর্মেই তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমারটি হল এক উদার বিশ্বাস, যা খ্রীস্টান নয়, এমনকি প্লিমাউথ ব্রাদার, কি সবচেয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানেরও বিরোধী নয়। সম্ভাব্য উদারতম সহিষ্ণুতার ভিত্তির উপর আমার ধর্মবিশ্বাস দাঁড়িয়ে। ধর্মান্ধ ক্রিয়াকলাপের জন্য কারো নিন্দা আমি করি না। তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তার কাজগুলি আমি দেখতে চেষ্টা করি। এই উদার বিশ্বাসই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। অবস্থানটি কিয়দংশে বিড়ম্বনাজনক বলে আমি মানি—তবে সেটা আমার কাছে নয়, অন্যদের কাছে![১২৬]

হিন্দুধর্মের প্রধান ঐশ্বর্য হল, এই ধর্ম সত্যসত্যই বিশ্বাস করে যে, সকল জীবনই (শুধু মানুষ নয়, সকল অনুভূতি ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তাই) আসলে এক। সকল জীবনই এক বিশ্বজনীন উৎস থেকে উৎসারিত—তাকে আল্লা, 'গড' বা পরমেশ্বর, যা-ই বলা হোক না-কেন।[১২৭]

আমার হিন্দুধর্ম সংকীর্ণ নয়। ইসলাম-খ্রীস্ট-বৌদ্ধ-জরাথুস্ত্রীয় ধর্মের মধ্যে যা কিছু আমি ভালো বলে জানি, তা আমার হিন্দুধর্মে আছে........সত্য হচ্ছে আমার ধর্ম এবং অহিংসা হল এর বাস্তবায়নের একমাত্র পথ। তরবারির মতাদর্শকে আমি চিরতরে খারিজ করেছি।[১২৮]

হিন্দুধর্ম ও অহিংসা

অহিংসার বাণীপূর্ণ হিন্দুধর্ম আমার কাছে বিশ্বের মহত্তম ধর্ম, যেমন আমার স্ত্রী আমার কাছে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী নারী। কিন্তু অন্যেরা তাদের নিজধর্ম বিষয়ে একই ধারণা পোষণ করতে পারে।[১২৯]

ভারতীয় সংস্কৃতিতে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও বৃহত্তম অবদান, অহিংসার মতবাদ। অহিংসা গত তিন হাজারেরও বেশিকাল ধরে এই দেশের ইতিহাসকে নিয়ামকভাবে প্রভাবিত করেছে। আজও লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের জীবনে এক জীবন্ত শক্তি হিসেবে রয়েছে অহিংসা। এটি একটি বিকাশমান মতবাদ। এর বাণী এখনও প্রচারিত হচ্ছে। অহিংসা এমনভাবে আমাদের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অনেকে যেমন মনে করেন এটা হয়েছে আমরা দুর্বল জাতি বলে, আসলে

কিন্তু তা নয়। বন্দুকের ঘোড়া টিপে একজনকে গুলিবিদ্ধ করতে যতটা আসুরিক ইচ্ছার দরকার হয়, দৈহিক বলের দবকার ততটা হয় না। এর কারণ হল, অহিংসার ঐতিহ্য ভারতীয় জনগণের গভীরে শিকডবিস্তার কবেছে।[১৩০]

মাতৃসমা 'গীতা'

উত্তম-কর্মসাধনের জন্য 'গীতা' আমাদেব হিংসাশ্রয়ী হবার শিক্ষা দেয়—এ আমি বিশ্বাস করি না। প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তরে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে, 'গীতা' মুখ্যত তারই বর্ণনা, দৈবী বচনাকার এখানে এক ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয় নিয়ে দেখিয়েছেন—নিজের জীবন বিপন্ন করেও স্ব-কর্তব্য সাধন করতে হবে। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলের কথা চিন্তা ক'রো না—এটাই 'গীতা'র শিক্ষা। দেহের খাঁচায় আবদ্ধ আমাদের মতো নশ্বর জীব, নিজেদেব ছাড়া আর কারও কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আলো এবং অন্ধকারের শক্তিব পার্থক্য দেখিয়ে 'গীতা'য় বলা হয়েছে, এদের ধর্ম পরস্পরবিরোধী।[১৩১]

যদিও খ্রীস্টধর্মেব অনেক কিছুরই আমি গুণগ্রাহী, তবু আমি কট্টর খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে একাত্মবোধ কবি না। হিন্দুধর্মকে আমি যে-ভাবে জেনেছি, তাতেই আমাব আত্মার পরিতৃপ্তি, আমার সমগ্র সত্তাব পূর্ণতা, এবং ভাগবদগীতা ও উপনিষদগুলিতে যে সান্ত্বনা আমি পাই, পর্বতশীর্ষেব ধর্মনির্দেশ আমাকে তা দিতে পারে না। এর কারণ কিন্তু এই নয় যে, এখানে যে আদর্শেব কথা বলা হয়েছে, তা আমি মূল্যবান মনে কবি না,—অথবা এমনও নয়, যে পর্বতশীর্ষেব উপদেশের কিছু মূল্যবান শিক্ষা আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু আমাকে স্বীকাব কবতেই হবে, যখনই দ্বিধা আত্মাকে জর্জরিত করে, যখনই হতাশা এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়, যখন দিগন্তে এতটুকু আশার আলোও দেখতে পাইনা আমি, তখনই ভাগবদগীতার শরণ নিই; একটি শ্লোক খুঁজে পাই, যা আমাকে সান্ত্বনা দেয়। তখন সেই সর্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেও আমার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। দুঃখজনক ঘটনা আমার জীবনে বহু ঘটেছে। তা যদি আমার জীবনে দৃশ্যমান কোনও স্থায়ী ছাপ না ফেলে থাকে, তার জন্য আমি ভাগবদগীতার শিক্ষার কাছে ঋণী।[১৩২]

নিজের সম্পর্কে বলতে পারি, যখনই আমি বাধার সম্মুখীন হই, তখনই আমি মাতৃসমা 'গীতা'র কাছে ছুটে যাই। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেননি, এমন ঘটনা কোনওদিন ঘটেনি। আমি যে-ভাবে 'গীতা' পড়ি ও প্রতিদিন তা যেভাবে বুঝি,—তা জানলে 'গীতা' পাঠে যারা আনন্দ পায়, তারা হয়তো আরও বেশি, নতুন কিছুর সন্ধান পাবে।[১৩৩]

আজ 'গীতা' আমার জীবনে শুধু আমার 'কোরান' বা 'বাইবেল' নয়,—তার চেয়েও বেশি, 'গীতা' আমার মা। পৃথিবীতে যে মা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন,—দীর্ঘদিন আগে তাঁকে আমি হারিয়েছি। কিন্তু সেই থেকে এই চিরন্তন মাতা আমার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্থান পূরণ করেছেন। এঁর পরিবর্তন নেই, কোনওদিন ইনি আমাকে হতাশও করেননি। যখনই আমি বিপদে পড়ি, বা দুঃখ পাই, তখনই আমি তাঁর বুকে আশ্রয় নিই।[১৩৪]

বুদ্ধের পথ

আমার সুনির্দিষ্ট মতামত হচ্ছে, বুদ্ধের শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অংশ এখন হিন্দু ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। গৌতম হিন্দু ধর্মে যে মহাসংস্কার এনেছিলেন, হিন্দু ভারতের পক্ষে আজ, ভাটির পথে পেছিয়ে গিয়ে, তার ওপারে চলে যাওয়া অসম্ভব। তাঁর মহান আত্মোৎসর্গ, মহান ত্যাগ, এবং জীবনের অতুলনীর শুদ্ধতার যে অনপনেয় প্রভাব তিনি হিন্দুধর্মে রেখে গেছেন, তাব জন্য হিন্দুধর্ম এই মহান আচার্যের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে.....বৌদ্ধধর্ম বলতে আজকে যা বোঝায়, তা বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষার অত্যাবশ্যক অংশ ছিল না, এই অংশটিকেই হিন্দুধর্ম আত্মস্থ করেনি।

আমার স্থির বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধেব শিক্ষা ভারতেই পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। এ না হয়ে উপায়ও ছিল না, কাবণ গৌতম নিজেই ছিলেন হিন্দুদের মধ্যে সর্বোত্তম হিন্দু। হিন্দুধর্মে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা সবই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বেদের ভিতরে নিহিত কিছু শিক্ষা, যা আগাছায় ঢাকা পড়েছিল, তাকে উদ্ধার করে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বেদের মধ্যে যে স্বর্ণোপম সত্য রয়েছে,—তা শব্দের অরণ্যে, অর্থহীন শব্দবন্ধের নিচে চাপা পড়েছিল। বুদ্ধ তাঁর মহান হিন্দু আত্মা নিয়ে এই অবণ্য কেটে পরিষ্কার করেছিলেন। বেদের কতিপয় শব্দকে তিনি এমন অর্থে সমৃদ্ধ করেছিলেন যা তাঁর প্রজন্মের মানুষের কাছে ছিল নিতান্তই অচেনা। ভারতেই তিনি পেয়েছিলেন সবচেয়ে অনুকূল মৃত্তিকা। বুদ্ধ যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁর অনুগামী হয়েছেন, পাশে ভিড় করেছেন, অহিন্দু নন, হিন্দুরাই, যাঁরা নিজেরাই বৈদিক আইনে সংপৃক্ত ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের হৃদয়ের মতই তাঁর শিক্ষা ছিল সর্বব্যাপী ও সর্বস্পর্শী। তাই সে শিক্ষা তাঁর দেহের বিনাশের পরেও বেঁচে রয়েছে এবং সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। বুদ্ধের অনুগামী বলে বর্ণিত হবার ঝুঁকি নিয়েও আমি বলছি যে, এই সাফল্য হল হিন্দুধর্মের বিজয়। বুদ্ধ কখনওই হিন্দুধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেননি, ববং তিনি এর ভিত্তিকে আরও প্রসারিত করেছেন। হিন্দুধর্মে তিনি এনেছিলেন এক নতুন জীবন ও ব্যাখ্যা। কিন্তু....আমি তোমাদের বলতে চাই যে শ্রীলঙ্কা বা ব্রহ্মদেশ বা চীন বা তিব্বত, কোনওখানেই বুদ্ধের শিক্ষা সমগ্রতায় আত্মস্থ করা সম্ভব হয়নি.....।[১৩৫]

বিশ্বব্যাপী নৈতিক নিয়ন্ত্রণ

বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না—বহুবার আমি এই তর্ক শুনেছি এবং বৌদ্ধধর্মেব মর্মার্থ প্রকাশের জন্য রক্ষিত বহু পুস্তককেও দেখেছি। এ বিষয়ে আমি সসংকোচে বলি, অনুরূপ ধারণা বুদ্ধের শিক্ষার মূল বিষয়টিরই পরিপন্থী....এই ভুল বোঝাবুঝির কারণ হল, তাঁর প্রজন্মে ঈশ্বরের নামে যা করা হতো তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ প্রত্যাখ্যান যথার্থ। যাঁকে ঈশ্বর বলা হয় তিনি বিদ্বেষ দ্বারা চালিত হতে পারেন, নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেন, পৃথিবীর রাজাদের মতই তাঁকে প্রলুব্ধ করা যায়, উৎকোচ দেওয়া যায় এবং বিশেষ কারো প্রতি তাঁর নেকনজর থাকে—এই ধারণাকেই বুদ্ধ অস্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বর নামধারী একজন, নিজের পরিতৃপ্তির জন্য পশুর রক্তপান করতে

চান, যে-পশু তাঁর নিজেরই সৃষ্টি—এই অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বুদ্ধের সমগ্র আত্মা মহৎ ক্রোধে জাগ্রত হয়েছিল। অতএব, বুদ্ধ ঈশ্বরকে তাঁর যথার্থ আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঈশ্বরের শুভ্র সিংহাসন থেকে সেই অন্যায়-দখলকারীকে নিচে নামিয়েছিলেন, সাময়িকভাবে ওই পবিত্র সিংহাসন যে দখল করে রেখেছিল। তিনি এই বিশ্বসংসারে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বের কথা পুনরায় জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, ওই আইনই হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর।

ঈশ্বরের আইন হচ্ছে চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং ঈশ্বরের থেকে তাঁকে আলাদা করা যায় না। তাঁর অমোঘ সম্পূর্ণতার এ-এক অপরিহার্য শর্ত। এই কারণেই ওই বিশাল ভ্রমটি ঘটে যে, বুদ্ধ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে শুধু নৈতিক আইনে বিশ্বাস করতেন। এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিভ্রান্তির জন্যই নির্বাণ নামক মহান শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বিভ্রান্তির উৎপত্তি। নির্বাণ অবশ্যই চূড়ান্ত বিলয় নয়। বুদ্ধের জীবনের মূল ব্যাপারটি আমি যে-ভাবে বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, আমাদের মধ্যে যা কিছু নীচ, যা কিছু ক্রূর, যা কিছু মন্দ ও পচনশীল, নির্বাণ হল সেই সব কিছুর আমূল বিনাশ। নির্বাণের অর্থ কবরের কালো, প্রাণহীন শান্তি নয়, বরং প্রাণময় শান্তি, সচেতন আত্মার প্রাণিত সুখ,—যা চিরন্তনের হৃদয়ে নিজ স্থান খুঁজে পেয়েছে বলে সচেতন....

সবিনয়ে বলতে চাই, ঈশ্বরকে তাঁর চিরন্তন আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে বুদ্ধ মানবজগতে মহান অবদান রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর মহত্তর অবদান হল, নগণ্যতম সকল প্রাণের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা।[১৩৬]

পশ্চিমের খ্রীস্টধর্ম

আজকের ইউরোপ ঈশ্বর বা খ্রীস্টধর্মের প্রতিভূ নয়, বরং শয়তানের আত্মার বাহক, এ-আমার দৃঢ় অভিমত। শয়তানের সাফল্য তখনই সবচেয়ে বেশি হয়, যখন সে ঈশ্বরের নাম মুখে নিয়ে আসে। ইউরোপ আজ নামেই খ্রীস্টান। বাস্তবে সে হল কুবেরের পূজারী। "সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের নিষ্ক্রমণ, ধনীর পক্ষে স্বর্গে প্রবেশের চেয়ে সহজ।" এ কথা বলেছিলেন যীশু খ্রীস্ট। তাঁর তথাকথিত অনুগামীরা এখন বৈষয়িক সম্পত্তি দিয়ে নৈতিক অগ্রগতি মাপতে ব্যস্ত ।[১৩৭]

পশ্চিম সম্পর্কে এই ভাষাটি বড়ই অদ্ভুত শোনাবে: যদিও সে খ্রীস্টধর্মের কথা বলে, কিন্তু সেখানে না আছে খ্রীস্ট, না খ্রীস্টধর্ম, নতুবা সেখানে যুদ্ধ ঘটতে পারত না। এইভাবেই আমি যীশুর বাণী উপলব্ধি করেছি।[১৩৮]

পশ্চিমে গিয়ে খ্রীস্টধর্ম বিকৃত হয়ে পড়েছে। এ-কথা বলতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।[১৩৯]

আমি আমার খ্রীস্টান ভাইদের বলি....পশ্চিমে তাদের খ্রীস্টধর্মের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তা যেন তারা গ্রহণ না করে। এখন সেখানে তারা এমনভাবে একে-অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, যা আগে কখনও হয়নি। সর্বোপরি, যীশু ছিলেন এশীয়, যিনি আরবদের লম্বা জোব্বা পরতেন। তিনি ছিলেন নম্রতার প্রতিমূর্তি। আমি আশা করি, ভারতের খ্রীস্টানরা, বাইবেলের ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে তাদের মধ্যে মূর্ত করে তুলবে, পশ্চিমী-ব্যাখ্যার

যীশুকে নয়—যাঁর হাত রক্তে রঞ্জিত। পশ্চিমের সমালোচনা করার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। পশ্চিমের অনেক গুণের কথা আমি জানি, আমি তার মূল্য দিই। তবু আমি বলতে বাধ্য যে এশিয়ার যীশুকে পশ্চিমে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়। অবশ্য কয়েকজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ-কথা খাটে না।[১৪০]

খ্রীস্টধর্মের পরোক্ষ প্রভাবে হিন্দুধর্ম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে....কিন্তু সাধারণভাবে ভারতের ওপরে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব বিচার করতে হবে আমাদের মধ্যে সাধারণ খ্রীস্টানেব জীবনধারণ ও আমাদের ওপরে তার প্রভাব দেখে। এ-বিষয়ে নিজস্ব মত আমি সখেদে জানাচ্ছি: এর ফল হয়েছে মারাত্মক।[১৪১]

যীশু খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব

যীশু, যিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁর সম্পর্কে কোনওদিন আমি আগ্রহী ছিলাম না। কেউ যদি প্রমাণ করে, যীশু নামে কেউ কোনওদিন ছিলেন না, এবং সুসমাচারে যা বলা হয়েছে তা নিছক লেখকের কল্পনাপ্রসূত—তাহলে আমার এসে যায় না কিছু। পর্বতে প্রদত্ত উপদেশাবলী তখনও আমার কাছে সত্য বলেই প্রতিভাত হবে।[১৪২]

যীশুকে এককভাবে দেবত্বে মণ্ডিত করতে পাবি না আমি। কৃষ্ণ বা রাম বা মহম্মদ বা জরাথুস্ত্রের মতই তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত। একই ভাবে, 'বাইবেলে'র প্রতিটি শব্দই ঈশ্বরের প্রেরণাজাত বলে মনে করি না, 'বেদ' বা 'কোবানে'ব প্রতিটি শব্দও অনুরূপ প্রেরণাজাত বলে ভাবি না। সবকটি গ্রন্থ একত্রে ধরলে, তা অবশ্যই অনুপ্রাণিত, কিন্তু বহু অংশকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এই প্রেরণাব অভাব বোধ কবি। 'গীতা' বা 'কোরানে'র মতো 'বাইবেল'ও আমার কাছে একটি ধর্মগ্রন্থ।[১৪৩]

যদিও সংকীর্ণ অর্থে আমি নিজেকে খ্রীস্টান বলে দাবি করতে পারি না, তথাপি আমার জাগতিক ও ব্যক্তিগত,—সর্ববিধ ক্রিয়াকর্মে অহিংসায় অবিনাশী আস্থার একটি উপাদান হচ্ছে যীশুর কষ্টস্বীকারের উদাহরণ।[১৪৪]

খ্রীস্ট আমার কাছে কী

যীশু আমার কাছে কী? আমার কাছে তিনি মানবজাতির অন্যতম মহান শিক্ষক। তাঁর অনুগামীদের কাছে তিনি ঈশ্বরের একমাত্র জন্মদত্ত পুত্র। এই বিশ্বাস মানা বা না-মানার ওপর কি আমার জীবনে যীশুর প্রভাব কিছুমাত্র বাড়ে বা কমে? এর জন্য কি তাঁর শিক্ষা ও মতবাদের মাহাত্ম্য আমার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? আমি তা মানতে পারি না।[১৪৫]

আমার কাছে ('জন্মদত্ত' কথাটির) অর্থ হল, আধ্যাত্মিক জন্ম। আমার ব্যাখ্যায়, অন্যভাবে বললে,—যীশুর নিজের জীবনের মধ্যেই তাঁর ঈশ্বরনৈকট্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। দেখা যাবে, তাঁর মতো ক'রে কেউ-ই ঈশ্বরের আত্মা ও ইচ্ছাকে প্রকাশিত করেননি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁকে আমি দেখি এবং ঈশ্বরের পুত্র বলে চিনতে পারি।[১৪৬]

আমি মনে করি, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের গুণাগুণ বিচার করা অসম্ভব। তার কোনও

প্রয়োজনও নেই। আর এটা ক্ষতিকরও বটে। আমার মতে, এর প্রত্যেকটির মধ্যেই এক অভিন্ন অনুপ্রেরণাদায়ী শক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেটি হল, মানবজীবনকে উন্নীত ও লক্ষ্যাভিমুখী করা। যা বললাম, সেই বিশিষ্টতা ও মহত্ত্ব যীশুর জীবনে রয়েছে বলে তিনি শুধু খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের নন সমগ্র জগত, সকল জাতি ও মানুষের। কোন ধ্বজা, নাম বা মতাদর্শের অধীনে তারা কাজ করছে, কী তাদের ধর্মবিশ্বাস, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কোন ঈশ্বরকে তারা উত্তরাধিকার হিসেবে পূজা করে—তাতে কিছু এসে যায় না।[১৪৭]

ভারতে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের শেষ নেই। কিন্তু গভীরে রয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মের প্রবৃত্তি।[১৪৮]

মহম্মদ যদি আজ ভারতে আসতেন, তাহলে তিনি তাঁর বহু তথাকথিত অনুগামীকে বাতিল করে দিয়ে আমাকেই প্রকৃত মুসলিম ব'লে চিহ্নিত করতেন। যীশু করতেন প্রকৃত খ্রীস্টান ব'লে।[১৪৯]

"আমরা কী ভাবে মানুষকে ঈশ্বরবিশ্বাসে বা যীশু কিংবা মহম্মদের শিক্ষার কাছে নিয়ে আসব?" যীশু তাঁর জনৈক অনুগামীকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা-ই আমি বলি,—"মুখে 'প্রভু, প্রভু' না করে স্বর্গে যে পিতা আছেন, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করো।" এই কথা তুমি, আমি সকলের পক্ষেই সত্য। জীবন্ত ঈশ্বরে যদি আমাদের আস্থা থাকে তাহলে সর্বমঙ্গল। এই বিশ্বাস যেন আমার আমৃত্যু থাকে। আমার অসংখ্য দুর্বলতা, খামতি সম্বন্ধে আমি সচেতন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদিন আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।[১৫০]

তা যদি না হতো, তাহলে, একটি নারীকে যা করতে বলেছিলাম, আমি নিজে তা-ই করতাম। শ্লীলতাহানির আশঙ্কায় বিপন্ন মেয়েটির কাছে না ছিল সহায়তার আশ্বাস না, পালাবার পথ। তাকে বলেছিলাম আত্মঘাতী হও।[১৫১]

ইসলাম এক শান্তির ধর্ম

খ্রীস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মতোই ইসলামকেও আমি শান্তির ধর্ম বলেই মনে করি। অবশ্যই এদের মধ্যে এ-ব্যাপারে মাত্রার তফাৎ আছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মেরই লক্ষ্য হল শান্তি।[১৫২]

ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের সুনির্দিষ্ট অবদান হল, একেশ্বরে তার ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং এই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মানবভ্রাতৃত্বের সত্যের বাস্তব প্রয়োগ। এই দুটিকেই আমি সুনির্দিষ্ট অবদান বলে মনে করি। এদিকে হিন্দুধর্মে ভ্রাতৃত্বের বোধটি বড় বেশি দর্শনে আকীর্ণ হয়ে উঠেছে। একইভাবে, যদিও হিন্দুধর্মের দর্শনে ঈশ্বর ছাড়া কোনও ভগবান নেই, তবুও এটা অস্বীকার করা যায় না যে এ ব্যাপারে ব্যবহারিক হিন্দুধর্ম ইসলামের মতো এত দৃঢ় আপসহীন নয়।[১৫৩]

বলপ্রয়োগ

ধর্মান্তরের জন্য বলপ্রয়োগের কোনও অনুমোদন 'কোরানে' নেই। পবিত্র পুস্তকে স্পষ্টতর ভাষায় বলা হয়েছে যে "ধর্মে জোরজুলুম চলে না।" নবীর সারা জীবনই ধর্মে জোরাজোরির বিরুদ্ধে নিয়োজিত। আমার জ্ঞানত, কোনও মুসলমানই জোরাজোরি সমর্থন করেননি। প্রচারের জন্য যদি বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভর করতে হতো, তাহলে ইসলাম একটি বিশ্বধর্ম হতে পারত না।[১৫৪]

আমি এই মর্মে আমার মত ব্যক্ত করেছি যে, ইসলামের অনুগামীরা বড় সহজে তরবারি ব্যবহার করে। এ কিন্তু 'কোরানে'র শিক্ষার জন্য নয়। আমাব মতে এর জন্য দায়ী, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ইসলামেব জন্ম, সেটি। খ্রীস্টধর্মের ক্ষেত্রেও এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাস রয়েছে, তার জন্য যীশু দায়ী নন। যে পরিবেশে খ্রীস্টধর্ম প্রসার লাভ করেছিল, তা এর মহৎ শিক্ষায় সাড়া দেবার যোগ্য ছিল না।[১৫৫]

'কোরান'

একাধিকবার আমি 'কোবান' পড়েছি। আমার ধর্মের সহায়তায় আমি বিশ্বের অন্য সব ধর্মের মধ্যে যা-কিছু ভালো, তা আয়ত্ত করতে পারি।[১৫৬]

আমি ইসলামকে এক প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম বলে গণ্য করি, তাই, 'কোবান' আমার কাছে এক ঈশ্বর-আদিষ্ট ধর্মগ্রন্থ এবং মহম্মদ একজন পয়গম্বর।[১৫৭]

আমার সিদ্ধান্ত, 'কোরানে'র শিক্ষা মূলত অহিংসার পক্ষে। 'কোরানে' বলা হয়েছে, হিংসার চেয়ে অহিংসা শ্রেয়তর। অহিংসাকে নির্দেশ করা হয়েছে কর্তব্য বলে; আব, যেখানে আবশ্যক, সেখানে হিংসা অনুমোদিত।[১৫৮]

১৮. ধর্ম ও রাজনীতি

জীবন এক অখণ্ড সমগ্র

মানব-মন বা মানব-সমাজ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এই ভিন্ন ভিন্ন নামে সংযোগহীন কতকগুলি কক্ষে বিভক্ত, আমি তা মনে করি না।[১৫৯]

যেহেতু মানুষের জীবন একটি অবিভাজিত সমগ্র, তাই তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না, নৈতিকতা ও রাজনীতির মধ্যেও নয়। লোক ঠকিয়ে যে ব্যবসায়ী বিত্তশালী হয় সে নিজেকেই এই ভেবে ঠকাতে সমর্থ হয় যে অসাধু পথে অর্জিত সম্পদের কিয়দংশ তথাকথিত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেই তার সব পাপ ধুয়ে যাবে। কারো প্রাত্যহিক জীবন কখনওই তার আধ্যাত্মিক সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। একে অপরের ওপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটায়।[১৬০]

আমার মধ্যে যে রাজনীতিক রয়েছে সে আমার একটি সিদ্ধান্তও প্রভাবান্বিত করেনি এবং এই যে আমি রাজনীতি করছি, তার কারণ রাজনীতি আজ আমাদের সকলকে সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। যত চেষ্টাই করা হোক-না-কেন, এর থেকে মুক্তি নেই। ১৮৯৪ সাল থেকে সচেতনভাবে ঐ সর্পের সঙ্গে যেভাবে আমি যুদ্ধ করে আসছি সেটাই করতে চাই। এর আগে মতামত তৈবি হওয়া থেকেই এই যুদ্ধ ছিল অচেতন। চারপাশে গর্জমান ঝড়ের মধ্যে স্বার্থপরেব মতো আমি শান্তিতে থাকতে চাই বলে নিজেকে এবং আমাব বন্ধুদেব নিয়ে বাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছি।[১৬১]

বিশ্বজনীন ও সর্বত্রগামী সত্যেব আত্মাকে মুখোমুখি দেখতে হলে নিজের মতো করেই ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিকেও ভালবাসতে হবে। এবং যে এটা করতে চায় সে জীবনের কোনও ক্ষেত্র থেকেই সরে থাকতে পারে না। এই কাবণেই সত্যেব প্রতি আনুগত্য আমাকে রাজনীতিব ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে এবং বিনা দ্বিধায় ও সবিনয়ে আমি বলতে পারি, যারা বলে ধর্মেব সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই তাবা ধর্ম বলতে কি বোঝায় তা জানে না।[১৬২]

সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ না করলে আমি ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারতাম না, এবং রাজনীতিতে অংশ না নিলে এটা সম্ভব হতো না। মানুষের কর্মতৎপরতার সকল ব্যাপাবই আজ অবিভাজ্য এক সমগ্র। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিশুদ্ধ ধর্মীয় কাজকে আজ ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কবিহীন করে রাখা সম্ভব নয়। আমি মানবিক কর্মকাণ্ড ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে পবিচিত নই। এটাই অন্যান্য সর্ববিধ কাজেব নৈতিক ভিত্তি গঠন কবে। এটা না থাকলে জীবন ক্ষুদ্রতব হয়ে "শব্দ ও ক্রোধে গড়ে ওঠা নেতিব" ধাঁধায় পরিণত হবে।[১৬৩]

রাজনীতি ছাড়া আমি এমনকি সামাজিক কাজও করতে পাবব না দেখে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি মনে কবি সামাজিক ও চারিত্রিক প্রগতির নিরিখে রাজনৈতিক কাজকে দেখা উচিত। গণতন্ত্রে জীবনের কোনও কিছুই রাজনীতির স্পর্শমুক্ত হতে পারে না।[১৬৪]

আমার কাছে ধর্মমুক্ত বাজনীতি নিছক জঞ্জাল এবং বর্জনীয়। বাজনীতি জাতিসমূহের সঙ্গে জড়িত, এবং যা কিছু জাতিসমূহেব মঙ্গলের সঙ্গে জড়িত, তা যদি কারও চিন্তার বিষয় হয় তাহলে তাকে ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন বা অন্যভাবে বললে, ঈশ্বর ও সত্যসন্ধানী হতে হবে। আমার কাছে ঈশ্বর ও সত্য বিনিময়যোগ্য শব্দ এবং কেউ যদি আমাকে বলে ঈশ্বব হচ্ছে মিথ্যা বা অত্যাচারের ভগবান তাহলে আমি তাঁর উপাসনা করব না। অতএব রাজনীতিতেও আমাদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা কবতে হবে।[১৬৫]

আমার জীবনের গভীরতম বিষয়গুলি থেকে রাজনীতিকে আমি বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। এর সহজ কারণ হল আমার রাজনীতি দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তা অঙ্গাঙ্গীভাবে অহিংসা ও সত্যের সঙ্গে জড়িত।[১৬৬]

ধর্ম ছাড়া একটি মুহূর্তও আমি বাঁচতে পারব না। আমার অনেক রাজনৈতিক বন্ধু আমার সম্বন্ধে হতাশ। কারণ তারা বলে যে, আমার রাজনীতির উৎপত্তিও ধর্ম থেকে।

ওরা ঠিকই বলে। আমার রাজনীতি ও সর্ববিধ ক্রিয়াকাণ্ডের উৎসে রয়েছে ধর্ম।

আমি আরও একটু এগিয়ে বলতে চাই, যে-কোনও ধার্মিক মানুষের সব কাজেরই উৎস হওয়া উচিত তার ধর্ম। কারণ ধর্মের অর্থ হল ঈশ্বরবন্ধন, অর্থাৎ তোমার প্রতিটি নিশ্বাসই ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত।[১৬৭]

প্রকৃতই, আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড ধর্মসংপৃক্ত হওয়া উচিত। এখানে ধর্ম কিন্তু সংকীর্ণতা নয়। এর অর্থ হল বিশ্বসংসারে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বিন্যাসে আস্থা। দৃশ্যমান নয় বলে তা আদৌ অবাস্তব নয়। এই ধর্ম হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মকে ছাপিয়ে ওঠে। এদের কিন্তু স্থানচ্যুত করে না। বরং এদেব সুসমঞ্জস করে তুলে বাস্তবতা দেয়।[১৬৮]

লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনই আমার রাজনীতি এবং আমার জীবন-কর্ম ও ঈশ্বরকে অস্বীকার না করলে এর থেকে নিজেকে মুক্ত করার সাহস আমার হবে না। (১৯৪৭ এব ১৫ আগস্টের পরে ভাবত যখন স্বাধীন হবে তখন) আমার রাজনীতি অন্যদিকে মোড় নিলেও নিতে পারে। কিন্তু সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর।[১৬৯]

নিঃসন্দেহে এক অর্থে আমার এই বক্তব্য সত্য যে, আমি আমার ধর্মকে আমার দেশের চেয়ে প্রিয় বলে মনে কবি। অতএব আমি প্রথমে হিন্দু ও পবে জাতীয়তাবাদী, এর ফলে কিন্তু আমি সেরা জাতীয়তাবাদীদের থেকে ছোট হয়ে যাই না। আমি সরলভাবে এটাই বোঝাতে চাই যে, আমাব ধর্ম ও আমার দেশের স্বার্থ অভিন্ন। একইভাবে যখন আমি বলি যে, সবকিছু, এমনকি ভাবতের মুক্তির চেয়েও নিজের মুক্তি আমার কাছে শ্রেয়, তখন এর অর্থ এই দাঁড়ায় না যে আমার ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য ভারতের রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মুক্তিকে বিসর্জন দিতে হবে। এর অর্থ হল, উভয়েই একসঙ্গে চলতে পারে।[১৭০]

ধর্ম জাতীযতাব পরীক্ষা নয়। ধর্ম হল মানুষ ও তার ঈশ্বরের নিজস্ব ব্যাপার। জাতীয়তাব নিরিখে তারা প্রথমে যেমন ভারতীয় শেষেও তেমনই, ধর্ম তাদের যা-ই হোক-না-কেন।[১৭১]

১৯. মন্দির ও মূর্তিপূজা

মূর্তিপূজার চরিত্র

মূর্তি পূজায় আমি অবিশ্বাসী নই। কোনও মূর্তি আমার মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ জাগায় না। কিন্তু আমি মনে করি যে মূর্তিপূজা মানুষের স্বভাবগত। আমরা প্রতীক খুঁজে বেড়াই। অন্য জায়গায় না গিয়ে কোনও গীর্জায় গেলে কেন একজন বেশি শান্ত হয়ে উঠবে? মূর্তি, পূজার সাহায্য করে। কোনও হিন্দুই মূর্তিকে ঈশ্বর বলে মনে করে না। মূর্তিপূজাকে আমি পাপ বলে মনে করি না।[১৭২]

আক্ষরিক অর্থে, আমি একই সঙ্গে মূর্তিপূজারী ও মূর্তিপূজা-বিরোধী। মূর্তিপূজার পিছনে যে মানসিকতা তাকে আমি মূল্য দিই। মানবজাতিকে উন্নীত করায় এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ....আবার যখন দেখি, এই পূজা ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হয়ে নিজের দেবতা ভিন্ন অনা দেবদেবীর আরাধনায় কোনও গুণ খুঁজে পায় না—তখন আমি মূর্তিপূজার বিরোধী

হয়ে উঠি। এই ধরনের প্রতিমাপূজায় একটা সূক্ষ্ম চাতুরি, একটা ছলনা জড়িয়ে থাকে বলে তা অনেক বেশি মারাত্মক। কিন্তু স্থূল এক খণ্ড পাথর বা একটি সোনার মূর্তিকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করার মধ্যে সেই চাতুরি বা ছলনা থাকে না।[১৭৩]

আমি একই সঙ্গে মূর্তিপূজার সমর্থক ও বিরোধী। মূর্তিপূজা যখন পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয় এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও ধারণার নিচে চাপা পড়ে তখন একটি জঘন্য সামাজিক পাপ হিসাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই-এর দরকার হয়। অন্যদিকে, নিজের আদর্শকে মূর্তরূপ দেওয়াব ব্যাপারে মূর্তিপূজা মানবস্বভাবজাত এবং ভক্তিমার্গের সহায়ক বলে মূল্যবান। যখন কোনও গ্রন্থকে পূতপবিত্র মনে ক'রে আমরা তার পূজা করি তখন মূর্তিপূজাই করা হয়। পবিত্রতা ও ভক্তির ভাব নিয়ে যখন আমরা মন্দির বা মসজিদে যাই তখন আমরা মূর্তিরই পূজা করি। এব মধ্যে ক্ষতিকারক কিছু আমি দেখি না। অপবপক্ষে, সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত বোধশক্তির অধিকাবী হিসেবে মানুষের পক্ষে অন্য কিছু করা প্রায়ই অসম্ভব। বৃক্ষপূজার মধ্যে কোনও পাপ বা ক্ষতিকারক কিছু তো আমি দেখিইনা বরং এই পূজার মনোভাবে গভীব আবেগ ও কাবিাক সৌন্দর্যেব সন্ধান পাই। এর মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ জগতের প্রতি সত্যকার প্রতীকী শ্রদ্ধাই মূর্ত হয়ে ওঠে, যে জগৎ সুন্দর আকৃতি ও আকারের অসংখ্যরূপে যেন লক্ষ লক্ষ মুখে ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যেব গুণগান করে চলেছে....[১৭৪]

বৃক্ষের সামনে মানত ও প্রার্থনা ভিন্ন ব্যাপার। গীর্জা, মসজিদ, মন্দির বা গাছের ও পূজাস্থানেব নিকটে নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থের মানত ও প্রার্থনাব ব্যাপারটিকে উৎসাহিত কবা উচিত নয়। স্বার্থপব অনুবোধ বা মানত করা মূর্তিপূজার সঙ্গে কার্যকাবণ সম্পর্কযুক্ত নয়। মূর্তিই হোক বা অদৃশ্য ঈশ্বরই হোন—কারও কাছেই ব্যক্তিগত স্বার্থবাহী প্রার্থনা জানানো অন্যায়।

অবশ্য এব থেকে কেউ যেন মনে না-করে বসে যে, সাধারণভাবে আমি বৃক্ষপূজার প্রবক্তা। বৃক্ষপূজার পক্ষাবলম্বন আমি এই জন্যে করছি না যে আমি মনে কবি এই কাজ ভক্তিনিবেদনের সহাযক, আমি শুধু বলছি যে এই মহাবিশ্বে ঈশ্বর নিজেকে অসংখ্যরূপে প্রকাশ করেছেন এবং এর প্রতিটি রূপ দেখলেই আমার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা জাগরিত হয়।[১৭৫]

মূর্তিপূজাব বিষয়ে এইটুকু বলতে বাধা নেই যে, কোনও-না-কোনওভাবে এছাড়া আমাদের চলবে না। যাকে সে ঈশ্বরের গৃহ বলে, সেই মসজিদ রক্ষা করতে কোনও মুসলমান প্রাণ দেয় কেন? কেন একজন খ্রীস্টান গীর্জায় যায় এবং শপথ নেওয়ার প্রয়োজন হলে 'বাইবেল' ছুঁয়ে শপথ নেয়? আমি এর বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো দেখি না। মসজিদে ও সমাধিক্ষেত্র নির্মাণের জন্য প্রভূত সম্পদ দানের ব্যাপারটি পৌত্তলিকতা নয় তো কী? পাথরে নির্মিত বা কাপড়ে বা কাঁচের গায়ে আঁকা কুমারী মেরী ও সন্তদের কল্পিত প্রতিকৃতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে রোমান ক্যাথলিকরাই বা কী করে? যাই হোক, আমরা পাথর পূজা করি না। পাথর বা ধাতুর তৈরি মূর্তির মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে পূজা করি তা সে যত বেঢপ চেহারারই হোক-না-কেন।[১৭৬]

পূজার স্থান

মন্দিরের অস্তিত্ব আমার কাছে পাপ বা কুসংস্কার বলে মনে হয় না। মিলিত উপাসনা ও বারোয়ারী পূজাক্ষেত্র মানুষের প্রয়োজন। এই মন্দিরের মধ্যে মূর্তি থাকবে কি থাকবে না সেটা স্বভাব ও রুচির প্রশ্ন। আমি মনে করি না যে মূর্তি সম্বলিত কোনও হিন্দু বা রোমান ক্যাথলিক উপাসনালয়মাত্রেই মন্দ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং মূর্তি নেই বলেই কোনও মসজিদ বা প্রোটেস্টান্ট উপাসনালয় ভালো ও কুসংস্কারমুক্ত। ক্রুশ এর মতো একটি প্রতীক বা একটি গ্রন্থ সহজেই পৌত্তলিকতার ও তৎসহ কুসংস্কারের বস্তু হয়ে উঠতে পারে। আবার বালকৃষ্ণ বা কুমারী মেরীর মূর্তিপূজা হতে পারে মহীয়ান ও সর্ব কুসংস্কারমুক্ত। সবকিছুই নির্ভর করে উপাসকের হৃদয়ের তারতম্যের ওপর।[১৭৭]

পূজাস্থানগুলি আমার কাছে নিছক ইট-সুরকির গাঁথনি নয়। এগুলি হল বাস্তবতার ছায়া। প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গীর্জা, মসজিদ ও মন্দিরের জায়গায় আবার নতুন করে সব গড়ে উঠেছে।[১৭৮]

মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, সিনাগগ বা আগিয়াবি ইত্যাদি নানা নামে বর্ণিত ঈশ্বরের গৃহ ব্যতিরেকে কোনও ধর্ম বা ধর্মগোষ্ঠী কাজ করেছে বা করছে বলে আমার জানা নেই। এটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যীশুসহ কোনও মহান সংস্কারকই উপাসনালয় ধ্বংস বা খারিজ করেছিলেন বলে শোনা যায়নি। এঁদের সকলেই উপাসনালয় থেকে শুরু করে বৃহত্তর সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্বাসিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন....বহু বছর হল মন্দিরে যাওয়া আমি বন্ধ করেছি কিন্তু তার জন্য আমি মানুষ হিসেবে আগের চেয়ে ভালো হয়েছি বলে মনে করি না। যতদিন যাওয়ার মতো অবস্থা তাঁর ছিল ততদিন আমার মা নিয়মিত মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করেননি। সম্ভবত তাঁর বিশ্বাস আমার চেয়ে অনেক গভীর ছিল, যদিও আমি মন্দিরে যাই না।[১৭৯]

মন্দির বা মসজিদ বা গীর্জা....ঈশ্বরের নিবাস হিসেবে এদের মধ্যে কোনও পার্থক্য আমি করি না। ধর্মবিশ্বাসই তাদের ওই ভাবে গড়েছে। এগুলি হল অ-দৃশ্য যিনি, তাঁর কাছে পৌঁছনোর জন্য তৃষাতুর মানুষের আর্তি।[১৮০]

(নিজের ভিতরে ঈশ্বরের জীবন্ত অস্তিত্বের) সচেতনতা অর্জনের জন্য মন্দিরে যাওয়ার দরকার নেই।[১৮১]

পাথরের বাড়ির তুলনায় আমাদের দেহগুলি বরং যথার্থ মন্দির। সম্মিলিত উপাসনার শ্রেষ্ঠ স্থান হল ফাঁকা জায়গা, যেখানে মাথার ওপরে আকাশের চাঁদোয়া ও নিচে মেঝের মতো জননী বসুন্ধরা।[১৮২]

২০. অস্পৃশ্যতার অভিশাপ

আমি পুনর্জন্ম চাই না। কিন্তু যদি আমাকে পুনর্জন্ম নিতে হয় আমি যেন অস্পৃশ্য হয়ে জন্মাই, যাতে করে আমি তাদের দুঃখ, কষ্ট ও নিয়ত মহা-অপমান ভাগ করে নিতে

পারি, যাতে করে ঐ চরম দুর্দশা থেকে নিজেকে ও তাদের মুক্ত করতে আমি সচেষ্ট হতে পারি। তাই আমি প্রার্থনা করেছি যে, যদি পুনরায় জন্মাতে হয় আমি যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র না হয়ে 'অতিশূদ্র' হয়ে জন্মাই।[১৮৩]

আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের অনেক আগেই আমার সঙ্গে 'অস্পৃশ্যতা' দূরীকরণের কাজের বিবাহ হয়েছিল। আমাদের দ্বৈত জীবনে দুবার এরকম ঘটনা ঘটেছিল যা আমাকে অস্পৃশ্যদের জন্য কাজ ও আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকার মধ্যে বাছাই করে নিতে হতো এবং প্রথমটিই আমার পছন্দ ছিল। কিন্তু আমার স্ত্রীর শুভবুদ্ধির জন্য সংকট এড়ানো সম্ভব হয়। আমার আশ্রমে, যেটা আমার সংসার সেখানে বহু হরিজন রয়েছে। রয়েছে একটি মিষ্টি দুষ্টু মেয়ে যে আমার নিজের মেয়ের মতই থাকে।[১৮৪]

মানুষের প্রতি ভালবাসাই আমার জীবনের গোড়ার দিকে অস্পৃশ্যতার সমস্যাটি এনে হাজির করেছিল। আমার মা বলেছিলেন, "ওই ছেলেটাকে ছুঁবি না, ও অচ্ছুৎ"। আমি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন ছোঁব না?" এবং সেইদিন থেকে শুরু হয়েছিল আমার বিদ্রোহ।[১৮৫]

ভারতেব এক-পঞ্চমাংশকে যদি আমরা চিরকাল পদানত করে বাখি এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জাতীয় সংস্কৃতির সুফলগুলি তাদের দিতে অস্বীকার করি তাহলে স্বরাজ একটি অর্থহীন শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। এই মহান শুদ্ধিকরণেব অভিযানে আমরা ঈশ্বরের সহায়তা চাইছি কিন্তু তাঁব সৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে যাদের দাবি সবচেয়ে যথার্থ তাদের মানবতার অধিকার আমবা দিতে অস্বীকার করছি। নিজেবাই যখন আমরা অমানবিক তখন অন্যদের অমানবিকতা থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের সওয়াল না কবাই ভালো।[১৮৬]

ধর্মের পবিত্র নামে মানুষকে নিগৃহীত করে চলা, সহজ ভাষায় ধর্মান্ধ একগুঁয়েমিপনা ছাড়া কিছু নয়।[১৮৭]

হিন্দুধর্মের সংস্কাবসাধন এবং তার প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অস্পৃশ্যতা দূর কবা হল প্রধান কাজ....অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ...একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া।[১৮৮]

যদি অস্পৃশ্যতা বেঁচে থাকে তাহলে হিন্দুধর্মের মৃত্যু হবে।[১৮৯]

অস্পৃশ্যতা টিকে থাকার চেয়ে হিন্দুধর্মের মৃত্যুও শ্রেয়।[১৯০]

আমার আশা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সেই যুদ্ধে নিজেকে উৎসর্গ করে মানবজাতির সার্বিক পুনর্জীবন আনয়ন সম্পন্ন করা। এটা হয়তো ঝিনুকের রঙের রূপার মতই অবাস্তব, নিছকই স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্ন যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ আমি তা স্বপ্ন বলে মনে করি না। রোমা রোলাঁর ভাষায়, 'লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে জয় নেই, জয় হল এর জন্য নিরন্তর সাধনায়।'[১৯১]

অস্পৃশ্যতা ও জাতপাত

অস্পৃশ্যরা আছে বলে জাতের বিলোপ ঘটানো ভুল হবে। এ-যেন দেহে কোনও কদর্য মাংস গজিয়েছে বলে দেহকে নাশ করা বা আগাছা হয়েছে বলে ফসল নষ্ট কবে ফেলা। অতএব, আমরা যেভাবে বুঝি, সেই অস্পৃশ্যতাকে সমূলে বিনাশ করতে হবে।

পুরো ব্যবস্থাটিকে বাঁচিয়ে তবে ওই বাড়তিটুকু দূর করতে হবে। অতএব, অস্পৃশ্যতা জাতিপ্রথার সৃষ্ট নয়, হিন্দুধর্মের মধ্যে উচ্চ-নীচের যে ধারণা ঢুকে গেছে এবং একে কুরে করে খাচ্ছে তাই এর উৎস। তা-ই অস্পৃশ্যতার ওপরে আক্রমণ হল, 'উচ্চ-নীচ' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত। যে মুহূর্তে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হবে অমনি জাতিবর্ণব্যবস্থা শুদ্ধ হবে। আমার স্বপ্নানুযায়ী প্রকৃত বর্ণধর্ম রূপ নেবে সমাজের চার বিভাজনে, যেখানে একে অপরের পরিপূরক ও কেউ অন্যের চেয়ে ছোট বা বড় নয় এবং প্রত্যেকেই হিন্দুধর্মের পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়।[১৯২]

বর্ণাশ্রম ধর্ম

এই পৃথিবীতে মানুষের কর্মজীবন বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। দিনের পর দিন সম্পদের আহরণ ও নানা বৃত্তির সন্ধানের জন্য তার জন্ম নয়। তার জন্ম এই কারণেই যে, সে যেন তার শক্তির প্রতিটি কণাকে তার নির্মাতাকে জানার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। এই জন্য দেহ ও আত্মাকে যুগলবন্দী করে রাখতে তাকে তার পূর্বপুরুষদের বৃত্তিই গ্রহণ করতে হয়। এই হল বর্ণাশ্রম ধর্ম, এর বেশি বা কম কিছু নয়।[১৯৩]

বংশানুক্রমিক বৃত্তির ভিত্তিতে যে বর্ণ গড়ে ওঠে আমি তাতে বিশ্বাস করি। চারটি বিশ্বজনীন কর্মধারা বোঝাতে ওই কাজগুলি হল: শিক্ষা দান করা, দুর্বলকে রক্ষা করা, কৃষি ও বাণিজ্য অব্যাহত রাখা এবং কায়িক শ্রমের মাধ্যমে সেবা করা। এই বৃত্তিগুলি সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই সাধারণ সত্য, কিন্তু হিন্দুধর্ম এগুলিকে মানব গড়ার আইন হিসেবে চিহ্নিত ক'রে সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এগুলিকে ব্যবহার করেছে। কেউ তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হোক আর না-ই হোক মাধ্যাকর্ষণ আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু এ বিষয়টি যাঁরা মেনেছেন সেই বিজ্ঞানীরা একে ব্যবহার করে এমন পরীক্ষা ঘটিয়েছেন যার ফল বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। একইভাবে, বর্ণের সূত্র আবিষ্কার ও প্রয়োগ করে হিন্দুধর্ম বিশ্বকে চমকিত করেছে। যখন হিন্দুরা জাড্যের আলস্যে আক্রান্ত হয়েছে তখন বর্ণের অপব্যবহারের ফলে অসংখ্য জাতি এবং অসবর্ণ বিবাহ ও পংক্তি ভোজ সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক বিধিনিষেধ চালু হয়েছে। এই বিধিনিষেধের সঙ্গে বর্ণের কোনও সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন বর্ণের মানুষ বিবাহ করতে পারে, এক পাতে খেতে পারে। হয়তো শুচিতা ও স্বাস্থ্যের কারণে ওই বিধিনিষেধগুলি দরকার। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণ যখন কোনও শূদ্র মেয়েকে বিয়ে করে বা এর উল্টোটা ঘটে তখন বর্ণের আইনের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করা হয় না।[১৯৪]

আজ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিছকই তকমায় পরিণত হয়েছে। আমি যেভাবে বুঝি সেই বর্ণ-র ক্ষেত্রে ঘোর বিভ্রান্তিকর অবস্থা বিরাজ করছে এবং আমি চাই, সকল হিন্দুই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের শূদ্র বলে ঘোষণা করবে। ব্রাহ্মণ্যবাদের সত্য প্রকাশের এই একমাত্র পথ, এ পথেই বর্ণধর্ম তার সত্যরূপ ফিরে পাবে।[১৯৫]

আমি বিশ্বাস করি, মানুষ যখন জন্মায়, তখন তার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। প্রতিটি ব্যক্তিই নির্দিষ্ট কয়েকটি সীমাবদ্ধতাসহ জন্মায়, যা সে অতিক্রম করতে পারে

না। এই সীমাবদ্ধতাগুলি সতর্ক নিরীক্ষণের মাধ্যমে বর্ণের সূত্রে উপনীত হওয়া গেছে। এর ফলে নির্দিষ্ট প্রবণতাসম্পন্ন নির্দিষ্ট লোকের জন্য কার্যের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানো গেছে। সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিলেও বর্ণের সূত্রে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই—একদিকে এতে যেমন প্রত্যেককে তার শ্রমের সুফল সম্বন্ধে নিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে, তার প্রতিবেশীর ওপরে চড়াও হওয়া থেকেও তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। এই মহান সূত্র দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে হতমান হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা-বিন্যাস তখনই গড়ে উঠবে, যখন এই সূত্রের অর্থ পূর্ণভাবে উপলব্ধ হবে এবং এর বাস্তবায়ন ঘটবে।[১১৬]

অসবর্ণ বিবাহ ও পঙক্তিভোজন

যদিও বর্ণাশ্রমে অসবর্ণ বিবাহ বা পঙক্তিভোজন নিয়ে কোনও বিধিনিষেধ নেই তবুও এ-ব্যাপারে জোর করে কিছু চাপানো চলে না। কোনও পুরুষ বা নারী কাকে বিয়ে করবে এবং কার সঙ্গে বসে আহার করবে, সে বিষয়ে ব্যক্তি হিসেবে তার অবাধ পছন্দই চূড়ান্ত হওয়া উচিত।[১১৭]

জাতি

আমি মনে করি, জাতির চার ভাগই মৌলিক, স্বাভাবিক ও আবশ্যকীয়। অসংখ্য যে অধিবর্ণ রয়েছে সেগুলি কখনও সুবিধার জন্য, কখনও আবার সেগুলি বাধাস্বরূপ। যত তাড়াতাড়ি এগুলি মিশে যায় ততই মঙ্গল।[১১৮]

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণভেদের মূল্য একসময় খুবই উল্লেখনীয় ছিল। এর ফলে বংশানুক্রমিক দক্ষতা নিশ্চিত হতো এবং প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ হতো। নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে বর্ণই ছিল সেরা নিরাময়। বৃত্তিগত গোষ্ঠীর সর্ববিধ সুবিধাই এতে ছিল। যদিও এক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নতুন পথে পা দেয়নি বা কিছু উদ্ভাবন করেনি তবুও এগুলির বিরোধিতাও করেছে বলে জানা যায়নি....

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে জাতি হচ্ছে ভারতীয় সমাজের গবেষণাগারে সমাজগতভাবে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে মানুষের পরীক্ষা। আমরা যদি এর সাফল্য প্রমাণ করতে পারি তাহলে হৃদয়হীন প্রতিযোগিতা এবং লোভ ও লালসাজনিত সামাজিক সংহতিহানির বিরুদ্ধে সেরা দাওয়াই ও মুক্তির উপায় হিসেবে বিশ্বের কাছে এটি পেশ করা যায়।[১১৯]

জাতি ও বর্ণ

....আমি বহুবার বলেছি যে আধুনিক অর্থে জাতিতে আমি বিশ্বাস করি না। এটি একটি পূতিগন্ধময় বস্তু। এবং প্রগতির পথে অন্তরায়। অন্যদিকে, আমি মানুষে মানুষে অসাম্যেও বিশ্বাস করি না। আমরা সকলেই সম্পূর্ণ সমান। কিন্তু সাম্য হচ্ছে আত্মার, দেহের নয়। অতএব এটি একটি মানসিক অবস্থা। সাম্যের কথা আমাদের ভাবতে ও জোর দিয়ে বলতে হবে কারণ বস্তুগত বিশ্বে বিশাল অসাম্যই দেখা যায়। বাইরের এই আপাত

অসাম্যের মধ্যেই আমাদের সাম্য অর্জন করতে হবে। কোনও ব্যক্তির ওপরে অন্য ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ। তাই জাতি যদি প্রতিষ্ঠার নিরিখে ভেদাভেদ করে তাহলে তা পাপ।[২০০]

জাতিভেদ আমাদের মধ্যে এমনই গভীর শিকড় গেড়েছে যে ভারতের মুসলিম, খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এটা সত্য যে, বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও শ্রেণীগত বৈষম্য কমবেশি দেখা যায়। এর অর্থ হল এটা মানবজাতির সাধারণ ব্যাধি। একমাত্র সত্যকার অর্থে ধর্মকে অবলম্বন করেই এর দূরীকরণ সম্ভব। আমি কোনও ধর্মের নীতিবাক্যের মধ্যেই অনুরূপ বাধা ও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের সমর্থন খুঁজে পাইনি।

ধর্মের চোখে সব মানুষই সমান। শিক্ষা, বুদ্ধি ও সম্পদ থাকলেই, এগুলি যার নেই তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার অধিকার বর্তায় না। কোনও ব্যক্তি যদি প্রকৃত ধর্মের শুদ্ধকারী সারাৎসার এবং শৃঙ্খলার বোধে উদ্বুদ্ধ ও পবিত্র হয় তাহলে সে নিজের সুবিধাগুলি, সুবিধাবঞ্চিতদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার তাগিদ অনুভব করবে। তাই যদি হয়, তাহলে আজ, আমাদের এই দুরবস্থায় প্রকৃত ধর্ম এই দাবিই করে যে আমাদের সকলকেই 'অতিশূদ্র' হয়ে উঠতে হবে।

নিজেদের মালিক বলে ভাবলে আমাদের চলবে না। ভাবতে হবে, আমরা আমাদের কাছে গচ্ছিত ধনের তত্ত্বাবধায়ক। এই ধনকে সমাজসেবায় ব্যবহার করতে হবে এবং সেবাকার্যের বিনিময়ে ন্যায্য কিছু ধন নিজেদের নিতে হবে, তার বেশি নয়। এই ব্যবস্থায় কেউ দরিদ্র বা কেউ ধনী থাকবে না। সর্বধর্মই সমান বলে বিবেচিত হবে। ধর্মীয়, জাতিগত বা অর্থনৈতিক ক্ষোভজনিত সর্ববিধ বিবাদ তখন আর বিশ্বব্যাপী শান্তিকে বিঘ্নিত করবে না।[২০১]

৫. অহিংসা

২১. অহিংসার সুসমাচার

আমাদের প্রজাতির আইন

আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই। নিজেকে একজনে বাস্তবপন্থী ভাববাদী বলে দাবি করি। অহিংসার ধর্ম শুধু ঋষি ও সন্তদের জন্যই নয়। অহিংসা হল আমাদের প্রজাতির আইন, যেমন হিংসা পশুর আইন। পশুর ক্ষেত্রে আত্মা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সে দৈহিক বল ছাড়া কোনও আইন জানে না। মানুষের মর্যাদা দাবি করে যে, তাকে উচ্চতর আইন মানতে হবে—আত্মার শক্তির আইন....

হিংসা পরিবৃত পরিস্থিতিতে যে ঋষিরা অহিংসার সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা নিউটনের চেয়েও প্রতিভাধর ছিলেন। ওয়েলিংটনের চেয়েও বড় যোদ্ধা। অস্ত্রের ব্যবহার জেনেই তাঁরা এর অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং রণক্লান্ত পৃথিবীকে শিখিয়েছিলেন যে তার মুক্তির পথ হিংসা নয়, অহিংসা।[১]

আমার অহিংসা

আমি একটি পথই জানি—অহিংসার পথ। হিংসার পথ আমার স্বভাববিরোধী। হিংসা আয়ত্ত করার ক্ষমতা আমি অর্জন করতে চাই না....এই বিশ্বাসই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে যে, তিনিই হলেন অগতির গতি এবং করুণাপ্রার্থী হয়ে তাঁর শরণ নিলে তিনি এগিয়ে আসেন। এই বিশ্বাসের বলেই এই আশা আমি বুকে করে রেখেছি যে, ঈশ্বর একদিন আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমি তার কথা জনগণকে বলব।[২]

সারাজীবন ধরেই আমি 'জুয়াড়ী'। সত্যসন্ধানের আবেগে ভরপুর হয়ে, অক্লান্তভাবে অহিংসায় আমার বিশ্বাসকে অনুসরণ করতে করতে কোনও বাজি ধরতেই আমি পিছপা হইনি। এটা করতে গিয়ে আমার ভুল হয়েছে কিন্তু যদি করে থাকি সেটা করেছি সর্ব যুগ ও সর্ব দেশের সেরা বিজ্ঞানীর সঙ্গে।[৩]

অহিংসার শিক্ষা আমি শিখেছিলাম আমার স্ত্রীর কাছে। আমি জোর করে তাঁকে আমার ইচ্ছার সামনে নতজানু করতে চেষ্টা করেছিলাম। একদিকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ়চিত্ত প্রতিরোধ এবং অন্যদিকে আমার মূঢ়তার কাছে শান্ত নতিস্বীকারের কষ্ট

শেষ পর্যন্ত আমাকে যারপরনাই লজ্জায় ফেলে এবং চিন্তার এই মূর্খতা থেকে আমি মুক্ত হই যে, তাঁর ওপর কর্তৃত্ব করার জন্যই আমার জন্ম। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠলেন আমার অহিংসার শিক্ষক।[৪]

যে মতাদর্শ আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে তা কর্মবিমুখতা নয়, বরং সর্বোচ্চ স্তরের কর্মতৎপরতা।[৫]

নিজের মধ্যে বীরোচিত বা দর্শনীয় কোনও অহিংসার উদ্বোধন ঘটাতে পেরেছি, এই বিশ্বাসের বশে...আমি কখনওই নিজেকে বাহবা দেব না...বা বন্ধুদেরও দিতে দেব না। এইটুকুই বলতে পারি, এক মুহূর্ত না-থেমে অবিশ্রাম আমি সেই দিকেই এগিয়ে চলেছি।[৬]

অহিংসার চরিত্র

১. অহিংসা হচ্ছে মানবজাতির আইন এবং পাশবিক শক্তির চেয়ে এই আইন অনন্তগুণে মহান ও শ্রেয়।

২. শেষ বিশ্লেষণে অহিংসা তাদের কাজে লাগে না যাদের প্রেমের ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস নেই।

৩. অহিংসা একজনের আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধকে সুরক্ষিত করে, যদিও একইভাবে সবসময়ে জমির মালিকানা বা অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করে না। যদিও এর নিয়মিত অভ্যাসের ফলে উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রহরী দিয়ে পাহারা দেওয়ার চেয়ে ভালো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই অসৎপথে সঞ্চিত সম্পদ ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অহিংসা কোনও সহায়তা করে না।

৪. যে ব্যক্তি বা জাতি অহিংসা অভ্যাস করবে তাকে সম্মান ব্যতীত আর সবকিছু আত্মোৎসর্গের জন্য (জাতির ক্ষেত্রে শেষ মানুষটি অবধি) প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব অহিংসা অন্য জাতির দেশকে দখল করার পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ তার প্রতিরক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে শক্তির ওপর নির্ভরশীল।

৫. যদি প্রেমের ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য সমান ভালবাসা থাকে তবেই অহিংসা এমন একটি শক্তি যা, আবালবৃদ্ধবনিতা সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে। জীবনের আইন হিসেবে অহিংসা যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে তাকে সমগ্র সত্তায় ছড়িয়ে পড়তে হবে, বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলবে না।

৬. এটা মনে করা অত্যন্ত গর্হিত, যে, অহিংসা আইন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেই কার্যকর, জনগণ বা মানবজাতির জন্য নয়।[৭]

অহিংসা ও সত্যের পথ ক্ষুরধার। এর অভ্যাস আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের চেয়েও বেশি দরকারি। ঠিকভাবে গ্রহণ করলে খাদ্য দেহকে পুষ্টি দেয়, ঠিকভাবে অভ্যাস করলে অহিংসা আত্মার পুষ্টি জোগায়। দেহের জন্য খাদ্য আমরা মেপে খেয়ে থাকি এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। আত্মার খাদ্য অহিংসা কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করতে হয়। এখানে তৃপ্তি বলে কোনও কিছু নেই। প্রতি মুহূর্তে আমাকে সচেতন থাকতে হবে যে আমি অভীষ্টসিদ্ধির পথে চলেছি এবং সেই লক্ষ্যের নিরিখে নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে।

অপরিবর্তনীয় মতাদর্শ

অহিংসার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনে সততা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, সস্নেহ মায়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। ইংরেজীতে ওরা বলে যে, সততাই হচ্ছে সেরা নীতি। কিন্তু অহিংসার ক্ষেত্রে এটা নিছক নীতি নয়। নীতি পাল্টাতে পারে ও পাল্টায়। অহিংসা একটি অপরিবর্তনীয় মতাদর্শ। চারদিকে যখন হিংসা ফণা তোলে তখন তার মুখোমুখি একে অনুসরণ করতে হবে। অহিংস ব্যক্তির সঙ্গে অহিংসা মূল্যহীন। সত্যি বলতে, তখন এটা আদৌ অহিংসা কিনা তাই বলা কঠিন। কিন্তু যখন হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসা দাঁড়ায় তখন এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদটি বোঝা যায়। সদা-জাগ্রত, সদা-সতর্ক, সদা-সচেষ্ট না হলে আমাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়।[৮]

একমাত্র আইনসিদ্ধ বস্তু হল অহিংসা। এই অর্থে হিংসা কখনওই আইনসিদ্ধ হতে পারে না। মনুষ্যসৃষ্ট আইনের দ্বারা নয়, ববং মানুষের জন্য সৃষ্ট প্রকৃতির আইন এ অনুমোদন করে না।[৯]

ঈশ্বরে বিশ্বাস

ঈশ্ববে জীবন্ত বিশ্বাস ছাড়া (অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস) অসম্ভব। অহিংস ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কৃপা ছাড়া কিছুই করতে পাবে না। এটা না থাকলে ক্রোধ, ভয় বা প্রতিশোধ ছাড়া মৃত্যুবরণেব সাহস সে পাবে না। এই বিশ্বাস থেকেই ওই সাহস আসে যে, ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ভয় বলে কিছু থাকতে পারে না। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, এটা জানা থাকার আর এক অর্থ, যাদের বিরোধী বলা যাবে তাদের জীবনের প্রতিও সম্মানপ্রদর্শন।[১০]

অহিংসা হল সর্বোচ্চ স্তরের সক্রিয় শক্তি। এ হল আত্মিক শক্তি যা আমাদের অন্তরস্থ ঈশ্বরের শক্তি। এই নির্গলিতার্থের সবটুকু অসম্পূর্ণ মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না, এর পূর্ণ জ্যোতি সে সহ্য করতেও পারবে না। কিন্তু এই শক্তির এক কণাও সে যদি পায়, যখন তা আমাদের মধ্যে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তখন অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

আকাশের সূর্য সমগ্র বিশ্বসংসারকে জীবনদায়ী উষ্ণতা দেয়। কিন্তু এর কাছে যে যাবে তাকে সূর্য গ্রাস করে ভস্ম করে দেবে। ঈশ্বরও অনুরূপ। আমরা যতটা অহিংসা উপলব্ধি করব ততই আমরা ঈশ্বরোপম হয়ে উঠব। কিন্তু আমরা কখনওই পূর্ণভাবে ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারব না।[১১]

আসল ঘটনা হচ্ছে হিংসার পথে অহিংসা কাজ করে না। অহিংসা কাজ করে বিপরীত পথে। সশস্ত্র কোনও মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার অস্ত্রের ওপরে নির্ভরশীল হয়। আর যে-মানুষ স্ব-ইচ্ছাতেই নিরস্ত্র, সে সেই অদৃশ্য শক্তির ওপরে নির্ভর করে, যাকে কবিরা বলেন ঈশ্বর, কিন্তু বিজ্ঞানীরা অভিহিত করেন অজ্ঞাত বলে। কিন্তু যা অজ্ঞাত তাকে যে অস্তিত্ববিহীন হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। সকল শক্তির মধ্যে ঈশ্বরই হলেন সেই শক্তি যা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত। এই শক্তির ওপরে যে অহিংসা নির্ভর করে না তা তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, ধূলায় নিক্ষেপের যোগ্য।[১২]

প্রথম আবশ্যিকতা হল নিজের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত অবস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।[১৩]

ধর্মীয় ভিত্তি

হিন্দুধর্মের প্রতি আমার আনুগত্য কয়েকজন খারিজ করে দিয়েছে। তার কারণ অত্যন্ত গোঁড়ার মতো আমি অহিংসায় বিশ্বাস করি ও তার পক্ষে বলি। তারা বলে যে আমি ছদ্মবেশী খ্রীস্টান। এবং আমি যখন সেই মহাকাব্যে বিশুদ্ধ অহিংসা খুঁজে পাই তখন বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই বলা হয় যে, আমি 'গীতা'র অর্থ বিকৃত করছি। আমার কতিপয় হিন্দু বন্ধু বলেন যে, 'গীতা'য় বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে হত্যা করাও কর্তব্য। এই সেদিনই একজন বহুবেত্তা শাস্ত্রীমহাশয় আমার 'গীতা'র ব্যাখ্যাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং আরও বলেছেন, 'গীতা'র সার-কথা, পাপ ও পুণ্যের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও 'গীতা'র শিক্ষা, নির্দ্বিধায় ও নির্মমভাবে আমাদের ভিতরকার পাপ নির্মূল করা—এই মর্মে 'গীতা'র কোনও কোনও ভাষ্যকার যে মত ব্যক্ত করেছেন, তা মানা যায় না।

অহিংসার বিরুদ্ধে এই মতামতগুলি আমি বিশদভাবে জানাচ্ছি কারণ আমার সমাধান সূত্রটি অনুধাবন করার জন্য এগুলি বোঝা দরকার...।

সঠিকভাবে বিচার করে তবে আমাকে নাকচ করতে হবে। আমার ধর্ম হল সম্পূর্ণরূপে আমার সঙ্গে আমার স্রষ্টার ব্যাপার। আমি যদি হিন্দু হই তাহলে সমগ্র হিন্দু জনসাধারণ আমাকে একঘরে করলেও আমি হিন্দুই থাকব। তবু আমি বলব যে অহিংসা হচ্ছে সর্বধর্মের শেষ কথা।[১৪]

অহিংসার শিক্ষা সব ধর্মের মধ্যেই বিদ্যমান কিন্তু আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, হয়তো এই ভারতেই অহিংসার প্রয়োগ একটি বিজ্ঞানে পর্যবসিত হয়েছে। বহু সন্ত তপশ্চর্যার জন্য প্রাণপাত করেছেন এবং কবিরা বলেছেন তাঁদের আত্মত্যাগের জন্যই হিমালয় শুদ্ধ হয়ে তুষারশুভ্রতা পেয়েছে। কিন্তু অহিংসার সেই ব্যবহার আজ মৃতপ্রায়। তাই আজ ক্রোধের জবাবে প্রেম ও হিংসার জবাবে অহিংসার চিরন্তন আইনের পুনঃপ্রবর্তন দরকার এবং জনক রাজা ও রামচন্দ্রের এই দেশ ছাড়া আর কোথায় কাজটি শীঘ্র করা সম্ভব হবে?[১৫]

হিন্দুধর্মের অনন্য অবদান

অহিংসা সব ধর্মেই রয়েছে কিন্তু হিন্দু ধর্মেই তার সর্বোত্তম প্রকাশ ও প্রয়োগ ঘটেছে। (জৈনধর্ম বা বৌদ্ধধর্মকে আমি হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করি না)।

হিন্দুধর্ম শুধু সকল মানব প্রাণের মহামিলনে বিশ্বাসী নয়, যা কিছু প্রাণবান তাদের সকলের একত্বে বিশ্বাসী। আমার মতে মানবিকতাবাদের বিকাশে হিন্দুধর্মের অনন্য অবদান গোরুর পূজা। সকল জীবনের একতায়, এবং এর ফলে পবিত্রতায় বিশ্বাসের এ হল ব্যবহারিক প্রয়োগ। আত্মার জন্মান্তরে মহান বিশ্বাস এখান থেকেই এসেছে। এবং সব শেষে সত্যের জন্য অক্লান্ত সন্ধানের অনবদ্য ফল হল বর্ণাশ্রমের আইনের আবিষ্কার।[১৬]

আমাকে এ-প্রশ্নও করা হয়েছে যে, হিন্দুধর্মের কোথায় আমি অহিংসার সন্ধান পেয়েছি?

অহিংসা হিন্দুধর্মে যেমন রয়েছে, তেমন খ্রীস্ট ও ইসলাম ধর্মেও রয়েছে। তোমরা একমত হও বা না হও আমার দৃষ্টিতে যে বিশ্বাসকে আমি সত্য বলে মনে করি তার প্রচার আমার কাছে অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত যে অহিংসা কাউকে কখনও কাপুরুষে পরিণত করেনি।[১৭]

'কোরান' এবং অহিংসা

(বড়িসাহেব) আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে পবিত্র 'কোরানে' সত্যাগ্রহের প্রতি পর্যাপ্ত সমর্থন রয়েছে। 'কোরানে'র এই ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি একমত হয়েছেন যে কোনও কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে হিংসা যদিও অনুমোদিত তবুও ঈশ্বরের কাছে হিংসার তুলনায় আত্মসংযম প্রিয়তর এবং এটাই হচ্ছে প্রেমের আইন। এই হল সত্যাগ্রহ। হিংসার অর্থ মানুষের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, আর সত্যাগ্রহ মানে দায়িত্ব পালন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও সহজেই দেখা যায় যে হিংসা কোনও কল্যাণ তো করেই না, ববং অপরিসীম ক্ষতি করে।[১৮]

কয়েকজন মুসলিম বন্ধু আমাকে বলে যে, মুসলিমরা কখনও নির্ভেজাল অহিংসা মেনে নেবে না। এদের মতে, মুসলিমদের কাছে নাকি হিংসা, অহিংসার মতই আইনসিদ্ধ ও আবশ্যিক। দুটিরই ব্যবহার নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর। এই দুইয়ের আইনসিদ্ধতা প্রমাণের জন্য 'কোরানে'র অনুমোদন দেখাবার দরকার নেই। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে এই পরিচিত পথেই চলেছে। নির্ভেজাল হিংসা বলে বিশ্বে কিছু নেই। কিন্তু আমি আমার অনেক মুসলিম বন্ধুর কাছে শুনেছি যে 'কোরান' অহিংসার ব্যবহারই শেখায়। 'কোরানে'র মতে, প্রতিহিংসার চেয়ে সংযত থাকাই শ্রেয়। ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি, যা হল আসলে অহিংসা। বাদশা খানের মতো গোঁড়া মুসলিম, যিনি কখনও নামাজ ও রমজান করা ভোলেন না, তিনিই মতাদর্শ হিসেবে অহিংসাকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছেন। এর জবাবে এ কথা বলা যায় না যে তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের যোগ্য নন, সে কথা বললে, সলজ্জভাবে বলতে হয়, আমিও তা নই।

আমাদের কাজকর্মে ফারাক যদি থেকেই থাকে তাহলে সেটা তার চরিত্রের নয়, মাত্রায়। পবিত্র 'কোরানে' অহিংসার কথা পরে ঢোকানো হয়েছে বলে যে মত রয়েছে তা আমার তত্ত্বের জন্য দরকারি নয়।[১৯]

খাদ্যগ্রহণের ব্যাপার নয়

অহিংসা নিছক খাদ্যবিচারবিদ্যার ব্যাপার নয়, এ তার চেয়েও বেশি। কে কি খায় বা পান করে, তার মূল্য যৎসামান্য, এর পেছনে যে আত্মসংযম ও নির্লোভ হওয়ার ব্যাপারটি আছে সেটিই আসল। তোমার খাদ্যগ্রহণের সময় বিভিন্ন পদ পছন্দ করার ব্যাপারে সর্বতোভাবে যতটা সম্ভব সংযম অভ্যাস করো। এই সংযম প্রশংসার যোগ্য, এমনকি দরকারিও, কিন্তু এর দ্বারা বড় জোর অহিংসার প্রান্ত সীমা ছোঁয়া যায়। খাদ্যের ব্যাপারে কেউ যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েও অহিংসার মূর্তরূপ হিসেবে তোমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে

পারে, যদি তার হৃদয়ে অন্যের প্রতি অপার ভালবাসা থাকে, পরের দুঃখে তার হৃদয় বিগলিত হয়, তার হৃদয় রিপুমুক্ত হয়। অন্যদিকে কেউ যদি স্বার্থপর, রিপুর দাস এবং নির্দয় হয় তাহলে খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে সে অতিসংযমী হলেও অহিংসায় তার কোনও স্থান নেই এবং সে কৃপার পাত্র এক হীন ব্যক্তি।[২০]

সত্যের পথ

জাগতিক বা অতিজাগতিক যে-কোনও বস্তুর চেয়ে অহিংসার প্রতি আমার ভালবাসা বেশি। আমার কাছে এর সমতুল, কেবলমাত্র সত্যের প্রতি আমার ভালবাসা, যা অহিংসার সমার্থক এবং একমাত্র যার মধ্য দিয়েই আমি সত্যকে দেখতে পাই, সেখানে পৌঁছতে পারি।[২১]

....অহিংসা ব্যতিরেকে সত্যের সন্ধান করা এবং তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। অহিংসা ও সত্য এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে বাস্তবে তাদের বাঁধন ছাড়িয়ে আলাদা করা অসম্ভব। তারা হল মুদ্রার দুই পিঠ বা মসৃণ ছাপ-না-মারা এক ধাতব চাকতির দুটি দিক। এর কোনটি সোজা দিক, কোনটি উল্টো, কে বলতে পারে? তবুও, অহিংসা হল উপায় এবং সত্য হল গন্তব্য। উপায় সবসময়েই আমাদের আয়ত্তে থাকে—তাই অহিংসাই আমাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য। উপায়ের সদ্ব্যবহার করলে আজ বা কাল আমরা গন্তব্যে পৌঁছবই। এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলে চূড়ান্ত জয় প্রশ্নাতীত হয়ে উঠবে।[২২]

অহিংসা লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে সত্য। কিন্তু মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্য উপলব্ধি করতে অহিংসা প্রয়োগ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। অহিংসার সনিষ্ঠ সন্ধানের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িত রয়েছে সত্য। কিন্তু হিংসার ক্ষেত্রে তা হয় না। তাই আমি অহিংসার শপথ নিই। সত্য স্বাভাবিকভাবে আমার কাছে এসেছিল। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অহিংসাকে আমি অর্জন করেছি।

কিন্তু অহিংসা যেহেতু উপায়, তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রাত্যহিক জীবনে অহিংসার বিষয়টি নিয়ে আমরা বেশি চিন্তিত। আমাদের জনগণকে অতএব অহিংসার শিক্ষা দিতে হবে। এর স্বাভাবিক ফল হিসেবেই ঘটবে সত্যের শিক্ষা।[২৩]

কাপুরুষতাকে আড়াল করা নয়

বিপদ দেখলে প্রিয়জনদের রক্ষার ব্যবস্থা না করে পালাতে হবে, আমার অহিংসা একথা বলে না। হিংসা ও কাপুরুষোচিত পলায়নের মধ্যে আমি ভীরুতার বদলে হিংসাই বেছে নেব। অন্ধ মানুষকে সুন্দর দৃশ্য দেখানোব প্রলোভন যেমন আমি দেখাতে পারি না, তেমনই কাপুরুষকেও আমি অহিংসা শেখাতে পারি না। অহিংসা হচ্ছে সাহসিকতার সর্বোচ্চ শিখর। এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই, হিংসার শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে আমার অসুবিধা হয়নি। অনেক বছর ধরে, যখন আমি কাপুরুষ ছিলাম, আমার মধ্যে হিংসা ছিল। যখনই কাপুরুষতা ত্যাগ করতে শুরু করলাম তখনই আমি অহিংসাকে মূল্য দিতে শুরু করি। বিপদাপন্ন কর্তব্যস্থল থেকে যে হিন্দুরা

পালিয়ে গিয়েছিল, তারা অহিংস বলে বা আঘাত হানতে ভয় পেয়েছিল বলে পালায়নি। তারা পালিয়েছিল মৃত্যুবরণ করতে বা আহত হতে তারা অনিচ্ছুক ছিল বলে। বুল টেরিয়ারের কাছ থেকে যে খরগোশ ছুটে পালায় সে কখনওই অহিংস নয়। টেরিয়ারকে দেখলেই বেচারা কাঁপতে থাকে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুট লাগায়।[২৪]

অহিংসা কাপুরুষতার আড়াল নয়, এ হল সাহসীর সর্বোচ্চ গুণ। অহিংসা প্রয়োগ করতে তরবারি-চালনার তুলনায় অনেক বেশি সাহসের দরকার হয়। ভীরুতা কোনও ভাবেই অহিংসার সঙ্গে খাপ খায় না। তরবারি-চালনার থেকে অহিংসায় পৌঁছনো সম্ভব এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া হিসেবেও সহজ। অতএব অহিংসার মধ্যে আঘাত হানার ক্ষমতা পূর্বশর্তবিশেষ। এ হল নিজের প্রতিশোধস্পৃহার ওপরে সচেতনভাবে স্ব-ইচ্ছায় সংযম স্থাপন। কিন্তু নিষ্ক্রিয়, কাপুরুষোচিত ও অসহায় আত্মসমর্পণের তুলনায় প্রতিশোধ সবসময়েই শ্রেয়। তাব চেয়েও উচ্চতর হল ক্ষমা। প্রতিশোধস্পৃহাও দুর্বলতাবিশেষ। মনগড়া বা প্রকৃত ক্ষতিব ভয় থেকে প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম। ভয় পেলে কুকুর ডাকে ও কামড়ায়। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কাউকে ভয় পায় না কেউ যদি তাকে অন্যায়ভাবে আঘাত কবার চেষ্টা করে তাহলে সে আক্রমণকাবীর বিরুদ্ধে ক্রোধজাগ্রত করাটাও যথেষ্ট বিরক্তিকব বলে মনে করবে। যে শিশুরা সূর্যের দিকে ধুলো ছোঁড়ে সূর্য তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয় না। এইভাবে তারা নিজেদেরই কষ্টভোগের কারণ ঘটায়।[২৫]

প্রকৃত অহিংসার পথে চলতে হলে হিংসাব চেয়ে অনেক বেশি সাহসের প্রয়োজন হয়।[২৬]

সাহসীদের অহিংসা কেউ যদি আয়ত্ত করতে চায় তাহলে তার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কাজ হল নিজের মনকে ভয়মুক্ত কবা এবং এই মুক্তির আলোকে তার ছোট, বড়—প্রতিটি কাজ নিয়ন্ত্রিত কবা। অতএব অহিংসার উপাসককে তার ওপরওয়ালার হুমকির কাছে নতিস্বীকাব কবা চলবে না এবং এটা করতে হবে বিনা ক্রোধে। তাকে অবশ্য তার চাকরি বিসর্জন দিতে হতে পারে—তা সে যতই লাভজনক হোক-না-কেন। সব-কিছু ত্যাগ করাব পরেও যদি নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে তার মনে কোনও তিক্ত মনোভাব না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে সাহসীদের অহিংসা বর্তমান।

ধরা যাক, একজন সহযাত্রী আমার ছেলেকে মারবে বলে শাসাচ্ছে। যখন আমি তাকে বোঝাতে গেলাম, সে তখন আমার দিকে তেড়ে এল। তখন যদি আমি তার আঘাত ধীর ভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে, আমার মধ্যে সাহসীদের অহিংসা বিদ্যমান। এগুলি প্রাত্যহিক ঘটনা এবং এরকম উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। প্রতিবারেই যদি আমি আমার ক্রোধ সংযত করতে পারি এবং ঘুসির জবাবে ঘুসি দেবার ক্ষমতা থাকলেও তা না করি, তখন সাহসীদের অহিংসা আমার আয়ত্ত হবে যা আমাকে কখনও নিরাশ করবে না এবং এর ফলে আমার সবচেয়ে নিশ্চিত বিরোধীরাও আমাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে।[২৭]

নিজের মধ্যে ভীরুতা প্রশ্রয় দেওয়া আমার চরিত্রবিরোধী। দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েক হাজার মানুষ কঠিন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে [অহিংস উপায়ে] রুখে দাঁড়িয়েও বেশ কিছুটা

সফল হয়েছিল। তাই সেখান থেকে ফেরার পরেই আমি স্থির করি, অহিংসা অর্থাৎ সত্যকার সাহসিকতা প্রচার করাই হবে আমার ব্রত।[২৮]

চাই, বিনয়

কারও যদি....গর্ব ও অহংবোধ থাকে তাহলে তার মধ্যে অহিংসা নেই। বিনয় ব্যতিরেকে অহিংসা অসম্ভব। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যখনই আমি অহিংস কাজ করেছি তখনই অদৃশ্য এক ক্ষমতার উচ্চতর নির্দেশ আমাকে পথ দেখিয়েছে ও আমাকে রক্ষা করেছে। আপন ইচ্ছাশক্তির জোরে এটা বাছতে গেলে আমি চূড়ান্ত ব্যর্থ হতাম। প্রথম যখন আমি জেলে যাই, আমার ভয় হয়েছিল। কারাজীবন সম্বন্ধে নানা ভয়াবহ গল্প আমি শুনেছিলাম। কিন্তু রক্ষাকর্তা হিসেবে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস ছিল। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে যারা কারাগারে গিয়েছিল তারা বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, আর যারা নিজেদের ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করেছিল তারা ব্যর্থ হয়েছিল। ঈশ্বর তোমার শক্তি জোগাচ্ছেন, এটা স্বীকার করার মধ্যে কোনও দীনতাব ব্যাপার নেই। দীনতা প্রকাশ পায় তখনই, যখন কোনও একটা কাজ করে তুমি অন্যের বাহবা কুড়োতে চাও। কিন্তু এখানে সে প্রশ্নই ছিল না।[২৯]

যখন আমি নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শূন্যে পরিণত করতে শিখেছিলাম তখনই দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ক্ষমতা আমি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম।[৩০]

২২. অহিংসার ক্ষমতা

অহিংসা যখন বেগবান শক্তি, তখন তার অর্থ, সচেতনভাবে কষ্টস্বীকার করা। এর মানে, পাপীর ইচ্ছার কাছে ভীরু আত্মসমর্পণ নয়, স্বৈরাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমগ্র আত্মশক্তি প্রয়োগ করা। আমাদের সত্তার এই আইন মেনে কাজ করলে একজন ব্যক্তি একাই তার মর্যাদা, তার ধর্ম ও তার আত্মাকে রক্ষা কবার জন্য এক ন্যায়হীন সাম্রাজ্যের সমগ্র প্রতাপ অগ্রাহ্য করতে পারে এবং রচনা করতে পারে ওই সাম্রাজ্যের পতন অথবা তার পুনরভ্যুদয়ের ভিত্তি।[৩১]

সক্রিয় শক্তি

আমি যে অহিংসার কথা বলি, তা দুরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে প্রতিহিংসার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ও অনেক বেশি বাস্তব সংগ্রাম। অনৈতিকতার বিরুদ্ধে আমি মানসিক তথা নৈতিক প্রতিরোধের কথা ভাবি। আমি স্বৈরাচারীর অসির শান একেবারে ভোঁতা করে দিতে চাই, তবে তা অন্য কোনও বেশি ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে নয়, তার আশাভঙ্গ ঘটিয়ে—আমি শারীরিকভাবে তাকে প্রতিরোধ করতে পারি, তার

এই প্রত্যাশা বিফল করে দিয়ে। তার বদলে আমি যে আত্মিক প্রতিরোধ গড়ে তুলব, তাতে সে বিভ্রান্ত হবে, এটা প্রথমে তার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, অবশেষে তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করবে। এ-স্বীকৃতি তাকে হতমান করবে না, বরং তাকে উন্নীত করবে। একেও বলা যেতে পারে এক আদর্শ অবস্থা। এবং তাই বটে। যে সব উপপাদ্য থেকে আমি আমার যুক্তি দাঁড় করিয়েছি, তা ইউক্লিডের সংজ্ঞার মতই সত্য। সত্য তো বটেই, কেন না বাস্তবে আমরা ব্ল্যাকবোর্ডে ইউক্লিডের একটি লাইনও আঁকতে পারি না। আবার ইউক্লিডের সংজ্ঞা মাথায় না রেখে কোনও জ্যামিতিবিদের পক্ষেও এগোনো সম্ভব নয়। তেমনি আমরা ....যার ভিত্তিতে সত্যাগ্রহের নীতি রচিত সেই মূল প্রতিপাদ্যগুলি বাদ দিতে পারি না।[৩২]

আমি মানছি যে, সবল, দুর্বলের ধন লুঠ করবে এবং দুর্বল হওয়া পাপ। কিন্তু এ-কথা মানুষের আত্মা বিষয়ে বলা হয়, দেহ বিষয়ে নয়। দেহ বিষয়ে এ কথা যদি বলা হতো, আমরা পাপ থেকে কখনও মুক্ত হতে পারতাম না। কিন্তু আত্মার শক্তি, তার বিরুদ্ধে সমগ্র সশস্ত্র পৃথিবীকে উপেক্ষা করতে পারে। দুর্বলতম দেহ যার, তারও এ-শক্তি আছে।[৩৩]

মানুষের হাতে মহত্তম শক্তি হল অহিংসা। মানুষের উদ্ভাবনীশক্তি যে ভয়ংকরতম মারণাস্ত্র তৈরি করতে পারে, তার চেয়েও শক্তিমান। ধ্বংস মানুষের আইন নয়। মানুষ মুক্তচিত্তে বাঁচতে পারে যদি সে মৃত্যুর জন্য সদাপ্রস্তুত থাকে, দরকারে নিজের ভাইয়ের হাতেও—তবে কখনওই (ভাইকে) হত্যা করে নয়, কারণ যা-ই হোক না কেন, প্রতিটি হত্যাকাণ্ড বা অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিটি আঘাত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।[৩৪]

অহিংসা হল সক্রিয় রেডিয়ামের মতো। দেহের কোথাও মারাত্মক মাংসস্ফীতি ঘটলে রেডিয়ামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অংশ সেখানে প্রবিষ্ট করালে তা ক্রমাগত, নিঃশব্দে ও অবিরাম কাজ করে চলে, যতক্ষণ না ব্যাধিগ্রস্ত গ্রন্থিটি পুনরায় স্বাস্থ্য ফিরে পায়। একইভাবে প্রকৃত অহিংসার সামান্য পরিমাণও নিঃশব্দে, সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টির অগোচরে সক্রিয় থাকে ও সমগ্র সমাজের কল্যাণসাধন করে।[৩৫]

অতুলনীয় সাহসিকতা

শক্তির জন্য সশস্ত্র সৈন্য তার অস্ত্রের ওপরে নির্ভর করে। ওর হাত থেকে অস্ত্র সরিয়ে নাও,—বন্দুক বা তরবারি—ক্রমে সে অসহায় হয়ে পড়বে। কিন্তু যে ব্যক্তি অহিংসার নীতি যথার্থ উপলব্ধি করেছে তার অস্ত্র হল ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি এবং এর সমকক্ষ কোনও অস্ত্র বিশ্বের জানা নেই।[৩৬]

লক্ষ্যে অবিচল বিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়চিত্ত মুষ্টিমেয় মানুষের ছোট একটি দলও ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিতে পারে।[৩৭]

সবচেয়ে সাহসী, আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য বা অনুরূপ সৈন্যদলের চেয়ে শক্তিমানের অহিংসা সবসময়েই অধিকতর ক্ষমতাশালী।[৩৮]

বিশ্বাসভিত্তিক পরীক্ষা

কঠিনতম ধাতুও পর্যাপ্ত উত্তাপে গলে যায়। সেই রকম, কঠিনতম হৃদয়ও অহিংসার পর্যাপ্ত তাপে নরম হয়। এবং তাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অহিংসার ক্ষমতা সীমাহীন।

প্রতিটি ক্রিয়া, বহুবিধ, এমনকি বিরোধী শক্তিরও ফলপরিণাম। এখানে শক্তির কোনও অপচয় হয় না। বলবিদ্যার বইতে এ-কথাই আমরা পড়ি। মানুষের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও এই সূত্র সমভাবে সত্য। তফাৎটি হল, একটি ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা সক্রিয় শক্তিগুলিকে জানি এবং এটা জানা থাকলে গাণিতিক পদ্ধতিতে ফলাফলটি আগে বলা যায়। মানুষের সক্রিয়তার ক্ষেত্রে এর ফলাফলটি বহুবিধ শক্তির ওপরে নির্ভরশীল, যাদের সম্বন্ধে বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কিছু জানি না। কিন্তু এই অজ্ঞতার কারণে এই শক্তিগুলির ক্ষমতা অবিশ্বাস কবা উচিত নয়। বরং এই অজ্ঞতা আরও শক্তিশালী বিশ্বাসের কারণ হতে পারে। অহিংসা যেহেতু বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি এবং যেহেতু তা সম্পূর্ণ গোপনে কাজ করে তাই এর জন্য চাই ব্যাপকতম বিশ্বাসের প্রয়োগ। বিশ্বাস নিয়ে যেমন ঈশ্বরে আস্থা রাখতে হয় সেভাবেই আমাদের অহিংসায় বিশ্বাস রাখতে হবে।[৩৯]

হিংসা হল জলের মতো। যখন তা নিষ্ক্রমণের মুখ পায় তখন প্রবল বেগে এগিয়ে যায়। অহিংসা উন্মত্তভাবে কাজ করে না। অহিংসা হল শৃঙ্খলার সারাৎসার। কিন্তু যখন তা গতিশীল হয় তখন কোনও হিংসাই একে চূর্ণ করতে পাবে না। সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল হবার জন্যে অহিংসাব প্রয়োজন নিষ্কলুষ শুদ্ধতা ও অজেয় বিশ্বাস......।[৪০]

অহিংসা এক বিজ্ঞান

অহিংসা এক বিজ্ঞান। বিজ্ঞানেব শব্দভাণ্ডারে 'ব্যর্থতা' শব্দটিব স্থান নেই। প্রত্যাশিত ফললাভে ব্যর্থতা, অনেকক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবনের পূর্বসূরী।[৪১]

যা-কিছু সামনে পড়ে তা গিলে ফেলা যদি হিংসার কাজ হয় তাহলে অহিংসার কাজ হচ্ছে হিংসাব হাঁ-মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়া। অহিংস পরিবেশে কেউ তাব অহিংসার পরীক্ষা নিতে পারবে না। এর পরীক্ষা একমাত্র হিংসার সামনেই হতে পারে।[৪২]

হিংসার যথার্থ মোকাবিলা একমাত্র অহিংসা করতে পারে। এটি একটি প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, হিংসার অস্ত্র, যদি তা আণবিক বোমাও হয়, প্রকৃত অহিংসার মুখোমুখি পড়লে তা-ও অকেজো হয়ে পড়ে। তবে এটা সত্য, মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনই এই অমিত শক্তিধব অস্ত্রটির ব্যবহার জানে। এর জন্য প্রগাঢ় উপলব্ধি ও মানসিক বল আবশ্যক। সামরিক বিদ্যালয় ও কলেজে যা দরকার, তার থেকে অহিংসার শিক্ষা ভিন্নতর। হিংসাকে অহিংসা দিয়ে প্রতিহত করতে গিয়ে কেউ যখন জটিলতা অনুভব করে তখন তার কারণ হল মানসিক দুর্বলতা।[৪৩]

কর্মই বিচার্য, কর্তা নয়

'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়',—এটি এমন একটি আপ্তবাক্য যা সহজে বোধগম্য

হলেও খুব অল্প ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় আর এই কারণেই বিদ্বেষের বিষ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই অহিংসা হচ্ছে সত্যানুসন্ধানের ভিত্তি। প্রতিদিনই আমি বুঝতে পারছি এই অনুসন্ধান অহিংসা-ভিত্তিক না হলে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোনও ব্যবস্থাকে প্রতিহত করা ও তাকে আক্রমণ করা বেশ যুক্তিসঙ্গত কিন্তু যে এর প্রণেতা তাকে প্রতিহত ও আক্রমণ করা নিজের বিরুদ্ধেই অনুরূপ আচরণের সামিল। আমরা সকলে একই দোষে দোষী এবং এক ও অভিন্ন স্রষ্টার সন্তান বলে আমাদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তিও অসীম। কোনও একক ব্যক্তিকে আহত করার অর্থ এই ঐশ্বরিক ক্ষমতাগুলিকে অপমান করা, তাতে শুধু ঈশ্বরেরই ক্ষতিসাধন করা হয় না, তার সঙ্গে ক্ষতি করা হয় সমগ্র বিশ্বের।[৪৪]

মানুষ এবং তার কাজ দুটি পৃথক বস্তু। ভালো কাজে যেমন সায় জানাতে হয় ও মন্দ কাজে আপত্তি, সেইসঙ্গে কাজটির কর্তাকেও শ্রদ্ধা বা অনুকম্পা প্রদর্শন করতে হবে কাজটির ভালো-মন্দ বিচার করে।[৪৫]

যারা কৃত-কার্যের পরিবর্তে কর্তাকে ধ্বংস করতে চায়, তারা ওই কর্তার চেয়েও গর্হিত কাজ করে, কারণ কর্তাকে ধ্বংস করলেই তাদের কৃত-কর্মও বিনষ্ট হয়ে যাবে—তাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। এরা জানে না, পাপের উৎস কোথায়।[৪৬]

অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হল, অহিংস সংঘাতের পরে কোনও তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে না এবং শত্রুরা মিত্রে পরিণত হয়। দক্ষিণ অফ্রিকায় জেনারেল স্মাট্‌স-এর ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছিল। গোড়ায় তিনি ছিলেন আমার কট্টর বিরোধী ও সমালোচক। আজ তিনি আমার সহৃদয় বন্ধু।[৪৭]

অহিংসার প্রধান কথাই হল, আমাদেব মধ্যের অহিংসা যেন প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠোর না করে কোমল করে তোলে, তাকে দ্রবীভূত করে; তার হৃদয়তন্ত্রীতে সমভাবের অনুরণন তোলে।

অহিংসাপন্থী হিসেবে তোমবা কি বলতে পারো যে তোমরা যথার্থ অহিংস আচরণ করো? তোমরা কি বলতে পারো, প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত বাণ উন্মুক্ত বক্ষে ধারণ করো এবং তা ফিরিয়ে দাও না? বলতে পারো কি, তোমরা ক্রুদ্ধ হও না বা প্রতিপক্ষের সমালোচনায় বিচলিত হও না?[৪৮]

আজীবন অহিংসা অভ্যাস করার ফলে, যথেষ্ট অসম্পূর্ণ হলেও, এর ব্যবহারে নিজেকে আমি দক্ষ বলে মনে করি। আরও বিশদভাবে বললে, যতই অহিংসা আমি ব্যবহার করি ততই স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, আমার জীবনে অহিংসার পূর্ণ প্রকাশ থেকে কত দূরে আমি রয়ে গেছি। পৃথিবীতে মানুষ আজ তার মহত্তম কর্তব্য বিষয়ে অজ্ঞ। তাই সে বলছে হিংসার তাণ্ডবের মধ্যে অহিংসার সফল হওয়ার সুযোগ আজ খুবই কম। কিন্তু আমি অকুতোভয়ে বলতে পারি, এই আণবিক বোমার যুগে বিশুদ্ধ অহিংসাই হচ্ছে একমাত্র শক্তি যা হিংসার সমস্ত কৌশল সমবেত হলেও তাকে পরাজিত করতে সক্ষম।[৪৯]

২৩. অহিংসার প্রশিক্ষণ

"ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীকে আমরা এই দুরূহ কাজ কীভাবে শেখাব?"

এর কোনও সহজ রাস্তা নেই। একমাত্র পথ, নিজের জীবনে এই আদর্শ মূর্ত করে তোলা, এর বাণীকে প্রাণবন্ত করে তোলা। অবশ্যই, নিজের জীবনে অহিংসার প্রকাশ ঘটাতে হলে সবার আগে চাই, সুগভীর অধ্যয়ন, অপরিসীম ধৈর্য ও আপন সত্তাকে নিঃশেষে কলুষমুক্ত করা। ভৌতবিজ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য তোমাকে যদি সারা জীবন ব্যয় করতে হয়, তাহলে মানবজাতির এ-যাবৎ জ্ঞাত মহত্তম আত্মিক শক্তি আয়ত্ত করার জন্য কতগুলি জীবনকালের প্রয়োজন? কিন্তু, হোক না বহু-জীবনকাল! তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কী আছে? কারণ, এটাই যদি জীবনের একমাত্র স্থায়ী সম্পদ, একমাত্র অমূল্য শিক্ষা হয়, তাহলে একে অধিগত করার জন্য যে-চেষ্টাই তুমি করো না কেন, তা তো সঙ্গত কারণেই করছ। প্রথমে সন্ধান করো স্বর্গরাজ্যের, তাহলে আর সবকিছুই এর সঙ্গে আসবে। এই স্বর্গরাজ্য হল অহিংসা।[৫৩]

অহিংসায় প্রশিক্ষিত হওয়ার জন্য অস্ত্রের কোনও দরকারই নেই। সত্যি বলতে কি, অস্ত্র যদি থাকে, তো ছুঁড়ে ফেলে দিতেই হবে, সীমান্ত প্রদেশে খানসাহেব যেমন করেছেন। যারা বলে, অহিংসা শেখার আগে আমাদের হিংসা শেখা একান্তই আবশ্যক তারা নিশ্চয়ই এটাও বলে যে একমাত্র পাপীরাই সন্ত হতে পারে।

সবার আগে চাই নির্ভীকতা

হিংসার প্রশিক্ষণে যেমন হত্যা করার শিল্প আয়ত্ত করতে হয়, তেমনই অহিংসার প্রশিক্ষণে আয়ত্ত করতে হয় মৃত্যুবরণের শিল্প। হিংসার অর্থ ভয় থেকে মুক্তি নয়, বরং ভীতির কারণের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায় উদ্ভাবন। অপরপক্ষে, অহিংসার ক্ষেত্রে ভয়ের কোনও কারণ নেই। অহিংসার উপাসককে ভীতিমুক্ত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তার জমি, সম্পদ, জীবন সবকিছুই তাকে হারাতে হতে পারে কিন্তু এ-নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না। যে সর্ববিধ ভয় জয় করেনি, সে সুচারুভাবে অহিংসা প্রয়োগ করতে পারবে না। অহিংসার উপাসকের একটি ভয় শুধু থাকবে। সেটি হল ঈশ্বরভীতি। যে ঈশ্বরের কাছে আশ্রয়প্রার্থী তাকে একবার দেহোত্তীর্ণ আত্মাকে দর্শন করতে হবেই। এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ যদি অবিনাশী আত্মার দর্শন পায় তাহলে সে নশ্বর দেহের প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করে। অতএব অহিংসার প্রশিক্ষণ, হিংসার প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ। ঐহিক বস্তুর আরক্ষণের জন্য হিংসার প্রয়োজন, অহিংসার প্রয়োজন আত্মাকে, আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য। ঘরে বসে এই অহিংসা শেখা যাবে না। এর জন্য উদ্যমী হতে হবে। নিজেদের পরীক্ষা করার জন্য, বিপদ ও মৃত্যুর মুখে অকুতোভয় হতে হবে, শরীরের ব্যাপারে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে এবং সর্ববিধ প্রতিকূলতা সহ্য করাব ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। দুজন লোক লড়াই করছে দেখলে

যার কাঁপুনি ধরে ও চম্পট দেয় সে অহিংস নয়, কাপুরুষ। অহিংস মানুষ ওই লড়াই বন্ধ করার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও পিছপা হবে না। সহিংসের চেয়ে অহিংসের সাহসিকতা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। হিংসাশ্রয়ীর তকমা হল তার অস্ত্র, বর্শা বা তলোয়ার বা রাইফেল। অহিংসের বর্ম হলেন ঈশ্বর।

যে অহিংসায় শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক তার জন্য এটা কোনও পাঠক্রম নয়। কিন্তু যে নীতিগুলির কথা বললাম তার থেকে একটি পাঠক্রম দাঁড় করানো সহজ।[৫১]

নির্ভীকের অহিংসা

অহিংসার জন্য বাইরে থেকে বা প্রকাশ্যে কোনওরকম তালিম দেবার দরকার হয় না। এর জন্য আবশ্যক, বদলা নেওয়ার জন্য হত্যা না করার ইচ্ছাশক্তি এবং প্রতিশোধস্পৃহামুক্ত হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার সাহস। এটা কোনও অহিংসার উপদেশ বাণী নয় বরং সহজ যুক্তির কথা, বিশ্বজনীন এক আইনের পাঠ। এই আইনে যদি অপরিমিত বিশ্বাস থাকে তাহলে কোনও প্ররোচনাই সংযমের বাঁধ ভাঙতে পারে না। একেই আমি নির্ভীকের অহিংসা বলে বর্ণনা করেছি।[৫২]

যে-অহিংসা কেবল একজন ব্যক্তিবিশেষ কাজে লাগাতে পারে, সমাজের ক্ষেত্রে তার উপাযোগিতা খুব একটা বেশি নয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজোপযোগী হতে গেলে তার নিষ্পন্ন কাজগুলি এমন হওয়া আবশ্যক যাতে উপযুক্ত অধ্যবসায় থাকলে যে-কেউ তা অর্জন করতে পারে। কেবলমাত্র বন্ধুদের মধ্যেই যার ব্যবহার সীমাবদ্ধ, অহিংসার কাছে তার মূল্য একটি স্ফুলিঙ্গের চেয়ে বেশি নয়। এটা 'অহিংসা' নামে আখ্যাত হতে পারে না। 'অহিংসার সামনে শত্রুতা অদৃশ্য হয়ে যায়'—এই নীতিবাক্যটি অসামান্য। এর অর্থ, চরম শত্রুতা অপসারণের জন্য চরম সমমাত্রায় অহিংসা প্রয়োগ করতে হবে।

এই গুণ অর্জনের জন্য চাই দীর্ঘ অনুশীলন, যা জন্ম-জন্মান্তর ধরেও চলতে পারে। এই কারণে তা মূল্যহীন হয়ে যায় না। তীর্থপথে চলতে চলতে প্রতিদিনই তীর্থযাত্রীর নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হবে, যাতে করে, শীর্ষে পৌঁছে বাঞ্ছিত সৌন্দর্য দেখবার আগেই তার ছিটেফোঁটা সে দেখতে পাবে। এর ফলে তার উৎসাহ বেড়ে যাবে। অবশ্য কেউ যেন এই ধারণা করে না বসে যে, গোটা পথটাই গোলাপের গালিচায় ঢাকা, কোনও কাঁটা নেই। জনৈক কবি বলেছেন, যারা অসমসাহসী তারাই শুধু ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে, ক্ষীণহৃদয়রা নয়। আজ পরিবেশ এমনই বিষাক্ত যে, কেউ প্রাচীন ঋষিদের নীতিবাক্য শুনতে এবং কর্মক্ষেত্রে অহিংসার অসংখ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরিক হতে চায় না। "ইষ্ট এসে অনিষ্টকে নির্বীর্য করে দেয়"—এই প্রাজ্ঞ-বচন প্রাত্যহিক কার্যক্ষেত্রে অনুভূত হয়। আমরা কেন এটা ভাবতে পারি না যে, বিশ্বের সকল কাজকর্মই যদি ধ্বংসাত্মক হতো তাহলে এর পরিণামে কবেই না শেষের সেদিন ঘনিয়ে আসত। প্রেম বা অহিংসাই আমাদের এই বসুন্ধরাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এইটুকু মানতেই হবে। এই অমূল্যজীবনের আশীর্বাদকে বহু আয়াসে পরিচর্যা করতে হবে—সমৃদ্ধতর করতে হবে কারণ এর মাধ্যমেই উত্তরণ ঘটে। নামা সহজ, ওঠাই কঠিন। আমাদের

মধ্যে অধিকাংশই নিয়মানুবর্তী নই—তাই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা মানেই সামান্য কারণে অন্যের সঙ্গে বিবাদ বা হানাহানি।

যার মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলা রয়েছে, অহিংসার এই সর্বোত্তম আশীর্বাদ তার ওপরেই বর্ষিত হবে।[৫৩]

২৪. অহিংসার প্রয়োগ

কেউ যদি তার ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহিংসা অভ্যাস না ক'রে ভাবে যে বড়সড় ব্যাপারে এর প্রয়োগ করবে তাহলে তার ভুল হবে সীমাহীন। দাক্ষিণ্যের মতই অহিংসারও সূচনা হতে হবে স্ব-গৃহে।

কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যদি অহিংসায় প্রশিক্ষিত হওয়া জরুরি হয় তাহলে জাতিকেও অনুরূপভাবে প্রশিক্ষিত হতেই হবে। একজন তার নিজস্ব বৃত্তে অহিংস হবে এবং তার বাইরে সহিংস, এটা হতে পারে না। অন্যভাবে, এমনকি নিজের পরিচিত বৃত্তেও অনেকে অহিংস নয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, অহিংসা নেহাৎ-ই একটা বাইরের ব্যাপার। যখন তুমি প্রতিরোধের সম্মুখীন হও, যেমন, যখন চোর বা খুনীর আবির্ভাব ঘটে তখনই তোমার অহিংসা পরখ হয়। হয় তুমি চোরকে তারই অস্ত্র দিয়ে নিরস্ত্র করবে বা করার চেষ্টা করবে অথবা ভালবাসা দিয়ে তাকে জয় করবে। ভদ্র ও বিনয়ী লোকেদের মধ্যে থাকলে তোমার আচরণ অহিংস বলে গণ্য না-ও হতে পারে।

পারস্পরিক ধৈর্যশীলতার নামই অহিংসা। তাই যখনই তুমি এই বিশ্বাসে উপনীত হবে যে অহিংসা হচ্ছে জীবনের আইন তখনই তোমার সঙ্গে যারা সহিংস ব্যবহার করছে তাদের বেলায় এটা ব্যবহার করবে। এই আইন ব্যক্তির মতই জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিঃসন্দেহে প্রশিক্ষণ আবশ্যক। এবং সূচনাটি ছোট মাপেই হয়। কিন্তু বিশ্বাস থাকলে বাকিটা পরপর ঘটতে থাকে।[৫৪]

অহিংসার বিশ্বজনীনতা

আদর্শ হিসেবে অহিংসাকে সর্বব্যাপী হতে হবে। কর্মপ্রক্রিয়ার একটি ক্ষেত্রে আমি অহিংস ও অন্য ক্ষেত্রে সহিংস—এমন হতে পারে না।[৫৫]

অহিংসা ব্যক্তিবিশেষ ব্যবহার করতে পারে কিন্তু বহু ব্যক্তির দ্বারা গঠিত জাতি ব্যবহার করতে পারে না—এ-কথা বলা অধর্ম।[৫৬]

আমার মতে, কোনওভাবেই অহিংসাকে নিষ্ক্রিয়তা বলা চলে না। অহিংসা বলতে আমি বুঝি, জগতের সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি....অহিংসা সর্বোচ্চ আইন। আমার অর্ধশতকের অভিজ্ঞতায় এমন কোনও অবস্থায় আমি এখনও পড়িনি যখন আমাকে বলতে হয়েছে, আমি অসহায়, অহিংসার মধ্যে আমি কোনও প্রতিকার খুঁজে পাই না।[৫৭]

অহিংসার অনুশীলন

আমি একজন অদম্য আশাবাদী। ব্যক্তিবিশেষের অহিংস হয়ে ওঠার অসংখ্য সুযোগ আছে—এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমার আশাবাদ দাঁড়িয়ে আছে। তুমি যতই তোমার সত্তায় একে বিকশিত করে তুলবে, ততই এই আশাবাদ সংক্রামক হয়ে উঠবে এবং শেষে তা তোমার পারিপার্শ্বিকের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে এবং এমনকি বিশ্বময়ও ছড়িয়ে পড়তে পারে।[৫৮]

প্রথম যৌবনেই আমি জেনেছি যে, অহিংসা এমন কোনও নিভৃতবাসী স্বভাবগুণ নয়, ব্যক্তিবিশেষকে যার চর্চা করতে হবে তার শান্তি ও পরমমুক্তির জন্য, বরং এ হল সেই সমাজের এক আচরণবিধি, যে সমাজ ধারাবাহিক মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চায় এবং বহুযুগ ধরে তার যে শান্তির আর্তি সেই শান্তির পথে অগ্রসর হতে চায়।[৫৯]

সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে অহিংসা প্রয়োগ করলে এর প্রকৃত মূল্য জানা যায়। এর সাহায্যে ধরাধামে স্বর্গস্থাপন সম্ভব। অপর জগত বলে কিছু নেই। সব জগতই এক। 'এখানে' ও 'ওখানে' বলে কিছু নেই। জিনস্ যেমন দেখিয়েছেন, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণেও অ-দৃশ্য সেই সুদূর নক্ষত্ররাজিসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি অণুতে আশ্রিত।

অতএব, অহিংসার ব্যবহার কেবল গুহাবাসীদের মধ্যে এবং অন্য-ভুবনে সুপ্রতিষ্ঠালাভের গুণাবলী অর্জনের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা ভুল বলে আমি মনে করি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্যকর না হলে, কোনও গুণেরই সার্থকতা থাকে না।[৬০]

ব্যাপকক্ষেত্রে ব্যবহার

ব্যাপকক্ষেত্রে নির্ভীকের অহিংসা আমরা দেখতে পাই না—এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কেউ কেউ এমন সন্দেহও পোষণ করে যে, গোষ্ঠী বা দলের পক্ষেই যেখানে অহিংসা প্রয়োগ করা দুষ্কর সেখানে ব্যাপক জনগণের প্রশ্ন ওঠে কী করে? তাদের মতে অহিংসার ব্যবহার অ-সাধারণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে, যা কয়েকজনমাত্র ব্যক্তির আয়ত্তাধীন তা মানবজাতিব কোনও কল্যাণে লাগতে পারে না।[৬১]

কার্যকরতা

একটানা পঞ্চাশ বছর ধরে আমি বৈজ্ঞানিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার সঙ্গে অহিংসা ও তার সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছি। সংসারে, প্রতিষ্ঠানে, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—জীবনের সর্বস্তরে আমি এর প্রয়োগ করেছি। এমন একটি ঘটনাও আমি জানি না যখন অহিংসা ব্যর্থ হয়েছে। যখন মনে হয়েছে যে অহিংসা ব্যর্থ হয়েছে তখন তার জন্য আমি নিজের অসম্পূর্ণতাকে দায়ী করেছি। নিজের পক্ষে কোনও সম্পূর্ণতার দাবিদার আমি নই। কিন্তু আমি মনে করি, আমি একজন আবেগতাড়িত সত্যসন্ধানী—যে সত্যের অপর নাম হল ঈশ্বর। এই সন্ধানের পথেই আমি অহিংসা আবিষ্কার করি।

এর প্রচারই আমার জীবনাদর্শ। এই জীবনাদর্শ চরিতার্থ করা ছাড়া জীবনে আর কোনও আগ্রহ আমার নেই।[৬২]

অহিংসার সংকীর্ণ ও ঋজু পথটি ছাড়া বেদনার্ত বিশ্বের সামনে আর কোনও আশাপ্রদ পথ খোলা নেই। আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সত্যকে নিজের জীবনে মূর্ত করে তুলতে ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু সেই ব্যর্থতা হবে তাদের নিজেদের, কখনওই চিরন্তন আইনের নয়।[৬৩]

২৫. অহিংস সমাজ

অহিংসাকে নিছক একটি ব্যক্তিগত অনুশীলনলব্ধ গুণ বলে আমি মনে করি না। অন্যান্য গুণাগুণের মতই এটি একটি অনুশীলনীয় সামাজিক গুণ। নিশ্চিতভাবেই পারস্পরিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সমাজ মূলত অহিংসার দ্বারা চালিত। আমি চাই তা আরও ব্যাপক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রসার লাভ করুক।[৬৪]

পৃথিবীকে যেমন তার নিজের অবস্থানে ধরে রেখেছে অভিকর্ষ তেমনই সমগ্র সমাজকে এক করে রেখেছে অহিংসা। কিন্তু অভিকর্ষ যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল তখন এই আবিষ্কারের ফলে এমন সব ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়েছিল যে বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের কোনও ধারণা ছিল না। তেমনই অহিংসার আইনানুযায়ী যখন সচেতনভাবে সমাজ গঠিত হবে তখন বৈষয়িক খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে এর গঠন হবে আজকের তুলনায় ভিন্নতর। কিন্তু অহিংসাভিত্তিক সরকার কেমন হবে সে সম্বন্ধে আগে থেকে আমি কিছু বলতে পারব না।

আজ যা ঘটছে তা হল, অহিংসার সূত্রটিকে নস্যাৎ করে হিংসাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা, যেন এটাই চিরন্তন আইন।[৬৫]

একমাত্র গ্রামে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়ে অহিংসা-ভিত্তিক সমাজ গড়তে পারে। এদের মধ্যে সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ অস্তিত্বের শর্ত হল ঐচ্ছিক সহযোগিতা।[৬৬]

সরকার

একটি সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণ অহিংস হয়ে ওঠা কঠিন, কারণ সে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। আজ আমার পক্ষে এ-জাতীয় স্বর্ণযুগের চিন্তা সম্ভব নয়। কিন্তু মূলত অহিংস সমাজের সম্ভাবনায় আমি বিশ্বাসী। এবং তার জন্য কাজ করছি।[৬৭]

আদর্শ এক সমাজে কোনও সরকার থাকবে-কি-থাকবে-না তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে। আমার মনে হয় না, বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে। অনুরূপ একটি সমাজের জন্য আমরা যদি কাজ করে চলি, তাহলে ধীরে ধীরে তা এমন একটি রূপলাভ করবে, যা থেকে জনগণ উপকৃত হতে পারবে। ইউক্লিডের

সরলরেখার কোনও প্রস্থ নেই। কিন্তু এখনও সেই রেখা কেউ আঁকতে পারেনি, পারবেও না। তবু, আদর্শ রেখাটি মনে রেখেই আমরা জ্যামিতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পেরেছি। এক্ষেত্রে যা সত্য তা প্রতিটি আদর্শ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

নৈরাজ্য

বিশ্বের কোথাও কোনও সরকারবিহীন রাষ্ট্র নেই, এটা মনে রাখা দরকার। যদি কোথাও সম্ভব হয় তাহলে তা ভারতেই হবে। এর কারণ হল, এ-ব্যাপারে একমাত্র আমাদের দেশেই কিছুটা চেষ্টা হয়েছে। এখনও এ-ব্যাপারে পর্যাপ্ত সাহসিকতা আমরা দেখাতে পারিনি, আর, এটা অর্জন করার একটিমাত্র পথই খোলা রয়েছে। শেষোক্ত ব্যাপারে যাদের আস্থা আছে তাদের এটা দেখতে হবে। এবং এটা করতে হলে মৃত্যুভয় পুরোপুরি বর্জন করতে হবে, যেভাবে আমরা কারাগারের ভয়কে পরিহার কবতে পেরেছি।[৬৮]

গণতন্ত্র ও অহিংসা

যুদ্ধবিজ্ঞান নির্ভেজাল ও অকাট্য একনায়কতন্ত্রের পথে নিয়ে যায়। একমাত্র অহিংসা-বিজ্ঞানই পরিশুদ্ধ গণতন্ত্রের পথ দেখাতে পারে।[৬৯]

গণতন্ত্র ও হিংসা একসঙ্গে চলতে পারে না। যেসব রাষ্ট্র আজ শুধু নামেই গণতান্ত্রিক, তাদের হয় খোলাখুলি সর্বগ্রাসী রূপ নিতে হবে, নতুবা প্রকৃত গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে গেলে সাহসের সঙ্গে অহিংস হতে হবে।[৭০]

জাতীয় স্তরে অহিংসাকে স্বীকৃতি না দিলে সাংবিধানিক বা গণতান্ত্রিক সরকার বলে কিছু হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক—সর্বত্র জীবনের সূত্র হিসেবে অহিংসার প্রচারের জন্য আমি আমার জীবনীশক্তি নিয়োজিত করেছি।

আমার ধারণা, ক্ষীণভাবে হলেও সেই আলো আমি দেখেছি। আমি সতর্ক হয়ে একথা লিখছি, কারণ আইনটিকে তার সমগ্রতায় জানি বলে আমি দাবি করতে পারি না। আমাব পরীক্ষার সাফল্য সম্বন্ধে যদি আমি অবহিত হই, তাহলে এর ব্যর্থতাগুলিও আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সাফল্যগুলি আমাকে এক অনির্বাণ আশায় উদ্দীপিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি বারংবার বলেছি, কেউ যদি উপায় সম্বন্ধে যত্নবান হয় তাহলে লক্ষ্য আপনা-আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ করবে। অহিংসা হল উপায় এবং সকলেরই লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আন্তর্জাতিক লীগ একমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে সকল জাতিই পূর্ণরূপে স্বাধীন হবে। সংশ্লিষ্ট জাতিগুলি যে অনুপাতে অহিংসাকে আত্মস্থ করবে, এই স্বাধীনতার প্রকৃতি তাব উপরে নির্ভরশীল হবে। একটি বিষয় নিশ্চিত। অহিংসা-ভিত্তিক এক সমাজে ক্ষুদ্রতম জাতিও নিজেকে বৃহত্তমের সমকক্ষ বলে ভাববে। কে উত্তম, কে অধম, এই ধাবণাই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে।

....অহিংসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে, আমার মতো একজনের পক্ষে এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটাই সম্ভব যে, অহিংসা যতদিন না নিছক নীতি না হয়ে একটি জীবন্ত শক্তি, একটি অলঙ্ঘনীয় আদর্শ বলে গণ্য হবে, ততদিন সাংবিধানিক বা গণতান্ত্রিক সরকার দুস্তর স্বপ্ন হয়ে থেকে যাবে। যদিও আমি বিশ্বজনীন অহিংসার কথা বলি, তবু আমার পরীক্ষা ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা যদি সফল হয় তাহলে বিনা দ্বিধায় বিশ্ব এটি গ্রহণ করবে। এখানে একটা বড় 'কিন্তু' রয়ে গেছে। বিলম্ব যদিও আমাকে উদ্বিগ্ন করে না, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেই আমার বিশ্বাস সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়।'[১১]

ক্ষমতার ব্যবহার

অহিংসার চরিত্রানুযায়ীই, সে ক্ষমতা 'দখল' করতে পারে না বা এটা তার অভীষ্টও নয়। *কিন্তু অহিংসা এর চেয়েও বেশি কিছু করতে পারে।* সরকারি যন্ত্র দখল না করেও *অহিংসা ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চালিত করতে পারে।* এখানেই অহিংসার সৌন্দর্য।

এর একটি ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। জনগণের অহিংস অসহযোগিতা যদি এমন পূর্ণতা পায় যে প্রশাসনের তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল বা বিদেশী আক্রমণের আঘাতে প্রশাসন ভেঙে পড়ল, সেক্ষেত্রে যে শূন্যস্থান তৈরি হবে তা পূরণ করার জন্য গণপ্রতিনিধিরা এগিয়ে আসবে। তত্ত্বগত দিক দিয়ে এটা সম্ভব।

কিন্তু ক্ষমতার ব্যবহারকে যে সহিংস হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। পিতা সন্তানদের ওপরে ক্ষমতা বজায় রাখেন, প্রয়োজনে শাস্তিও দেন কিন্তু তার মধ্যে হিংসা থাকে না। সেই ক্ষমতাই সবচেয়ে কার্যকর যা পীড়া দেয় না। সঠিকভাবে ব্যবহৃত ক্ষমতা ফুলের মতই লঘুভার হবে, কেউ তার ওজন বুঝতে পারবে না।

জনগণ স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। একাধিকবার আমার হাতে একনায়কের একচ্ছত্র ক্ষমতা এসেছে। কিন্তু সকলেই জানত, তাদের ঐচ্ছিক সম্মতির ওপরেই আমার ক্ষমতা নির্ভরশীল। তারা যে-কোনও সময় আমাকে অপসারিত করতে পারত এবং টুঁ-শব্দটি না ক'রে আমি নিজে নেমে দাঁড়াতাম।

মহাপুরুষ ও অতিমানবরা যুগে যুগে একবার করেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু একজন ব্যক্তিও যদি অহিংসার আদর্শ সম্যক উপলব্ধি করে তাহলে তার প্রভাব ও উজ্জ্বলতা গোটা সমাজকে উজ্জীবিত করবে। যীশু পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাই, তাঁর অবর্তমানে তাঁর বারোজন শিষ্য আরব্ধ কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

বহু প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের ধৈর্য ও প্রতিভার ফলে তড়িৎশক্তির সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু আজ সকলেই, এমনকি শিশুরাও তাদের দৈনন্দিন জীবনে তড়িতের শক্তি ব্যবহার করে। তেমনই, একবার একটি আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তব রূপ পেলে তার পরিচালনার জন্য কোনও আদর্শ-ব্যক্তির প্রয়োজন যে হতেই হবে এমন নয়। গোড়াতেই দরকার হল এক সর্বব্যাপী সামাজিক জাগরণের, বাকিটা আপনিই ঘটবে।

হাতের কাছের উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, আমি শ্রমিক শ্রেণীকে বলেছি যে, আসল পুঁজি কিন্তু রূপা বা স্বর্ণ নয়, আসল পুঁজি হল তাদের দুটি হাত, দুটি পা-এব

শ্রম এবং তাদের মেধা। একবার শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত হলে তাদের ক্ষমতার স্ফূরণের জন্য আর আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না।[৭২]

২৬. অহিংস রাষ্ট্র

অনেকেই মাথা নেড়ে এ-কথা বলেছে, "কিন্তু, আপনি জনগণকে অহিংসা শেখাতে পারবেন না। এটা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেই হতে পারে এবং সেও ক্বচিৎ কদাচিৎ।" এটা আমার মতে স্থূল আত্ম-প্রবঞ্চনা। মানবজাতি যদি স্বভাবগতভাবে অহিংস না হতো তাহলে বহুযুগ আগেই সে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলত। কিন্তু সহিংস ও অহিংস, এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বে শেষোক্তরা সবসময়েই জয়ী হয়েছে।

সত্য ঘটনা হল, রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে উপায় হিসেবে জনগণের মধ্যে অহিংসার প্রসার ঘটানোর জন্য আমরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজেও লাগিনি বা পর্যাপ্ত ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষাও করিনি।[৭৩]

রাজনৈতিক ক্ষমতা

আমার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা চূড়ান্ত কোনও লক্ষ্য নয়, ববং জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনগণ যাতে নিজেদের উন্নতি ঘটাতে পারে, তার একটি উপায়। রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হল জাতীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। জাতীয় জীবন যদি স্ব-নিয়ন্ত্রিত হবার মতো সুচারু হয়ে ওঠে, তখন কোনও প্রতিনিধির দরকার হবে না। তখন এক প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত নৈরাজ্যের রাষ্ট্রও গড়ে উঠতে পাবে যেখানে প্রত্যেকেই নিজের শাসক। সে এমনভাবে নিজেকে শাসন করে যে সে কখনওই প্রতিবেশীর কাছে বাধাস্বরূপ হয়ে ওঠে না।

অতএব আদর্শ রাষ্ট্রে কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে না। যেহেতু রাষ্ট্রও থাকবে না। কিন্তু জীবনে কখনওই সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ ব্যবস্থা হয় না। এই জন্য থরো সেই ধ্রুপদী মন্তব্যটি করেছিলেন—সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যা সবচেয়ে কম শাসন করে।[৭৪]

পুঁজিবাদ ও অছিগিরি

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাষ্ট্র যদি হিংসার সাহায্যে পুঁজিবাদকে দমন করে তাহলে তা হিংসার পাকে পাকে জড়িয়ে পড়বে এবং কখনওই অহিংসার বিকাশ ঘটাতে পারবে না। রাষ্ট্রের হিংসা প্রকাশ পায় কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত আকারে। ব্যক্তিবিশেষের একটি আত্মা রয়েছে কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু মনপ্রাণহীন যন্ত্র, একে কখনওই হিংসামুক্ত করা যাবে না। কারণ তার ওপরে নির্ভর করেই রাষ্ট্রযন্ত্র টিকে থাকে। এই কারণেই আমি অছিগিরির মতাদর্শকে শ্রেয় মনে করি।

এই ভয়টা সবসময়েই থেকে যায় যে, রাষ্ট্র যাদের সঙ্গে একমত হবে না তাদের বিরুদ্ধে সে অতিরিক্ত হিংসা প্রয়োগ করতে পারে। আমি বরং খুবই খুশি হব, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অছি হিসেবে আচরণ করে। কিন্তু তারা যদি একাজে ব্যর্থ হয় তাহলে ন্যূনতম হিংসা প্রয়োগ করে রাষ্ট্র বিষয়সম্পত্তি থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারে।

এই কারণেই আমি গোল-টেবিল বৈঠকে বলেছিলাম যে, প্রত্যেকটি কায়েমী স্বার্থের ব্যাপারই খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং যেখানে দরকার সেখানে বাজেয়াপ্তকরণের নির্দেশ দিতে হবে। ঘটনার গুণাগুণ অনুযায়ী স্থির হবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি হবে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের চেয়ে অছিগিরির ধারণাটির প্রসার ঘটানোই শ্রেয়, কারণ আমার মতে রাষ্ট্রের হিংসার তুলনায় ব্যক্তি মালিকানার হিংসা কম আঘাত হানে। যাইহোক, অবশ্যম্ভাবী হলে আমি ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমর্থন করব।

মানুষ অভ্যাসের দাস, একথা মেনে নিয়েও বলছি, তার পক্ষে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে বাঁচাই শ্রেয়। আমি এ-ও বিশ্বাস করি যে, মানুষ তার ইচ্ছাশক্তিকে এতটাই উন্নত করে তুলতে পারে যে শোষণের পরিমাণ ন্যূনতমে নামিয়ে আনাও তার পক্ষে সম্ভব।

রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতাব বৃদ্ধি দেখলে আমি যারপরনাই ভীত হই। কারণ, এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে শোষণের মাত্রা কমলেও মানবজাতির সবচেয়ে বড় ক্ষতিও হয়ে যায়, কারণ যে ব্যক্তিসত্তাকে বিনাশ করা হয় সেটাই হল সর্ববিধ প্রগতির উৎস।

আমরা এরকম অনেক ঘটনা জানি, যেখানে ব্যক্তিরা অছিগিরি গ্রহণ করেছে। কিন্তু রাষ্ট্র যেখানে গরিবদের জন্য সক্রিয় হয়েছে সেখানে অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি।'[৭৫]

অহিংস স্বরাজ

অহিংসাভিত্তিক স্বরাজে জনগণকে তাদের অধিকার না জানালেও চলবে, কিন্তু তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে। এমন কোনও কর্তব্য নেই, যাকে ঘিরে অধিকার সৃষ্ট হয় না এবং সেগুলিই হল প্রকৃত অধিকার যা একের কর্তব্যের সুষ্ঠ পালনের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট হয়। অতএব, প্রকৃত নাগরিকের অধিকার তাদের ওপরেই বর্তায় যারা আপন রাষ্ট্রের সেবা করে। এবং তাদের ওপরে যে অধিকার বর্তায় একমাত্র তারাই তার প্রতি সুবিচার করতে পারে।

মিথ্যা বলার ও গুণ্ডাবাজি করার অধিকার সকলেরই রয়েছে। কিন্তু এই ধরনের অধিকার প্রয়োগ করলে তা প্রয়োগকারী ও সমাজ, উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। কিন্তু যে সত্য ও অহিংসা অবলম্বন করে, তার জোটে সম্মান আর সম্মান নিয়ে আসে অধিকার। এবং যারা কর্তব্য পালনের ফলস্বরূপ অধিকার অর্জন করে তারা সমাজের স্বার্থেই কেবল তা প্রয়োগ করে, কখনওই নিজেদের জন্য নয়।

জাতির স্বরাজের অর্থ, প্রতিটি ব্যক্তির স্বরাজের (স্ব-শাসন) সমাহার এবং নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিবৃন্দের কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে এই স্বরাজ আসে। এই স্বরাজে কেউ

তার অধিকারের কথা ভাবে না। যখনই সুষ্ঠু কর্তব্যপালনের জন্য তাদের প্রয়োজন হয় তখন তারা এগিয়ে আসে।[৭৬]

অহিংসা-ভিত্তিক স্বরাজের শাসনে কেউ কারো শত্রু নয়, সকলেই সাধারণ স্বার্থে নারীপুরুষ নির্বিশেষে নিজস্ব বরাদ্দ কাজটুকু করে, সকলেই লিখতে-পড়তে পারে এবং তাদের জ্ঞানও দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায়। কেউই নিঃস্ব হয় না এবং শ্রমিক সবসময়েই কাজ পায়। এরকম একটি সরকারের শাসনে জুয়াখেলা, মদ্যপান, অনৈতিক কাজকর্ম বা শ্রেণী-হিংসার কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

ধনীরা তাদেব ধনসম্পদ বিচক্ষণতার সঙ্গে ও কার্যকভাবে ব্যবহার করবে। ঐহিক ভোগসুখ ও বৈভব বাড়াবার জন্য অর্থের অপচয় করবে না। এমন যেন না ঘটে, মুষ্টিমেয় ধনী রত্নখচিত প্রাসাদে বাস করবে, আব লক্ষ লক্ষ মানুষ দিন কাটাবে সূর্যালোক ও আলোবাতাসবর্জিত হৃতদরিদ্র চালাঘরে....

অহিংস স্বরাজে ন্যায্য অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যভাবে বললে, কেউ অন্যায্য অধিকার ভোগ করবে না। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রে দখলদারী বলে কিছু থাকবে না, এবং দখলকারীর দখল কেড়ে নেবার জন্য বলপ্রয়োগেরও প্রয়োজন হবে না।[৭৭]

বিকেন্দ্রীকরণ

আমি বলব, ভাবতকে যদি অহিংস পথে বিকাশলাভ করতে হয় তাহলে বহুক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যাক। কেন্দ্রীকরণকে টিকিয়ে রাখা ও বক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তির দরকার। সাধারণ বসতবাটি, যেখানে নেবাব মতো কিছু নেই সেখানে পুলিশ নিষ্প্রয়োজন। বড়লোকের প্রাসাদে ডাকাতির আশঙ্কায় কডা প্রহরা রাখতে হয়। বড় বড় কারখানা হলেও তাই। পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনী, সজ্জিত নগরকেন্দ্রিক ভাবতের চেয়ে গ্রামভিত্তিক ভারতে বিদেশী আক্রমণের ভয় কম থাকবে।[৭৮]

ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীকরণ সমাজেব অহিংস কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[৭৯]

আধুনিক রাষ্ট্র

বলপ্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গঠিত কোনও আধুনিক বাষ্ট্রের বহিরাগত বা আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার শক্তিকে অহিংসভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কোনও মানুষ একই সঙ্গে ঈশ্বর ও কুবেরের সেবা করতে পারে না বা একই সঙ্গে 'শান্ত ও ক্রুদ্ধ' হতে পারে না। দাবি করা হয়, অহিংসার ওপর ভিত্তি করেও রাষ্ট্র থাকতে পারে; অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র সশস্ত্র কোনও বিশ্বজোটের বিরুদ্ধেও অহিংস প্রতিরোধ গড়তে পারে। এইরকমই ছিল অশোকের রাষ্ট্র। এরকম উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। এবং যদি দেখা যায় যে অশোকের রাষ্ট্র অহিংসাশ্রয়ী ছিল না তাহলেও বক্তব্য অসার হয়ে যায় না। নিজস্ব গুণের ভিত্তিতে এর বিচার করতে হবে....।

সামরিক শক্তিতে যে বলীয়ান, সে কখনও অহিংসা প্রদর্শন করতে পারে না। তাই বাশিয়াকে যদি অহিংসা প্রদর্শন কবতে হয় তাহলে হিংসা সৃষ্টির সব ক্ষমতা পরিহার

করতে হবে। সত্যি ঘটনা হল, যারা একসময় সামরিক শক্তিতে শক্তিমান ছিল তারা যদি তাদের মনের পরিবর্তন ঘটায় তাহলে বিশ্বকে এবং তাদের প্রতিপক্ষকে তারা আরও ভালভাবে তাদের অহিংসার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে।[৮০]

২৭. হিংসা ও সন্ত্রাসবাদ

হিংসার দ্বারা কখনওই সত্যের প্রচার হয় না, এ আমি আমার অভিজ্ঞতায় শিখেছি। যারা নিজেদের আদর্শকে ন্যায্য বলে বিশ্বাস করে, তাদের অসীম ধৈর্য থাকা প্রয়োজন। যারা অপরাধমূলক কাজের মধ্য দিয়ে আইন ভাঙে না বা হিংসাশ্রয়ী দুষ্কর্ম করে না, কেবল তারাই আইন-অমান্যের যোগ্য।[৮১]

গণহিংসা

সরকার-সংগঠিত হিংসা সম্বন্ধে যেখানে আমার কিছু করণীয় নেই, সেখানে জনগণের অসংগঠিত হিংসা সম্বন্ধে আমার করণীয় তো আরও কম। এই দুই-এর মধ্যে বরং আমার পিষ্ট হয়ে যাওয়াই ভালো।[৮২]

আমার মতে, সরকারি হিংসার মতই গণহিংসাও আমাদের পথে সমান বাধার সৃষ্টি করে। আমি গণহিংসার তুলনায় বরং সরকারি হিংসাকে ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারি। কারণ, দ্বিতীয়টি মোকাবিলার সময় প্রথমটির মতো সমর্থন আমি পাবো না।[৮৩]

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, হিংসা কোনও ধর্মেরই আদর্শ নয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অহিংসা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রেই হিংসাকে অনুমোদন করা যায়। কিন্তু এখনও ভারতের সামনে অহিংসার চূড়ান্ত রূপটি আমি উপস্থাপিত করিনি।[৮৪]

আমি হিংসা বিরোধী। কারণ, যখন তা ভালো কাজের জন্য করা হয়, সেই ভালও নিতান্তই সাময়িক। এর থেকে যে পাপ হয় তা কিন্তু চিরস্থায়ী।[৮৫]

হিংসায় বিশ্বাস নেই

আমার বিশ্বাস, একটি আদর্শের পেছনে হিংসার সমর্থন যত বেশি, সেই আদর্শ তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপাতদৃষ্টিতে, বাস্তব এর বিপরীত মনে হলেও, কথাটা বলছি। আমার পথের প্রতিবন্ধক কাউকে বধ করে হয়তো মিথ্যা নিরাপত্তার বোধ আমি অনুভব করব। কিন্তু সেই নিরাপত্তা হবে সাময়িক। কারণ, ব্যাপারটির মূল কারণের মোকাবিলা আমি করিনি। যথাসময়ে অবশ্যই অন্য লোক এসে আমাকে বাধা দেবে। আমার কাজ তাই বাধাদানকারী মানুষ বা ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করা নয় বরং যার জন্য তারা আমায় বাধাদান করছে সেই কারণটির সন্ধান ক'রে প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।[৮৬]

সশস্ত্র অভ্যুত্থানে আমার বিশ্বাস নেই। ওষুধ হিসেবে এটি রোগের চেয়েও খারাপ,

আরোগ্য যার লক্ষ্য। এসব হল প্রতিশোধপরায়ণতা, ধৈর্যহীনতা ও ক্রোধের মনোভাবের পরিচায়ক। শেষ অবধি হিংসার পদ্ধতির ফল ভালো হতে পারে না।[৮৭]

বিপ্লবী

বিপ্লবীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কোনও মন্দ আদর্শের জন্য বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগ অতুলনীয় ক্ষমতার অযথা অপচয় এবং মন্দ আদর্শের জন্য অপব্যবহৃত বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মহিমায় ভালো আদর্শ থেকে দৃষ্টি টেনে নিয়ে তা শেষোক্তেরই ক্ষতিসাধন করে।

বীর ও আত্মত্যাগী বিপ্লবীর সামনে টান হয়ে দাঁড়াতে আমার লজ্জা নেই, কারণ একইভাবে আমি অহিংস মানুষের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে পাল্টা খাড়া করতে পারি, যা নির্দোষের রক্তে রঞ্জিত নয়। অন্যকে হত্যা করার কাজে নিরত লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের চেয়েও একটি নিষ্পাপ মানুষের আত্মত্যাগ লক্ষগুণে শক্তিশালী। ঈশ্বর বা মানুষের অভাবিত অভব্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ প্রতিবাদ হল নিষ্পাপের ঐচ্ছিক আত্মত্যাগ।

স্বরাজের পথে যে তিনটি প্রধান বাধা রয়েছে সেইদিকে আমি বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—এগুলি হল, চরকা প্রসারের কাজ অসমাপ্ত রাখা, হিন্দু-মুসলমান বিবাদ এবং নিপীড়িত শ্রেণীগুলির ওপরে অমানবিক নিষেধাজ্ঞা। ধৈর্যসাধ্য এই গঠনমূলক কাজে তাদের বরাদ্দ অংশ যথার্থ ধৈর্যের সঙ্গে পালন করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। কাজটি হয়তো যথেষ্ট দর্শনীয় নয়। কিন্তু এর জন্য দরকার বীরের অধ্যবসায়, নীরব, অবিরাম প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিগত পরিচিতির বিলোপ, যা কেবল সেরা বিপ্লবীরাই করতে পারে। ধৈর্যহীনতা বিপ্লবীদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ করে দেয়, তাকে বিপথে চালিত করে।

মিথ্যা উল্লাসে উত্তেজিত হয়ে ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে, ক্ষুধার্ত জনগণ যখন ধীরে ও অগোচরে নিজে স্বেচ্ছা-উপবাস করে তখন তা অনেক বেশি বীরত্বের।[৮৮]

নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা নিবারণ

আমার দেশের জনগণের দুর্দশা লাঘবের চেয়ে মানব প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা নিবারণ নিয়ে আমি বেশি চিন্তিত....আমি জানি স্বেচ্ছায় মানুষ যখন কষ্টভোগ করে তখন তার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের ও সমগ্র মানবজাতিকে উন্নীত করে। কিন্তু এমন মানুষদেরও আমি জানি যারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের বেপরোয়া চেষ্টায় বা দুর্বল জাতি বা দুর্বল মানুষকে শোষণ করার তাগিদে নিজেদের নির্মম করে তোলে এবং তার ফলস্বরূপ তারা নিজেদেরই শুধু নয়, মানবজাতিকেও অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।[৮৯]

ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণের মধ্যে বিশেষ কোনও রমণীয় বস্তু নেই। অনেক সময়, ম্যালেরিয়া-পীড়িত জনপদের মধ্যে শ্রম ও একঘেয়ে জীবনের তুলনায় অনুরূপ মৃত্যু সহজতর ব্যাপার....আমি আমার বিপ্লবী বন্ধুকে এই কথাই বলব যে, ফাঁসিকাঠ কেবল তখনই দেশের স্বার্থসাধন করে যখন ফাঁসিতে মৃত্যুবরণকারী 'নিষ্পাপ মেষশাবক' হয়।[৯০]

....যা কিছু ইউরোপীয় তারই আমি নিন্দা করি না। কিন্তু দেশ, কাল নির্বিশেষে

আমি গোপন হত্যা ও অন্যায় পদ্ধতির বিরোধী, এমনকি যদি তা সৎ উদ্দেশ্যেও হয়....শয়তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ষড়যন্ত্র হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে শয়তানি। এক শয়তানই আপাতত আমার পক্ষে যথেষ্ট, এর সংখ্যাবৃদ্ধির আর প্রয়োজন দেখি না....।[১১]

যে-কোনও কাপুরুষতাকে আমি ঘৃণা করি—তা দার্শনিক বা অন্যবিধ যা-ই হোক না কেন। এবং শেষপর্যন্ত আমি যদি দেখি, বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ কাপুরুষতাকে দূর করছে তাহলে এর পদ্ধতির প্রতি আমার ঘৃণা অনেকটা নরম হবে, যদিও নীতিগতভাবে আমি এর বিরোধীই থেকে যাব...।

কোনও অবস্থাতেই হত্যা, গুপ্তহত্যা বা সন্ত্রাসবাদ আমি ভালো বলে মনে করি না। আমি বিশ্বাস করি, শহীদের রক্তে পরিপুষ্ট হলে আদর্শ দ্রুত পরিপক্ক হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেবায় অবিচল থেকে সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে ধুঁকে ধুঁকে মরে, সে-ও কিন্তু ফাঁসিতে যে যায় তারই মতো রক্ত ঝরায়। যার ফাঁসি হয়, তার হাত যদি অন্যের রক্তে রঞ্জিত হয় তাহলে তার আদর্শ পুষ্ট হওয়ার যোগ্যই নয়।

ইতিহাসের নায়কগণ

এদের (বিপ্লবীদের) কাজকর্ম গুরু গোবিন্দ সিং বা ওয়াশিংটন বা গ্যারিবল্ডি বা লেনিনের সঙ্গে তুলনা করা একেবারেই ভুল ও বিপজ্জনক। তবে অহিংসার তত্ত্বের পরীক্ষার ভিত্তিতে দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি, আমি যদি পূর্বোক্তদের সময় তাঁদের দেশে থাকতাম তাহলে এঁদের প্রত্যেককে সফল ও সাহসী যোদ্ধা হিসেবে মানলেও বিপথে চালিত দেশপ্রেমিক বলে বর্ণনা করতাম....।

বীরদের কাজকর্মের খুঁটিনাটি ইতিহাসে যা লেখা আছে আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি ইতিহাসের মূল ঘটনাগুলি স্বীকার করি ও ব্যক্তিগত আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগ্রহণ করি। এবং এই ঘটনাগুলি যদি জীবনেব সর্বোচ্চ আইনবিরোধী হয় তাহলে এর পুনরাবৃত্তি আমি ঘটাতে চাই না। কিন্তু ইতিহাসের সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করার আমি বিরোধী। মৃতদের সম্বন্ধে কুমন্তব্য করা অনুচিত।

আমি কামাল পাশা ও ডি ভ্যালেরা-কেও বিচার করতে পারি না। এবং যুদ্ধে বিশ্বাসী বলে, তাঁরা আমার পথপ্রদর্শক হতে পারেন না, কারণ আমি সম্পূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাসী। আমি কৃষ্ণে বিশ্বাসী। কিন্তু আমার কৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, স্রষ্টা, রক্ষক ও আমাদের সকলের বিনাশকর্তা। তিনি স্রষ্টা, তাই বিনাশও করতে পারেন....

বিপ্লব আত্মহননের তুল্য

আমার জীবনদর্শন অন্যকে শেখাবার সাধ্য আমার নেই। যে দর্শনে আমি বিশ্বাসী আমার বড়জোর তা অভ্যাস করার যোগ্যতা আছে...আমাব দর্শন পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়ার স্বাধীনতা বিপ্লবীদের আছে...কিন্তু ভারত কখনওই তুরস্ক বা আয়ারল্যাণ্ড বা রাশিয়ার মতো নয় এবং চিরকালের জন্য না হোক, দেশের জনজীবনের বর্তমান স্তরে তো বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ আত্মহননেরই সামিল হবে বলে আমি মনে করি। এত বিশাল,

নৈরাশ্যজনকভাবে বিভক্ত, এত দারিদ্র ও ভীতত্রস্ততায় ডুবে থাকা নিঃস্ব জনগণের পক্ষে ওই কথা বোধহয় সবসময়েই খাটবে।[১২]

বলা হয়, প্রতিপক্ষের আত্মাব মঙ্গলের জন্য নাকি বিপ্লবী তার দেহের বিনাশ ঘটায়....আমি এরকম একজন বিপ্লবীর কথাও জানি না যে তার প্রতিপক্ষের আত্মা আছে কি নেই সে কথা একবারও ভেবেছে। প্রতিপক্ষের দেহ ও আত্মা বিনষ্ট হয় তো হোক, বিপ্লবীর একমাত্র উদ্দেশ্য তার দেশের স্বার্থরক্ষা।[১৩]

আমি নৈরাজ্যবাদীকে তার দেশপ্রেমের জন্য সম্মান করি। নিজের দেশের জন্য মৃত্যুবরণের সাহস আছে বলে তাকে সম্মান করি। কিন্তু প্রশ্ন করি তাকে, হত্যা করা কি সম্মানজনক? সম্মানিত মৃত্যুর যোগ্য অগ্রদূত কি গুপ্তঘাতকের খঞ্জর? আমি মানি না।[১৪]

আমি পুনবায় আমার সুচিন্তিত মত জানাচ্ছি। অন্য দেশেব ক্ষেত্রে যা-ই হোক, ভারতে অন্তত রাজনৈতিক হত্যা দেশের ক্ষতিই করতে পারে।[১৫]

ইতিহাসের পাতা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তে রঞ্জিত। প্রচণ্ড কষ্টস্বীকার না করে কোনও জাতি মুক্তি অর্জন কবতে পেরেছে এরকম একটি ঘটনাও আমি জানি না। গুপ্তঘাতকের ছুরি, বিষের ভান্ড, রাইফেলধারীর বুলেট, বরশা—এইসব অস্ত্র ও পদ্ধতি এতদিন ধরে যাবা ব্যবহাব কবেছে তাদেব আমি মুক্তি ও স্বাধীনতার অন্ধ প্রেমিক বলে মনে করি....সন্ত্রাসবাদীর হয়ে সাফাই গাইতে আমি পারব না।[১৬]

বিপ্লবী তাহলে আমার সঙ্গে, আমার জন্যে এই প্রার্থনা করুক যে, আমি যেন শীঘ্রই তাই (বিপুমুক্ত, পাপে অপাবগ) হয়ে উঠি। আর, ইত্যবসরে, সে আমার সঙ্গে এই পদক্ষেপটি ফেলুক যা আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট—কঠোরভাবে অহিংস উপায়ে ভারতেব মুক্তি অর্জন।[১৭]

২৮. কাপুরুষতা অথবা হিংসা

একটি সমগ্র জাতির পৌরুষহানির চেয়ে আমি বরং হাজারবার হিংসার ঝুঁকি নিতে রাজি।[১৮]

হিংসা বেছে নেওয়া

আমি মনে করি, যখন কাপুরুষতা ও হিংসার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে তখন আমি হিংসা বেছে নেব...কাপুরুষের মতো নিজের সম্ভ্রমহানির অসহায় সাক্ষী হয়ে থাকার চেয়ে আমি চাই নিজের সম্মানরক্ষার্থে ভারত অস্ত্র ধারণ করুক।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, হিংসার চেয়ে অহিংসা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ এবং শাস্তিপ্রদানের চেয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন অধিকতর পুরুষোচিত। মার্জনা করার ক্ষমতা সৈন্যকেই মানায়.....যখন দণ্ডদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকে। কোনও অসহায় ব্যক্তি এরকম করাব ভান করলে তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়....।

তবে, ভারতকে আমি অসহায় মনে করি না.... নিজেকে অসহায় প্রাণী ভাবি না....ক্ষমতা শুধুমাত্র কায়িকশক্তি থেকে আসে না। এর উৎস অদম্য ইচ্ছাশক্তি।[৯৯]

এর দ্বারা মানুষের মধ্যে যে পশু রয়েছে তাকে আমরা বিতাড়িত করতে চাই কিন্তু তার পুরুষকার কেড়ে নিতে চাই না এবং মানুষের নিজস্ব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় মাঝে মাঝে তার ভিতরের পশুটি কুৎসিত চেহারা নিয়ে দেখা দিতে বাধ্য।[১০০]

বিশ্ব পুরোপুরি যুক্তির দ্বারা চালিত নয়। জীবনের মধ্যেই একধরনের হিংসা রয়েছে এবং আমাদের ন্যূনতম হিংসার পথটি বেছে নিতে হবে।[১০১]

কাপুরুষতা নয়

আমি চাই হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই হত্যা করার বদলে মৃত্যুবরণ করার নীরব সাহসের চর্চা করুক। কিন্তু কারও যদি সেই সাহস না থাকে তাহলে আমি চাই সে খুন করার শিল্প রপ্ত করুক এবং ভীতুর মতো বিপদ থেকে না পালিয়ে নিজেই বরং খুন হয়ে যাক। শেষোক্ত যে, সে পালালেও মানসিক হিংসার অপরাধে অপরাধী। সে পালায় কারণ খুনোখুনির মধ্যে তার নিজের খুন হওয়ার সাহস নেই।[১০২]

আমার অহিংসা-পদ্ধতি কদাপি ক্ষমতাহানি ঘটাবে না বরং এর ফলেই, জাতি তার ইচ্ছানুযায়ী বিপদের সময় শৃঙ্খলা ও প্রস্তুতিসহ হিংসা অবলম্বন করতে পারবে।[১০৩]

আমার অহিংসার আদর্শ একটি অতীব সক্রিয় শক্তি। এর মধ্যে কাপুরুষতা বা এমনকি দুর্বলতারও কোনও স্থান নেই। সহিংস মানুষ একদিন অহিংস হলেও হতে পারে, কিন্তু ভীরুর জন্যে কোনও আশা নেই। আমি তাই বার বার বলেছি.....আমরা যদি অহিংসা অর্থাৎ সহিষ্ণুতার শক্তির সাহায্যে নিজেদের, আমাদের নারীদের এবং পূজাস্থানগুলি রক্ষা করতে না পারি, তাহলে যদি মানুষ হয়ে থাকি তবে অন্তত এগুলি রাখার জন্য আমাদের লড়াই করা উচিত।[১০৪]

একজন মানুষ যতই দুর্বলদেহ হোক-না-কেন, তার যদি পালাতে লজ্জা করে তাহলে সে নড়বে না এবং নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করবে। এটা হবে অহিংসা ও সাহসের পরিচয়। আবার কেউ, যতই দুর্বল হোক, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার চেষ্টা করবে এবং এই চেষ্টার মধ্যে মারা যাবে। এটা সাহসিকতা কিন্তু অহিংসা নয়। বিপদের মোকাবিলা করা যদি তার দায়িত্ব হয় তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে তা হবে ভীরুতা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মানুষটির মধ্যে ভালবাসা ও দাক্ষিণ্য থাকবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে থাকবে ঘৃণা বা অবিশ্বাস এবং ভয়।[১০৫]

যারা অহিংস হতে পারে না ও হবে না, যারা অস্ত্রধারণ ও যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারে, আমার অহিংসা সেইসব মানুষকেও স্বীকার করে নেয়। হাজারবার বলেছি, আবার বলছি, অহিংসা শক্তিমানের জন্য, দুর্বলের জন্য নয়।[১০৬]

বিপদের মুখোমুখি না হয়ে তা থেকে পলায়ন করার অর্থ মানুষ ও ঈশ্বরে নিজের বিশ্বাসকে বাতিল করা, এমন কি নিজস্ব সত্তাকেও অস্বীকার করা। বিশ্বাসের এই দেউলিয়াপনা ঘোষণা করার চেয়ে ডুবে মরাও ভালো।[১০৭]

হিংসার দ্বারা আত্মরক্ষা

বারংবার আমি বলেছি, যে নিজেকে, নিজের প্রিয়জনকে বা তাদের মর্যাদাকে, অহিংসভাবে মৃত্যুবরণ করে রক্ষা করতে পারে না তার উচিত, নিপীড়কের সঙ্গে হিংসার পথে মোকাবিলা করা। এই দুটোর একটাও যে পারে না সে গুরুভার বোঝাবিশেষ। পরিবারের কর্তা হওয়ার অধিকারই তার নেই। তার উচিত হয় নিজেকে লুকিয়ে রাখা বা অসহায় হয়ে জীবন কাটানো এবং জেনে রাখা যে বদমাইশ এসে হুকুম করলেই সে কেঁচোর মতো কুঁকড়ে যাবে।[১০৮]

আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করার শক্তি আবশ্যক নয় বরং মৃত্যুবরণের শক্তি প্রত্যেকের থাকা উচিত। যে মানুষ পূর্ণভাবে মৃত্যুবরণে প্রস্তুত, তার হিংসা প্রদর্শনের কোনও ইচ্ছাও থাকবে না। বরং এটাকে আমি স্বপ্রমাণিত বক্তব্য বলে মনে করি যে, হত্যা করার ইচ্ছার সঙ্গে মৃত্যুবরণের ইচ্ছার সম্পর্ক উল্টো অনুপাতের। ইতিহাসে এরকম বহুবার দেখা গেছে যে যারা ক্ষমার বাণী মুখে নিয়ে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুববণ করেছে, তারা তাদের সহিংস প্রতিপক্ষের হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটিয়েছে।[১০৯]

যে মানুষ মরতে ভয় পায় এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যার নেই তাকে অহিংসা শেখানো যায় না। অসহায় নেংটি ইঁদুর পেলেই বেড়াল খেয়ে নেয়, তাই বলে ইঁদুরকে অহিংস বলা যাবে না। পারলে সে সোৎসাহে হত্যাকারীকে ভক্ষণ করত কিন্তু সে সবসময়েই বেড়ালের কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করে। তাকে আমরা ভীরু বলি না কারণ প্রকৃতি তাকে যেভাবে তৈরি করেছে তাতে অন্যরকম আচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু কোনও মানুষ যখন বিপদের সামনে নেংটি ইঁদুরের মতো আচরণ করে, তখন সঙ্গত কারণেই তাকে কাপুরুষ বলা হয়। তার অন্তরে হিংসা ও ঘৃণা রয়েছে। নিজের গায়ে আঁচড়টি না লাগিয়ে তার শত্রুকে বধ করতে পারলে সে তা-ই করত। তার সঙ্গে অহিংসার কোনও সম্পর্ক নেই। অহিংসার বাণী তার কাছে নিরর্থক। তার স্বভাবে বীরত্ব বলে কিছু নেই। অহিংসা কী, তা হৃদয়ঙ্গম করার আগে তাকে তার আত্মশক্তি সম্পর্কে সজাগ করতে হবে এবং তার চেয়েও প্রবল প্রতিপক্ষের উদ্যত আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টায় এমনকি মৃত্যুবরণ করতেও শেখাতে হবে। অন্য কিছু করলে তার ভীরুতাকেই সমর্থন করা হবে এবং তা তাকে অহিংসা থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি যেমন প্রত্যক্ষভাবে কাউকে বদলা নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করব না, তেমনই তথাকথিত অহিংসার আড়ালে কোনও কাপুরুষকেও আশ্রয় দেব না । অহিংসা কী পদার্থে নির্মিত তা জানা নেই বলে অনেকেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছে আঘাত প্রতিরোধ করার চেয়ে, বিশেষত যেখানে জীবনের ঝুঁকি থাকতে পারে সে-ক্ষেত্রে বিপদ থেকে পিটটান দেওয়াটা শ্রেয়গুণ। অহিংসার জনৈক শিক্ষক হিসেবে আমার উচিত যতটা সম্ভব ঐ জাতীয় কাপুরুষোচিত মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা।[১১০]

আত্মাহুতি দিতে যদি প্রস্তুতির অভাব থাকে, তাহলে সে-ক্ষেত্রে একমাত্র সম্মানজনক পথ হল.....আত্মরক্ষা।[১১১]

হিংসা যদিও আইনসিদ্ধ নয় তবুও যখন তা আত্মরক্ষার জন্য বা অরক্ষিতকে রক্ষা করার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটা কাপুরুষোচিত নতিস্বীকারের তুলনায় অনেক বেশি সাহসিকতার কাজ। ওই নতিস্বীকার কি পুরুষ, কি নারী কারোরই স্বার্থরক্ষা করে না। হিংসার পরিস্থিতিতে সাহসিকতার বিভিন্ন স্তর ও বৈচিত্র্য রয়েছে। এটা প্রত্যেককে নিজের মতো করে ঠিক করতে হবে। অন্য কারও সে অধিকার নেই।[১১২]

২৯. আগ্রাসনের প্রতিরোধ

আমাকে বাঁচতে হবেই। আমি কোনও জাতি বা ব্যক্তির দাস হতে পারব না। হয় পূর্ণস্বাধীনতা নয় বিনাশ। সশস্ত্র সংঘাতে জয়লাভের চেষ্টা হবে নিছক দুঃসাহসিকতা। কিন্তু যে আমাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করছে যদি তাব শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করে আমি তাব ইচ্ছাপালনেব বিরোধিতা করি এবং নিরস্ত্র এই চেষ্টায় মৃত্যুবরণও করি তবে তাকে দুঃসাহস বলা যাবে না। এর মধ্যে দিয়ে আমার দেহ ধ্বংস হবে কিন্তু আত্মা বা আমার মর্যাদা আমি রক্ষা করতে পাবব।[১১৩]

প্রতিরোধের কর্তব্য

প্রকৃত গণতন্ত্রী হল সে-ই যে বিশুদ্ধ অহিংস উপায়ে তার স্বাধীনতা এবং তৎসহ তাব দেশ ও শেযপর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করে....কিন্তু প্রতিরোধের কর্তব্য তাদের ওপবেই বর্তায় যাবা মতাদর্শ হিসেবে অহিংসায় বিশ্বাস করে, আব যাবা প্রতিটি ক্ষেত্রের গুণাগুণ বিচার ক'রে, হিসাব ক'বে স্থির করে একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধের তারা সমর্থক, না, বিরোধী—তাদের ওপব এটা বর্তায় না। ওই প্রতিবোধ, প্রত্যেকের নিজের স্থির করাব বিষয় এবং তার যদি অন্তরের কণ্ঠস্বরেব অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই কণ্ঠের নির্দেশ মানা উচিত।[১১৪]

অপ্রতিরোধের প্রকৃত অর্থটি প্রায়শই, হয় ভুল বোঝা হয়েছে, বা একে বিকৃত ক'বে দেখানো হয়েছে। এব অর্থ কখনওই এই নয় যে, আগ্রাসকের হিংসার সামনে অহিংস মানুষ নুয়ে পড়বে। আগ্রাসকের হিংসার জবাব হিংসায় না দিয়ে, সে আমৃত্যু তার অন্যায় দাবি মানতে অস্বীকাব করবে। অ-প্রতিরোধের এটাই হল প্রকৃত অর্থ....।

হিংসার জবাবে সে হিংসা ব্যবহার করবে না বরং নিজের হাত সে থামিয়ে রেখে হিংসাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে এবং একই সঙ্গে অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। দুনিয়াতে চলার সত্য রাস্তা কেবল একটাই। অন্য পথ অবধারিতভাবে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার দিকে নিয়ে যাবে। তখন নেহাৎই প্রয়োজনে শান্তির এক একটি পর্যায় আসবে, যা আনবে রণক্লান্তি এবং যখন আরও উচ্চতর মানের হিংসা বাবহারের প্রস্তুতি চলতে থাকবে। প্রবলতার হিংসায় অর্জিত শান্তির অনিবার্য পরিণাম আণবিক বোমা ও ওই বোমার অনাসব

প্রতিভূ। এ হল অহিংসা ও গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। অহিংসা বাদ দিয়ে গণতন্ত্র সম্ভব নয়।[১১৫]

নিষ্ঠুরতার জবাব নিষ্ঠুরতা দিয়ে দেওয়ার মধ্যে নিজের নৈতিক ও বৌদ্ধিক দেউলিয়াপনাই প্রকাশ পায় এবং এর ফলে শুধু একটি অশুভ বৃত্তের সূচনা হতে পারে।[১১৬]

প্রতিরোধ দুই ধরনের (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও অহিংস প্রতিরোধ) এবং প্রতিরোধকারীর দুর্বলতার অর্থে ধরলে যখন তোমার প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় তখন তোমাকে খুবই বেশি মূল্য দিতে হবে। নাজারেথের যীশুর বিজ্ঞ, স্পষ্ট ও সাহসী প্রতিরোধকে ইউরোপ ভুল করে দুর্বলের প্রতিরোধ বলে মনে করেছিল। যখন আমি 'নতুন নিয়ম' প্রথম পড়ি তখন চারটি সুসমাচারের মধ্যে যীশুর কোনও নিষ্ক্রিয়তা বা দুর্বলতা খুঁজে পাইনি। পরে যখন তলস্তয়-এর 'সুসমাচারগুলির ঐকতান' এবং তাঁর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রচনা পড়লাম তখন এর অর্থ আমার কাছে স্পষ্টতর হল। যীশুকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী হিসেবে মনে করার জন্যে পাশ্চাত্যকে কি যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়নি? 'পুরাতন নিয়ম' এবং ঐতিহাসিক ও আধা-ঐতিহাসিক অন্যান্য নথিতে যে-সব যুদ্ধের বিবরণ আছে তাকে তুচ্ছ করে দেবার মত একাধিক যুদ্ধের জন্য দায়ী হচ্ছে খ্রীস্টান জগৎ। আমি জানি, আমার বলায় ভুল হতে পারে, কারণ, কী আধুনিক, কী প্রাচীন,—ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই অগভীর।[১১৭]

(হত্যা করার প্রক্রিয়ায় নিহত হওয়ার চেয়ে) হত্যা না ক'রে মৃত্যুবরণ করতে অনেক বেশি বীরত্বের প্রয়োজন। হত্যা করায় ও এর মধ্য দিয়ে নিহত হওয়ার মধ্যে খুব নয়নলোভন কিছু নেই। কিন্তু যে শত্রুর ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার না ক'রে মৃত্যুবরণের জন্য নিজের গলা এগিয়ে দেয় সে উচ্চতরমার্গের সাহসের পরিচয় দেয়।[১১৮]

অহিংসার পথ

বিশ্বের মহান নীতিগুলির মধ্যে একটি হল অহিংসা, যাকে বিশ্বের কোনও শক্তিই নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আমার মতো হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু অহিংসা মৃত্যুহীন। এবং এই আদর্শে বিশ্বাসীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই অহিংসার বাণী প্রচারলাভ করতে পারে।[১১৯]

অহিংসা হল সর্বোত্তম আদর্শ। অহিংসা সাহসীদের জন্য, কখনওই কাপুরুষদের নয়। অন্যের হত্যার মাধ্যমে লাভবান হওয়া এবং ধার্মিক ও অহিংস ভেবে নিজেকে ভ্রান্ত বিশ্বাসে ভুলিয়ে রাখা, নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা।[১২০]

অহিংসার তরবারিতে যখন তুমি সশস্ত্র তখন বিশ্বের কোনও শক্তিই তোমাকে পদানত করতে পারবে না। বিজয়ী ও বিজিত—উভয়কেই অহিংসা মহৎ করে তোলে।[১২১]

সারা বিশ্ব জুড়ে বর্তমানে যে হিংসার বিস্ফোরণ ঘটছে তা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, শক্তিমানের অপরাজেয় অহিংসার পদ্ধতি এখনও পুরোপুরি আবিষ্কৃত হয়নি। অহিংস ক্ষমতার এক রতিও কখনও নষ্ট হয় না।[১২২]

আমি কখনওই বলি না যে 'ডাকাত বা চোর বা ভারতে আক্রমণকারী জাতির সঙ্গে

বোঝাপড়ায় হিংসা ব্যবহার করবে না'। বরং সেটা ভালভাবে করার জন্যই নিজেদের সংযত রাখা শিখতে হবে। সামান্যতম অজুহাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরাটা শক্তি নয়, দুর্বলতার পরিচায়ক। পারস্পরিক হাতাহাতি হিংসার নয়, পৌরুষহীনতার প্রশিক্ষণ মাত্র।[১২৩]

যদিও সব হিংসাই মন্দ এবং সাধারণভাবে নিন্দনীয় তবুও অহিংসায় বিশ্বাসীর পক্ষে আগ্রাসক এবং প্রতিরোধকারীর মধ্যে প্রভেদ করাটা অনুমোদিত, এমন কি তার কর্তব্যও বটে। এটা করার পর তাকে অহিংসভাবে প্রতিরোধকারীর পক্ষে দাঁড়াতে হবে অর্থাৎ তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণ দিতে হবে। তার হস্তক্ষেপের ফলে দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্রুত অবসান ঘটতে পাবে এবং যাবা লড়াই করছিল তাদের মধ্যে শান্তিও স্থাপিত হতে পারে।[১২৪]

আমার অহিংসা, আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক এই দুই ধরনের হিংসাকেই মেনে নেয়। এটা সত্য যে, শেষ পর্যন্ত উভয়ের ভেদরেখা লুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের গুণাগুণ থেকে যায়। যখনই এবকম ঘটবে তখন অহিংস ব্যক্তি এটা বলতে বাধ্য যে কোন পক্ষ ন্যায়সঙ্গত অবস্থানে আছে। এইভাবেই আমি আবিসিনীয়, হিস্পানী, চেক, চীনা, পোলদের সাফল্য কামনা করেছি। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি চেয়েছি, তারা অহিংস প্রতিরোধ প্রয়োগ করলেই পাবত।[১২৫]

যুদ্ধ যদি অন্যায় হয় তাহলে কী কবে তা নৈতিক সমর্থন বা আশীর্বাদের যোগ্য হতে পারে? সব যুদ্ধই আমি সম্পূর্ণ অন্যায় বলে মনে কবি। কিন্তু আমবা যদি দুই যুদ্ধরত পক্ষের মনোভাব বিশ্লেষণ কবি তাহলে হয়তো দেখা যাবে, একপক্ষ ঠিক এবং অপরপক্ষ অন্যায়কারী। উদাহরণ হিসেবে 'ক' যদি 'খ'-এব দেশ দখল করতে চায় তাহলে অবশ্যই 'খ'-এর বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়। দুজনেই সশস্ত্র সংঘাতে নামল। সহিংস যুদ্ধে আমি অবিশ্বাসী কিন্তু তা হলেও 'খ'-এর অবস্থান ন্যায়সঙ্গত বলে সে-ই আমার নৈতিক সমর্থন ও আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য।[১২৬]

অহিংসার পথে চলার সাহস তোমাব না থাকলে তুমি ঘুসির জবাবে ঘুসি মারতে পারো। কিন্তু হিংসা প্রয়োগেরও একটি নৈতিক সূত্র রয়েছে। তা না থাকলে হিংসার আগুন যে জ্বালাবে, সে সেই আগুনেই ভস্ম হয়ে যাবে। এদের সকলেও যদি ধ্বংস হয়ে যায় তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি ভারতের স্বাধীনতা ধ্বংস হতে দিতে পারব না।[১২৭]

ভারতের পথ

আমি স্বীকার করি, জাতি যদি তেমন ইচ্ছা কবে তাহলে প্রকৃত হিংসার দ্বারা মুক্তি অর্জনের অধিকার তার আছে। সেক্ষেত্রে আমার জন্মভূমি হলেও ভারত আর আমার ভালবাসার দেশ থাকবে না, যেমন আমার মা যদি বিপথগামী হন তবে আর আমি তাঁকে সম্মান করব না।[১২৮]

ভারত যখন স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর এবং প্রলোভন ও শোষণমুক্ত হবে, তখন সে আর পশ্চিম বা পুবের কোনও শক্তির লুব্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করবে না এবং দামী অস্ত্রশস্ত্রের

ভার বহন না করেই সে নিরাপদ বোধ করবে। তার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিই হবে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সবথেকে জোরালো প্রাচীর।[১২৯]

অহিংস প্রতিরোধ

ইতিহাসে এরকম কোথাও লেখা নেই যে, কোনও জাতি অহিংস প্রতিরোধের পথ বেছে নিয়েছে। হিটলার যদি আমার দুঃখে অবিচলিত থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ তার ফলে মহার্ঘ কিছুই আমাকে হারাতে হচ্ছে না। আমার সম্মানই হল একমাত্র বাঁচাবার জিনিস। এটা হিটলারের দয়ার অপেক্ষা কবে না। কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাসী হিসেবে আমি এর সম্ভাবনা খাটো করতে চাই না। এখন অবধি হিটলার এবং তাব সমগোত্রীয়রা কেবল এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছে যে, মানুষ শক্তির কাছে নতিস্বীকার করে। কিন্তু যদি নিরস্ত্র পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোনও তিক্ততা মনে না রেখে অহিংস প্রতিরোধ করে তাহলে হিটলারদেব সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কে সাহস করে বলতে পাবে যে হিটলারদের স্বভাবে মহত্তর সূক্ষ্ম শক্তির ডাকে সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা নেই? তাদেরও মধ্যে তো আমার মতই একই আত্মা রয়েছে....

ডাক এসেছে। আমাকে সাড়া দিতে হবে। আমার বাণী আমাব জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এটা না করতে পারার অপমান আমার মধ্যে এতই গভীর যে সেটা এতদিন প্রকাশের পথ পায়নি। যে আলো আমার মধ্যে জ্বলেছে এবার আমাকে অন্তত তার উপযুক্ত কাজ করতে হবে।

....যখন আমি সত্যাগ্রহ প্রথম শুরু করি, আমার কোনও সঙ্গী ছিল না। আমরা মাত্র তেব হাজার পুরুষ, নারী ও শিশু, ছিলাম একটি গোটা জাতির বিরুদ্ধে, যার ক্ষমতা ছিল আমাদের গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার। আমি জানতাম না কে আমার কথা শুনবে। ঘটনাটা ঘটে গেল বিদ্যুৎ লহমায়। ১৩০০০-এর সবাই লড়েনি। অনেকে পেছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতির মর্যাদা রক্ষা পেয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ নতুন ইতিহাস রচনা করল....

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে যদি এই ব্যক্তিদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারি এবং তাদের এটা দেখাতে পারি যে অস্ত্রধারণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষমতা থাকলে নিজেকে যতটা সাহসী লাগে, অহিংসার ফলে তার চেয়ে বেশি সাহসী তারা বোধ কবছে কি না। তা না হলে তাদের উচিত কাপুরুষতার নামান্তর অহিংসা ত্যাগ করে অস্ত্র তুলে নেওয়া। নিজেদের ইচ্ছা বাদে আর কিছুই তাদের অস্ত্রধারণ থেকে নিবৃত্ত করবে না।

আমি এমন এক অস্ত্র দিয়েছি....যা দুর্বলকে নয়, সাহসীকে মানায়। যত বড়ই হোক, পার্থিব কোনও ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করতে দৃঢ়চিত্ত প্রত্যাখ্যানের মতো কোনও সাহসিকতা নেই এবং সেটাও করতে হবে আত্মিক তিক্ততা ছাড়া এবং পূর্ণভাবে এই বিশ্বাস রেখে যে একমাত্র আত্মাই অমর, আর কিছু নয়।[১৩০]

মৌলিক অনুমানসমূহ

পরিবার বা গোষ্ঠীতে আমরা যা করি তার ভিত্তিতে আমি যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেছি। মানবজাতি হল একটি বৃহৎ পরিবার এবং প্রকাশিত প্রেম যদি যথোপযুক্ত তীব্র হয় তাহলে তা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রযোজ্য হবে। এবং একক ব্যক্তিবিশেষ যদি এমনকি বর্বরদের বিরুদ্ধে সফল হতে পারে তাহলে ব্যক্তিদের একটি দল কেন, ধরা যাক, এক দল বর্বরের বিরুদ্ধে, সফল হবে না? আমরা যদি ইংরাজদের বিরুদ্ধে সফল হতে পারি তাহলে আমাদের বিশ্বাসের বিস্তার ঘটিয়ে এটাও তো নিশ্চিত বলা যায় যে, তাহলে আমরা ন্যূন সংস্কৃতিমান ও ন্যূন উদারনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন জাতির বিরুদ্ধেও সফল হবো। আমি মনে করি, বিশুদ্ধ অহিংসার সাহায্যে আমরা যদি ইংরাজদের বিরুদ্ধে সফল হই তাহলে অন্যদের বিরুদ্ধেও সফল হবো বা অন্যভাবে বললে, অহিংসা দিয়ে যদি আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি তাহলে ওই একই অস্ত্র দিয়ে একে আমরা রক্ষাও করতে পারব। এই বিশ্বাস অর্জন করতে না পারলে আমাদের অহিংসা নিতান্তই সুবিধাবাদ—এটা খাদ মেশানো ধাতু, বিশুদ্ধ সোনা নয়।

প্রথমত, দ্বিধাকণ্টকিত অহিংসা দিয়ে কখনও আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না। দ্বিতীয়ত, যদি তা হয়ও তাহলে কোনও আগ্রাসকের থেকে দেশকে রক্ষা করার সময় দেখা যাবে যে আমাদের কোনও প্রস্তুতিই নেই। অহিংসার চূড়ান্ত কার্যকরতা সম্বন্ধে আমাদের যদি সংশয় থাকে, তাহলে কংগ্রেসের পক্ষে তার নীতি পাল্টানো এবং জাতিকেও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় আহ্বান জানানোই হবে সবচেয়ে ভালো। কংগ্রেসের মতো একটি গণ-সংগঠন যদি নিজের মনের সন্ধান না জেনে জনগণকে একটি মিথ্যা বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় তাহলে তার পক্ষে এটা কর্তব্যে অবহেলা বলে বিবেচিত হবে। এটা হবে কাপুরুষতা....কারণ অহিংসায় বিশ্বাস না রাখতে পারলেও আমরা সহিংস হয়ে উঠব এমন কোনও কথা নেই। মুখোশটা খুলে ফেলে আমরা স্বাভাবিক হবো এটাই হবে সবচেয়ে শোভন রাস্তা।[১৩১]

একটি জাতি বা গোষ্ঠী যত ছোটই হোক-না-কেন, এমন কি একজন ব্যক্তিরও যদি মন এবং প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল থাকে তাহলে বিশাল সশস্ত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের মর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারে। এখানেই রয়েছে নিরস্ত্রের অতুলনীয় শক্তি ও সৌন্দর্য। এ হল অহিংস প্রতিরক্ষা যা কখনওই পরাজয় কী তা জানে না ও মানে না। তাই কোনও জাতি বা গোষ্ঠী যদি তার চূড়ান্ত নীতি হিসেবে অহিংসাকে বেছে নেয় তাকে এমনকি আণবিক বোমাও পদানত করতে পারে না।[১৩২]

কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে অহিংস পদ্ধতিতে সে ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করবে। কিন্তু সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য কংগ্রেস ওই পদ্ধতি অবলম্বন করবে কি না এখনও স্থির করেনি।

আমার কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে শারীরিকভাবে যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল, যে খোঁড়া ও পঙ্গু—তাদের সকলের সঙ্গে যদি স্বাধীনতাকে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হয় তাহলে সেই স্বাধীনতার রক্ষায়ও তারা সমান ভাগে অংশ নেবে। অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতার সঙ্গে এটা কীভাবে খাপ খাবে তা আমার মেঠো মন বুঝতে অক্ষম।

আমি তাই অহিংসা অর্থাৎ সত্যাগ্রহ বা আত্মিক শক্তির নামে শপথ নিচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও নেব। সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে দৈহিক অক্ষমতা কোনও প্রতিবন্ধক নয় এবং দুর্বল কোনও নারী বা শিশুও সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত কোনও দানবের বিরুদ্ধে তার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে।[১৩৩]

কৃতিত্ব যেখানে প্রাপ্য, প্রাপক হিংসায় বিশ্বাসী হলেও আমার অহিংসা তাকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে না। তাই সুভাষ বোসের হিংসায় বিশ্বাস এবং তাঁর তৎপরবর্তী ক্রিয়াকলাপ আমি গ্রহণ করতে না পারলেও তাঁর দেশপ্রেম, যোগ্যতা ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করেছি। একইভাবে, যদিও কাশ্মীরিদের সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য ব্যবহার এবং শেখ আবদুল্লার সশস্ত্র ভূমিকা সমর্থন করিনি কিন্তু এদের যোগ্যতা ও প্রশংসাযোগ্য আচরণকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারিনি। বিশেষত যদি সাহায্যকারী সৈন্য ও কাশ্মীরি রক্ষীরা বীরের মতো নিঃশেষে মৃত্যুবরণ করে। আমি জানি, তারা যদি এটা করতে পারে তাহলে হয়তো তারা ভারতের চেহারা পাল্টে দিতে পারবে। কিন্তু এই প্রতিরক্ষা যদি মনোভাব ও কাজের দিক থেকে সর্বাংশে অহিংস হয় তাহলে ওই 'হয়তো' শব্দটা আমি ব্যবহার করব না। তখন আমি নিশ্চিত হবো, যে ভারতের চেহারা এমনভাবে পাল্টাবে যে রক্ষীদের দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং এমনকি পাক মন্ত্রিসভাও গ্রহণ করতে পারে।

আমি বলি, অহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করলে রক্ষীদের কোনও সশস্ত্র সহায়তা দেওয়া হবে না। অহিংস সহায়তা কেন্দ্র থেকে বিনা দ্বিধায় করা যায়। কিন্তু কোনও সাহায্য আসুক বা না-আসুক বিপুল সংখ্যক আক্রমণকারীদের বা এমনকি একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর শক্তিক্ষমতাও রক্ষীদের উপেক্ষা করবে এবং নিজ নিজ কর্তব্যস্থলে অবিচল থেকে, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অন্তরে কোনও ঘৃণা বা ক্রোধ না রেখে, নিরস্ত্র থেকে, এমনকি নিজের মুষ্টিও ব্যবহার না করে তারা যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে যে বীরত্ব দেখানো হবে, ইতিহাসে এখনও তা অশ্রুতপূর্ব। কাশ্মীর তখন একটি পুণ্যভূমিতে পরিণত হবে যার সুবাস শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।[১৩৪]

৩০. ভারত কোন পথে যাবে

আমি একথা বলছি না যে ভারত দুর্বল, তাই সে অহিংসা অভ্যাস করুক। আমি চাই ভারত তার শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থেকে অহিংসায় দীক্ষিত হোক। তার শক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য কোনও অস্ত্র-প্রশিক্ষণের দরকার নেই। আমরা নিজেদের মাংসপিণ্ডবৎ ভাবি বলেই মনে হয় যে আমাদের ওই প্রশিক্ষণের দরকার।[১৩৫]

ভারতকে তার পথ স্থির করতে হবে। যদি ইচ্ছা হয় তাহলে সে যুদ্ধের পথে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে এবং ফলে তখন সে এখনকার চেয়ে আরও তলায় তলিয়ে যাবে

....ভারত যদি যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করে তাহলে তার অবস্থা ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ড-এর চেয়ে ভালো তো হবেই না, বরং হয়তো অনেক বেশি খারাপই হবে....

শান্তির পথ

কিন্তু ভারতের সামনে শান্তির পথটি অবারিত। তার যদি ধৈর্য থাকে তাহলে নিশ্চিত সে স্বাধীনতা পাবে। আমাদের অধৈর্য মানসিকতায় সেটা দীর্ঘতম বলে ঠেকলেও এইটাই হবে হ্রস্বতম পথ। শান্তির পথ অভ্যন্তরীণ বিকাশ ও স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিত করে। এ-পথ আমরা প্রত্যাখ্যান করি কারণ আমরা কল্পনা করে নিয়েছি যে এর ফলে শাসকের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করা হয়, যে নিজেকে আমাদের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করব যে ঐ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি নিছকই কথার কথা, এবং জীবন বা সম্পদহানির ক্ষয়স্বীকার করতে অনিচ্ছুক বলে আমরাও ঐ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটির অংশীদার, তখন আমাদের একমাত্র প্রয়োজন হল নিষ্ক্রিয় অনুমোদনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটি পাল্টে ফেলা। যুদ্ধেব পথে গেলে আমাদের যে দৈহিক পীড়ন ও নৈতিক ক্ষতি হতো, ওই পরিবর্তন মেনে নেওয়ার পীড়ন সেই তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। যুদ্ধের কষ্ট দুপক্ষেরই ক্ষতিসাধন করে। শান্তির পথে গেলে যে কষ্ট হয় তাতে দুপক্ষেরই লাভ। নবজন্মের আনন্দময় বেদনার মতো হবে তা...

শান্তির পথ, সত্যের পথ। সততার পূর্ণতা শান্তির পূর্ণতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিক, মিথ্যাভাষণই হচ্ছে হিংসার জন্মদাত্রী। কোনও সৎ লোক দীর্ঘকাল সহিংস থাকতে পারে না। আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই সে অনুভব করবে যে তাব সহিংস থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। এটাও সে আবিষ্কার করবে যে যতদিন তার মধ্যে ক্ষীণতম হিংসার রেশও থাকবে, ততদিন সে তার অন্বিষ্ট সত্যের সন্ধান পাবে না।[১৩৬]

আমরা দুর্বল তাই, অহিংসা বোঝা সহজ নয়, অভ্যাস করা তো নয়ই। আমরা সকলে প্রার্থনার মন নিয়ে, বিনম্রভাবে নিরন্তর ঈশ্বরের কাছে আবেদন করব যেন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং প্রাত্যহিক সেই আলোকদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকি। তাই, শান্তির প্রেমিক ও উদ্গাতা হিসেবে আমার কর্তব্য, আমাদের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের দাবিব অভিযানের মধ্যে অহিংসায় অবিচল অনুরক্ত থাকা, এবং এইভাবে ভারত যদি পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করতে সফল হয় তাহলে তা হবে বিশ্বশান্তিতে তার মহত্তম অবদান।[১৩৭]

পশ্চিমের অনুকরণ নয়

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড যা করছে সেটাই আমাদের পক্ষে ভালো বলে ধরে নেওয়া আজকের একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। ....যুদ্ধ হয়ে উঠেছে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য অর্থ ও সম্পদের ব্যাপার। এটা আর ব্যক্তিগত বীরত্ব বা সহ্যশক্তির বিষয় নয়। আমি অতি সহজেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের ধ্বংস করার জন্য একটি বোতাম টিপে মুহূর্তের মধ্যে তাদের ওপরে গরল নিক্ষেপ করতে পারি।

নিজেদের রক্ষা করার জন্য এই পদ্ধতি অনুকরণ করতে কি আমরা আগ্রহী? যদি বা তা চাইও, আমাদের কি সেই আর্থিক সংগতি আছে? আমরা প্রায়ই ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয় নিয়ে অভিযোগ করি। কিন্তু আমরা যদি আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে ব্রতী হই তাহলে তো এই বোঝা আরও দশগুণ বৃদ্ধি পাবে...

হিংসার সাহায্যে জাতিকে অহিংস পথে রাখা যাবে না। ভিতর থেকে এটা রাষ্ট্রেও সংক্রামিত হবে যদি রাষ্ট্রের অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই এই প্রশ্নটি আজ আমাদের বিবেচনা করতে হবে, "আমাদের আশু আকাঙ্ক্ষাটি কী?" আমরা কি প্রথমে পশ্চিমী জাতিগুলির অনুকরণ করব? এক সুদূর ও অস্পষ্ট ভবিষ্যতে, সব যন্ত্রণা সহ্য করার পর, আবার পিছু হাঁটব? না কি আমরা নতুন এক পথে যাব বা সেটাই বজায় রাখব যেটাকে আমি আমাদের মূলত শান্তিপূর্ণ পথ বলে মনে করি এবং এর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা জয় করে কায়েম করব?

এখানে কিন্তু কাপুরুষতার সঙ্গে আপসের কোনও প্রশ্ন নেই। আত্মরক্ষার জন্যে হলেও, হয় ধ্বংস করার জন্য আমাদের অস্ত্রধারণের প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় দুর্দশাভোগ করাও শিখতে হবে, নতুবা দেশকে রক্ষ করার বা তাকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে ত্যাগস্বীকারের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই সাহসিকতা অপবিহার্য। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাহসিকতা দ্বিতীয়টির মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও আমরা হয়তো সঠিকভাবে হিংসা বর্জন করতে পারব না। কিন্তু হিংসা তখন অহিংসার পদানত থাকবে এবং জাতীয় জীবনে তার ভূমিকা হবে নগণ্য।

ঠিক এই মুহূর্তে, অন্তত চিন্তায় ও কথায় জাতীয় নীতি অহিংসা হলেও আমরা বোধ হয় হিংসার দিকেই এগিয়ে চলেছি। আবহাওয়ার মধ্যে বিরাজ করছে এক অস্থির মনোভাব। আমাদের দুর্বলতাই আমাদের হিংসা থেকে বিরত রাখছে। যা চাই তা হল শক্তির ভিত্তিতেই স্বেচ্ছায় হিংসা পরিহার কবা। এর জন্য কল্পনাশক্তির সঙ্গে দরকার বিশ্বপট পরিবর্তনের গভীর অধ্যয়ন। আজ পশ্চিমের আপাত গরিমা আমাদের মোহান্ধ করছে এবং ভুল করে আমরা প্রাত্যহিক এক প্রমত্ত-নৃত্যকে প্রগতি বলে মনে করছি। আমরা এটা দেখছি না যে, এ হল নিশ্চিত মৃত্যুর পথ। সর্বোপরি, এটা আমাদের বোঝা দরকার যে, পশ্চিমী জাতিগুলির সঙ্গে তাদের শর্তে প্রতিযোগিতার অর্থ, যেচে আত্মহত্যা করা। অন্যদিকে, আমরা যদি উপলব্ধি করি, হিংসার আপাত-প্রাধান্য থাকলেও নৈতিক শক্তিই বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা, তাহলে তার অসীম সম্ভাবনায় পূর্ণতম বিশ্বাস রেখে আমাদের অহিংসায় দীক্ষিত হতে হবে। সকলেই এটা বুঝেছে যে, ১৯২২ সালে যদি অহিংস পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হতো আমরা সার্বিক লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হতাম। তবুও, আঁকাড়া ধরনের হলেও, অহিংসার কার্যকরতার জীবন্ত প্রমাণ সেদিন আমরা পেয়েছিলাম। স্বরাজের যে যৎকিঞ্চিৎ অর্জিত হয়েছিল তা অক্ষুণ্ণই রয়েছে। সত্যাগ্রহের সূত্রপাতের আগে জাতিকে যে মহাভয় আচ্ছন্ন করেছিল তা চিরতরে দূরীভূত হয়েছে। অতএব, আমার মতে, অহিংসা হচ্ছে ধৈর্যশীল প্রশিক্ষণের বিষয়। আমরা যদি রক্ষা পেতে চাই ও বিশ্ব প্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে চাই তাহলে স্পষ্টত ও মূলত আমাদের পথটিকে শান্তির পথ হতেই হবে।[১৩৮]

যুদ্ধের বিকল্প

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের এক নিরবচ্ছিন্ন কালপর্বের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পর, আমার অন্তরের অন্তস্তলে, কোথাও আমি অনুভব করি যে রক্তক্ষয় সম্বন্ধে বিশ্ব যারপরনাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্ব একটা পরিত্রাণের পথ খুঁজছে। এই বিশ্বাসে আমি আত্মতুষ্টি লাভ করি যে হয়তো বুভুক্ষু বিশ্বকে সেই পথ দেখাবার সম্মান প্রাচীন ভারতভূমিই পাবে।

তাই, তার মহান সংগ্রামে বিশ্বের সব মহান জাতিকে আমি হার্দ্যিক সহযোগিতা জানাবার জন্য অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ জানাই।[১৩৯]

সবিনয়ে আমি বলতে চাই, ভারত যদি সত্য ও অহিংসার পথে তার ভাগ্যজয় করে, তাহলে বিশ্বশান্তিতে তার অবদান কিছু কম হবে না। যে শান্তির জন্য বিশ্বের সব জাতিই আজ আকুল সেক্ষেত্রে, যে-সব জাতি মুক্তভাবে ভারতকে সাহায্য দিয়েছে তার কিছু সামান্য প্রতিদান ভারত দিতে পারবে।[১৪০]

স্বাধীনতার সেই আলোয় ভারত যদি তার (অহিংসা ও দৈহিক শক্তিমত্তায় নির্ভরশীল না হওয়ার) নীতির উপযুক্ত হতে পারে, তাহলে বিশ্বের কোনও শক্তিই তার দিকে কুনজর দিতে সক্ষম হবে না। এটাই হবে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান এবং বিশ্ব-প্রগতিতে তার অবদান।[১৪১]

নির্ভীকের অহিংসা

আমাদের অহিংসা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে আমাদের নিয়ে এসেছে। সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে আমরা কি সেই অহিংসাকে বর্জন করব? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার কাঙ্ক্ষিত, নির্ভীকের অহিংসা স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন, ঠিক তেমনই বিদেশী আগ্রাসন ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রেও সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত ও অব্যর্থ ফলপ্রদ কর্মপন্থা।

প্রকৃত অহিংস ভারতের কোনও বিদেশী শক্তির কাছ থেকেই ভয়ের কিছু নেই এবং প্রতিরক্ষার জন্য ভারতকে ব্রিটিশ নৌ ও বিমান বাহিনীর মুখাপেক্ষী হতে হবে না। আমি জানি, নির্ভীকের অহিংসা এখনও আমাদের আয়ত্তে আসেনি।[১৪২]

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দেশকে যদি অহিংসার দিকে চালিত করা না যায় তাহলে তা দেশের তথা বিশ্বের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এর অর্থ, স্বাধীনতাকে বিদায় জানানো। এর ফলে সামরিক একনায়কতন্ত্রও স্থাপিত হতে পারে। দিনরাত আমি শুধু ভাবছি কীভাবে সাহসিকের অহিংসা অর্জন করা যায়।

এশীয় সম্মেলনে আমি বলেছিলাম যে, আমার আশা, ভারতের অহিংসার সুবাস সমগ্র বিশ্বকে বিমোহিত করবে। প্রায়শই সংশয় জাগে, এই আশা কি বাস্তব রূপ নেবে![১৪৩]

ভারতের কর্তব্য

ভারত এখন স্বাধীন এবং বাস্তব চিত্রটি আমার চোখে স্পষ্ট প্রতীয়মান। পরাধীনতার দুর্বহ বোঝাটি এখন অপসারিত হয়েছে, তাই সকল শুভ-শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এমন এক দেশ-গড়ার মহান কাজে ব্রতী হতে হবে, যে-দেশ মানুষের সংঘাত নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত হিংসার পদ্ধতি পরিহার করবে—তা, সেই সংঘাত দুই রাষ্ট্রের মধ্যেই হোক, বা, একই জাতির দুই অংশের মধ্যে। আমার এখনো সেই বিশ্বাস আছে যে ভারত পরিস্থিতির যোগ্য বলে নিজেকে প্রমাণ করবে এবং বিশ্বের সামনে প্রমাণ করবে যে দুই নতুন রাষ্ট্রের জন্ম কোনও বিপদ নয়, বরং মানবজাতির বাকি অংশের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। চোখের মণির মতো যদি তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হয় তাহলে স্বাধীন ভারতের কর্তব্য হবে পারস্পরিক সংঘাত নিরসনের জন্য অহিংসার উপায়টিকে আরও সুচারু করে তোলা।[১৪৪]

(অহিংসার) দ্বারা চল্লিশ কোটির এক সুমহান জাতি বিনা রক্তপাতে বিদেশী শাসনের জোয়ালমুক্ত হতে পেরেছে। ভারতের স্বাধীনতাই বর্মা ও সিংহলকেও স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। যে জাতি অস্ত্রের শক্তি ছাড়াই স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে তার উচিত বিনা অস্ত্রেই তাকে রক্ষা করা। ভারতের পদাতিক বাহিনী আছে, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গড়ে উঠছে এবং এগুলিকে আরও উন্নত করা হচ্ছে, এসব সত্ত্বেও কথাগুলি সত্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারত যদি তার অহিংস শক্তির বিকাশ না ঘটায় তাহলে সে নিজের বা বিশ্বের জন্যে কিছুই অর্জন করেনি। ভারতের সামরিকীকরণের অর্থ তার নিজের এবং তৎসহ সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস।[১৪৫]

৩১. ভারত এবং অহিংসার পথ

দুর্বলের অহিংসার থেকে যা পৃথক, সেই সাহসী ও শক্তিমানের অহিংসার প্রসার ঘটাতে আমার অক্ষমতা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু এই স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে, কি করে এই অমূল্য গুণটির চর্চা করতে হয় তা আমি জানি না....(যদি এটা সত্য হয়) তাহলে এ-কথা বলা অধিকতর সত্য হবে যে, শক্তিমানের অহিংসা শিক্ষা দেওয়ার কোনও কার্যসূচী তৈরি হয়নি তা বলার চেয়ে এটা বলাই সমীচীন হবে যে, ভারত এখনও এই শিক্ষার জন্য প্রস্তুত নয়। এটা বলা অসমীচীন হবে না যে, দুর্বলের অহিংসার জন্যে প্রস্তুত কার্যসূচীটি যতটা আকর্ষণীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে শক্তিমানের অহিংসার....কার্যসূচীটি ততটা নয়।[১৪৬]

নিছক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা অহিংসার যেমন আছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তা নেই...এই গরলকে অমৃতে পরিবর্তিত করতে হলে কী করতে হবে? প্রক্রিয়াটি

কি সম্ভবপর? আমি জানি, তা সম্ভব এবং মনে হয় পথটিও চিনি। কিন্তু ভারতীয় মানস এখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হলেও অহিংসার শিক্ষা গ্রহণ করার সংবেদনশীলতা তার এখনও হয়নি। হয়তো একমাত্র অহিংসাই গরলকে অমৃতে পরিণত করতে পারে।

এটাই যে পথ, তা অনেকেই স্বীকার করে, কিন্তু এই সেরা পথটি গ্রহণ করার মতো হৃদয় তাদের নেই। আমি জোরগলায় ঘোষণা করতে পারি যে, অহিংসা কখনওই ব্যর্থ হয়নি। জনগণ এর যোগ্য হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমাকে যখন বলা হয়, অহিংসা প্রচারের পদ্ধতি আমি জানি না, তখন আমি কিছু মনে করি না। আমার সমালোচকরা আরও অনেকটা এগিয়ে এমত ইঙ্গিতও করেন যে আমার নিজের মধ্যেই অহিংসা নেই। মানুষের হৃদয়ের সংবাদ কেবল ঈশ্বরই জানেন।[১৪৭]

একটা ব্যাপাব স্পষ্ট বলে নিই। আমি অকপটে ও সর্বতোভাবে স্বীকার করেছি যে, গত ত্রিশ বছর ধরে যা আমরা অভ্যাস করেছি তা অহিংস প্রতিরোধ নয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, যা কেবল দুর্বলরাই ব্যবহার করে। কারণ সশস্ত্র প্রতিবোধ গড়ে তুলতে তারা অনিচ্ছুক না হলেও অপাবগ।

যা কেবল অসমসাহসী হৃদয়েব মানুষরা দিতে পারে সেই অহিংস প্রতিরোধের ব্যবহার যদি আমরা জানতাম, তাহলে বিশ্বেব সামনে স্বাধীন ভারতের এক সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র উপস্থিত করতে সক্ষম হতাম। তার বদলে আমবা দিয়েছি দ্বিখণ্ডিত এক ভারত, যেখানে একটি অংশ অপরটি সম্বন্ধে অতীব সন্দিগ্ধ এবং উভয়েই পারস্পরিক সংঘর্ষে এতই ব্যস্ত যে ঠাণ্ডা মাথায় সেই সব ক্ষুধার্ত ও নগ্ন কোটি কোটি মানুষের কথা ভাবার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে, যারা এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর ছাড়া আর কোনও ধর্ম জানে না, যিনি তাদের কাছে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা রূপে দেখা দেন।[১৪৮]

....এটা ছিল দুর্বলের নিষ্ক্রিয়তা এবং কখনওই হৃদয়বানের অহিংসা নয়, যে এমনকি স্বার্থের সংঘাতের মধ্যেও মানুষের ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের বোধ বিসর্জন দেবে না, যে চিরকাল তার প্রতিপক্ষেব হৃদয় পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবে, তাকে পীড়ন করবে না।

ভারত যদি এমন কোনও পথ আবিষ্কার করতে পারে, যার দ্বারা হিংসার শক্তি তার হিংস্রতা হারাবে...এবং সেই রূপান্তরিত সমুন্নত শক্তিকে এমন এক গঠনমূলক শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত করতে পারে, যেখানে স্বার্থের সংঘাত চিরতরে নির্মূল হবে—তাহলে সে-হবে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো একটি দিন।[১৪৯]

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যা অর্জন করা যায়নি তা কখনওই অর্জন করা যাবে না, একথা বলার অধিকার কারও নেই। বরং আজ অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট সুযোগ এসেছে। একথা সত্য যে আমাদের দেশের মানুষ বিশ্বব্যাপী সামরিকীকরণের ঘূর্ণিতে পড়ে গেছে। কিন্তু মাত্র কয়েকজনও যদি এর বাইরে থাকতে সক্ষম হয় তারাই হবে নির্ভীকের অহিংসা প্রদর্শনে পারঙ্গম সেই মুষ্টিমেয়, যারা ভারতের প্রথম সেবকের পরিচিতি লাভ করবে। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে এটি প্রকাশ করা যাবে না। অতএব, যতক্ষণ না অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়, বিশ্বাসেই এর স্বীকৃতি থাক।[১৫০]

পুলিশ বাহিনী

কখনও আমি পুলিশদের এড়িয়ে চলিনি বরং আমার সব কাজে তাদের নজর রাখতে সাহায্য করেছি। সারা জীবন ধরে এটা আমার কর্মনীতির অঙ্গ ছিল। এর কারণ, গোপনীয়তাকে আমি সর্বদা ঘৃণা করেছি এবং এই ধরনের নজরদারি সম্বন্ধে আমার মাথাব্যথা না থাকায় আমার জীবন ও কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। এই মাথা না-ঘামানো এবং পুলিশের সঙ্গে সবসময়ে ভদ্র ব্যবহার করার ফলে এদের মধ্যে অনেকের ভেতরে নীরব পরিবর্তন ঘটেছে।

তবে এই উদাসীনতার ব্যাপারটি একটি পৃথক বিষয় এবং একান্তই ব্যক্তিগত। ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশী গোয়েন্দাবৃত্তিকে নিন্দনীয় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, যা কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সরকারকে মানায় না। বাড়তি করের বোঝায় ন্যুব্জ করদাতার ওপরে এ আর এক অর্থহীন বোঝা। কারণ, মনে রাখতে হবে, এই অস্বাভাবিক খরচের গোটাটাই আসে শ্রমজীবী লক্ষ লক্ষ মানুষের পকেট থেকে।[১৫১]

এমনকি একটি অহিংস রাষ্ট্রেরও পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন হতে পারে। স্বীকার করছি, এ আমার অসম্পূর্ণ অহিংসার এক চিহ্ন। সেনাবাহিনী সম্বন্ধে যেমন আমি বলেছি, তেমনই পুলিশবাহিনী ছাড়া আমাদের চলবে, এ-কথা বলার সাহস আমার নেই। এটা ঠিক যে এমন একটি রাষ্ট্রের আদল আমি দেখতে পারি এবং পাই যেখানে পুলিশের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এর বাস্তবায়নে আমরা সফল হবো কি না তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

আমার চিন্তাভাবনায় যে পুলিশ আছে তার আদল বর্তমানের পুলিশবাহিনীর থেকে একেবারে পৃথক। অহিংসায় বিশ্বাসীদেব নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হবে। তারা হবে জনগণের সেবক, প্রভু নয়। জনগণও সহজাতভাবে তাদের সর্ববিধ সহায়তা করবে এবং পারস্পবিক সহযোগিতার মাধ্যমে তারা ক্রমেই কমে-আসা গোলযোগ সহজেই মেটাতে পারবে।

সেই পুলিশ বাহিনীব হাতে কোনও-না-কোনও ধরনের অস্ত্র থাকবে, কিন্তু তা ব্যবহৃত হবে কদাচিৎ, নতুবা কখনওই নয়। প্রকৃত অর্থে সেই পুলিশকর্মীরা হবে সংস্কারক। তাদের পুলিশী কাজ প্রধানত দস্যু ও ডাকাতদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অহিংস রাষ্ট্রে শ্রমিক ও পুঁজির মধ্যে বিবাদ ও ধর্মঘট খুব কমই হবে, কারণ অহিংস সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভাব এত বেশি হবে যে সমাজের মূল অংশগুলি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। একইভাবে, সেখানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের কোনও সুযোগ থাকবে না।[১৫২]

ততদিনে যদি আমি বা আর কেউ নিম্নোক্ত বিষয় দুটি মোকাবিলা করার উন্নততর কোনও পথ দেখাতে না পারি, তাহলে স্বরাজের আমলে তোমার আমার থাকবে এক সুশৃঙ্খল, বুদ্ধিমান পুলিশ বাহিনী, যা অভ্যন্তরে শান্তি রক্ষা করবে এবং বহিরাগত হামলাকারীদের সঙ্গে লড়বে।[১৫৩]

অপরাধ ও শাস্তি

অহিংস ধরনের স্বাধীন ভারতে অপরাধ থাকবে কিন্তু কোনও অপরাধী থাকবে না।

তাদের শাস্তিপ্রদান করা হবে না। অপরাধ হল যে কোনও ব্যাধির মতই একটি রোগ এবং চালু সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি। অতএব হত্যাসমেত সকল অপরাধই রোগ হিসেবে গৃহীত হবে। অবশ্য সেই ভারত রূপ নেবে কি না সে অন্য প্রশ্ন।[১৫৪]

স্বাধীন ভারতের কারাগার কেমন হবে? সকল অপরাধীই সেখানে রোগী হিসেবে গণ্য হবে এবং কারাগারগুলি হবে হাসপাতাল, যেখানে ওই রোগীদের চিকিৎসা ও নিরাময়ের জন্য ভর্তি করা হবে। কেউই মজা করার জন্য অপরাধ করে না। এটা হল অসুস্থ মনের পরিচায়ক। নির্দিষ্ট অসুখের কারণ অনুসন্ধান ক'রে তাকে দূর করতে হবে।

কারাগারগুলি যখন হাসপাতালে পরিণত হবে তখন তার জন্যে প্রাসাদোপম অট্টালিকার কোনও প্রয়োজনে হবে না। কোনও দেশই এটা করতে পারে না, ভারতের মতো গরিব দেশ তো নয়ই। জেলরক্ষীদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের মতো। বন্দীরাও যেন মনে করে যে জেলকর্মীরা তাদের বন্ধু। তাদের উদ্দেশ্য বন্দীদের মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে সহায়তা করা, বন্দীদের হেনস্থা করা নয়। জনপ্রিয় সরকার নিশ্চয়ই এই মর্মে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবে কিন্তু নিজেদের প্রশাসনকে মানবিক করে তোলার দায়িত্ব জেলকর্মীদেরও কিছু কম নয়।

বন্দীদের কর্তব্য কী হবে?.....তাদের আচরণ হবে আদর্শ বন্দীর মতো। কারাগারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার জন্য তাদের সচেষ্ট হতে হবে। যে কাজই বন্দীদের দেওয়া হবে সেটা যেন তারা মনপ্রাণ দিয়ে করে। উদাহরণস্বরূপ, বন্দীদের খাবার তারা নিজেরাই রান্না করবে। ভাত, ডাল বা যা-ই তারা খাবে তা ঝাড়াইবাছাই করে কাঁকর, পাথর সব ফেলে দিতে হবে।

বন্দীদের অভিযোগ যা-ই থাকুক না কেন, তা যেন তারা ভদ্রভাবে কর্তৃপক্ষের গোচরে আনে। নিজেদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে তাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত, যাতে যে লোকটি জেলে ঢুকেছিল, তার চেয়ে ভালো লোকটি বেরিয়ে আসে।[১৫৫]

৩২. ভারত এবং সহিংস পন্থা

ভারত যদি তরবারির আদর্শ গ্রহণ করে তাহলে সাময়িকভাবে হয়তো সে বিজয়ী হবে। ভারত তখন আর আমার হৃদয়ের গর্ব থাকবে না। আমি ভারতের প্রতি উৎসর্গীকৃত। কারণ, সব কিছুই আমি তার কাছে পেয়েছি। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বে তার একটি বিশেষ কাজ রয়েছে। অন্ধভাবে ইউরোপের অনুকরণ করা তার উচিত নয়।

ভারত যখন তরবারির আদর্শ গ্রহণ করবে সে হবে আমার পরীক্ষালগ্ন। আশা করি, তখন আমি পেছিয়ে পড়ব না। আমার ধর্মের কোনও ভৌগোলিক সীমানা নেই। তাতে আমার বিশ্বাস যদি জীবন্ত হয়, তা আমার ভারতের প্রতি ভালবাসাকেও ছাপিয়ে উঠবে। অহিংসার ধর্মের মাধ্যমে ভারতের সেবা করার জন্যই আমার জীবন নিবেদিত...।[১৫৬]

আমার জীবৎকালে ভারত যদি হিংসার আদর্শ গ্রহণ করে তাহলে ভারতে থাকার কোনও ইচ্ছাই আমার থাকবে না। সে আর আমার মনে কোনও সম্ভ্রম জাগাবে না। আমার দেশপ্রেম আমার ধর্মের অধীন। শিশু যেমন মায়ের বুক আঁকড়ে থাকে আমিও তেমনই ভারতের বক্ষলগ্ন, কারণ আমি অনুভব করি যে ভারত আমাকে প্রয়োজনীয় আত্মিক রসদ জোগায়। তার পরিবেশ আমার সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষার উপযোগী। এই বিশ্বাস হারালে আমার দশা হবে অনাথের মতো, যার আর অভিভাবকের সন্ধান পাবার আশা থাকবে না।[১৫৭]

নিরস্ত্র বিজয়

আমি জানি, ভারত যদি সর্বসমক্ষে অহিংস উপায়ে উঠে দাঁড়াতে পারে তাহলে তার কখনওই এক বিশাল পদাতিক বাহিনী, অনুরূপ এক বিরাট নৌবাহিনী ও সুসজ্জিত বিমান বাহিনীর প্রয়োজন হবে না। ভারতের আত্মচেতনা যদি প্রয়োজনীয় উচ্চতায় উন্নীত হয়ে মুক্তিসংগ্রামে তাকে অহিংস বিজয় এনে দেয়, তাহলে বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটবে এবং যুদ্ধের সব আয়োজন অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। এরকম ভারত হয়তো নিছকই দিবাস্বপ্ন বা শিশুর দেয়ালা। কিন্তু আমার মতে, অহিংসার মাধ্যমে মুক্ত হলে এই ঘটনাই ঘটবে.....তখন তার কণ্ঠ হবে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের কণ্ঠ, যা বিশ্বের সকল হিংসার শক্তিকে সংযত রাখতে প্রয়াসী হবে।[১৫৮]

জাতীয় সরকার কী নীতি গ্রহণ করবে আমি বলতে পারব না। ইচ্ছা থাকলেও তখন হয়তো আমি বেঁচেই থাকব না। যদি থাকি, তাহলে সম্ভাব্য সব জায়গায় আমি অহিংসা গ্রহণের পরামর্শ দেব এবং সেটাই হবে বিশ্ব-শান্তি এবং নতুন এক বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভারতের মহত্তম অবদান। আমি আশা করি, ভারতে যেহেতু অনেকগুলি সমরপটু জাতি রয়েছে, এবং সেই সরকারে যেহেতু এদের সকলেরই প্রভাব থাকবে, তাই জাতীয় নীতি এক সংশোধিত চরিত্রের সামরিকবাদের দিকে ঝুঁকবে। সেইসঙ্গে এটাও আশা করি যে, এই সব চেষ্টার ফলে....এটা প্রমাণ করা যাবে যে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অহিংসার কার্যকরতা ব্যর্থ হয়নি এবং দেশে প্রকৃত অহিংসার প্রতিনিধিত্বকারী একটি শক্তিশালী দল থাকবে।[১৫৯]

সামরিকীকরণের পথ

জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের স্থান হবে কোথায়? সে কি পঞ্চম শ্রেণীর এক শক্তি হিসেবে সন্তুষ্ট থাকবে.... ? একটি প্রথম শ্রেণীর সামরিক ক্ষমতা হবার জন্যে ভারতকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। এবং তার জন্য তাকে কোনও পশ্চিমী শক্তির অধীনতা স্বীকার করতে হবে।[১৬০]

.....ভারতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে: একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হবার চেষ্টায় সে অন্তত কয়েক বছরের জন্যে বিশ্বে একটি বক্তব্যবিহীন পঞ্চম শ্রেণীর ক্ষমতা হিসেবে সন্তুষ্ট থাকবে,....না সে তার অহিংসার নীতিকে অব্যাহত রেখেও তাকে আরও পরিশুদ্ধ

করে তুলে তথাকথিত বিজয়ের (মিত্রশক্তির) পরও যে বোঝা (হিংসার) বিশ্বকে নিষ্পিষ্ট করছে তার থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার জন্য নিজের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ব্যবহারকারী, বিশ্বের সর্বপ্রথম দেশের সম্মান লাভ করবে।[১৬১]

সত্য ও অহিংসার সঙ্গে আবদ্ধ মুক্ত ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের শান্তির শিক্ষা দেবে। কিন্তু এটা আমরা ও কংগ্রেস মিলে স্থির করব যে, স্বাধীন ভারত শান্তির পথে চলবে, না তরবারির নীতি গ্রহণ করবে। বিশ্বের ক্ষুদ্র জাতিগুলি মানবজাতিকে তার মূল্যবান ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করবে, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। চল্লিশ কোটির এক উপমহাদেশ যদি বারুদের পন্থা নিয়ে বিপজ্জনক জীবনধারণের পথ বেছে নেয় তাহলে তা খুবই ভয়াবহ হবে।[১৬২]

রণক্লান্ত এশীয় দেশগুলি কি জাপানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামরিকীকরণের দিকে এগোবে? এর উত্তর নির্ভর করবে ভারত কোন দিকে তার প্রভাব খাটাবে তার ওপর ....স্বাধীন ভারত বিশ্বকে কি শান্তির শিক্ষা দেবে, না, যে বিদ্বেষ ও হিংসায় বিশ্ব একেবারেই হতক্লান্ত সেই শিক্ষা দেবে?[১৬৩]

সমগ্র ভারত যদি (চিরন্তন প্রেমের সূত্র) মেনে নেয় তাহলে ভারত বিশ্বের প্রশ্নাতীত নেতার স্থান গ্রহণ করবে।[১৬৪]

আমার একমাত্র আশা ও প্রার্থনা [যে....একদিন] এক নতুন ও বলিষ্ঠ ভারত জাগ্রত হবে,—যে ভারত পশ্চিমের যাবতীয় নীচতাব হীন অনুকরণ করে যুদ্ধবাজ হয়ে উঠবে না, বরং পশ্চিমের শিক্ষণীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষায় শিক্ষিত এক নতুন ভারত, যে কেবল এশিয়া ও আফ্রিকা নয় সমগ্র যন্ত্রণার্ত বিশ্বের আশার আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে...

উন্মত্ততা এবং পশ্চিমের জাঁকজমকের ভ্রান্ত অনুকরণ সত্ত্বেও আমার এবং অনেকেরই এই আশা আছে যে ভারত এই মৃত্যুনৃত্য অতিক্রম করবে। যতই অসম্পূর্ণ হোক, ১৯১৫ থেকে টানা বত্রিশ বছরের অহিংসার প্রশিক্ষণের যোগ্য নৈতিক সমুন্নতি অর্জন করবে।[১৬৫]

আকৃতিতে খর্বতর কিন্তু আত্মিক কলুষমুক্ত, ভারত এখনও নির্ভীকের অহিংসার লালনক্ষেত্র হিসেবে বিদ্যমান থাকবে এবং বিশ্বের নৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিপীড়িত ও শোষিত জাতিসমূহের কাছে আশা ও মুক্তির বাণী শোনাবে। কিন্তু অশুদ্ধ, আত্মাবিহীন ভারত হবে নিতান্তই এক অনুকৃতি এবং সে-ও পশ্চিমের সামরিক রাষ্ট্রের এক তৃতীয় শ্রেণীর নকল, যে তাদের প্রচণ্ড আঘাতের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। আমার স্বপ্নের ভারত ছাড়া অন্য কোনও ভারত দেখার জন্য আমি জীবনধারণ করতে চাই না।[১৬৬]

৬. সত্যাগ্রহ

৩৩. সত্যাগ্রহ্ সুসমাচার

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হল এমন তববারি যার এক সব দিকে ধার। যে-কোনও ভাবে একে ব্যবহার করা যায়। যে একে ব্যবহার করে এবং যার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, তাদের উভয়কেই্ এই অস্ত্র আশীর্বাদ করে। এ এক বিন্দু রক্তপাত না ঘটিয়েও সে সুদূরপ্রসারী ফল দেয়। এই্ তরবারিতে মবচে ধরে না। এই্ অস্ত্র চুরি করা যায় না।[১]

আমি নিশ্চিত যে, একান্ত পাষাণ হৃদয়ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সামনে গলে যাবে....এ হ্ল এক সার্বভৌম ও কার্যকর ওষুধ....এক বিশুদ্ধ চবিত্রের আয়ুধ। এ দুর্বলের হাতিয়ার নয়। দৈহিক প্রতিরোধকারীর চেয়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী হ্তে অনেক বেশি সাহ্স প্রয়োজন।

এ সাহ্স হ্ল, যীশু, দানিয়েল, ক্র্যানমার, ল্যাটিমাব ও রিডলির সাহ্স, যাঁরা শান্তভাবে নির্যাতন ও মৃত্যুববণ কবেছিলেন। এ হ্ল তলস্তয়ের সাহস যিনি মহত্তম নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে রাশিয়ার জারদের অস্বীকার করেছিলেন।

বাস্তবিক, একজন পূর্ণাঙ্গ প্রতিরোধকারীই্ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়েব সংগ্রাম জেতানোর পক্ষে যথেষ্ট।[২]

আমি বলি ....নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পদ্ধতিটি হ্ল...সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও নিরাপদ কারণ আদর্শটি যদি সত্য না হয় তাহলে একমাত্র প্রতিবোধকারীরাই্ কষ্টভোগ করে।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা আত্মিক শক্তির পবিত্রতম প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন যীশু খ্রীস্ট, দানিয়েল ও সক্রেতিস। এই্ আচার্যদের সকলেই তাঁদের আত্মার তুলনায় দেহ্কে নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন।

এই আদর্শের শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বলতম (আধুনিক যুগে) ব্যাখ্যাতা হ্লেন তলস্তয়। তিনি শুধু এর প্রচারই্ করেননি, এই্ আদর্শ অনুযায়ী জীবনধারণও করেছিলেন। ইউরোপে এই্ আদর্শ চালু হ্বার অনেক আগেই্ ভারতে এটি আচরিত ও সাধারণভাবে ব্যবহৃতও হ্তো।

সহজেই্ চোখে পড়ে, আত্মিক শক্তি দৈহিক শক্তির তুলনায় অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। জনগণ যদি তাদের বিভিন্ন অভিযোগ প্রতিকারের জন্য আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে বর্তমান কষ্টস্বীকারের অনেকটাই্ এড়ানো সম্ভব।

যাই হোক না কেন, এই শক্তির ব্যবহারে কারও কষ্ট হয় না। যখনই এর অপপ্রয়োগ হয় তখন ব্যবহারকারীই আহত হয়, যার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত, তার কিছু হয় না। সৎগুণের মতই এ নিজেই নিজের প্রতিদান। এই ধরনের শক্তি-ব্যবহারে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই।[৩]

বুদ্ধ অকুতোভয়ে শত্রুশিবিরে সংগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দাম্ভিক পুরোহিতবর্গকে নতজানু হতে বাধ্য করেছিলেন। খ্রীস্ট জেরুজালেমের মন্দির থেকে মহাজনদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ভন্ড ও ইহুদী মতান্ধদের ওপরে স্বর্গের অভিশাপ নামিয়ে এনেছিলেন। দুজনেই তীব্র প্রত্যক্ষ কর্মোদ্যোগে বিশ্বাসী ছিলেন।

কিন্তু তিরস্কৃত হয়েও বুদ্ধ ও খ্রীস্ট তাঁদের প্রতিটি কাজের মধ্যে অভ্রান্তভাবে ক্ষমা ও প্রীতির নিদর্শন রেখে গেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে একটি আঙুলও তাঁরা তোলেননি। যে সত্যের জন্য তাঁরা জীবনধারণ করেছিলেন তার পরিবর্তে সানন্দে নিজেদের উৎসর্গ করতে নিয়ত প্রস্তুত ছিলেন।

বুদ্ধের প্রেমের মহিমা যদি যাজকবর্গকে নত করার কাজের তুল্য না হত, তাহলে তিনি যাজকদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণ দিতেন। সমগ্র একটি সাম্রাজ্যের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে খ্রীস্ট মাথায় কাঁটার মুকুট পরে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। এখন আমি যদি অহিংস-চরিত্রের প্রতিরোধ গড়ে তুলে থাকি, তাহলে বিনম্রচিত্তে ওই মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছুই করছি না.....।[৪]

আইন অমান্য আন্দোলন

আইন অমান্য আন্দোলনকে নাগরিক দায়িত্বসম্পন্ন হতে হলে অবশ্যই আন্তরিক, মর্যাদাবান, সংযমী, অনুদ্ধত হতে হবে, উত্তমরূপে অধিগত কয়েকটি নীতি হবে এর আশ্রয়, এখানে অস্থিরচিত্ততার কোনো অবকাশ নেই, এবং সর্বোপরি এর পেছনে কোনও অসাধু উদ্দেশ্য বা বিদ্বেষ থাকলে চলবে না।[৫]

আমি দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করি যে, আইন অমান্য হচ্ছে বিশুদ্ধতম সংবিধানসম্মত বিক্ষোভের রূপ। অবশ্যই এটা গর্হিত ও নিন্দনীয় হয়ে ওঠে যদি এর নাগরিক অর্থাৎ অহিংস চরিত্রটি নিছকই ছদ্মবেশ হয়। অহিংসার সততা যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তীব্রতম আইন অমান্য হিংসার দিকে চলে যেতে পারে বলেই তা নিন্দার্হ নয়।

কোনও বড় ও দ্রুতগতি আন্দোলনকে সাহসিক ঝুঁকি না-নিয়ে চালনা করা যায় না। বড় ধরনের ঝুঁকি না থাকলে জীবনধারণ একান্তই অর্থহীন। বিশ্ব ইতিহাস কি এই শিক্ষাই দেয় না যে, ঝুঁকি না থাকলে জীবনে কোনও রোমাঞ্চ থাকে না?[৬]

আইন অমান্য হল নাগরিকের জন্মগত অধিকার। মানুষ হলে সে এই অধিকার ত্যাগ করবে না। নাগরিক আইন অমান্য আন্দোলনের পরে কখনওই নৈরাজ্য আসে না। অপরাধমূলক আইন অমান্যে এটা আসতে পারে। সব রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগ ক'রে অপরাধমূলক আইন অমান্যকে দমন করে। না করলে সে নিজেই ধ্বংস হবে।[৭]

সত্যাগ্রহী বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সমাজের আইন মেনে নেয়।

কারণ সে এটাকে তার পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। যখন কোনও ব্যক্তি এইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমাজের আইন মেনে চলে তখন সে বিচার করতে পারে যে এর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট আইনটি ভালো ও ন্যায়সঙ্গত আর কোনটি অন্যায় ও অসাম্যমূলক। কেবল তখনই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি আইন অমান্য করার নাগরিক অধিকার তার ওপর বর্তায়।[৮]

পূর্বশর্ত

যে-কোনও নাগরিক আইন অমান্যেরই প্রথম ও অপরিহার্য প্রাকশর্ত হল যারা নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে বলে চিহ্নিত, তাদের তরফ থকে বা জনসাধারণের তরফ থেকে কোনওভাবেই যেন হিংসাশ্রয়ী ঘটনা না ঘটে, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করা। হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটে গেলে, নাগরিক প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধবাদী কোনও সংস্থা বা রাষ্ট্রের উস্কানিতে ঐ ঘটনা ঘটেছে—এ-কথা বলার কোনও অর্থ নেই।

নাগরিক প্রতিরোধ আন্দোলন হিংসার পরিস্থিতিতে বিকাশলাভ করতে পারে না, এটা স্পষ্ট। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, এর ফলে সত্যাগ্রহীর সামর্থ্যে টান পড়ছে, তাকে নাগরিক আইন অমান্য ছাড়া আন্দোলনের অন্য পথের সন্ধান করতে হবে।[৯]

সত্যাগ্রহের চরিত্র

এই চরিত্রই হল সত্যাগ্রহের সৌন্দর্য। এটা আপনা-আপনিই আসে, একে খুঁজতে বাইরে বেরোতে হয় না। এই গুণটি সত্যাগ্রহের নীতির মধ্যেই রয়েছে।

ধর্মযুদ্ধ তাকেই বলব, যে-যুদ্ধে নিরাপদে রক্ষা করার মতো কোনও গোপনীয়তা নেই, শঠতার কোনও সুযোগ নেই, অসত্যের কোনও স্থান নেই। এই যুদ্ধ না চাইলেও আসে। ধার্মিক মানুষ এর জন্য নিয়ত প্রস্তুত থাকে।

পূর্ব-পরিকল্পিত সংগ্রাম কখনও ন্যায়সংগত সংগ্রাম হতে পারে না। ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে ঈশ্বর নিজে অভিযানের পরিকল্পনা ও যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

একমাত্র ঈশ্বরের নামেই ধর্মযুদ্ধ করা যায়। যখন সত্যাগ্রহী পুরোপুরি সহায়হীন হয়ে পড়ে, তার সামর্থ্য যখন প্রায় নিঃশেষিত, চারদিকে নিঃসীম অন্ধকার ঘনিয়ে আসে কেবল তখনই সেই ঈশ্বর উদ্ধারকল্পে এগিয়ে আসেন।[১০]

প্রাথমিক পর্বে, সত্যাগ্রহ প্রয়োগের সময় আমি আবিষ্কার করেছিলাম, সত্যসন্ধানের পথে প্রতিপক্ষকে হিংসার দ্বারা আঘাত করা অন্যায়। বরং ধৈর্য ও সহানুভূতি দিয়ে তাকে তার ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে আনতে হবে। একই জিনিস একের কাছে সত্য ও অপরের কাছে ভ্রান্ত বলে মনে হতে পারে। ধৈর্য মানেই কষ্টভোগ। অতএব এই আদর্শের অর্থ প্রতিপক্ষকে কষ্ট দেওয়া নয়। নিজে কষ্ট পাওয়া, তার মধ্য দিয়ে সত্যকে জয়যুক্ত করা।[১১]

সত্যাগ্রহ, তার থেকে উদ্ভূত অসহযোগ এবং নাগরিক প্রতিরোধ, কষ্টস্বীকারের সূত্রের নতুন নতুন নাম ছাড়া আর কিছু নয়।[১২]

সত্যের সঙ্গে অহিংসা যুক্ত হলে তুমি বিশ্বকে তোমার পদানত করতে পারবে। সত্যাগ্রহের সারমর্ম হল, রাজনৈতিক অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সত্য ও নম্রতার প্রাথমিক প্রয়োগ।[১৩]

সত্যাগ্রহ হল চূড়ান্ত আত্মবিলোপ, মহত্তম বিনয়, সর্বোত্তম ধৈর্য ও উজ্জ্বলতম বিশ্বাস। সত্যাগ্রহ নিজেই নিজের পুরস্কার।[১৪]

নিরন্তর সত্যসন্ধান ও সত্যে উপনীত হবার দৃঢ় সিদ্ধান্তের নামই সত্যাগ্রহ।[১৫]

এ হল এমন এক শক্তি যা নীরবে কাজ করে, আপাতদৃষ্টিতে ধীব গতিতে। বাস্তবে কিন্তু বিশ্বে এমন কোনও শক্তি নেই যা এত প্রত্যক্ষভাবে ও দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে।[১৬]

সত্যাগ্রহ শব্দটিকে অনেক সময় অত্যন্ত হেলাফেলায় ব্যবহার কবা হয়। প্রচ্ছন্ন হিংসা গোপন করার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু শব্দটির প্রবর্তক হিসেবে আমি বলতে চাই, চিন্তায় কথায়, কাজে প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ, গোপন বা প্রকাশ্য, কোনও ধবনের হিংসারই কোনও স্থান এখানে নেই। প্রতিপক্ষের অনিষ্ট-চিন্তা বা তাকে কোনও কটু কথা বলা বা তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তার সম্বন্ধে কিছু বলা—এ সবই হল সত্যাগ্রহ ভঙ্গ করা....

সত্যাগ্রহ, শান্ত-সৌম্য, কাউকে আঘাত দেয় না। রাগ বা বিদ্বেষ থেকে সত্যাগ্রহ আসতেই পারে না। সত্যাগ্রহ কোলাহল করে না, ধৈর্য হারায় না, তিল কে তাল করে হৈ চৈ বাধায় না। এ হল জোব-জববদস্তিব উল্টো পিঠ। হিংসার পূর্ণাঙ্গ বিকল্প হিসেবে সত্যাগ্রহের চিন্তা করা হয়েছিল।[১৭]

যার আত্মিক শক্তি আছে সত্যাগ্রহেব সংগ্রাম তাবই জন্যে, নিত্য দ্বিধাগ্রস্ত বা মনোবলহীনের জন্য নয়। জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ—এই দুটি শিল্পই সত্যাগ্রহ আমাদের শেখায়। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষ তাব অন্তরস্থ আত্মাকে উপলব্ধি করাব জন্য সচেতন প্রয়াস চালায়—এইখানেই পশুব সঙ্গে তাব প্রভেদ।[১৮]

বিকাশমান বিজ্ঞান

সত্যাগ্রহেব জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাকে বিকশিত করছে। প্রয়োজনে সাহায্য নেবার মতো কোনও পাঠ্যপুস্তক আমার নেই, এমন কি 'গীতা'ও নয়, যাকে আমি বলি আমার অভিধান। আমার চিন্তাপ্রসূত সত্যাগ্রহ হল এক নির্মীয়মান বিজ্ঞান। অবশ্য এটাও হতে পারে যে, যাকে আমি বিজ্ঞান বলছি তা হয়তো একদিন বিজ্ঞান-ই নয় বলে প্রমাণিত হবে, এ-নিয়ে ভাবনা ও কাজ, এক উন্মাদের না হলেও, বোকার কীর্তি বলে গণ্য হবে।

আবার এ-ও হতে পারে, সত্যাগ্রহের যা সত্য তা পাহাড়ের মতই সুপ্রাচীন। কিন্তু বিশ্বের সমস্যাবলী বা বিশেষ কবে যুদ্ধের প্রধান সমস্যা সমাধানে এর কোনও মূল্য আছে কি নেই তা এখনও জানা যায়নি। এমনও হতে পারে, এর মধ্যে নতুন বলে যা বলা হচ্ছে তা হয়তো প্রধান সমস্যাটির নিরিখে একেবারেই মূল্যহীন বলে মনে হবে। হতে পারে, সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংসার বিজয় বলে যা দাবী করা হচ্ছে তা

হয়তো প্রকৃতপক্ষে সত্য ও অহিংসার জয় নয়, হিংসার ভীতিকে জয়। এসব সম্ভাবনা নিয়ে আমি সবসময়ই ভাবি। কিন্তু আমি অসহায়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বা, অন্য নামে, তাঁর নিরন্তর সান্নিধ্যলাভে যে সাড়া পেয়েছি, তা-ই দেশের সামনে রেখেছি গ্রহণ করার জন্য।[১১]

সত্যাগ্রহের কলাকৌশল

বিজয়ীর কাছে আত্মাকে নতিস্বীকার করতে দেবে না—এর অর্থ হচ্ছে তোমার বিবেক যা করতে বারণ করবে তা করতে অস্বীকার করবে। ধরো, 'শত্রু' তোমাকে বলল মাটিতে নাকে খৎ দিতে বা কান ধরতে বা ঐ জাতীয় অসম্মানকর কিছু করতে—তখন তুমি এই অপমানের কোনওটির সামনেই নতিস্বীকার করবে না। কিন্তু সে যদি তোমার সম্পদ কেড়ে নেয় তুমি মেনে নেবে, কারণ অহিংসার উপাসক হিসেবে তুমি শুরু থেকেই মেনে নিয়েছে, পার্থিব সম্পদের সঙ্গে তোমার আত্মার কোনও সম্বন্ধ নেই। যা-কিছু তুমি নিজস্ব বলে মনে করো তা ততক্ষণই তোমার যতক্ষণ বিশ্ব তোমাকে রাখার অনুমতি দেয়।

মন-কে পরবশ হতে না-দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনও প্রলোভনের ফাঁদে পা না-দেওয়া। মানুষ প্রায়শই দুর্বলচিত্ত। সে লোভ এবং মধুমাখা বাক্যের জালে ধরা পড়ে। আমরা আমাদের সমাজজীবনে নিত্য এটা ঘটতে দেখি। দুর্বলচিত্ত মানুষ কখনও সত্যাগ্রহী হতে পারে না। সত্যাগ্রহীর 'না' হল অকাট্য 'না' এবং তার 'হ্যাঁ' হল অমোঘ 'হ্যাঁ'। যারা তা পারে কেবল তাদেরই সত্য ও অহিংসার পূজারী হবার মত শক্তি আছে। কিন্তু এখানে চিত্তের দৃঢ়তা এবং একরোখা মনোভাবের মধ্যেকার ফারাকটা বুঝে নিতে হবে। যদি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার পরে কেউ বুঝতে পারে যে সিদ্ধান্তটি ভুল হয়েছিল এবং এটা জেনেও যদি সেই সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থাকে তাহলে সেটা হবে একগুঁয়েমি ও অন্যায়। সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু বিশদভাবে ভেবেচিন্তে তার পরে সিদ্ধান্তে আসা উচিত।

বশ্যতা অস্বীকার করার অর্থ স্পষ্ট। তুমি কিছুতেই বিজয়ীর আধিপত্যের সামনে মাথা নিচু করবে না। তুমি তাকে তার অভীষ্ট অর্জনে সহায়তা করবে না। শ্রীযুক্ত হিটলার কখনও ব্রিটেন দখলের স্বপ্ন দেখেননি। তিনি চান যে ব্রিটিশরা হার স্বীকার করুক। বিজেতা বিজিতের কাছ থেকে যা-খুশি তাই চাইতে পারে এবং শেষোক্তকে বাধ্য হয়ে তা মেনে নিতে হয়। কিন্তু কেউ যদি পরাজয় স্বীকার না করে তাহলে প্রতিপক্ষকে বধ করা পর্যন্ত শত্রু লড়বে। সত্যাগ্রহী কিন্তু শত্রু তাকে মারার চেষ্টা করার আগেই নিজের দেহকে মৃত বলে মেনে নেয়। অর্থাৎ সে দেহের বন্ধনমুক্ত। কেবলমাত্র আত্মার জয়েই প্রাণধারণ করে। অতএব, সে যখন এইভাবে আগেই মৃত্যুবরণ করেছে তখন কেন অন্য কাউকে বধ করতে চাইবে? বধ করতে গিয়ে নিহত হওয়ার অর্থ হচ্ছে পরাজয় মেনে মৃত্যুবরণ। কারণ, শত্রু যা চায় তুমি জীবিত থাকতে সেটা যদি না পায় তাহলে তোমাকে বধ করে সে সেটা পেতে চায়। অন্যদিকে, যদি উপলব্ধি করে, নিজের জীবন রক্ষা করার জন্যও তার বিরুদ্ধে হাত তোলার তিলমাত্র চিন্তাও তোমার

নেই, তখন সে তোমাকে বধ করার উৎসাহ হারাবে। প্রত্যেক শিকারীর এই অভিজ্ঞতা হয়। কেউ গাভী শিকার করেছে এমন কখনও শোনা যায়নি।।[২০]

কষ্টস্বীকারের ক্ষমতা

ক্রোধশূন্য ও অসূয়াশূন্য কষ্টস্বীকারের অরুণোদয়ের সামনে কঠোরতম হৃদয় এবং গহনতম অজ্ঞতাও অন্তর্হিত হয়।[২১]

কষ্টস্বীকারের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। কষ্টস্বীকার প্রাজ্ঞ ও নির্বোধ দু'রকমই হতে পারে এবং সীমা স্পর্শ করার পরে তাকে দীর্ঘায়িত করা শুধু নির্বুদ্ধিতাই নয়, অত্যন্ত অন্যায়।[২২]

প্রকৃত কষ্টস্বীকার আত্মবিস্মৃত এবং কখনও হিসেব কষে না—তার আছে নিজস্ব আনন্দ যা অন্য সব আনন্দকে ছাড়িয়ে যায়।[২৩]

ক্রমেই আমার মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হচ্ছে যে, জনগণের কাছে যে ব্যাপারগুলি মৌলিক গুরুত্বের, যেগুলি নিছক যুক্তি দিয়ে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, কষ্টস্বীকারের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করতে হবে। কষ্টস্বীকার, মানুষের আইন। যুদ্ধ, জঙ্গলের আইন। কিন্তু প্রতিপক্ষকে মতান্তরিত করতে এবং যুক্তির কণ্ঠের সামনে তার প্রায়শ-রুদ্ধ কর্ণকুহর খুলে দিতে জঙ্গলের আইনের তুলনায় কষ্টস্বীকার অনন্তগুণে শক্তিশালী।[২৪]

সত্যাগ্রহের বিধি

ভয় কাকে বলে সত্যাগ্রহী জানে না। অতএব প্রতিপক্ষকে বিশ্বাস করতে সে কখনওই শঙ্কিত নয়। প্রতিপক্ষ যদি তাকে কুড়ি বারও ঠকায়, তবুও একুশবারের বার সত্যাগ্রহী তাকে বিশ্বাস করাব জন্য প্রস্তুত থাকবে। কারণ তার আদর্শের মূল কথা হল মানুষের প্রকৃতিতে নিয়ত আস্থা রাখা।[২৫]

সত্যাগ্রহী যদি সহজাতভাবে আইনমান্যকারী না হয় তাহলে সে ওই নামের অযোগ্য। এই আইন মানার স্বভাবের জন্যই সব আইনের ওপরে যে সর্বোচ্চ আইন, সে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে।[২৬]

সত্যাগ্রহ যেহেতু প্রত্যক্ষ কর্মের অন্যতম সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর পদ্ধতি, তাই সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহ করার আগে অন্য সব উপায় ব্যবহার করে নিঃশেষিত করে। সে নিয়ত ও নিরন্তর ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, জনমতের কাছে আবেদন জানায়, জনমতকে শিক্ষিত করে এবং যে তার কথা শুনতে চায় তার কাছে নিজের বক্তব্য শান্ত ও ধীর ভাবে পেশ করে। এইভাবে সব চেষ্টার পরে সে সত্যাগ্রহ বেছে নেয়। যখন সে তার অন্তরের নিহিত কণ্ঠস্বরের চূড়ান্ত আহ্বান শুনে সত্যাগ্রহ শুরু করে, তখন তার পেছনে কোনও পথ নেই, ফেরার উপায় নেই।[২৭]

সত্যাগ্রহী যেমন সর্বদা লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত তেমনি তাকে শান্তির জন্যও সমান উদগ্রীব থাকতে হয়। শান্তির যে-কোনও সম্মানজনক সুযোগকেই সে স্বাগত জানায়।[২৮]

আমার উপদেশ হল, প্রথমেও সত্যাগ্রহ, শেষেও সত্যাগ্রহ। স্বাধীনতার অন্য কোনও ভালো রাস্তা নেই।[২৯]

পাশবিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ বলে সত্যাগ্রহের বিধিতে কিছু নেই। বা এই আত্মসমর্পণ হচ্ছে কষ্টস্বীকারের কাছে আত্মসমর্পণ, সঙ্গীণধারীর কাছে নয়।[৩০]

সত্যাগ্রহী হিসেবে সবসময়েই আমার যা বক্তব্য তা সর্বদা পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষার জন্য খোলা রাখতে হবে। কোনও ভুল ধরা পড়লে তা দূর করতে হবে।[৩১]

সত্যাগ্রহীর যোগ্যতাবলী

আমি মনে করি, ভারতের প্রত্যেক সত্যাগ্রহীর পক্ষে....নিম্নোক্ত যোগ্যতাবলী আবশ্যক:

১. তাকে ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস রাখতে হবে, কারণ ঈশ্বরই তার আধারশিলা।

২. সত্য এবং অহিংসার আদর্শে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। মানবস্বভাবে নিহিত শুভবোধের প্রতি তাকে আস্থাশীল হতে হবে। এই শুভবোধকে সে তার কষ্টস্বীকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত প্রেম ও সত্যের মাধ্যমে জাগ্রত করতে চেষ্টা করবে।

৩. তাকে পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে এবং নিজের আদর্শের জন্য নিজের জীবন ও সম্পদ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক হতে হবে।

৪. তাকে নিয়মিত খাদিবস্ত্র পরিধান করতে হবে ও চরকা কাটতে হবে। ভারতে এটা একান্তই আবশ্যক।

৫. তাকে সবরকম নেশা থেকে মুক্ত হতে হবে। অন্য সব মাদক দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত হতে হবে। যাতে তার যুক্তিবুদ্ধি সর্বদা স্বচ্ছ ও মন লক্ষ্যে অবিচল থাকে।

৬. সময়ে সময়ে যে নিয়মানুবর্তিতার সূত্র দেওয়া হবে তা সে স্বেচ্ছায় সর্বতোভাবে মেনে চলবে।

৭. কারাগারের নিয়মবিধি সে মেনে চলবে, যদি-না সেগুলি তার আত্মসম্মানকে আঘাত করার জন্য বিশেষভাবে উদ্ভাবিত হয়ে থাকে।

এই যোগ্যতাবলী যেন সম্পূর্ণ বলে মনে করা না হয়। উদাহরণ হিসেবে এগুলির উল্লেখ করা হল।[৩২]

শয়তানের ডানায় ভর করে কোনও সত্যাগ্রহী যেন স্বর্গেও না আরোহণ করে।[৩৩]

সত্যাগ্রহে প্রতারণা বা মিথ্যাচার বা কোনও ধরনের অসত্যের স্থান নেই।[৩৪]

সম্মানজনক শর্তে সমঝোতার সুযোগ সত্যাগ্রহী কখনও হারায় না। হারাতে পারেও না। সবসময়েই, সমঝোতায় ব্যর্থতা এলে সে পুনরায় সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। এর জন্য তার কোনও পূর্বপ্রস্তুতির দরকার হয় না। তার বক্তব্য প্রকাশ্যে জানানো হয়ে থাকে।[৩৫]

অন্যায়কারীকে বিব্রত করার কোনও বাসনা যে সত্যাগ্রহীর থাকে না, এটা প্রায়শ মনে রাখা হয় না। সত্যাগ্রহীর আবেদন অন্যায়কারীর ভয় জাগ্রত করার জন্য নয়। সবসময়েই এর লক্ষ্য তার হৃদয়। সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য অন্যায়কারীকে মতান্তরিত করা, তাকে পীড়ন করা নয়। সর্ববিধ কাজেই সত্যাগ্রহীকে কৃত্রিমতা পরিহার করে চলতে হবে। সে কাজ করবে স্বাভাবিকভাবে, অন্তরের বিশ্বাসের প্রেরণায়।[৩৬]

সত্যাগ্রহ প্রধানত সত্যনিষ্ঠের অস্ত্র। সত্যাগ্রহী অহিংসার কাছে সংকল্পবদ্ধ এবং জনগণ যতক্ষণ না চিন্তায়, কথায় ও কাজে অহিংসা মেনে চলবে, আমি সত্যাগ্রহ করতে পারব না।[৩৭]

বরাবরই বলেছি, কেউ যখন নিজের ভ্রান্তি উত্তল কাচ দিয়ে পরীক্ষা করবে এবং অন্যেরটা করবে বিপরীত উপায়ে, তখনই সে দুই-এর মধ্যে আপেক্ষিক তফাৎ বুঝতে সক্ষম হবে। এ-ছাড়াও আমার বিশ্বাস, যে সত্যাগ্রহী হতে চায় তাকে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে ও বিবেকবানের মতো এই নিয়ম মেনে চলতে হবে।[৩৮]

পাশবিক শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য সত্যাগ্রহী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে....।[৩৯]

প্রতিপক্ষ থেকে আসা কোনও দৃশ্য বা অদৃশ্য বিপদ নিয়ে প্রকৃত সত্যাগ্রহী কখনও বিচলিত হয় না। প্রতিটি সৈন্যদলের মতোই তার ভয়ের কারণ হল তার নিজের মধ্যের বিপদ।[৪০]

সত্যাগ্রহ ও নিপীড়ন

নিপীড়ন নিজেই সত্যাগ্রহে তালিম দেয়, যেমন অভাবিত যুদ্ধ সৈন্যকে দেয় যুদ্ধের প্রশিক্ষণ। সত্যাগ্রহীর অবশ্যকর্তব্য হল নিপীড়নের কারণগুলি আবিষ্কার করা। তাবা দেখবে যে সামান্যতম শক্তি প্রদর্শনেই পীড়িত মানুষ সহজে ভীত হয়ে পড়ে এবং তারা কষ্টস্বীকার ও আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। এটাই হল সত্যাগ্রহের প্রথম শিক্ষা গ্রহণের সময়।

এই অতুলনীয় শক্তি সম্বন্ধে যে কিছুমাত্রও অবহিত সে যেন তার প্রতিবেশীদের এই শিক্ষাই দেয় যে, দুর্বল ও অসহায়ভাবে নয়, অকুতোভয়ে, জ্ঞাতসারে নিপীড়ন সহ্য করতে হবে...

এইগুলিই হল (উত্তেজনাহীন প্রস্তুতির নিয়ম) সত্যাগ্রহ প্রশিক্ষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ধীর-স্থিরভাবে নিরন্তর কাজ করার প্রয়োজনীয় পর্বগুলির মধ্য দিয়ে প্রার্থী যদি না যায় তাহলে সে শক্তিশালী ও সক্রিয় অহিংসার অনুশীলন করতে পারে না।[৪১]

৩৪. সত্যাগ্রহের শক্তি

সত্যাগ্রহের জয়

যতক্ষণ বিদ্বেষ থাকবে ততক্ষণ সত্যাগ্রহের পূর্ণ বিজয় সম্ভব নয়। কিন্তু যারা নিজেদের দুর্বল বলে মনে করে তারা ভালবাসতে পারে না। প্রত্যহ সকালে উঠে তাই আমাদের এই শপথ নিতে হবে, "আমি বিশ্বে কাউকে ভয় করব না। শুধু ভয় পাব ঈশ্বরকে।

কারও প্রতি আমি বিদ্বেষ পোষণ করব না। কারও অন্যায়ের কাছে আমি নতিস্বীকার করব না। সত্য দিয়ে অসত্যকে জয় করব এবং অসত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য করব কষ্টস্বীকার।"[৪২]

সত্যাগ্রহীর জন্য কোনও সময়সীমা নেই। তার কষ্টস্বীকারের ক্ষমতারও কোনও সীমা নেই। তাই সত্যাগ্রহে পরাজয় বলে কিছু থাকতে পারে না।[৪৩]

জীবনকে আমি সামান্যই মূল্য দিই বলে সত্যাগ্রহের জন্য হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর স্বেচ্ছামৃত্যু বরণে আমি আনন্দিত—এ-কথা ঠিক নয়। এর কারণ, আমি জানি শেষ পর্যন্ত এতে জীবনহানি সর্বাপেক্ষা কম হয় এবং সর্বোপরি যাবা জীবন দেয় তারা মহান হয়ে ওঠে এবং তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে নৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে।[৪৪]

একবার যখন সত্যাগ্রহ গতিশীল হয় তখন তা যথোপযুক্ত তীব্র হলে এর প্রভাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন করতে পারে। এ হল মহত্তম শক্তি, কারণ এতে আত্মার সর্বোত্তম প্রকাশ।[৪৫]

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে, ক্রমোন্নয়নের সূত্র, প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি স্বতঃসিদ্ধে পরিণত হয়। কোনও সত্যাগ্রহ সংগ্রাম যখন এগিয়ে চলে, তখন অন্যান্য বহু উপাদানের সহায়তায় এর স্রোত আরও তীব্রতর হয় এবং ক্রমেই আবও বেশি করে ফল পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়া সত্যই অপ্রতিরোধ্য এবং সত্যাগ্রহের প্রাথমিক নীতির সঙ্গে জড়িত। কাবণ সত্যাগ্রহে যা ন্যূনতম তা সর্বোচ্চও বটে, যেহেতু ন্যূনতমেব চেয়ে কম আর হয় না, তাই পিছু হঠার কোনও প্রশ্নও নেই। একমাত্র সম্ভাব্য গতি হচ্ছে সামনের দিকে। অন্যান্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে, এমনকি যদি তা ন্যায়সঙ্গতও হয়, দাবীগুলি একটু বাড়িয়ে রাখা হয় যাতে ভবিষ্যতে কমানো যায়। এইজন্য ক্রমোন্নয়নের সূত্র সব ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হয় না।[৪৬]

আমার কাছে সত্যাগ্রহ হল বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ সক্রিয় শক্তি। এ হল সূর্যের মতো যা প্রতিদিন অব্যর্থভাবে আকাশে উদিত হয়। যদি আমরা একে বুঝতে পারতাম তাহলে দেখতাম, এর শক্তি লক্ষ কোটি সূর্যেরও অধিক। এর থেকেই বিচ্ছুরিত জীবন ও জ্যোতি এবং শান্তি ও সুখ।[৪৭]

একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী

মাত্র একজন সত্যাগ্রহীও যদি শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকে তাহলে জয় নিশ্চিত।[৪৮]

জিঘাংসা প্রবৃত্তির ফলে মৃত লক্ষ লোকের জীবনদানের চেয়ে এক জন নিরাপরাধ মানুষের আত্মোৎসর্গ লক্ষগুণে বেশি প্রভাবশালী। ঈশ্বর বা মানুষ-কল্পিত সবচেয়ে বর্বর অত্যাচারের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রত্যুত্তর হল নিরপরাধের ঐচ্ছিক আত্মোৎসর্গ।[৪৯]

আমি মনে করি, মাত্র একজন ব্যক্তিও যদি প্রায়-পূর্ণভাবে অহিংস হয়, তাহলে সে মহাগ্নিও নির্বাপিত করতে পারে....প্রত্যাশিত ফলগুলি জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় অর্জিত হোক, গণতন্ত্রের এই যুগে এটাই আবশ্যক। অতীব ক্ষমতাশালী কোনও একজন

ব্যক্তির চেষ্টায় কোনও লক্ষ্যসাধন নিঃসন্দেহে উত্তম কিন্তু এ ঘটনা কখনওই জনগোষ্ঠীকে তার সম্মিলিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে পারে না।[৫০]

আমি একা চলায় বিশ্বাসী। একাই আমি এই বিশ্বে এসেছিলাম। মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকায় আমি একাই হেঁটেছি। সময় এলে আমি একাই চলে যাব। আমি জানি, যদি কখনও নিতান্ত একা পড়ে যাই তখনও সত্যাগ্রহ শুরু করার ক্ষমতা আমার থাকবে। এ আগেও আমি করেছি।[৫১]

সত্যাগ্রহের প্রয়োগ

সত্যাগ্রহ এমন এক শক্তি যা ব্যক্তিবিশেষ আবার জনগোষ্ঠীও ব্যবহার করতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, গৃহস্থালীব ব্যাপারেও ব্যবহৃত হতে পারে। সর্বজনীন প্রযোজ্যতা এব চিরন্তনতা ও দুর্ভেদ্যতার প্রমাণ। পুরুষ, নারী ও শিশুরাও সত্যাগ্রহ করতে পারে।

দুর্বলরা যতদিন না হিংসার জবাব হিংসায় দেবার ক্ষমতা অর্জন করবে ততদিন তারাই কেবল এই শক্তি ব্যবহাব করবে, এ-কথা একেবারে সত্য নয়।

সন্ত্রাস এবং সর্ববিধ নিপীড়ন ও সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই শক্তির সম্পর্ক অন্ধকারের সঙ্গে আলোব মতো। রাজনীতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে অপরিবর্তনীয় নীতিবাক্য হল : জনগণের ওপরে শাসন ততক্ষণই সম্ভব যতক্ষণ তারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শাসিত হতে চায়।[৫২]

একমাত্র আদি সত্যাগ্রহী বলে আমি কখনও দাবী করিনি। শুধু বলেছি, এই মতাদর্শের প্রয়োগ প্রায় বিশ্বজনীন। তবে, সর্বযুগে ও দেশে হাজারে হাজারে মানুষ এই মতাদর্শকে আত্মস্থ করবে কি না সেটা দেখতে বা তার প্রমাণ পেতে এখনও বাকি আছে।[৫৩]

অহিংস অধিকার

সত্যাগ্রহ বিশ্বজনীন-প্রয়োগের এক নিয়ম। পরিবার থেকে শুরু করে এর ব্যবহার যে-কোনও এলাকায় বিস্তৃত হতে পারে।

ধরা যাক, কোনও জমিদার তার রায়তদের শোষণ করে এবং শ্রমের ফল থেকে তাদের বঞ্চিত ক'রে নিজের ভোগের জন্য আত্মসাৎ করে। রায়তরা গিয়ে যখন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল সে শুনল না, বরং উল্টে বলল, তার স্ত্রীর জন্য এতটা দরকার, ছেলেপুলের জন্য কতটা দরকার ইত্যাদি। তখন ঐ প্রজারা বা তাদের সমর্থনে যারা এগিয়ে এসেছে সেই প্রভাবশালী লোকেরা জমিদারের স্ত্রীর কাছে আবেদন করল, সে যেন তার স্বামীকে বোঝায়। স্ত্রী সম্ভবত বলবে, তার নিজের জন্য শোষণের অর্থের দরকার নেই। সন্তানেরাও একইভাবে বলবে যে, তারা নিজেরাই পরিশ্রম করে নিজেদের চাহিদা মেটাবে।

ধরা যাক, এর পরেও জমিদার কারো কথায় কান দিল না। বা তার স্ত্রীপুত্রকন্যারাও প্রজাদের বিরুদ্ধে একজোট হল। এরকম হলে প্রজারা মানবে না। চলে যেতে বললে তারা চলে যাবে কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়ে যাবে যে, জমি যে-চষে জমি তারই

হয়। মালিক তো আর গোটা জমিটা নিজে চাষ করতে পারে না। রায়তদের ন্যায্য দাবি তাকে মানতে হবে।

এমনও হতে পারে রায়তদের বদলি অন্য লোক এল। হিংসার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বিক্ষোভ চলবে যতক্ষণ না বদলি রায়তরা নিজেদের ভুল বঝতে পেরে উৎখাত রায়তদের সমব্যথী হয়।

এইভাবে, সত্যাগ্রহ হচ্ছে জনমতকে শিক্ষাদানের এক এমন পদ্ধতি যা সমাজের সব অংশের ওপরে প্রভাবশালী হয়, শেষে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। হিংসা এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আমূল সামাজিক কাঠামোতে প্রকৃত বিপ্লব তার ফলে দীর্ঘায়িত হয়।

সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী হল

১. প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে সত্যাগ্রহীর হৃদয়ে কোনও ঘৃণা থাকবে না; ২. সত্যাগ্রহের বিষয়টিকে সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে; ৩. তার কর্মাদর্শ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কষ্টস্বীকারের জন্য সত্যাগ্রহীকে প্রস্তুত থাকতে হবে।[৫৪]

আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ

আমি বিশ্বাস করি এ-যুগে প্রত্যেক নর-নারীর আত্মরক্ষার কৌশল শেখা উচিত। পশ্চিমে এটা অস্ত্র সহযোগে শেখানো হয়। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময় ধরে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বয়স বা লিঙ্গভেদে সত্যাগ্রহের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য সকলেই। এই প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল মানসিক, কায়িক নয়। মানসিক প্রশিক্ষণে কোনও জোব-জবরদস্তি চলে না। পারিপার্শ্বিকতা নিঃসন্দেহে মনের ওপরে কাজ করে কিন্তু তার দ্বারা জুলুম সমর্থিত হয় না ....

সত্যাগ্রহ সবসময়েই সশস্ত্র প্রতিরোধের চেয়ে শ্রেয়। এটা তর্কে নয়, প্রত্যক্ষ প্রদর্শনেই ভালো বোঝানো যায়। এই আয়ুধ বলশালীকেই মানায়। সত্যাগ্রহ কখনওই দুর্বলের ভূষণ হতে পারে না। দুর্বল বলতে এখানে দৈহিক নয়, মন ও আত্মার দুর্বলতার কথা বলা হচ্ছে। ওই সীমাবদ্ধতা একটি মূল্যবান গুণ, নিন্দনীয় বিচ্যুতি নয়।

আরও একটি সীমাবদ্ধতা বোঝা দরকার। কোনও ভ্রান্ত আদর্শের জন্য কখনওই সত্যাগ্রহ ব্যবহৃত হতে পারে না।

প্রতিটি গ্রাম এবং নগরের কয়েকটি ক'রে বাড়ি নিয়ে সত্যাগ্রহ-ব্রিগেড সংগঠিত হতে পারে। প্রতিটি ব্রিগেড গঠিত হবে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যারা সংগঠকদের সুপরিচিত। এ ব্যাপারে সত্যাগ্রহ সশস্ত্র প্রতিরক্ষার থেকে আলাদা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রত্যেকের কাজ দাবি করে। আর সত্যাগ্রহ-ব্রিগেডে একমাত্র তারাই থাকতে পারে যারা অহিংসা ও সত্যে বিশ্বাসী। এইজন্যই দলভুক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিশদ ধারণা সংগঠকদের থাকা আবশ্যক।[৫৫]

দুরাগ্রহ

হিংসার পদ্ধতি থেকে ভারতের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। এর ফলে কর্মীরা আত্মহননের পথে যাবে এবং যদি কর্মীরা দেশের আইন অপরাধমূলকভাবে অমান্য ক'রে তাদের ক্রোধের প্রকাশ ঘটায় তাহলে ভারতকে অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করতে হবে...

আমি যখন সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য সম্বন্ধে প্রচার শুরু করি, তার মধ্যে মোটেই অপরাধমূলক আইন অমান্যের বিষয়টি ছিল না। আমার অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে, সত্যের প্রচার হিংসা দিয়ে কখনওই সম্ভব নয়।

যারা নিজেদের আদর্শের যাথার্থ্যে বিশ্বাসী তাদের অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। আর যারা অপরাধমূলক আইন অমান্য বা হিংসামূলক কাজের ঊর্ধ্বে, তারাই কেবল আইন অমান্যে যোগ দিতে পারে।

কোনও ব্যক্তি একই সঙ্গে নাগরিক ও অপরাধমূলক আইন অমান্য করতে পারে না। যেমন সে একই সঙ্গে শান্ত ও ক্রুদ্ধ হতে পারে না। নিজের ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ অধিকার অর্জন করলে তবেই যেমন কেউ আত্মসংযমী হতে পারে, তেমনি দেশের আইন স্বেচ্ছায় পুরোপুরি মেনে চলার শৃঙ্খলা অর্জন করলে তবেই নাগরিক আইন অমান্যের ক্ষমতা মেলে।

আবার, একমাত্র সেই লোককেই মোহমুক্ত বলা যায় যে এর সম্মুখীন হয়েও একে প্রতিরোধ করতে পেরেছে। তেমনই, যখন ক্রোধের যথেষ্ট কারণ থাকলেও আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হব তখন আমরাও বলতে পারব যে ক্রোধকে আমরা জয় করেছি।[৫৬]

কতিপয় ছাত্র 'বসে ধর্না' দেওয়াব মধ্য দিয়ে বর্বরতার প্রাচীন এক ধারা পুনরায় চালু করেছে....আমি এটাকে বর্বরতা বলি, কারণ এ হল পীড়নের এক স্থূল পদ্ধতি। এটা কাপুরুষোচিতও বটে। কারণ যে ধর্না দেয় সে জানে যে তাকে কেউ মাড়িয়ে যাবে না। পদ্ধতিটিকে সহিংস বলা কঠিন তবে নিশ্চিতভাবে তার চেয়েও জঘন্য।

আমরা যদি প্রতিপক্ষের সঙ্গে মারামারি করি তাহলে অন্তত তাকে ফিরে ঘুসি মারবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু, যাবে না জেনেও আমরা যখন তাকে আমাদের মাড়িয়ে চলে যেতে আহ্বান করি তখন তাকে খুবই বিব্রত ও অবমাননাকর অবস্থায় ফেলা হয়। আমি জানি, যে-অত্যুৎসাহী ছাত্ররা ধর্না দিয়েছে তারা এর বর্বরতার দিকটা ভাবেনি। কিন্তু যার নিজের বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনে সকল বিরোধিতার বিরুদ্ধে একা দাঁড়ানোর কথা তাকে তো চিন্তাভাবনা করেই চলতে হবে।

কোনও অস্থিরতা, বর্বরতা, অভব্যতা ও জবরদস্তি চলবে না। আমরা যদি গণতন্ত্রের প্রকৃত ভাবধারা জাগ্রত করতে চাই তাহলে আমাদের অসহিষ্ণু হলে চলবে না। অসহিষ্ণুতা নিজের আদর্শে নিজের আস্থারই হানি ঘটায়।[৫৭]

আমাকে গ্রেপ্তার করার পর এত উত্তেজনা ও গোলযোগের কারণ আমি বুঝে উঠতে পারিনি। এ সত্যাগ্রহ নয়। দুরাগ্রহের চেয়েও খারাপ।

সত্যাগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল যে সর্ববিধ হিংসা থেকে বিরত

থাকবে এবং পাথর ছুঁড়ে বা কোনওভাবে কাউকে আঘাত করবে না। কিন্তু বোম্বাইতে আমরা পাথর ছুঁড়েছি। রাস্তা অবরোধ ক'রে ট্রামগাড়ির পথ রোধ করা হয়েছে। এ সত্যাগ্রহ নয়। আমরা এমন পঞ্চাশ জনের মুক্তির দাবী করেছি যারা হিংসাত্মক ঘটনার জন্য গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের মূল কর্তব্য ছিল নিজেরা গ্রেপ্তার বরণ করা। যারা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত ছিল তাদের মুক্তি দাবী করলে ধর্মীয় কর্তব্য ভঙ্গ করা হয়।[৫৮]

আমি বারংবার বলেছি যে সত্যাগ্রহে হিংসা, লুঠপাট বা অগ্নিসংযোগের কোনও স্থান নেই। তবুও সত্যাগ্রহের নামে আমরা বাড়ি পুড়িয়েছি, জোর করে অস্ত্র দখল করেছি, টাকা লুঠ করেছি, ট্রেন থামিয়েছি, টেলিগ্রাফের তার কেটেছি, নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছি এবং দোকানপাট, বসতবাড়ি লুঠ করেছি। এই ধরনের কাজ ক'রে যদি আমি কারাগার বা ফাঁসির মঞ্চ থেকেও রেহাই পেতাম, তাহলেও আমি ওইভাবে রক্ষা পেতে চাইতাম না।[৫৯]

...ভ্রান্ত আদর্শের জন্য বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগ শক্তির প্রভূত অপচয়। ভ্রান্ত আদর্শের জন্য ভ্রান্তভাবে ব্যবহৃত বীরত্ব, আত্মত্যাগের চটক সৃষ্টি ক'রে সেদিকে নজর কেড়ে নেয়, ফলে ভালো আদর্শের ক্ষতি হয়।[৬০]

....কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্বিচার প্রতিরোধ আইনহীনতা, অবাধ যথেচ্ছাচার, সবশেষে নিজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে।[৬১]

৩৫. অসহযোগ

জনগণের মধ্যে মর্যাদা ও ক্ষমতার বোধ জাগিয়ে তোলার অন্যতম চেষ্টা হল অসহযোগ। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন তারা বুঝবে যে, অন্তরস্থ আত্মাকে জানতে পারলে পাশবিক শক্তিকে ভয় পাওয়াব কোনও কারণ থাকবে না।[৬২]

না-জেনে ও অনিচ্ছায় কু-কাজে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে অসহযোগ এক প্রতিবাদ... 'সু' এর সঙ্গে সহযোগিতা যেমন একটি কর্তব্য সেইরকম আর একটি কর্তব্য, হল 'কু'-এর সঙ্গে অসহযোগ।[৬৩]

অসহযোগ কোনও নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয় অতীব সক্রিয়, বরং দৈহিক প্রতিরোধ বা হিংসার চেয়েও। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কথাটি ভ্রমাত্মক। আমি যেভাবে অসহযোগ ব্যবহার করেছি তাকে অহিংস হতেই হবে, অতএব তাকে শাস্তিমূলক হলে চলবে না। ঘৃণা, অশুভ ইচ্ছা বা বিদ্বেষ এর ভিত্তি হলেও চলবে না।[৬৪]

ধর্মীয় ভিত্তি

আমি বলি, 'ভাগবদগীতা' হল অন্ধকার ও আলোকের শক্তির মধ্যে অসহযোগের এক সুসমাচার। একেবারে আক্ষরিক অর্থ করলেও দেখা যায় যে অন্যায়কারী কৌরবদের বিরুদ্ধে যথার্থ আদর্শের প্রতিভূ অর্জুনকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

তুলসীদাস সন্তকে (ভালো) উপদেশ দিয়েছেন, অ-সন্তদের (পাপীদের) পরিহার করতে।

জেন্দ-আবেস্তায় বলা হয়েছে, আহুরমাজদা ও আহিরিমানের মধ্যে চিরন্তন এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে। এদের মধ্যে কোনও সমঝোতা নেই। বাইবেল সম্বন্ধে কেউ যদি বলে যে এতে অসহযোগের বিরোধিতা করা হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে, সে যীশুকে জানেই না, কারণ তিনি ছিলেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধীদের মধ্যে যুবরাজোপম, যিনি আপসহীন মনোভাব নিয়ে সদ্দূকি ও ফরীশীদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং সত্যের জন্য তাদের পিতামাতার কাছ থেকে পুত্রদের সরিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি।

আর ইসলামের মহানবী কী করেছিলেন? যতক্ষণ তাঁর জীবন বিপন্ন হয়নি ততক্ষণ তিনি অতীব সক্রিয়ভাবে মক্কাতে অসহযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন এবং যখন দেখলেন যে তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের নিরর্থক প্রাণ দিতে হবে তখন তিনি পদযুগল থেকে মক্কার ধুলো মুছে ফেলে মদিনাতে পলায়ন করেন। প্রত্যাবর্তন করেন তখনই যখন তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার উপযুক্ত শক্তি হয়েছিল।

সকল ধর্মেই বলা হয়েছে, অন্যায়কারী ব্যক্তি ও নৃপতিদের সঙ্গে অসহযোগ যেমন কর্তব্য তেমনই কর্তব্য হল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও নৃপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা। বস্তুত, বিশ্বের অধিকাংশ ধর্মপুস্তকেই অসহযোগ অতিক্রম ক'রে অন্যায়ের কাছ আত্মসমর্পণের পরিবর্তে হিংসাকে আশ্রয় করার কথাই বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য...স্পষ্টভাবে অসহযোগের কর্তব্য প্রমাণ করে। প্রহ্লাদ তাঁর পিতার, মীরাবাঈ তাঁর স্বামীর এবং বিভীষণ তাঁর নির্মম ভ্রাতার...সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন।[৬৫]

মৌলনীতি

যে-মৌলনীতি অহিংসার আশ্রয় তা হল নিজের ক্ষেত্রে যা ভালো তা সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। সমগ্র মানবজাতিই মূলত এক। অতএব যা আমার পক্ষে সম্ভব তা সকলের পক্ষেই সম্ভব....

অহিংস অসহযোগের নীতির এই হল সারাৎসার। অতএব, বোঝাই যায় যে, প্রেমেই এর উৎস। এর লক্ষ্য কখনওই প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেওয়া বা আঘাত করা নয়। এমনকি তার সঙ্গে সহযোগিতা করার সময়েও তাকে অনুভব করাতে হবে যে আমাদের মধ্যে তার বন্ধুরাই রয়েছে এবং যখনই সম্ভব তখনই তার প্রতি মানবিক আচরণ করে তার হৃদয় স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে।

অহিংস সংঘাতের পর কোনও তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে না। শেষে শত্রুরা মিত্রে পরিণত হয়। সত্যি বলতে , এটাই অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা। দক্ষিণ অফ্রিকায় জেনারেল স্মাটস্-এর ক্ষেত্রে আমার এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। গোড়াতে তিনি ছিলেন আমার তীব্র বিরোধী ও সমালোচক। আজ তিনি আমার পরম বন্ধু.....

স্থায়ী গুণ

সময় পাল্টায় এবং ব্যবস্থাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস যে শেষ পর্যন্ত একমাত্র

অহিংসা এবং অহিংসাশ্রিত যা—কিছু তা-ই টিকে থাকবে। উনিশ শত বছর আগে খ্রীস্টধর্মের জন্ম। যীশুর কর্তৃত্বের আয়ু মাত্র তিন বছর। তাঁর সময়েও তাঁর শিক্ষাকে ভুলভাবে বোঝা হয়েছিল এবং বর্তমানের খ্রীস্টধর্ম তাঁর মূল শিক্ষার নেতিকরণে পর্যবসিত। (তিনি বলেছিলেন, "তোমার শত্রুকে ভালোবাসো"। অবশ্য কোনও ব্যক্তির শিক্ষার সারমর্ম প্রচারিত হওয়ার পক্ষে উনিশ শত বছর কী আর এমন সময়) ?

এরপর ছয় শতাব্দী কেটে গেল এবং ইসলামের আবির্ভাব ঘটল, বহু মুসলমানই আজ আমাকে এই কথাটিও বলতে দেবে না যে, শব্দার্থ অনুযায়ী ইসলাম যা বোঝায় তাহলে নির্ভেজাল শান্তি। 'কোরান' পাঠ করে আমি নিশ্চিত যে, ইসলামের ভিত্তি হিংসা নয়।

কিন্তু এখানেও, কালচক্রে তেরশ বছর এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমি নিশ্চিত যে, এই দুই মহান ধর্ম ততটাই প্রাণবন্ত থাকবে যতটা পরিমাণে এর অনুগামীরা অহিংসার মূল শিক্ষাটি গ্রহণ করবে। কিন্তু এটা নিছক বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয় নয়, একে হৃদয়ের অন্তস্তলে গ্রহণ করতে হবে।[৬৬]

সত্যাগ্রহের অস্ত্রগারে অসহযোগ অন্যতম প্রধান অস্ত্র হলেও এটা ভুললে চলবে না যে এটা শুধুমাত্র সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রতিপক্ষের সহযোগিতা আদায়ের উপায়। অহিংস পদ্ধতিব মর্মার্থ: এই পদ্ধতি বৈরিতাকে শেষ করতে চায়, বৈরীকে নয়। অহিংস সংগ্রামে, একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তোমার সংগ্রাম, তার ঐতিহ্য ও প্রথাগত বিধান তোমাকে মানতে হবে। অতএব সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য কখনওই বিরোধী ক্ষমতার সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলা নয়, বরং সেই সম্পর্কের পরিবর্তন ও বিশুদ্ধিসাধন।[৬৭]

অসহযোগের নীতিশাস্ত্র

অসহযোগকে আমি এমনই শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি বলে মনে করি যে, আন্তরিক মনোভাব নিয়ে একে ব্যবহার করলে এ হল প্রথমে স্বর্গরাজ্য সন্ধানের মতো এবং পরে সবকিছুই একে একে ঘটে। জনগণ তখন তাদের প্রকৃত ক্ষমতা বুঝতে পারবে। তারা তখন শৃঙ্খলা, আত্মসংযম, যৌথ কর্মোদ্যোগ, অহিংসা, সংগঠন ইত্যাদি যা-কিছু একটি জাতিকে আরও বড় করে তোলে, তার মূল্য বুঝতে পারবে।[৬৮]

কোনও হাতিয়ারই অসহযোগের মতো এত শুদ্ধ, এত নিরীহ অথচ এত বেশি কার্যকর নয়। যথার্থ বিচক্ষণতায় ব্যবহৃত হলে এর থেকে কোনও নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে পারে না। এবং জনগণের আত্মত্যাগের ক্ষমতার ওপরে এর তীব্রতা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল।[৬৯]

আমরা 'না' বলার ক্ষমতা হারিয়েছি। সরকারের বিরুদ্ধে 'না' বলা প্রায় আনুগত্যহীনতা, প্রায় মহা অপরাধে পর্যবসিত। সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই ইচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান হল আগাছা দূর করার কাজের মতো, যা বীজবপনের আগে চাষী করে। বৃষ্টিতে আগাছা নিড়ানো বীজবপনের মতোই প্রয়োজনীয়। এবং গাছগুলি যখন বড় হয় তখনও নিড়ানী চাষীর কাছে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের একটি যন্ত্রই থেকে যায়। সকল চাষীই এটা জানে।

জাতির অসহযোগ হল তার নিজের শর্তে সরকারকে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমন্ত্রণ জানানো। এটাই প্রতিটি জাতির অধিকার এবং প্রতিটি উত্তম সরকারের কর্তব্য। অসহযোগের মাধ্যমে জাতি ফতোয়া জারি করে দেয় যে, সে আর লেজুড় হয়ে থাকবে না।[৭০]

পশ্চিমের স্বাধীনতার জন্য যে-সব ঐতিহাসিক সংগ্রাম হয়েছে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তার কোনও সাদৃশ্য নেই। এর ভিত্তি পাশবিক শক্তি বা বিদ্বেষ নয়। অত্যাচারীকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় এর নেই। এহল আত্মশুদ্ধির এক আন্দোলন। অতএব, এর লক্ষ্য অত্যাচারীকে মতান্তরিত করা। এটা সফল না-ও হতে পারে, কারণ ভারত এখনও গণ-অহিংসার জন্য প্রস্তুত নয়। কিন্তু মিথ্যা মানদণ্ডে এই আন্দোলনের বিচার করলে ভুল করা হবে। আমার নিজস্ব মত হল, এই আন্দোলন কোনও বিচারেই বিফল হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস অসহযোগ একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

এ-এক কর্তব্য

এক এক সময় অসহযোগ, সহযোগিতাব মতোই কর্তব্য পর্যবসিত হয়। নিজের অধঃপতন বা দাসত্বের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে কেউই বাধ্য নয়। অনোব চেষ্টায স্বাধীনতা পেলে, দাতারা যত দয়াবানই হোন না কেন, তা রক্ষা করা যায় না যদি ওই প্রচেষ্টা সরিয়ে নেওয়া হয়। অন্যভাবে বললে, ঐ স্বাধীনতা আসল স্বাধীনতা নয। কিন্তু অহিংস অসহযোগের মাধামে এটি অর্জন করাব শিল্প শেখার সঙ্গে সঙ্গে এমনকি যে নগণ্যতম, সে-ও প্রকৃত স্বাধীনতার আলো দেখতে পায়.....

আমি নিশ্চিত যে অহিংস অসহযোগ যা করতে পারে হিংসা কখনওই তা পারে না—তা হল অন্যায়কারীর হৃদপরিবর্তন। অহিংসাব যে পবীক্ষা প্রয়োজন ছিল, ভারতে আমরা তার ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমাদেব মিশ্রিত অহিংসা সত্ত্বেও যে আমরা এতটা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি সেটাই হল আসল বিস্ময়।[৭২]

আমি অসহযোগকে ধর্মীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছি, কারণ রাজনীতিতে আমি ততটাই প্রবিষ্ট হই যতটা তা আমার ধর্মীয় অংশকে উন্নীত করে।[৭৩]

আমার অসহযোগের পেছনে সবসময়েই রয়েছে, সামান্যতম সুযোগে, এমনকি আমার তীব্রতম প্রতিপক্ষের সঙ্গেও সহযোগিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা। নিয়ত ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী জনৈক অসম্পূর্ণ নশ্বর মানুষ হিসেবে আমার কাছে কেউই উদ্ধারের অযোগ্য নয়।[৭৪]

......কোনও ক্রূর ব্যাপারই আমার সমর্থন পাবে না। আমার কাছে সত্যাগ্রহের আইন, প্রেমের আইন হল এক চিরন্তন নীতি। যা কিছু ভালো তার সঙ্গে আমি সহযোগিতা করি। যা মন্দ তার সঙ্গে আমার অসহযোগিতা....।[৭৫]

বিদ্বেষ নয়

সুদীর্ঘ প্রার্থনাময় নৈতিক ও মানসিক শিক্ষার আশীর্বাদে আমি প্রায় চল্লিশ বছর কাউকে

ঘৃণা করতে পারিনি। জানি, বড় বেশি দাবী করছি। তবুও যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই কথাটা বলছি। কিন্তু যেখানেই পাপ থাকবে তাকে আমি ঘৃণা করতে পারি ও করি।

আমার অসহযোগের উৎস বিদ্বেষে নয়, বরং প্রেমে। আমার ব্যক্তিগত ধর্ম আমাকে সবসময় কাউকে ঘৃণা করতে নিষেধ করে। এই সহজ অথচ মহৎ আদর্শটির সন্ধান আমি একটি স্কুলপাঠ্য বইতে পেয়েছিলাম, তখন আমার বয়স বারো। সেই বিশ্বাস আমার এখনও রয়েছে, প্রতিদিনই এটা বাড়ছে। আমার মধ্যে এ এক বাঁধনহারা আবেগ।[৭৬]

সর্বব্যাপারে আনুগত্যহীনতা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু সকল অসত্য, যা-কিছু অন্যায়, যত পাপ তার প্রতি ওই মনোভাব আমি পোষণ করি....

আমি কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতি ততদিনই অনুগত থাকি যতদিন সেই প্রতিষ্ঠান আমার বিকাশের সহায়ক হয়, জাতির বিকাশের সহায়ক হয়। যে মুহূর্তে আমি দেখব যে ঐ প্রতিষ্ঠান বিকাশের সহায়ক হবার বদলে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখনই আমার অবশ্য কর্তব্য হবে আনুগত্য ত্যাগ করা।[৭৭]

আমার জীবনদর্শনে অঙ্গ হলেও আমার অসহযোগ হচ্ছে সহযোগিতারই নান্দীপাঠ। আমার অসহযোগ, পদ্ধতি ও ব্যবস্থার সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে নয়। এমনকি একজন ডায়ার-এর বিরুদ্ধে অশুভ ইচ্ছা পোষণ করাও আমার অনুচিত। আমার মতে বিদ্বেষ মানুষের মর্যাদাবোধের পরিপন্থী।[৭৮]

কেউ কেউ বলে, আমি নাকি আমার কালের মহত্তম বিপ্লবী। এটা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু আমি নিজেকে একজন বিপ্লবী, জনৈক অহিংস বিপ্লবী, বলে মনে করি। অসহযোগ আমাব হাতিয়ার। কোনও ব্যক্তিই সংশ্লিষ্ট লোকজনের ঐচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক সহযোগিতা ব্যতিবেকে সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে না।[৭৯]

সহযোগিতা আমার সহজাত। আমার এই অসহযোগের লক্ষ্য হচ্ছে সহযোগিতা থেকে সকল ক্ষুদ্রতা ও মিথ্যাচাব দূর করা। অন্যথায় ওই সহযোগিতাকে আমি শব্দটির অপলাপ করে মনে করি।[৮০]

৩৬. অনশন ও সত্যাগ্রহ

সত্যাগ্রহের আয়ুধ

সত্যাগ্রহের অস্ত্রাগারের একটি শক্তিশালী আয়ুধ হল অনশন। সকলে এটা করতে পারে না। শারীরিক ক্ষমতা থাকলেই অনশন করার যোগ্যতা জন্মায় না। ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস না থাকলে এই অনশন নিষ্ফল। কখনওই এটি একটি যান্ত্রিক প্রচেষ্টা বা নিছক অনুকরণ হওয়া উচিত নয়। এর আহ্বান আসতে হবে আত্মার গভীর থেকে। তাই, এমন অনশন সবসময়েই বিরল।[৮১]

শুদ্ধ অনশনে কখনওই স্বার্থপরতা, ক্রোধ, বিশ্বাসহীনতা বা অধৈর্যের কোনও জায়গা থাকতে পারে না....এখানে যা থাকা দরকার তা হল অসীম ধৈর্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একাগ্র

মন, অনাবিল শান্তি এবং ক্রোধহীনতা। যেহেতু একযোগে কোনও ব্যক্তির পক্ষে একাধারে এইসব গুণ প্রদর্শন করা অসম্ভব, তাই এমন কোনও ব্যক্তির সত্যাগ্রহী-অনশন করা উচিত নয়, যে অহিংসার নিয়মগুলি গভীরভাবে অনুসরণ করার কাজে আত্মনিবেদন করেনি।[৮২]

(অনশন করা) হল...কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং সর্বাংশে বিপদমুক্তও নয়। অতীতে অনশন যখন আমার কাছে ভুল বা নৈতিকভাবে অসঙ্গত বলে মনে হয়েছে, আমিও তার নিন্দা করেছি। কিন্তু যেখানে স্পষ্ট নৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে, সেখানে অনশন থেকে পেছিয়ে আসা কর্তব্যে অবহেলা। সঠিক অনশনের ভিত্তি হওয়া উচিত নির্ভেজাল সত্য ও অহিংসা।[৮৩]

আমৃত্যু অনশন

আমৃত্যু অনশন, সত্যাগ্রহের অস্ত্রাগারের সর্বশেষ ও সর্বাধিক ক্ষমতাশালী অস্ত্র। এ এক পবিত্র ব্যাপার। কিন্তু এর সর্ববিধ ফল পরিণাম বিচার করে এই অনশন করতে হয়। শুধু অনশন নয়, তার অর্থ কী তা-ই বিচার্য।[৮৪]

অনশন ও খ্রীস্টের পথ

যান্ত্রিকভাবে অনশন করা যায় না। অনশন শক্তিশালী বটে কিন্তু শখ করে ব্যবহার করলে বিপজ্জনক। এমনকি মনের মধ্যেও প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে যা লাগে, তার থেকেও অনশনে সম্পূর্ণতর আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। অনুরূপ একটি সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ সারা জগতের পক্ষে যথেষ্ট। যীশুর জীবনকে এরই দৃষ্টান্ত মনে করা হয়।[৮৫]

অনশন কখনও পীড়নমূলকও হতে পারে এটা অনস্বীকার্য। তেমন অনশন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা আদায় বা ওই জাতীয় কোনও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে অনশন করলে তা পীড়নমূলক ব্যবহার বা অসাধু প্রভাব খাটানোর সমতুল। ওইভাবে প্রভাব সৃষ্টির বিরুদ্ধে আমি নির্দ্বিধায় প্রতিরোধ চালাতে বলব। আমার বিরুদ্ধে যখন এরকম অনশন হয়েছে বা তার হুমকি দেওয়া হয়েছে তখন আমি নিজে সাফল্যের সঙ্গে তার প্রতিরোধ করেছি।

আর, যদি তর্ক তোলা হয়, স্বার্থপর ও স্বার্থহীন লক্ষ্যের মধ্যে বিভাজন রেখাটি বড়ই সূক্ষ্ম, আমি তাহলে বলব কেউ যদি মনে করে কোনও অনশনের লক্ষ্য স্বার্থপর বা অন্যভাবে অসৎ, তাহলে তার উচিত সর্বতোভাবে ওই অনশনের কাছে নতিস্বীকার না করা। এমনকি অনশনরত ব্যক্তির যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও না।

জনসাধারণ যদি অসৎ উদ্দেশ্যজাত অনশন উপেক্ষা করার অভ্যাস রপ্ত করে, তাহলে এই ধরনের অনশন পীড়নমূলক ও অন্যায় প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা মুক্ত হবে। অন্যান্য মানবিক কর্মের মতো অনশনও আইনী ও বেআইনীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।[৮৬]

স্বনামধন্য মহান কোনও ব্যক্তিও যদি একটি অযৌক্তিক আদর্শ বেছে নিয়ে তার সমর্থনে অনশন করে, তাহলে তার বন্ধু, সহকর্মী ও আত্মীয়দের কর্তব্য হচ্ছে (যাদের মধ্যে আমি নিজেকেও ধরি) তাকে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া, যাতে তাকে বাঁচিয়ে রেখে

অন্যায় আদর্শটি জিততে না পারে। সর্বোত্তম উপায়ও আর উত্তম থাকে না যখন শেষ লক্ষ্যটি ভ্রান্ত হয়।[৮৭]

শেষ আশ্রয়

একটি সাধারণ নীতির কথা আমি বলতে চাই। শেষ উপায় হিসেবে সত্যাগ্রহী তখনই অনশন বেছে নেবে যখন লক্ষ্যসাধনের অন্য সব উপায় পরীক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়। অনশনের ক্ষেত্রে অনুকরণের কোনও স্থান নেই। যার অন্তরের শক্তি নেই, অনশনের স্বপ্ন দেখাও তার উচিত নয়। সাফল্যের কথা কখনও যেন সে না-ভাবে।

কিন্তু কোনও সত্যাগ্রহী বিশ্বাসের জোরে একবার অনশন শুরু করলে, শেষ পর্যন্ত, তার কর্মোদ্যোগ সফল হবে কি হবে না, সে-কথা না ভেবে তাকে দৃঢ় থাকতে হবে।

অনশন ফলপ্রসূ হবে কি হবে না সেটা এখানে বিচার্য নয়। যে ফল পাবার আশায় অনশন করে সে সচরাচর ব্যর্থ। এবং আপাতভাবে যদি ব্যর্থ না-ও হয় তাহলেও যথার্থ অনশনে যে আন্তরিক আনন্দ থাকে তা থেকে সে বঞ্চিত হয়......

হাস্যকর অনশন মহামারীর মতোই ছড়িয়ে পড়ে। তা ক্ষতিকারকও বটে। কিন্তু অনশন যখন কর্তব্যে পর্যবসিত হয় তখন তা বর্জন করা যায় না। তাই, যখন প্রায়োজনীয় মনে হয় তখনই আমি অনশন করি এবং কোনও কারণেই তার থেকে সরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমি নিজে যা করি তা থেকে অন্যদের বিরত করতে পারি না। এটা সকলেই জানে যে, ভালোর মধ্যেও যা সেরা তা-ও অনেক সময় বিকৃত করা হয়। আমরা আকছার এরকম ঘটতে দেখছি।[৮৮]

...মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা যখন বিফল হয় তখন উপাসকরা অনশন শুরু করে। এই অনশন প্রার্থনার মনোভাবটিকে সমৃদ্ধ করে অর্থাৎ অনশন একটি আত্মিক কর্মোদ্যোগ এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত। এই জাতীয় কর্মোদ্যোগের প্রভাব জনসাধারণের জীবনে পড়ে এইভাবে: অনশনরত ব্যক্তি যদি তাদের পরিচিত হয় তাহলে তাদের নিদ্রিত বিবেক জেগে ওঠে।

কিন্তু একটি বিপদ থেকে যায়। ভ্রান্ত সহানুভূতির বশে জনসাধারণ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে প্রিয়জনের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে। এই বিপদটির মোকাবিলা করতে হবে। কেউ যখন অভ্রান্ততায় বিশ্বাস রেখে সঠিক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে তখন তাকে বাধা দেওয়া অনুচিত। এর ফলে বড়জোর সতর্কতার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ধরনের অনশন অন্তরের কণ্ঠস্বরের আদেশানুসারে শুরু করা হয়, অতএব এর মধ্যে ব্যস্ততা থাকে না।[৮৯]

৭. অপরিগ্রহ

৩৭.অপরিগ্রহ বিষয়ক সুসমাচার

সেবাধর্মের সূত্র

যখন দেখলাম, রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েছি, তখন নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, অনৈতিকতা, অসত্য, রাজনৈতিক ফায়দা বলতে যা বোঝায়—সে সব থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকতে হলে আমায় কী করতে হবে....গোড়ায় এছিল এক কঠিন সংগ্রাম। এনিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ হয় এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে, সন্তানদের সঙ্গেও। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, যে-মানুষের মধ্যে আমার জীবন, যাদের অচলাবস্থার আমি প্রতিদিনের সাক্ষী, তাদের যদি সেবা করতে হয় তাহলে আমাকে সকল সম্পদ, সব অধিকার ত্যাগ করতে হবে...

সততার সঙ্গে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, এই বিশ্বাস যখন আমার মনে এল তৎক্ষণাৎ আমি সবকিছু ত্যাগ করলাম। আমি তোমাদের কাছে স্বীকার করছি, গোড়ার দিকে কাজ এগিয়েছিল খুবই শ্লথগতিতে। এবং এখন, সেই কঠোর দিনগুলির কথা স্মরণ করলে আমার মনে পড়ে, প্রথমে কাজটি কষ্টকরও ছিল। কিন্তু দিন যত কাটতে লাগল, আমি দেখলাম, অনেককিছুই আমি ত্যাগ করতে পেরেছি। সে-সব ত্যাগ করাটা হয়ে উঠল এক গভীর আনন্দের বিষয়। একের পর এক, শেষে প্রায় জ্যামিতিক ক্রমবৃদ্ধির হারে বস্তুসামগ্রী আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে লাগল।

নিজের সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে পারি, বিশাল এক বোঝা যেন আমার কাঁধ থেকে নেমে গেল। আমি অনুভব করলাম, অনেক হালকাভাবে চলতে পারছি, আর খুবই আরামে ও অধিকতর আনন্দের সঙ্গে আমার দেশের মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারছি। কোনও কিছু অধিকার ক'রে থাকাটাই এরপর হয়ে উঠল একটা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার ও বোঝার মতো।

এই আনন্দের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি দেখলাম, কিছু যদি নিজের বলে রাখতাম তাহলে গোটা দুনিয়ার থেকে আমাকে তা রক্ষা করতে হত। এ-ও দেখলাম বহু লোক এসব চাইলেও তাদের কিছুই নেই। ক্ষুধার্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা যদি ফাঁকা জায়গায় আমায় পেয়ে শুধু এসব ভাগবাঁটোয়ারা নয়, উপরন্তু কেড়ে নিতে চায়, তাহলে আমাকে পুলিশের সাহায্যই নিতে হবে। তখন আমি নিজেকে বললাম, তারা

যদি এসব চায় এবং নিয়ে নেয় তাহলে কোনও বিদ্বেষের মনোভাব থেকে এটা করবে না। করবে, তাদের প্রয়োজন আমার চেয়ে অনেক বেশি বলে।[১]

নিজের সব সম্পত্তি ত্যাগ করার জন্য....গোটা দুনিয়া আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে অকিঞ্চন হওয়াটা খুবই লাভজনক হয়েছে। এ আমি চাই সেই সুখের ব্যাপারে লোকে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসুক। এ হল সবচেয়ে মহার্ঘ সম্পদ, আমি যার মালিক। তাই, দারিদ্রের পক্ষে প্রচার করলেও আমি আসলে একজন ধনী লোক—একথা বলা হয়তো অতিশয়োক্তি নয়।[২]

স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ

আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, স্বরাজ, আমাদের চাহিদা-বৃদ্ধি, আত্মপ্রশ্রয়ের ওপরে নির্ভর করবে না। করবে আমাদের চাহিদা-নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ স্বার্থত্যাগেব ওপর।[৩]

অপরিগ্রহ অ-চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। বিনা প্রয়োজনে যে-জিনিস আমরা আঁকড়ে থাকি, তা যদি ইতিমধ্যে চুরি গিয়ে না-ও থাকে, তাহলেও তাকে অপহৃত সম্পত্তি বলেই গণ্য করতে হবে। অধিকৃতির মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করার ব্যাপারটিও আছে। কোনও সত্যসন্ধানী, প্রেমের আইনের কোনও অনুগামী, আগামীকালের জন্য কিছু অধিকার করে রাখতে পারে না। ঈশ্বর কখনও আগামী কালকের জন্য মজুত করেন না। সেই মুহূর্তের জন্য যা দরকার তার থেকে বেশি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না। তাই তাঁর সদয় ব্যবস্থাপনার ওপরে বিশ্বাস রাখলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, তিনি আমাদের প্রাত্যহিক রুটি জোগাবেন অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সবকিছুই দেবেন...

যে-ঐশ্বরিক আইন আমাদের দৈনন্দিন রুটি জোগাচ্ছে সেদিনের প্রয়োজন অনুযায়ী, কিন্তু তার বেশি নয়—সেই আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অবহেলা, অসাম্য ও তজ্জনিত সর্ববিধ দুর্দশার সৃষ্টি করেছে। ধনীদের অধিকারে রয়েছে প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রীর এক অনাবশ্যক ভাণ্ডার, যা অবহেলায়, অপচয়ে নষ্ট হয় অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনধারণের ন্যূনতম খাদ্যের অভাবে অনাহারে মারা যায়।

যার যতটুকু প্রয়োজন, সে যদি কেবল সেইটুকুই নিজের অধিকারে রাখে তাহলে কেউই অভাববোধ করবে না। সকলেই সুখে জীবন কাটাতে পারবে। ধনীদের মনোকষ্টও যে গরিবদের চেয়ে কম, তা তো মনে হয় না। গরিব স্বপ্ন দেখে লক্ষপতি হওয়ার, আর লক্ষপতি কোটিপতি হওয়ার।

অপরিগ্রহের পরিতৃপ্তির এই বোধ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ ধনীদেরই গ্রহণ করা উচিত। তারা যদি শুধু তাদের সম্পত্তি মাঝারি সীমার মধ্যে রাখে তাহলে ক্ষুধার্তদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায়। ধনীদের সঙ্গে তাবাও পরিতৃপ্তির স্বাদ পেতে পারে।

অপরিগ্রহের আদর্শ সর্বতোভাবে পূরণ করার জন্য মানুষের উচিত পাখির মতোই, আগামীকালের জন্য মাথার ছাদ, বসন ও খাদ্য সঞ্চয় না করা। তার দরকার শুধু রোজকার রুটি। কিন্তু এটা জোগান দেওয়ার কাজ তার নয়, ঈশ্বরের। এই আদর্শে উপনীত হতে পারে 'কোটিকে গুটিক'—তা-ও পারে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পারব না

ভেবে আমাদের মতো সাধারণ সন্ধানীদের পেছিয়ে আসা ঠিক নয়। এই আদর্শকে কখনওই চোখের আড়াল করা চলবে না। এর আলোকে নিজেদের সম্পত্তি সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার ক'রে এর পরিমাণ হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রকৃত অর্থে, সভ্যতার মান নির্ভর করে উদ্দেশ্যমূলক ও স্বেচ্ছায় চাহিদা কমানোর ওপরে, সম্পদবৃদ্ধিতে নয়। এইভাবেই যথার্থ সুখ ও পরিতৃপ্তি অনুপ্রেরণা পাবে। সেবার ক্ষমতাও বাড়বে।

বিশুদ্ধ সত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, এই দেহও এক অধিকৃতি। বলা হয়েছে, আনন্দের ইচ্ছাই আত্মার জন্য দেহের সৃষ্টি করে। একথা ঠিক। এই ইচ্ছা অন্তর্হিত হলে দেহের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না এবং মানুষ জীবন ও মৃত্যুর দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত হয়। আত্মা নিত্য। কী কারণে সে দেহের খাঁচায় বন্দী থাকবে বা পাপ করবে বা ঐ খাঁচার স্বার্থে হত্যা করবে?

ত্যাগের আদর্শ

এইভাবে আমরা পরিপূর্ণ ত্যাগের আদর্শে উপনীত হই। এই দেহ যতদিন থাকে তাকে সেবার কাজে নিয়োজিত করতে শিখি। এই শিক্ষা থেকে বুঝতে পারি, রুটি নয়, সেবাই জীবনের পরম ধর্ম। আমাদের আহার-বিহার, নিদ্রা-জাগরণ সবই এই সেবার জন্য। মনের এই অবস্থা আমাদের পরম সুখের সন্ধান দেয়, চোখের সামনে অবারিত ক'রে কালের পূর্ণতার এক কল্যাণপ্রদ দৃশ্য।

ভুললে চলবে না, অপরিগ্রহ নীতি হিসেবে বস্তুসামগ্রীর মতো চিন্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে-ব্যক্তি তার মগজ অর্থহীন জ্ঞানে বোঝাই করে, সে অসীম মূল্যবান এই নীতিটি লঙ্ঘন করে। যে-চিন্তা আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে বা তাঁর অভিমুখী করে না, সেগুলি পথের বাধামাত্র।

এই প্রসঙ্গে আমরা 'গীতা'-র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে, অভিমানশূন্যতা (অমানিত্বম) ইত্যাদি গুণকেই জ্ঞান বলে এবং বাকি সবই অজ্ঞানতা। এটা যদি সত্য হয়, এবং কোনও সন্দেহই নেই, এটাই সত্য, তাহলে আজ আমরা জ্ঞান বলে আঁকড়ে আছি, আসলে তার অনেক কিছুই, বিশুদ্ধ ও সরল অ-জ্ঞানতা। অতএব মঙ্গল করার পরিবর্তে তা আমাদের অমঙ্গলই করে। এর ফলে মন ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, এমনকি শূন্যও হয়ে যায়। পাপের অশেষ শাখা-প্রশাখার মধ্যে তখন অতৃপ্তি বিকাশলাভ করে।

বলা বাহুল্য, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার অজুহাত খাড়া করার জন্য এটা বলা হচ্ছে না। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মানসিক বা দৈহিক কর্মময়তার দ্বারা পূর্ণ থাকা উচিত। কিন্তু সেই কর্ম হবে সাত্ত্বিক, সত্যের অনুগামী। যে তার জীবন সেবার জন্য নিবেদন করেছে সে একটি মুহূর্তও অলস বসে থাকতে পারে না। কিন্তু সৎ ও অসৎ কাজের মধ্যে প্রভেদ করা আমাদের শিখতে হবে। সেবার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি থাকলে এই (প্রভেদ করার) দূরদৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে লাভ করা যায়।[৪]

নৈতিক উদ্দেশ্য

আমাদের সকলকেই কেন সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে? কেন আমরা, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সকল সম্পদ ত্যাগ করব না? বিবেকহীন ব্যবসায়ীরা অসাধু উদ্দেশ্যে এটা করে থাকে। আমরা কেন নৈতিক ও মহান উদ্দেশ্যে এটা করতে পারব না?

একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে কোনও হিন্দুর পক্ষে এটা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিটি নিষ্ঠাবান হিন্দুই একটি নির্দিষ্ট কালপর্ব অবধি গার্হস্থ্যজীবন যাপন করার পর অপরিগ্রহের এক জীবনে প্রবেশ করবে, এটাই প্রত্যাশিত। সেই মহান ঐতিহ্য আমরা কেন ফিরিয়ে আনতে পারব না? কার্যত এর একটাই অর্থ, যাদের আমরা সম্পদ হস্তান্তর করি, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাদের ওপরেই ন্যস্ত করা। আমার কাছে ব্যাপারটি আকর্ষণীয়। এই ধরনের অছিগিরির অসংখ্য ঘটনায় লক্ষের মধ্যে একটিতেও আস্থার অবমাননা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

...অসৎ ব্যক্তিদের হাতে রশি না তুলে দিয়ে ওই পদ্ধতিতে কিভাবে কাজ করা যাবে দীর্ঘ পরীক্ষার পরেই শুধু এটা স্থির করা সম্ভব। অবশ্য ঠকে যাওয়ার ভয়ে কেউ যেন এই পরীক্ষা থেকে পেছিয়ে না যায়। 'গীতা'-র ঐশ্বরিক স্রষ্টা 'স্বর্গীয় গীত'-এর বাণী প্রদান করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেননি, তিনি সম্ভবত জানতেন এই বাণীকে বিকৃত ক'রে হত্যাসমেত সর্ববিধ পাপের সাফাই গাইবার চেষ্টা করা হবে।[৫]

ধর্মেব পরম পূর্ণতার....জন্য সকল সম্পদ ত্যাগ করা আবশ্যক। আমাদের সত্তার আইন সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর আমাদের উচিত স্ব-স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী এর প্রয়োগ করা, তাব বেশি নয়। এই হল মধ্যপন্থা।[৬]

সারনীতি

সার-নীতি হচ্ছে....লক্ষ মানুষের যা নেই তা অধিকার করতে দৃঢ় প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখান করার এই ক্ষমতা সহসা আমাদের ওপরে নেমে আসবে না। প্রথমে দরকার, লক্ষ মানুষ যে সম্পদ ও সুবিধা ভোগ করে না, তা গ্রহণ না করার মনোভাব সৃষ্টি। এর পরে ওই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে নিজেদের জীবন পুনরায় ঢেলে সাজানো।[৭]

প্রেম এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার একসঙ্গে চলতে পারে না। তত্ত্বগত দিক দিয়ে যেখানে নির্ভেজাল প্রেম রয়েছে সেখানে সম্পূর্ণ অপরিগ্রহ থাকতে হবে। এই দেহ হল আমাদের শেষ অধিকৃতি। অতএব কোনও মানুষ তখনই সর্বাঙ্গীণ প্রেম ও অপরিগ্রহ প্রদর্শন করতে পারবে যদি সে মানবসেবার জন্য দেহকে বর্জন করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত হয়।

কিন্তু এটা একমাত্র তত্ত্বেই সম্ভব। বাস্তবজীবনে বিশুদ্ধ প্রেম আমরা অতি অল্পই প্রদর্শন করতে পারি। কারণ অধিকৃতি হিসেবে দেহ সবসময়েই অসম্পূর্ণ থাকবে এবং সবসময়েই সম্পূর্ণ হবার প্রয়াস চালাবে। তাই যতক্ষণ আমরা বেঁচে থাকব প্রেম বা সম্পূর্ণ অপরিগ্রহ একটি অপ্রাপণীয় আদর্শ হয়ে থেকে যাবে। কিন্তু এই লক্ষ্যসাধনের জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।[৮]

যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবির, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ অপরিসীম প্রভাব বিস্তার ক'রে হাজার হাজার ব্যক্তির চরিত্র পাল্টে দিয়েছিলেন। তাঁরা এই পৃথিবীতেই বাস করে গেছেন, তাই বিশ্ব সমৃদ্ধতর হয়েছে। এঁদের সকলেই স্বেচ্ছায় দারিদ্রকে প্রধান অবলম্বন বলে বেছে নিয়েছিলেন....ঠিক যেভাবে প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিচার ক'রে আমরা আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক হুজুগ বেছেছি, যেভাবে আমরা প্রগতির উল্টো ঢালে তলিয়ে যাচ্ছি।[৯]

ধনসম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মান মানুষের কাছে পাপ ও অন্যায়ের যে মূল্য আদায় করে তা কী অসম্ভব ভারি![১০]

অনুমতি ছাড়া কারও কাছ থেকে কিছু নিলে অবশ্যই চৌর্যবৃত্তি হয়। কিন্তু দাতা যে-উদ্দেশ্যে কিছু দেয় তা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে বা নির্দিষ্ট মেয়াদের বেশি সময় ব্যবহার করলেও একধরনের চুরিই করা হয়। এই গভীর সত্যটির ভিত্তি হল: নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য যা দরকার, ঈশ্বর তার চেয়ে বেশি কখনওই সৃষ্টি করেন না। তাই যে ব্যক্তিই নিজের ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হস্তগত করে সে চুরির অপরাধে অপরাধী।[১১]

জীবনরহস্য

সবকিছু ত্যাগ করো—তা ঈশ্বরকে নিবেদন করে তারপর জীবনধারণ করো। জীবনধারণের অধিকার এইভাবে ত্যাগ থেকে উদ্ভূত হয়। এই সূত্র কখনওই বলে না: "অন্যেরা যখন অনুরূপ করবে তখন আমিও করব"। এই সূত্র বলে: "অন্যদের নিয়ে মাথা ঘামিও না, আগে নিজের কাজটা করো, বাকিটা তাঁর হাতে ছেড়ে দাও"।[১২]

হয়তো তোমার বস্তুসামগ্রী অধিকারে রাখার বা ব্যবহার করার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু কখনওই এগুলির অভাববোধ না-করার মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবনরহস্য।[১৩]

সুখী জীবনের গোপন চাবিকাঠি ত্যাগের মধ্যে। ত্যাগই জীবন। প্রশ্রয়দান আনে মৃত্যু। অতএব, ফলের আশা না করে সেবা করতে-করতে ১২৫ বছর বাঁচার অধিকার সকলেরই আছে। সকলেরই তা চাওয়া উচিত। এ জীবন সম্পূর্ণ ও এককভাবে সেবায় উৎসর্গ করতে হবে। অনুরূপ সেবার জন্য ত্যাগের মধ্যে এমন এক অশেষ আনন্দ আছে যা থেকে কেউ অন্যকে বঞ্চিত করতে পারে না। কারণ এই সুধামৃত অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে জীবনকে পুষ্ট করে। এই জীবনে দুশ্চিন্তা বা ধৈর্যহীনতার কোনও স্থান নেই। এই আনন্দ বাদ দিয়ে দীর্ঘজীবন সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও তা মূল্যহীন হতো।[১৪]

তার মানে এই নয়, একজনের কাছে সম্পদ থাকলে সে তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, স্ত্রীপুত্রপরিবারকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। এর সরল অর্থ, এই সম্পদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করবে ও নিজের সবকিছু ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করবে এবং তাঁর দেওয়া উপহার কেবল তাঁরই সেবার জন্য ব্যবহার করবে।[১৫]

৩৮. দারিদ্র ও সম্পদ

সংঘর্ষ এড়ানো

একজন মানুষ আর একজনের চেয়ে বেশি ধনী হবে না—এমন একটা ছবি আমার কল্পনায় ধরা পড়ে না। কিন্তু সেই সময়ের কথা আমি ভাবতে পারি, যখন গরিবদের শোষণ ক'রে ধনী হতে বড়লোকরা প্রত্যাখ্যান করবে। গরিবরা আর ধনীদের হিংসা করবে না। এমনকি সর্বাঙ্গসুন্দর এক পৃথিবীতেও আমরা অসাম্য দূর করতে পারব না। কিন্তু সংঘর্ষ ও তিক্ততা আমরা এড়াতে পারি, ও সেটা করা একান্তই আবশ্যক।[১৬]

আমি আমাদের বহু দেশবাসীকে বলতে শুনেছি, আমরা মার্কিনীদের মতো সম্পদশালী হবো কিন্তু এর পদ্ধতি এড়িয়ে চলব। আমি আগেভাগেই বলে রাখি, এরকম কোনও চেষ্টা হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা একইসঙ্গে 'প্রাজ্ঞ সংযতচিত্ত ও ক্রুদ্ধ' হতে পারি না।[১৭]

ভারতের প্রতিটি প্রাসাদ যা আমরা দেখতে পাই তা ভারতেব সম্পদের পরিচয় নয়। সম্পদ মুষ্টিমেয়কে যে অভব্য ক্ষমতা দেয় এটা তার পরিচয়। লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব ভারতবাসীর শ্রমের কাছে ওই মুষ্টিমেয় ধনী ঋণী।[১৮]

ধনীদের কর্তব্য

তাদের কর্তব্য কী, তা নিয়ে ধনীদের আজ ভাবতে হবে। যে ভাড়াটে পাহারাদার দিয়ে তারা তাদের সম্পদ রক্ষা করছে, হয়তো দেখবে যে ঐ রক্ষকই তাদের তেড়ে আসছে। অর্থবান শ্রেণীকে আজ হয় অস্ত্র নিয়ে নয়তো অহিংসার হাতিয়ার দিয়ে লড়তে শিখতে হবে।

যারা দ্বিতীয় পথটি অনুসরণ করবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে সেরা ও কার্যকর মন্ত্র হল "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" (ত্যাগ করে নিজের সম্পদ ভোগ করো)। বিশদভাবে বোঝালে এর অর্থ, "সর্বপ্রকারে তোমার ওই কোটি কোটি অর্থ রোজগার করো। কিন্তু মনে রেখো, সম্পদ তোমার নয়, জনগণের। তোমার ন্যায্য প্রয়োজনের জন্যে যা দরকার তা তুমি নাও, কিন্তু বাকিটা সমাজের জন্যে ব্যবহার করো।"

এই সত্যানুযায়ী এখনও কাজ করা হয়নি। কিন্তু এই কঠিন সময়েও ধনী শ্রেণীগুলি যদি এইভাবে কাজ না করে তাহলে তারা তাদের সম্পদ ও ভোগবাসনার এবং তার ফলস্বরূপ যারা তাদের পরাভূত করবে তাদের দাসত্ব করেই চলবে।

...আমি দেখতে পাচ্ছি, গরিবের হুকুমতের দিন আসছে, তা সে অস্ত্রের শক্তিকেই আসুক, কি অহিংসার পথে। এ-কথা যেন স্মরণে থাকে, দেহ যেমন, দৈহিক শক্তিও তেমনি সাময়িক। কিন্তু আত্মার মতো তার শক্তিও চিরস্থায়ী।[১৯]

এই মতামতে সমর্থন জানাতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। সাধারণত ধনী লোক

এবং বলতে গেলে বেশির ভাগ লোকই কিভাবে টাকা কামাবে তা নিয়ে চিন্তিত নয়। অহিংস পদ্ধতি প্রয়োগের সময় সকলকে এই সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হতে হবে, প্রতিটি ব্যক্তিই, তা সে যত পতিতই হোক-না-কেন মানবিক ও সুচারু ব্যবহারের ফলে পরিবর্তিত হতে পারে। মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে আমাদের আবেদন জানাতে হবে। আমরা আশা করব, সেই আবেদন সাড়া পাব।

সর্বমঙ্গল

সমাজের মঙ্গলের জন্য, শুধু ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, বরং সর্বমঙ্গলের জন্য প্রতিটি সদস্য যদি তার সকল প্রতিভা নিয়োজিত করে সেটা কি ভাল হয় না? এমন একটি প্রাণহীন সাম্য স্থাপন করতে আমরা চাই না, যেখানে কোনও ব্যক্তি তার দক্ষতাকে সম্ভাব্য পূর্ণ ক্ষমতায় প্রয়োগ করতে পারে না বা তাকে তা করতে দেওয়া হয় না। ওরকম সমাজ শেষ অবধি ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই, আমি যখন বলি, অর্থবান ব্যক্তিরা কোটি টাকা রোজগার করুক (সৎপথে অবশ্যই) কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে সকলের সেবার জন্য সেই অর্থ নিবেদন করা—তখন তা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। অসামান্য জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত যে মন্ত্রটি রয়েছে তা হল, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"। বর্তমান ব্যবস্থা, যাতে প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীর কী হল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কেবল নিজের জন্য বাঁচে, তার জায়গায় সার্বিক কল্যাণের জন্য এক নতুন জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করার এটাই হল সবচেয়ে নিশ্চিত পদ্ধতি।[২০]

ভিক্ষাবৃত্তি

আমাদের দেশ এমনই তীব্র দারিদ্র ও অনাহার প্রপীড়িত যে প্রতি বছরই এর ফলে বহু লোককে ভিক্ষাবৃত্তি, অবলম্বন করতে হচ্ছে, ক্ষুন্নিবৃত্তির মরীয়া চেষ্টা যাদের সর্বপ্রকার শোভনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ অসাড় করে দিয়েছে। আর আমাদের দেশের মহানুভবরা তাদের কাজের ব্যবস্থা করা ও রুটির জন্য কাজের প্রয়োজনীয়তার ওপরে জোর দেওয়ার পরিবর্তে তাদের ভিক্ষা দিয়ে থাকে।[২১]

স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তি, উদরান্নের জন্যে যে কখনও সৎ পথে কাজ করেনি তাকে বিনামূল্যে অন্ন জোগাতে হবে—আমার অহিংসা কখনও এরকম ধারণা সহ্য করে না। হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি প্রত্যেকটি 'সদাব্রত' বন্ধ করে দিতাম, যেখানে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। এই পদ্ধতি জাতির ক্ষতি করেছে। আলস্য, কর্মবিমুখতা, ভণ্ডামি, এমনকি অপরাধের প্ররোচনাও দিয়েছে। এই ভ্রান্ত দয়াপ্রদর্শন দেশের কি বৈষয়িক, কি আত্মিক, কোনও সম্পদই বৃদ্ধি করে না। দাতা নিজেকে ভ্রান্তভাবে পুণ্যবান মনে করে।

অনুগ্রহ নয়, কাজ

যদি দাতারা এমন প্রতিষ্ঠান খুলতেন, যেখানে পুরুষ ও নারীরা তাদের জন্য কাজ করত

এবং তার বদলে তারা স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার পেত—তাহলে তা কতই না শোভন ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক হতো! ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, চরকা বা যে-সব পদ্ধতির মাধ্যমে তুলো থেকে সুতো হয় সেটাই সবচেয়ে আদর্শ বৃত্তি হবে। কিন্তু দাতারা যদি এটা না মানেন, তাহলে তাঁরা অন্য যে-কোনও কাজ ঠিক করতে পারেন। নিয়মটি শুধু হবে, "বিনা শ্রমে খাদ্য নয়"....

আমি জানি, নিষ্কর্মাদের মুখের ওপর খাবার ছুঁড়ে দেওয়া সোজা। কিন্তু এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অনেক কঠিন, যেখানে খাদ্য পরিবেশিত হওয়ার আগে সৎভাবে শ্রম করতে হয়। জানি, আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে—লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে তারপর তাকে খোরাকি জোগানোর খরচ বর্তমান লঙ্গরখানার খরচের তুলনায় ব্যয়সাধ্য। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, দেশের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া হাঘরেদের সংখ্যা যদি আমরা জ্যামিতিক হারে বাড়াতে না-চাই, তাহলে এই পদ্ধতিটিই শেষপর্যন্ত সাশ্রয়কর বলে প্রমাণিত হবে।[২২]

নিরন্ন ও অলস জনগণের কাছে কেবলমাত্র একটাই সম্ভাব্যরূপে ঈশ্বর আবির্ভূত হতে পারেন—সেটা হল কর্মের রূপে। মজুরী হিসেবে থাকবে খাদ্য জোগানোর প্রতিশ্রুতি।[২৩]

নগ্নকে কাপড় দিয়ে অসম্মান করতে আমার তীব্র আপত্তি আছে। তার কাপড়ের দরকার নেই। বরং তাকে কাজ দেওয়া হোক যা তাব একান্ত আরশ্যক। তাদের পৃষ্ঠপোষক হবার পাপ আমি করব না। খুদকুঁড়ো বা বাতিল পোশাক দিয়ে তাদের আরও গরিব হয়ে ওঠায় আমি সাহায্য করব না। বরং আমার সবচেয়ে ভাল খাবার ও পোশাক তাদের দেব এবং কাজের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে যুক্ত হব।[২৪]

আমি জানি, ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহ দেওয়া অন্যায়। কিন্তু কাজ ও খাদ্যের প্রস্তাব না দিয়ে কোনও ভিক্ষুককে আমি ফিরিয়ে দেব না। যদি সে কাজ না করে তাহলে আমি তাকে ভিক্ষে ছাড়াই চলে যেতে বলব। খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ ইত্যাদি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের সহায়তা।

অন্ধত্বের ভান, বা এমনকি প্রকৃত অন্ধত্বের আড়ালেও অনেক কারচুপি চলেছে। অসৎপথে অর্জিত অর্থে বহু অন্ধ বড়লোক হয়ে উঠেছে। অনেক ভালো হতো যদি এই প্রলোভনের সামনে তাদের ছেড়ে না রেখে কোনও চিকিৎসালয়ে স্থান দেওয়া যেত।[২৫]

ভৃত্যনির্ভরতা

আমি মনে করি, যে ব্যক্তি অন্যের সহযোগিতা চায়, এবং অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী, ভৃত্যের ওপর তার নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। ভৃত্যের যখন আকাল পড়ে তখন ভৃত্য নিয়োগের মানে হচ্ছে, যে যা-মাইনে চাইবে তা-ই দিতে হবে। যা বলবে তা-ই মানতে হবে। ফলে নিয়োগকর্তা প্রভু হওয়ার বদলে নিজেই ভৃত্যে পরিণত হবে। না মনিব, না ভৃত্য, কারও পক্ষেই এটা শোভন নয়।

কিন্তু এমন যদি হয়, কোনও ব্যক্তি দাসত্ব চায় না, বরং আর এক ব্যক্তির সহযোগিতা,

চায় তাহলে সে শুধু তারই সেবা করবে না, যার সহযোগিতা সে চায় তারও সেবা করবে। এই নীতির সম্প্রসারণের মধ্যে, এক ব্যক্তির পরিবার গোটা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়বে, এবং অন্যদের সম্বন্ধেও তার দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটবে। সুখলাভের বাসনা চরিতার্থ করার আর কোনও পথ নেই।[২৬]

৩৯. দরিদ্রনারায়ণ

গরিবের ঈশ্বর

দরিদ্রনারায়ণ হল লক্ষ লক্ষ নামের একটি, যা দিয়ে মানবজাতি ঈশ্বরকে অভিহিত করে। ঈশ্বরকে নাম দেওয়া যায় না বা মানুষের বোধগম্যতায় আনা যায় না। দরিদ্রনাবায়ণের অর্থ হল গরিবের ঈশ্বর, দরিদ্রের হৃদয়ে আবির্ভূত ঈশ্বর।[২৭]

গরিবের কাছে যা অর্থনৈতিক, তা-ই আধ্যাত্মিক। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত জনের কাছে অন্য কোনও আবেদন তুমি করতে পারবে না। তারা কিছু বুঝবেই না। কিন্তু তুমি তাদেব কাছে ক্ষুধার অন্ন নিয়ে যাও, তারা তোমাকে তাদের ঈশ্বর বলে মনে করবে। অন্য কোনও চিন্তা তারা করতে পারে না।[২৮]

আমার এই হাত দিয়ে আমি তাদেব শতছিন্ন কাপড়ে বাঁধা, থেঁৎলানো খাবারের মণ্ড সংগ্রহ করেছি। এদের সঙ্গে তুমি আধুনিক প্রগতির কথা বলবে! মিথ্যাই এদের সামনে ঈশ্বরের নাম নিয়ে এদের অপমান করবে! তোমাকে এবং আমাকে ওরা শয়তান বলবে যদি আমরা তাদের ঈশ্বরের কথা বলি। যদি কোনও ঈশ্বরকে তারা জেনেই থাকে, তাহলে সে ঈশ্বর হল ভীতি ও প্রতিহিংসার ঈশ্বর, এক নির্দয় অত্যাচারী।[২৯]

শ্রমজীবী ও কর্মহীন লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা দিনে একবার পেট ভরে খেতে পায় না, এক টুকরো বাসি রুটি আর এক চিমটে নুন যাদের খাদ্য তাদের জন্য....স্বরাজ অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি কাজ করছি।[৩০]

ঈশ্বরের বাণী

ঈশ্বরের বাণী তাদের সামনে নিয়ে যাওয়ার সাহস আমার নেই। ওখানে যে কুকুরটা বসে আছে তার সামনে ঈশ্বরের বাণী রাখাও যা, ঐ ক্ষুধার্ত কোটি কোটি মানুষের সামনে রাখাও তা-ই—যাদের চোখে কোনও উজ্জ্বলতা নেই, তাদের একমাত্র ঈশ্বর হল রুটি। শুধুমাত্র শ্রমের পবিত্র বাণীর মাধ্যমেই, ঈশ্বরের বাণী আমি তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারি।

এখন, যখন আমরা চমৎকার প্রাতরাশের পর বসেছি এবং আরও চমৎকার একটি মধ্যাহ্নভোজের দিকে তাকিয়ে আছি, তখন ঈশ্বরের আলোচনা বেশ উপাদেয় ব্যাপার। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমি কী করে ঈশ্বরের কথা বলব যাদের দিনে দু'বেলা

খাবার জোটে না? ঈশ্বর তাদের সামনে একমাত্র অন্নের রূপ ধরে আবির্ভূত হতে পারেন। ভারতের কৃষকরা মাটি থেকেই তাদের রুটি জোগাড় করছিল। আমি তাদের সামনে চরকার কাজ নিয়ে এলাম, যাতে তাদের মাখনও জোটে। আমি আজ...এই যে কৌপিন পরিহিত, তার কারণ আমি অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন মূক লক্ষ লক্ষ মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি।[৩১]

আমার দাবী, আমি আমার দেশের লক্ষ কোটি মানুষকে চিনি। চব্বিশ ঘণ্টাই আমি তাদের সঙ্গে আছি। তারাই হল আমার প্রথম ও শেষ-সেবার প্রার্থী, কারণ লক্ষ লক্ষ ভাষাহীন মানুষের হৃদয়ে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনও ঈশ্বরকে আমি চিনি না। তারা তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারে না। আমি পারি। এবং এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেবা করার মধ্যে দিয়ে আমি সত্যরূপী ঈশ্বর বা ঈশ্বররূপী সত্যের উপাসনা করি।[৩২]

৮. শ্রম

৪০. উদরান্নের জন্য শ্রমের সুসমাচার

ঐশ্বরিক নিয়ম

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে সে উদরান্নের জন্য কাজ করে। বলেছিলেন, যারা কাজ না করে খায়, তারা তস্কর।[১]

আমরা যেন ঘাম ঝরিয়ে উদরান্নের সংস্থান করি। এই হল মহান প্রকৃতির অভিপ্রায়। অতএব, যে যতক্ষণ অলস বসে থাক, সে ততক্ষণই তার প্রতিবেশীদের কাছে বোঝা। ওরকম করার অর্থ হচ্ছে অহিংসার প্রথম পাঠটির বিবোধিতা কবা। প্রতিবেশীর জন্য অন্যের সুসঙ্গত ও নির্দিষ্ট বিবেচনা না থাকলে অহিংসা অর্থহীন, এবং এই প্রাথমিক শর্তটি অলস ব্যক্তি পূরণ করতে পারে না।[২]

রুটির জন্য শ্রম প্রসঙ্গে তলস্তয়ের রচনা পড়ে প্রথম আমি ঐ নিয়মটি উপলব্ধি করি যে, বাঁচতে হলে মানুষকে কাজ করতেই হবে। কিন্তু তার আগেও রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পড়ে শ্রমের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগরূক হয়েছিল। ত. ম. বন্দারেভ নামক জনৈক রুশী লেখক প্রথমে এই বিষয়টির ওপরে গুরুত্ব দেন যে, মানুষের উচিত স্বহস্তে পরিশ্রম করে নিজের রুটি জোগাড় করা। বিষয়টি তলস্তয় গ্রহণ কবলেন এবং ব্যাপক প্রচার করলেন। আমার মতে, 'গীতা'র তৃতীয় অধ্যায়েও এই একই নীতি বিধৃত হয়েছে। যেখানে বলা আছে যে, উৎসর্গ না-করে যে-ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে সে চুরি করা খাদ্য খায়। এখানে উৎসর্গের একমাত্র অর্থ হতে পারে রুটির জন্য শ্রম।[৩]

যুক্তির নিয়ম

যুক্তির সাহায্য নিলেও ওই একই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। যে কায়িক পরিশ্রম করে না, খাওয়ার অধিকার তার আসবে কোথা থেকে? বাইবেলে আছে, 'নিজের কপালের ঘামের বিনিময়ে তুমি তোমার রুটি খাবে'। একজন লক্ষপতিও যদি সারাদিন বিছানায় গড়িয়ে কাটায় এবং এমনকি তাকে খাইয়েও দিতে হয়, তাহলে সে-ও বেশিদিন ওইভাবে কাটাতে পারবে না, অচিরাৎ নিজের জীবন নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। সে, অতএব ব্যায়াম করে ক্ষিধে তৈরি করে, নিজের হাতে খায়।

এখন, কী গরিব, কী ধনী সকলকেই যদি কোনও-না-কোনওভাবে ওই ব্যায়াম করতেই হয় তাহলে তা কেন উৎপাদনশীল বা রুটির জন্য শ্রমের রূপ নেবে না? কেউ চাষীকে প্রাণায়াম বা পেশীর ব্যায়াম করতে বলে না। আর মানবজাতির নয় দশমাংশ জমি চাষ ক'রেই প্রাণধারণ করে। পৃথিবী আরও কত আনন্দময়, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও আরও শান্তিপূর্ণ হতো যদি ওই বাকি এক দশমাংশ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের উদাহরণ অনুসরণ করত, অন্তত তাদের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমটুকু করত।

সমাজবিপ্লব

...বিশ্বব্যাপী পুঁজি বনাম শ্রমিকের এক সংঘাত চলেছে এবং গরিবরা ধনীদের ঈর্ষা করে। সকলেই যদি রুটির জন্য পরিশ্রম করত, তাহলে সামাজিক মর্যাদাগত ফারাকটি দূর হয়ে যেত। ধনীরা তখনও থাকবে, কিন্তু তারা তাদের সম্পত্তির শুধু অছিধারী বলে নিজেদের মনে করবে, প্রধানত একে জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহার করবে।[৪]

যে-মুহূর্তে যা-দরকার, তার চেয়ে বেশি ঈশ্বর কখনওই সৃষ্টি করেন না। ফলে কেউ যদি প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দখল করে, তাহলে সে তার প্রতিবেশীকে বঞ্চিত ক'রে নিঃস্ব করে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে মানুষের অনাহারের কারণ হচ্ছে আমাদের মধ্যে অনেকে তাদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি দখল ক'রে নিচ্ছে। প্রকৃতির সব উপহার আমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু তার জাব্দা খাতায় খরচ ও জমা সবসময়েই সমান। অথচ আলাদা করে জমা বা খরচের ঘরে কোনও ভারসাম্য নেই।[৫]

পাখি ও পশুদের মতোই জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণে প্রতিটি মানুষেরই সমান অধিকার রয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটি অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে কর্তব্য, এবং ঐ অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধে থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা, তাই এখন প্রাথমিক ও মৌলিক সাম্যের ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিকার ও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তব্য হল, আমি আমার দেহ দিয়ে শ্রম করব; আর সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা হল, যে আমাকে আমার শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করবে তার সঙ্গে অসহযোগ।[৬]

প্রকৃত সেবা

রুটির জন্য বুদ্ধিদীপ্ত শ্রম সবসময়েই সর্বোচ্চ স্তরে সমাজসেবা। কোনও ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ বৃদ্ধি করছে, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? 'অস্তিত্ব' হচ্ছে 'কর্ম'।

শ্রমের আগে 'বুদ্ধিদীপ্ত' বিশেষণটি দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, সমাজসেবার জন্য শ্রমের পেছনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে। তা না হলে বলতে হয়, প্রত্যেক শ্রমিকই সমাজসেবা করছে। এক অর্থে সে করছে ঠিকই, কিন্তু এখানে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে সেটা এর চেয়েও বেশি কিছু। যে ব্যক্তি সকলের সার্বিক মঙ্গলের জন্য শ্রম করে, সে সমাজের সেবা করে, এবং তার শ্রমসংস্থান হওয়া উচিত। অতএব

অনুরূপ রুটির জন্য শ্রম, সমাজসেবার থেকে পৃথক নয়।[৭]

রুটির জন্য শ্রমের নিয়ম মেনে চললে সমাজের কাঠামোতে এক নিঃশব্দ বিপ্লব আসবে। সেবার সংগ্রামকে টিকে থাকার সংগ্রামের পারস্পরিক স্থলাভিষিক্ত ক'রে মানুষ তার বিজয় ঘোষণা করবে। পশুর নিয়মের জায়গায় আসবে মানুষের নিয়ম।[৮]

সকলেই যদি পরিশ্রমের ঘাম ঝরিয়ে জীবনধারণ করে, তাহলে পৃথিবী এক স্বর্গে পরিণত হবে। বিশেষ প্রতিভার ব্যবহারের প্রশ্নটি আলাদা ক'রে বিবেচনার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। সকলেই যদি রুটি সংস্থানের জন্য কায়িক শ্রম করে তাহলে এটা সহজেই অনুমেয় যে কবি, চিকিৎসক, আইনজীবী প্রমুখও তাদের প্রতিভা বিনাঅর্থে মানবসেবায় নিয়োগ করবে। কর্তব্যের প্রতি আত্মস্বার্থহীন অনুরাগ তাদের সৃষ্টিকেও উন্নততর ও সমৃদ্ধ করে তুলবে।[৯]

প্রয়োগের ক্ষেত্র

যে অহিংসা মেনে চলবে, সত্যের পূজা করবে এবং ব্রহ্মচর্য রক্ষা করাকে একটি সাধারণ কাজ হিসেবে মেনে চলবে তার কাছে রুটির জন্য শ্রম বাস্তব আশীর্বাদস্বরূপ। প্রকৃত অর্থে এই শ্রম একমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই হতে পারে। কিন্তু অন্তত এই মুহূর্তে সকলে কৃষিকার্য গ্রহণ করার মতো অবস্থায় নেই। অতএব, কোনও ব্যক্তি কৃষিকাজের বদলে সুতো কাটা বা সুতো বোনা বা ছুতোরের কাজ বা কামারের কাজ নিতে পারে। কিন্তু সে যেন মনে রাখে, কৃষিই হচ্ছে আদর্শ কাজ।

প্রত্যেকেরই উচিত নিজের মেথরের কাজ নিজে করা। মলত্যাগ খাদ্যগ্রহণের মতোই জরুরি। সবচেয়ে ভালো হয় যদি সকলেই নিজের বর্জিত পদার্থ পরিষ্কার করে। এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতিটি পরিবারকেই তার আবর্জনা পরিষ্কারের এই ক্ষেত্রটি দেখতে হবে।

বহু বছর ধরে অনুভব করেছি, সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে মেথরের কাজের দায়িত্ব দেওয়ার মধ্যে গুরুতর ভ্রান্ত কিছু রয়েছে। এই অত্যাবশ্যক শৌচসংক্রান্ত কাজটির দায়িত্ব নিম্নস্থ ব্যক্তিদের ওপর কে কবে প্রথম অর্পণ করেছিল, তার কোনও ঐতিহাসিক দলিল নেই।

শিশুকাল থেকেই, আমাদের উচিত এই ধারণা মনে চারিয়ে দেওয়া যে, আমরা সকলেই মেথর। যারাই এটা উপলব্ধি করবে তার পক্ষে সহজতর পথটি হবে রুটির জন্য শ্রম হিসেবে মেথরের কাজ শুরু করা। বুদ্ধি দিয়ে মেথরের কাজ গ্রহণ করলে মানুষের সাম্যকে প্রকৃত সম্মান জানানো হবে।[১০]

স্বেচ্ছাস্বীকৃতি

গ্রামে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে রুটি-রুজির জন্য শ্রমের কর্তব্যবিষয়ে নির্দিষ্টভাবে এবং সংশ্লিষ্ট সবকিছু স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া। কিন্তু সমালোচক বলেছেন, "ভারতের লক্ষ লক্ষ সন্তান গ্রামে বাস করেও অর্ধাহারের জীবন যাপন করে।" অপ্রিয় হলেও কথাটি

খুবই সত্য। সৌভাগ্যবশত আমরা জানি যে তাদের এই বাধ্যতা ঐচ্ছিক নয়। তারা হয়তো, পারলে কায়িক শ্রম পরিহার করে চলবে এবং জায়গা পেলে নিকটতম শহরে সত্বর যাত্রা করবে।

বাধ্য হয়ে প্রভুর আদেশ পালন করা, দাসত্বের দশা; স্বেচ্ছায় পিতার আদেশ মেনে চলা, পুত্রত্বের গৌরব। একইভাবে, রুটির জন্য শ্রমের আইনের অবশ্যপালনীয় বাধ্যতা জন্ম দেয়: দারিদ্র, ব্যাধি ও অসন্তোষের। এ-ও এক দাসত্বের দশা। ঐচ্ছিক আজ্ঞাপালনে সন্তোষ ও স্বাস্থ্য আসবেই। আর, স্বাস্থ্যই তো আসল সম্পদ, রজত বা স্বর্ণখণ্ড নয়।[১১]

শ্রমবিভাজন

আমি কর্ম ও শ্রম-বিভাজনের পক্ষপাতী। তবে, মজুরির সমতার ওপর জোর দিতে চাই। আইনজীবী, চিকিৎসক বা শিক্ষক ওই 'ভাঙ্গির' চেয়ে বেশি পাবার অধিকারী নয়। একমাত্র তাহলেই কাজের বিভাজন জাতি বা বিশ্বের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। প্রকৃত সভ্যতা বা সুখের অন্য কোনও সোজা সড়ক নেই।[১২]

রুটির জন্য শ্রমের অর্থনীতি মানে, প্রাণচঞ্চল জীবনের পথ। এর অর্থ, প্রত্যেককে অন্ন ও বস্ত্রের জন্য গায়ে-গতরে শ্রম করতে হবে। রুটির জন্য শ্রমের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা যদি মানুষকে আমি বোঝাতে পাবি, তাহলে অন্নবস্ত্রের কখনও অভাব হবে না। লোকে যদি কৃষিকাজ না-করে, সুতো না-কাটে, বস্ত্র না-বোনে তাহলে আমি আত্মবিশ্বাস নিয়েই নির্দ্বিধায় তাদের ক্ষুধার্ত ও নগ্ন হয়ে থাকতে বলব। [১৩]

১৯২৫ সালে আমি যা বলেছিলাম তা এখনও বিশ্বাস করি অর্থাৎ পুরুষ বা নারী নির্বিশেষ একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার ওপরের প্রাপ্ত বয়স্কদের রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে কায়িক শ্রম করতে হবে, বিনিময়ে তারা ভোটাধিকার পাবে।[১৪]

পূজা হিসেবে কাজ

ধরা যাক, দিনের মধ্যে এক ঘণ্টা গরিবরা যা করে সেই শ্রম আমাদের করতে হবে। এইভাবে আমরা তাদের নিয়ে ও তাদের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করব। এর থেকে মহৎ বা অধিক জাতীয়তাবাদী বলে কিছু আমি ভাবতে পারি না। যখন ঈশ্বরের নামে আমি দরিদ্রের মতোই তাদের জন্য শ্রমদান করব, সে-ই হবে আমার ঈশ্বর-পূজা, যার চেয়ে উন্নততর ঈশ্বর-আরাধনার কথা আমি কল্পনা করতে পারি না।[১৫]

তাঁর নামে কৃত ও তাঁকে উৎসর্গীকৃত কোনও কাজই ক্ষুদ্র নয়। এইভাবে করলে সব কাজই সমান গুণসমন্বিত হয়। জনৈক মেথর যে তাঁর কাজ করে, এবং জনৈক রাজা যে তাঁর নামে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে ও নিজেকে নিছক অছিধারী বলে মনে করে—এরা দু'জনেই সমান সম্মান ভোগ করে।[১৬]

...প্রেম বা অহিংসার অন্তস্তল থেকে উৎসারিত না হলে সেবা সম্ভব নয়। ....যথার্থ প্রেম সমুদ্রের মত সীমাহীন, একজনের অন্তরে উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তারপর

বেরিয়ে আসে, ছড়িয়ে পড়ে সকল সীমানা ও সীমান্তের ওপারে, আবৃত করে সমগ্র জগৎ। আবার রুটির জন্য শ্রম বাদ দিয়েও এই সেবা সম্ভব নয়। 'গীতা'য় একেই অন্যভাবে 'যজ্ঞ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনও পুরুষ বা নারী সেবার জন্য কায়িক পরিশ্রম করলে তবেই সে জীবনধারণের অধিকার অর্জন করে।[১৭]

আত্মোৎসর্গের কর্তব্য

'গীতা'-য় বলা হয়েছে "আত্মোৎসর্গের কর্তব্য ন্যস্ত ক'রে ব্রহ্মা তাঁর প্রজা সৃষ্টি করলেন এবং বললেন, 'এর মাধ্যমে তোমরা সমৃদ্ধিশালী হও। এরা দ্বারা তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হোক'। যে এই আত্মোৎসর্গ বিনা খাদ্যগ্রহণ করে, সে চুরি করে খায়"। বাইবেল বলেছে, "কপালের ঘাম ঝরিয়ে নিজের রুটির সংস্থান করো"। আত্মোৎসর্গ নানা ধরনের হতে পারে। এর মধ্যে একটি হতে পারে রুটির জন্য শ্রম। সকলেই যদি নিজের রুটির জন্য শ্রমটুকুই করত, তাহলে সকলের জন্যই পর্যাপ্ত খাদ্য ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকত। তাহলে জনসংখ্যাধিক্য নিয়ে হাহাকার, অসুখবিসুখ ও চারপাশে যে দুঃখদুর্দশা আমরা দেখতে পাই, তা থাকত না। অনুরূপ শ্রম হবে আত্মোৎসর্গের উচ্চতম রূপ। সন্দেহ নেই, মানুষ তার দেহ বা মনের দ্বারা আরও নানারকম কাজ করবে, কিন্তু সে সবই হবে সর্বমঙ্গলের জন্য প্রেমের শ্রম। তখন না থাকবে ধনী, না গরিব, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ, ছুৎ-অচ্ছুৎ কিছুই থাকবে না।

এটা হয়তো এক অপ্রাপণীয় আদর্শ। কিন্তু আমাদের এর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আত্মোৎসর্গের সমগ্র নিয়মটির শর্ত অর্থাৎ আমাদের সত্তার নিয়ম আমরা যদি পূরণ করতে না-ও পারি, তবুও আমাদের দৈনন্দিন অন্নজলের প্রয়োজনীয় কায়িক শ্রম যদি আমরা করতে পারি, তাহলেই ওই আদর্শসাধনের পথে অনেকটা এগিয়ে যাব।

এটা করতে পারলে আমাদের চাহিদা কমে যাবে এবং আহারও সহজসরল রূপ নেবে। তখন আমরা জীবনধারণের জন্য আহার করব, আহারের জন্য জীবনধারণ নয়। প্রস্তাবিত এই বিষয়টির অভ্রান্ততায় যার সন্দেহ আছে সে তার অন্নের জন্য শ্রম করে দেখুক। তার শ্রমের উৎপন্ন ফল থেকে সে গভীরতম তৃপ্তি পাবে, তার স্বাস্থ্যও ভাল হবে এবং সে আবিষ্কার করবে, এমন এমন অনেক জিনিসই সে আগে খেত, যা বাহুল্যমাত্র।[১৮]

কর্মের সুসমাচার

কাজের ওপরে যত বেশি গুরুত্বই দেওয়া হোক-না-কেন তবুও তা যথেষ্ট হয় না! আমি শুধু 'গীতা'-র কথায় বলছি, যেখানে প্রভু বলেছেন "নিদ্রাবিহীন কর্মে নিয়ত যদি না আমি ব্যস্ত থাকতাম তাহলে মানবজাতির সামনে এক ভ্রান্ত উদাহরণ উপস্থাপিত হতো।"

....আমার যদি (বুদ্ধের) মতো কারও সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের সৌভাগ্য হতো, তাহলে জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করতাম না যে, তিনি কেন ধ্যানের বদলে কর্মের শিক্ষা

দেননি। (তুকারাম, ধ্যানদেব) প্রমুখ সন্তদের ....সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও আমি একই প্রশ্ন করতাম।[১৯]

ঘাম ঝরিয়ে নিজের অন্নের সংস্থান করবে বলে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের খাদ্যসামগ্রী সমেত প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমরা যাদুকরের টুপির মধ্য থেকে পেয়ে যাচ্ছি এমন সম্ভাবনার কথা ভাবলে আমার ভয় হয়।[২০]

যদি একজনও পূর্ণ কর্মক্ষম পুরুষ বা নারী কাজ বা খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে আমাদের বিশ্রাম করতে বা একবার ভরপেট আহার করতে লজ্জা পাওয়া উচিত।[২১]

আমাদের দেশের নগ্ন দারিদ্র ও কর্মহীনতা দেখে আমি অশ্রুপাত করেছি। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী আমাদের অবহেলা ও অজ্ঞতা। আমরা এখনও তেমন ক'রে শ্রমের মর্যাদা বুঝি না। যেমন, যে জুতো বানায় সে জুতো ছাড়া আর কিছু বানাতে রাজি হবে না এবং অন্য সব শ্রমকে সে তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর বলে মনে করবে। এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করা আবশ্যক।

যারাই গায়ে-গতরে সৎভাবে শ্রম করতে চায় তাদের জন্য ভারতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান হতে পারে। কর্ম এবং তার দৈনিক রুটির চেয়ে বেশি রোজগারের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রত্যেককে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত থাকবে, নিশ্চিতভাবে তার কর্মসংস্থান হবে। সৎভাবে যে উপার্জন করতে চায়, তার কাছে কোনও শ্রমই হীন বলে মনে হতে পারে না। এখন কেবল দরকার ঈশ্বরপ্রদত্ত হাত ও পা ব্যবহার করার প্রস্তুতি।[২২]

....সংখ্যা তাদের যতই হোক-না-কেন, সকল কর্মহীন পুরুষ ও নারীর জন্য খোরাকি শ্রমের ব্যবস্থা করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।[২৩]

বুদ্ধিজীবীর শ্রম

কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝে। আমি বৌদ্ধিক শ্রমের মূল্য বাতিল করতে চাই না, কিন্তু সর্বজনহিতায় যে দৈহিক শ্রম দান করার জন্য আমাদের জন্ম তার পূরক হিসেবে বৌদ্ধিক শ্রম যথার্থ নয়। তার পরিমাণ যতই হোক না কেন। এটা প্রায়শই কায়িক শ্রমের চেয়ে অনন্ত গুণে শ্রেয়, তা কখনওই দৈহিক শ্রমের বিকল্প নয় বা হতেও পারে না। এমনকি, আমরা যে খাদ্যশস্য খাই তার চেয়ে বৌদ্ধিকখাদ্য অনেক মূল্যবান হলেও কখনওই তার জায়গা নিতে পারে না। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর উৎপন্ন বস্তু বাদ দিয়ে বৌদ্ধিক উৎপাদন এক উদ্ভট অসম্ভব ব্যাপার।[২৪]

মানুষ কি বৌদ্ধিক শ্রম দিয়ে তার খাদ্যের সংস্থান করতে পারে না? না, পারে না। দেহের যা প্রয়োজন তা দেহকে জোগান দিতে হবে। "সিজারের যা প্রাপ্য তাই সিজারকে দাও"—কথাটি হয়তো এ-ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিছক মানসজাত অর্থাৎ বৌদ্ধিক শ্রম হচ্ছে নিজের জন্য। এ হল তার নিজের পরিতৃপ্তি। এর জন্য কখনওই মজুরি চাওয়া উচিত নয়। আদর্শ রাষ্ট্রে চিকিৎসক, আইনজীবী ও সমগোত্রীয়রা একমাত্র সমাজের স্বার্থে কাজ করবে, ব্যক্তিস্বার্থে নয়।[২৫]

বুদ্ধিগত কাজ গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনের বিন্যাসে নিঃসন্দেহে তার একটি স্থান রয়েছে। কিন্তু আমি যার ওপরে জোর দিতে চাইছি, তা হল কায়িক শ্রম। কোনও মানুষই আমার মতে এই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। এটা এমনকি তার বৌদ্ধিক উৎপাদনের মনোন্নয়নের সহায়ক হবে।[২৬]

একজন মজুর টেবিলে বসে লিখতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি সারাজীবন টেবিলে বসে কলম পিষেছে, সে অবশ্যই কায়িক শ্রম করতে সক্ষম।[২৭]

৪১. শ্রমিক ও পুঁজি

আমি সবসময়েই বলেছি, পুঁজি ও শ্রমিক পরস্পরের পরিপূরক হবে। একে অন্যের সহায়তা করবে। ঐক্য ও সঙ্গতির মধ্যে বাসরত এক মহান পরিবারের মতো তাদের থাকা উচিত, যেখানে পুঁজি শুধু শ্রমিকদের বৈষয়িক মঙ্গল নয়, তাদের নৈতিক কল্যাণসাধনের বিষয়টিও দেখবে। পুঁজিপতিরা হবে তাদের অধীনস্থ শ্রমজীবী শ্রেণীর কল্যাণের অছিধারী।[২৮]

আমি পুঁজির সঙ্গে লড়তে ভয় পাই না। আমি পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়াই করি। পশ্চিম এই শিক্ষাই দেয়, পুঁজির পুঞ্জীভবন এড়াতে হবে যাতে অন্য ও আরও মারাত্মক রূপে জাতিযুদ্ধ না ঘটে। পুঁজি ও শ্রমিকেব পরস্পরের প্রতি বৈরভাবাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।[২৯]

পুঁজিবাদীর হৃদ্‌পরিবর্তন

আমি যদি পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে মৌলিক সাম্যের ব্যাপারটি স্বীকার করে নেই, যা আমার করাই উচিত, তাহলে পুঁজিপতিকে ধ্বংস করা কখনওই আমার লক্ষ্য হতে পারে না। তাকে মতান্তরিত করার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে। যে ভুল সে হয়তো করছে, তার প্রতি তার চোখ খুলে দেবে আমার অসহযোগ ....এটা সহজেই দেখানো যায়, পুঁজিপতির বিলুপ্তিসাধন পরিশেষে অবধারিতভাবে শ্রমিকের ধ্বংস ডেকে আনবে। যেহেতু কোনও ব্যক্তিই যেমন মুক্তিলাভ না-করার মতো মন্দ হতে পারে না, তেমনি কোনও ব্যক্তিই এমন নিখুঁত নয় যে সে অন্যের ধ্বংস চাইবে, যাকে সে ভ্রান্ত ধারণার বশে সম্পূর্ণ পাপী বলে মনে করে।[৩০]

কতিপয় লক্ষপতির মুণ্ডচ্ছেদ করে গরিবের ওপরে শোষণ বন্ধ করা যাবে না। এর জন্য দরকার গরিবদের অজ্ঞতা দূর করা এবং শোষণকারীদের সঙ্গে অসহযোগ করতে শেখানো। এর ফলে শোষকদেরও হৃদ্‌পবিবর্তন হবে। আমি একথাও বলেছি যে, শেষ পর্যন্ত দুজনেই সমান অংশীদারে পরিণত হবে। পুঁজি নিজে কোনও পাপ নয়, পাপ হচ্ছে এর ভ্রান্ত ব্যবহার। কোনও-না-কোনভাবে সবসময় পুঁজির দরকার পড়বে।[৩১]

শ্রমিকের কর্তব্য, অধিকার

দুনিয়ার সর্বত্র আমার এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে, শ্রমিক তার কর্তব্য একেবারে নিয়মাফিক, অনেক কার্যকর ও বিবেকসহ সম্পন্ন করে তার মালিকের চেয়ে, যার পাল্টা দায়িত্ব রয়েছে শ্রমিকদের প্রতি। অতএব শ্রমিকের পক্ষে এটা দেখা দরকার, কতদূর পর্যন্ত সে নিজের ইচ্ছা মালিকদের ওপরে চাপিয়ে দিতে পারে।

যদি দেখি, আমরা পর্যাপ্ত মজুরি বা থাকার ব্যবস্থা পাচ্ছি না, তাহলে কী করে আমরা তা পাবো এবং ভালোভাবে থাকতে পারব? শ্রমিকদের জন্য যে সুযোগসুবিধার প্রয়োজন, তার মান নির্ধাবণ করবে কে? নিঃসন্দেহে সেরা রাস্তাটা হচ্ছে, তোমরা শ্রমিকরা, তোমাদের নিজস্ব অধিকারসমূহ জানবে, তোমাদের অধিকার সাব্যস্ত করার পদ্ধতি অনুধাবন করবে, সেগুলি আদায় করবে। কিন্তু তার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি দরকার ....দরকার শিক্ষার।[৩২]

কিন্তু জগতে কর্তব্য বাদ দিয়ে কোনও অধিকার থাকতে পারে না। মালিক কখনও তার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে না। তোমরা যখন জানবে যে এই কারখানা যতটা মালিকেব, ততটা তোমাদেরও, তখন তোমরা কখনওই নিজেদের সম্পত্তির ক্ষতি করবে না। কারখানা-মালিকের সঙ্গে নিজেদের বিবাদের ঝাল মেটাতে কখনওই তোমাদের ক্রুদ্ধ হয়ে কাপড়ের কল বা যন্ত্রের ক্ষতি করা উচিত হবে না।

সংগ্রাম যদি করতেই হয়, তাহলে সততার পথে থাকো। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হবেন। আবারও বলছি, অধিকার অর্জনের জন্য আত্মশুদ্ধি এবং কষ্টস্বীকার করা ছাড়া আর কোনও সুগম পথ নেই।[৩৩]

শ্রমিকের ক্ষমতা

শ্রমিকরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ ও আত্মোৎসর্গকারী হয়, তাহলে তারা সবসময়েই জয়যুক্ত হবে, সবিনয়ে আমি এই মত ব্যক্ত করছি। পুঁজিপতিরা যতই অত্যাচারী হোক না কেন, আমি এ-বিষয়ে নিশ্চিত, যারা শ্রমিকদের সঙ্গে জড়িত এবং শ্রমিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, তাদের কোনও ধারণাই নেই যে কী পরিমাণ সম্পদ শ্রমিকদের অধিকারভুক্ত সবসময়েই পুঁজির আয়ত্তের বাইরে। শ্রমিকরা যদি শুধু এই কথাটি বোঝে ও উপলব্ধি করে যে তাদের বাদ দিলে পুঁজি অসহায়, তাহলে, তৎক্ষণাৎ শ্রমিকরা তাদের যোগ্য জায়গা খুঁজে পাবে।

দুর্ভাগ্যবশত, পুঁজির সম্মোহক প্রস্তাব ও প্রভাবের দ্বারা আমরা এমনই আচ্ছন্ন হয়ে গেছি, যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি—এই পৃথিবীতে পুঁজিই হচ্ছে সার। কিন্তু এক মুহূর্ত চিন্তা করলেই দেখা যাবে, শ্রমিকদের কাছে যে পুঁজি রয়েছে পুঁজিপতিরা কখনওই তার মালিক হতে পারবে না। তাঁর যুগে রাসকিন বলেছিলেন, শ্রমিকদের সামনে অপর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর কথায় আমরা কর্ণপাত করিনি।

ইংরেজি ভাষায় একটি অমোঘ শব্দ আছে, ফরাসী ভাষাতেও, বিশ্বের সব ভাষাতেই আছে, শব্দটি হল 'না'। যে-গোপন রহস্য আমরা আয়ত্ত করেছি, সেটা হল, পুঁজি

যখন শ্রমিকদের 'হ্যাঁ' বলতে বলে, তখন যদি "না" বলার ইচ্ছা হয়,—শ্রমিকরা সমস্বরে গর্জন করে ওঠে, "না"। তৎক্ষণাৎ শ্রমিকরা বুঝতে পারে, যখন তার 'হ্যাঁ' বলা দরকার তখন "হ্যাঁ", এবং যখন "না" বলা দরকার তখন "না" বাছাই করার অধিকার তার রয়েছে। এইভাবে শ্রমিকরা পুঁজির প্রভাব মুক্ত হয় এবং পুঁজি বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের তোয়াজ করে চলে।

পুঁজির হাতে বন্দুক ও বিষাক্ত গ্যাস আছে। তাতে বিন্দুমাত্র এসে যায় না। পুঁজি একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে যদি শ্রমিকরা তাদের মর্যাদা রক্ষার্থে "না" বলে। তখন শ্রমিকদের পাল্টা আক্রমণ করার দরকার হবে না। বুলেট ও বিষাক্ত গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রমিক তখন অকুতোভয়ে জানিয়ে যাবে: "না"।

শ্রমিকশ্রেণী প্রায়শই ব্যর্থ হয় একটাই বড় কারণে। তা হল, যেমন আমি বলেছি, সেভাবে পুঁজিকে জীবাণুমুক্ত না-করে শ্রমিকরা, (আমিও জনৈক শ্রমিক হিসেবেই বলছি) পুঁজি দখল ক'রে সবচেয়ে কদর্থে নিজেরাই পুঁজিপতি হতে চায়। অতএব ঘাটি আগলে বসে-থাকা পুঁজিপতি যখন দেখে, শ্রমিকদের মধ্যেই তার দপ্তরের প্রার্থী রয়েছে, তখন সে এদেরই একাংশকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকদের দমন করে। আমরা যদি সত্যিই এই সম্মোহক জাদুর মোহে না-পড়ে থাকতাম, তবে নরনারী নির্বিশেষে সকলেই এই মূল সত্যটি অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারতাম।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের কাছে প্রমাণ পাওয়ার পর, আমি কর্তৃত্বের (এমন বলার জন্য মার্জনা চাইছি) সুরেই তোমাদের বলছি,—তোমাদের কাছে আমি যে পরিকল্পনা পেশ করেছি, তা মানুষের অসাধ্য কিছু নয়। বরং পুরুষ ও নারী, প্রতিটি শ্রমিকেরই আয়ত্তাধীন।

আবার তোমরা দেখবে যে, অহিংস এই পরিকল্পনায় শ্রমিকদের যা করতে বলা হচ্ছে, তা...অস্ত্রে আপাদমস্তক সুসজ্জিত সৈন্যকে যা করতে বলা হয়, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ওই সৈন্য অবশ্য তার প্রতিপক্ষের ওপরে হানতে চায় মৃত্যু ও ধ্বংস, কিন্তু তার নিজের প্রাণও থাকে তার হাতের মুঠোয়। আমি চাই, শ্রমিকরা এই সৈন্যের সাহস অনুকরণ করুক, তার পাশবিকতা, অর্থাৎ তার মৃত্যু হানার দক্ষতা নয়। আমি বলতে চাই, যে শ্রমিক মৃত্যুকে বরণ করে, আত্মরক্ষার কোনও অস্ত্র ছাড়াই নিরস্ত্র মৃত্যু বরণ করার সাহস রাখে, সে, আপদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত কোনও ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি সাহস দেখায়।[৩৪]

বুদ্ধিবৃত্তির উপহার

যে মুহূর্তে শ্রমিকরা তাদের মর্যাদা উপলব্ধি করবে, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ চলে যাবে তার সঠিক জায়গায় অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্যই তা অছি হিসেবে রক্ষিত হবে। কারণ শ্রমিকের মূল্য অর্থের চেয়ে বেশি।[৩৫]

আমি মনে করি, বিভিন্ন পেশা সম্বন্ধে মোটামুটি কাজচালানো গোছের ধারণা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যা, পুঁজিপতির কাছে ধাতুও তা। শ্রমিকের পুঁজি তার দক্ষতা। শ্রমিকের সহযোগিতা

ছাড়া পুঁজিপতি যেমন তার পুঁজিকে ফলপ্রসূ করতে পারে না, তেমনই, পুঁজির সহায়তা ছাড়া শ্রমজীবীর শ্রমও ফলপ্রসূ হয় না।

এখন যদি শ্রমিক ও পুঁজিপতির বুদ্ধিবৃত্তির সম্পদ সমভাবে বিকশিত হয়, পরস্পরের কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়ার ব্যাপারে তাদের যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তাহলে একটা যৌথ উদ্যোগের সমান অংশীদার হিসেবে তারা পরস্পরকে সমীহ্ ও তারিফ করতে পারে। পরস্পরকে নিত্যকালের দুই আপসহীন প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করার কোনও কারণ নেই তাদের।

সংগঠন

পুঁজি আজ সংগঠিত এবং আপাতদৃষ্টিতে সুদৃঢ় নিরাপত্তাবেষ্টিত, কিন্তু শ্রমিক তা নয়। জটিলতাটা আসলে এখানেই। শ্রমজীবী মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে কোণঠাসা ও সংকীর্ণ করে রেখেছে তার হৃদয়হীন, যান্ত্রিক বৃত্তি। সে মানসিক বিকাশের সুযোগ সুবিধা পায় না। ফলে, তার ক্ষমতা অনায়ত্ত থেকে গেছে। তার মর্যাদার যোগ্য মূল্যও সে পায়নি।

তাকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে, তার মজুরি পুঁজিপতিদের হুকুমে স্থির হবে। নিজের শর্তে সে মজুরি চাইতে পারবে না। এখন তাকে শুধু সঠিক পথে সংগঠিত হতে হবে, তার বুদ্ধিবৃত্তির দ্রুত বিকাশ ঘটাতে হবে, তাকে নানারকম পেশা শিখতে হবে। তাহলেই সে মাথা উঁচু করে চলতে পারবে। রুটিরুজির জন্য আর তাকে ভয় পেতে হবে না।[৩৬]

আমি শ্রমিকদের সংগঠিত করার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু অন্য সবকিছুর মতোই আমি চাই, এ সংগঠন ভারতীয় পথে, বা অনুমতি দিলে, আমার পথে হোক। আমি সেটা করছি। ভারতীয় শ্রমজীবী এটা সহজাতভাবে জানে। আমি পুঁজিকে শ্রমিকের শত্রু বলে মনে করি না। আমি মনে করি এদের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়সাধন সম্ভব।

দক্ষিণ আফ্রিকা, চম্পারণ, বা আমেদাবাদে আমি যে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিলাম, তার মধ্যে পুঁজিপতিদের প্রতি কোনও বৈরিতার মনোভাব ছিল না। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সীমা পর্যন্ত প্রতিরোধ, পূর্ণ সফল হয়েছিল।[৩৭]

শ্রমিককে বুঝতে হবে, শ্রমিকও একাধারে পুঁজি। যখনই শ্রমিক যথার্থ শিক্ষিত ও সংগঠিত হবে, নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হবে, তখন যে-কোনও অঙ্কের পুঁজিই তাদের আর দাবিয়ে রাখতে পারবে না। সংগঠিত ও আলোকপ্রাপ্ত শ্রমিক নিজের শর্ত নিজেই বলতে পারবে। আমরা দুর্বল বলে, অসৎপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার শপথ নিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাদেরও শক্তিশালী হতে হবে। সবল হৃদয়, পূর্বসংস্কারবর্জিত আলোকিত মন এবং কর্মক্ষম ইচ্ছুক হাত, যে-কোনও বিঘ্ন কাটিয়ে উঠে সব বাধা অপসারিত করতে সক্ষম।[৩৮]

সংঘাত অবধারিত নয়

পুঁজি ও শ্রমিকের মধ্যে কোনও সংঘাত থাকা প্রয়োজন, আমি মনে করি না। এরা

একে অপরের ওপরে নির্ভরশীল। আজ যা আবশ্যক, তা হল, পুঁজিপতি যেন শ্রমিকের ওপরে প্রভুত্ব না ফলায়। আমার মতে, কারখানার অংশীদাররা যেমন, শ্রমিকরাও তেমনই তাদের কারখানার মালিক। কারখানা-মালিকরা যখন বুঝবে যে শ্রমিক তাদের মতোই মিল মালিক, তখন তাদের মধ্যে কোনও বিবাদ থাকবে না।[৩৯]

জমি মালিক ও অন্যান্য মুনাফাকারীদের জনগণ শত্রু মনে করে না। কিন্তু এই শ্রেণীগুলি তাদের প্রতি যে অন্যায় করেছে, সে সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। পুঁজিপতিদের শত্রু বলে ভাবতে আমি জনগণকে শেখাই না, তাদের বলি, তারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু।[৪০]

পুঁজি ও শ্রমিকেব মধ্যে স্বার্থের সংঘাত আছে। নিজেদের কর্তব্য পালন ক'রে এর সমাধান আমাদের করতে হবে। পরিশুদ্ধ রক্ত যেমন বিষাক্ত জীবাণু প্রতিরোধ করে, তেমনই, শুদ্ধ হলে শ্রমিকরাও শোষণের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য হতে পারবে।

আমি কখনও বলিনি, যতক্ষণ শোষণ এবং শোষণ করার ইচ্ছা থাকবে, ততক্ষণ শোষক ও শোষিতের মধ্যে সহযোগিতা থাকা উচিত। আমি শুধু বিশ্বাস করি না, পুঁজিপতি ও জমিদার, কোনও অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাগিদে শোষক, বা তাদের ও জনগণের স্বার্থের মধ্যে কোনও মৌলিক ও আপসহীন বৈরিতা রয়েছে।

শ্রেণীযুদ্ধের ধারণাটি আমার মনে ধরে না। ভারতে শ্রেণীযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী তো নয়ই, বরং একে এড়ানোও সম্ভব যদি আমরা অহিংসার বাণী অনুধাবন করি। যারা অবশ্যম্ভাবী শ্রেণীযুদ্ধেব কথা বলে, তারা অহিংসার তাৎপর্য বোঝেনি, বা বুঝলেও বুঝেছে অত্যন্ত ভাসাভাসাভাবে।[৪১]

গঠনমূলক ব্যবহার

আমি কি বলিনি, যে ওরা (শ্রমিকরা) যদি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে, বিচক্ষণতার সঙ্গে ও গঠনমূলকভাবে তা ব্যবহার করে, তাহলে তারাই প্রকৃত শাসক হয়ে উঠবে এবং মালিকরা হবে তাদের অছিধারী, প্রয়োজনের ও কাজের বন্ধু? এই সুখকর অবস্থা তখনই আসবে, যখন তারা জানবে, পৃথিবীর জঠর থেকে শ্রমিক যে সোনা ও রূপা তুলে আনে, সে পুঁজির চেয়ে শ্রম আরও অনেক যথার্থ পুঁজি।[৪২]

সুচারুরূপে সম্পন্ন কর্তব্য থেকে যে অধিকার সৃষ্ট হয়, তা অলঙ্ঘনীয়। অতএব, মজুরি পাবার অধিকার আমার তখনই হবে, যখন আমার কর্তব্য আমি সম্পন্ন করব। কাজ না করে আমি যদি মজুরি নেই, তাহলে সেটা হবে চুরি। বারবার অধিকার নিয়ে পীড়াপীড়িতে আমি যুক্ত থাকতে পারি না,যদি কর্তব্য সম্পন্ন করবার প্রসঙ্গটি উল্লেখিত না হয়। এই কর্তব্যের ওপরেই অধিকার নির্ভর করে। এব থেকেই অধিকার জন্ম নেয়।[৪৩]

৪২. ধর্মঘট : সঙ্গত ও অসঙ্গত

প্রথমে মধ্যস্থতা

আমি জানি, ন্যায়বিচার পাবার জন্য ধর্মঘট করা শ্রমজীবীর জন্মগত অধিকার। কিন্তু যে মুহূর্তে পুঁজিপতি মধ্যস্থতা করার নীতি মেনে নেবে, তখন ধর্মঘট অবশ্যই অপরাধ বলে গণ্য হবে।[৪৪]

ধর্মঘট ও রাজনীতি

ধর্মঘট আজ দৈনন্দিন ব্যাপার। বিদ্যমান অশান্তির এ-এক লক্ষণ। হরেক রকম ভাসা ভাসা চিন্তা-ভাবনা হাওয়ায় ভাসছে। একটা অস্পষ্ট আশায় সকলে অনুপ্রাণিত। হতাশাও হবে বিশাল, যদি এই অস্পষ্ট আশা নির্দিষ্ট অবয়ব লাভ না করে। আজ যারা উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক সেজে বসেছে, ভারতের শ্রমিক জগৎ, অন্য সবজায়গার মতোই, তাদের দয়ার ওপরে নির্ভরশীল। এই উপদেষ্টা ও দিশারীরা সবসময়ে সতর্ক নয়। এমনকি, সতর্ক হলেও সর্বদা বিচক্ষণ নয়। শ্রমিকরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। ক্রুদ্ধ হওয়ার সর্ববিধ কারণই তাদের আছে। তাদের শেখানো হচ্ছে এবং তাতে কোন ভুল নেই যে, মালিকদের সম্পদবৃদ্ধি প্রধানত তাদেরই কারণে। এরপর কাজের যন্ত্রটা নামিয়ে রাখতে বলতে বেশি চেষ্টা করতে হচ্ছে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ভারতের শ্রমিকদের ওপরে প্রভাব ফেলেছ। আর সে ধরনের শ্রমিকনেতারও অভাব নেই, যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মঘট সঙ্গত মনে করে।

আমার মতে এমন উদ্দেশ্যে শ্রমিক ধর্মঘট ব্যবহার করা অতীব গর্হিত এক ভুল। অনুরূপ ধর্মঘট যে রাজনৈতিক স্বার্থসাধক হতে পারে সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তা হলে তা আর অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনার আওতায় থাকে না। যতক্ষণ না শ্রমিকরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে পারছে, সাধারণের হিতার্থে কাজ করতে তৈরি হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যে খুবই বিপজ্জনক—এটা বুঝতে বিশেষ মাথা খাটানোর প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তে শ্রমিকদের কাছে এতখানি আশা করা ঠিক নয়। যতদিন না তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে ভদ্রভাবে মন-প্রাণ রক্ষা করতে পারছে ততক্ষণ তাদের কাছে এটা প্রত্যাশা করা অনুচিত।

অতএব, শ্রমিকদের মহত্তম রাজনৈতিক অবদান হবে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করা—ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া, নিজেদের অভিজ্ঞতায় দাবীজানানো।এমনকি এ দাবিও তারা করতে পারে, যে-জিনিস উৎপাদনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, মালিকরা যেন সে পণ্যের যথাযথ ব্যবহার করে। তাই সঠিক বিবর্তনটি হবে, শ্রমিকদের আংশিক মালিকানার স্তরে উন্নীত হওয়া। বর্তমানে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য

সরাসরি ধর্মঘট হতে পারে। পরে যখন তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে, তখন তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের জন্যও তারা ধর্মঘট করতে পারে।

সাফল্যের শর্ত

সফল ধর্মঘটের শর্তগুলি সরল। এগুলি পূরণ করা হলে ধর্মঘট কখনওই বিফল হয় না:

১. ধর্মঘটের কারণটি ন্যায়সঙ্গত হতেই হবে।

২. ধর্মঘটীদের মধ্যে যথার্থ মতৈক্য থাকবে।

৩. যারা ধর্মঘট করবে না তাদের বিরুদ্ধে কোনও হিংসা প্রয়োগ চলবে না।

৪. ধর্মঘট চলাকালে শ্রমিকরা ইউনিয়নের তহবিলের ওপরে নির্ভর না করে নিজেদের ভরণপোষণ চালাবে। অর্থাৎ তারা অন্য কোনও কার্যকর উৎপাদনশীল সাময়িক কাজ বেছে নেবে।

৫. যদি ধর্মঘটীদের বদলি হিসেবে পর্যাপ্তসংখ্যক শ্রমিক থাকে তাহলে ধর্মঘটে কোনও সুরাহা হবে না। সে-ক্ষেত্রে, অন্যায় আচরণ বা অপ্রতুল মজুরি বা অনুরূপ কোনও কারণে ইস্তফা দেওয়াই সমীচীন হবে।

৬. উপরোক্ত সব ক'টি শর্ত পূরণ না করেও ধর্মঘট সফল হয়েছে, এমনও দেখা গেছে। কিন্তু তা-থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, সে-ক্ষেত্রে মালিকরা ছিল দুর্বল এবং তাদের বিবেকদংশনও ছিল। ভ্রান্ত উদাহরণের অনুকরণ ক'রে আমরা প্রায়ই গুরুতর ভুল করে বসি। সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হল, যে উদাহরণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণ, তার অনুকরণ না ক'রে, যে পরিস্থিতি আমাদের জানা, সাফল্যের জন্য যাকে আবশ্যক বলে মনে করি, তা অনুসরণ করা।[৪৫]

রাজনৈতিক ধর্মঘট

ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকলে ধর্মঘট কখনওই বাঞ্ছনীয় নয়। কোনও অসঙ্গত ধর্মঘটের সফলতা উচিত নয়। তেমন ধর্মঘট থেকে জনসাধারণের সহানুভূতি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

জনসাধারণ কোনও ধর্মঘটের ন্যায্যতা বিচার করতে পারে না, যদি-না সে ধর্মঘট, জনগণের আস্থাবান নিরপেক্ষ মানুষের সমর্থন পায়। স্বার্থবাহী মানুষরা নিজেদের ব্যাপারেই গুণাগুণ বিচার করতে পারে না। অতএব, দু'পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি মধ্যস্থতার বা বিচারবিভাগীয় মীমাংসার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সাধারণত, যখন মধ্যস্থতা বা বিচারবিভাগীয় মীমাংসার ব্যবস্থা থাকে তখন বিষয়টি জনসমক্ষে আসে না। এমন ঘটনা কিন্তু ঘটেছে যখন উদ্ধত মালিকরা রায় উপেক্ষা করেছে, অথবা ভুলপথে চালিত কর্মীরা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার শক্তি বিষয়ে সচেতন বলে, অনুরূপ আচরণই করেছে। গায়ের জোরে আদায়ের পথ বেছে নিয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে ধর্মঘট করা হয়, তাতে রাজনৈতিক পরিণামের গোপন

উদ্দেশ্য থাকা কখনও উচিত নয়। এ রকম ঘটলে রাজনৈতিক লক্ষ্যের কাজটি কখনও এগোয় না। সাধারণভাবে ধর্মঘটীরাও নানান ঝামেলায় পড়ে। এমনকি ডাক-ধর্মঘট ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ পরিষেবার ক্ষেত্রে ধর্মঘট হলে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, জনজীবনে তেমন কোনও বিপর্যয় না ঘটালেও তারা নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়।

এর ফলে সরকার কিছু অসুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু অচল হয়ে পড়বে না। ধনীরা ব্যয়সাধ্য ডাক-ব্যবস্থা করে নেবে। কিন্তু ও রকম কোনও (জনপরিষেবা-মূলক) ধর্মঘটের সময়, প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের যে সুবিধা সাধারণ মানুষ বহু প্রজন্ম ধরে পেয়ে আসছে,—তা থেকে বিপুলসংখ্যক গরিব মানুষ বঞ্চিত হবে। আইনসঙ্গত সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও যদি ব্যর্থতা আসে, একমাত্র তখনই এ-রকম ধর্মঘট হতে পারে।

যতক্ষণ না সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা তাদের আয়ত্তাধীন সবরকম আইনী উপায় ব্যবহার করে নিঃশেষ করেছে, ততক্ষণ তাদের জন্য সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট নিষিদ্ধ থাকবে.......

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে, রাজনৈতিক ধর্মঘট তার নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতেই বিচার্য। কখনওই একে অর্থনৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে মিশিয়ে বা জড়িয়ে ফেললে চলবে না। অহিংস কার্যক্রমে রাজনৈতিক ধর্মঘটের সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। তা খাপছাড়াভাবে করা উচিত নয়। সর্বদা হবে প্রকাশ্যে, খোলামেলাভাবে। গুণ্ডাবাজির দ্বারা পরিচালিত হবে না। এমনভাবে তা করা হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক কাজে না পৌঁছয়।[৪৬]

অহিংস ধর্মঘট

যে-অন্যায়ের প্রতিকার দরকার, তাব জ্বালা বুকে নিয়ে যারা কাজ করে চলেছে, শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ধরা যাক, টিমবাকটুর দেশলাই প্রস্তুতকারক মজুররা যে মজুরি পায় তাতে তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু টিমবাকটুর মিল-মজুররা যে ভুখা-মজুরি পায় তা তাদের গ্রাসাচ্ছদনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখন, দেশলাই প্রস্তুতকারক মজুররা যদি কলের মজুরদের প্রতি সহানুভূতিতে ধর্মঘট করে, তাহলে তাদের ধর্মঘট হবে এক হিংসাত্মক কাজ। সবচেয়ে ভালো যে কাজটা তারা করতে পারে এবং করা উচিত, তা হল,—টিমবাকটুর মিলমালিকদের উপর তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে নেওয়া। এর ফলে তাদের বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ আনা যাবে না।

তবে, প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী না হলেও কেউ ধর্মঘট করতে বাধ্য হতে পারে। এমন ঘটনাও বিচিত্র নয়। ধরা যাক, দেশলাই কারখানার মালিকরা যদি টিমবাকটুর মিলমালিকদের সঙ্গে একজোট হয়ে হাত মেলায়, তখন দেশলাই-মজুরদের কাজ হবে মিল-মজুরদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। কিন্তু এই যুক্ত হবার ব্যাপারটা আমি নিছক উদাহরণ হিসেবে খাড়া করেছি। শেষ বিশ্লেষণে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব গুণাগুণ বিচার্য। হিংসা খুবই সূক্ষ্ম এক শক্তি। এর উপস্থিতি অনুভব করলেও, তা খুঁজে বের করা সবসময়ে সহজ নয়।[৪৭]

ধর্মঘট হওয়া উচিত স্বতঃস্ফূর্ত। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কলকাঠি নেড়ে নয়। কোনও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই যদি ধর্মঘট সংগঠিত হয়, তাহলে গুণ্ডাবাজি ও লুটপাটের কোনও অবকাশ থাকে না। এ-ধরনের ধর্মঘটে ধর্মঘটীদের মধ্যে চমৎকার সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মঘট হবে শান্তিপূর্ণ। এর মধ্যে কোনওরকম ক্ষমতার আস্ফালন থাকলে চলবে না।

এককভাবে, বা অন্যদের সহযোগিতায়, নিজের রুটির সংস্থানের জন্য কোনও কাজ ধর্মঘটীদের নিতেই হবে। কী ধরনের কাজ, তা আগে থেকে ভেবে নিতে হবে। বলাই বাহুল্য এ ধরনের শান্তিপূর্ণ, কার্যকর ও বলিষ্ঠ ধর্মঘটে গুণ্ডামি বা লুঠতরাজের কোনও জায়গা থাকবে না। এইরকম ধর্মঘট আমি দেখেছি। আমি কোনও কল্প-স্বর্গের ছবি আঁকিনি।[৪৮]

অহিংস হলেও কোনও সর্বজনীন ধর্মঘট ও ক্ষমতাদখলের অংশীদার আমি কখনওই হব না।[৪৯]

পুঁজিবাদ ও ধর্মঘট

শ্রমিক যখন ধর্মঘট করে, তখন পুঁজির আচরণ কি রকম হবে? প্রশ্নটি মুখে মুখে ঘুরছে, এবং এই মুহূর্ত বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল দমনমূলক পথ, যার নাম বা ডাকনাম হচ্ছে "আমেরিকান" পন্থা। এর অর্থ, সংগঠিত গুণ্ডাবাজি চালিয়ে শ্রমিককে দমন করা। এই পদ্ধতি যে ভুল ও ধ্বংসাত্মক, তা সকলেই স্বীকার করবে। অপর যে পথ যথার্থ ও মর্যাদাপূর্ণ, তা হল প্রতিটি ধর্মঘটকে তার গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করা ও শ্রমিককে তার প্রাপ্য দেওয়া, পুঁজি যা প্রাপ্য মনে করে, তা নয়, শ্রমিক নিজে যা ন্যায্য বলে মেনে নেয়, আলোকপ্রাপ্ত জনমত যা সঙ্গত বলে সাব্যস্ত করে....

সময় যেমন এগোচ্ছে, শ্রমিক দুনিয়াও তেমনি তার দাবী নিয়ে চাপ দিচ্ছে,—সে দাবিও প্রত্যহ বেড়ে চলেছে। দাবিগুলি নিয়ে জোরাজোরি করার অধীরতায় তারা হিংসার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করছে না। দাবি বলবৎ করার নতুন নতুন পন্থা ব্যবহৃত হচ্ছে। মালিকদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, যন্ত্র বিকল করে দেওয়া, ধর্মঘটে যোগ দিতে অনিচ্ছুক বয়োবৃদ্ধ নারী ও পুরুষকে হেনস্থা করা, বলপূর্বক ধর্মঘট ভঙ্গকারী দালালদের ঠেকানো,—এ সব করতে শ্রমিকরা দ্বিধা করছে না। এমন পরিস্থিতিতে নিয়োগকর্তারা কী রকম আচরণ করবে?

....মালিকদের প্রতি আমার পরামর্শ, তারা স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মালিক বলে ভাবুক। শ্রমিক স্বপ্ন দেখে, এ-সব ব্যবস্থার স্রষ্টা সে। এ-ছাড়াও কর্মীদের ভালোমতো শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করে তোলাকে যেন তারা কর্তব্য জ্ঞান করে। এতে কর্মীদের সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশিত হবে—মালিকদের উচিত শ্রমিকদের এই ক্ষমতাকে প্রণোদনা দেওয়া, সোৎসাহে স্বাগত জানানো।

এই মহান কাজটি মালিকরা রাতারাতি করতে পারবে না। ইত্যবসরে, যাদের প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটীরা ধ্বংসাত্মক আঘাত হানতে চলেছে, সেই মালিকরা কী করবে? নির্দ্বিধায় আমি

সেই মালিকদের বলব, তারা তৎক্ষণাৎ প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ধর্মঘটীদের দেওয়ার প্রস্তাব দিক। ওই প্রতিষ্ঠান, মালিকদের যতটা ধর্মঘটীদেরও ততটাই। মালিকরা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, তারা মনে কোনও ক্ষোভ রাখবে না, কেন না এটাই ন্যায্য কাজ,—নিজেদের সদিচ্ছা প্রদর্শনের জন্য তারা তাদের ইঞ্জিনিয়ার ও দক্ষ কর্মীদের প্রস্তাব দেবে শ্রমিকদের সহায়তা করার।

নিয়োগকারীরা শেষে দেখবে যে তাদের কোনও ক্ষতিই হয়নি। বস্তুতই তাদের সঠিক কাজ বিপক্ষকে নিরস্ত্র করবে এবং বিপক্ষীয়দের আশীর্বাদও তারা পাবে। এইভাবে তারা তাদের পুঁজির যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারবে। এ ধরনের কাজকে আমি নিছক হিতৈষণা বলব না। এটা হবে, পুঁজিপতিদের তরফে, তাদের সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহার, কর্মীদের সঙ্গে সৎ আদান-প্রদান, যার ফলে কর্মীরা সম্মানিত অংশীদারে রূপান্তরিত হবে।[৫০]

সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট

সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট যদি তার সময়ের আগেই তড়িঘড়ি বেড়ে চলে....তাহলে আমাদের আদর্শের অশেষ ক্ষতি হবে। অহিংসার কর্মসূচীতে, আমাদের সরকারকে বেকায়দায় ফেলে, কোনও ফায়দা তোলার মনোভাব বর্জন করতে হবে। আমাদের কর্মতৎপরতা যদি শুদ্ধ হয়, আর সরকারের অশুদ্ধ, তাহলে আমাদের শুদ্ধতা তাকে লজ্জায় ফেলবে যতক্ষণ না সে নিজে শুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ-ভাবে শুদ্ধীকরণের এক আন্দোলন, উভয়পক্ষের ক্ষেত্রেই লাভজনক। নিছক ধ্বংসের এক আন্দোলন ধ্বংসকারীকে অপরিশুদ্ধ রেখে যায়। যাদের সে ধ্বংস করতে চায়, তাদের স্তরেই নামিয়ে আনে তাকে।

আমাদের সহানুভূতিমূলক ধর্মঘটগুলিকেও আত্মশুদ্ধির, অর্থাৎ অসহযোগের ধর্মঘট হতে হবে। তাই, কোনও অন্যায় দূর করার জন্য আমরা যখন ধর্মঘট ঘোষণা করি, আমরা সেই অন্যায়ে অংশগ্রহণ করা বাস্তবিকই বন্ধ করি এবং অন্যায়কারীকে তার নিজের হাতেই ছেড়ে দেই। অন্যভাবে বললে, অন্যায়টা করে চলার মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা আছে, সেটা তাকে দেখার সুযোগ দেই। কাজে ফিরে না যাবার দৃঢ়চিত্ত অঙ্গীকার থাকলে এ ধরনের ধর্মঘট সফল হয়....

ধর্মঘটীদের যথার্থ অসন্তোষের কারণ এবং লাগাতার ধর্মঘট চালাবার ক্ষমতা থাকলেও ধর্মঘট ব্যর্থ হতে পারে, যদি সেখানে বদলি শ্রমিকের ব্যবস্থা থাকে। তাই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি বোঝে যে সহজেই তার বদলে অন্য কোনও লোক নিয়োগ করা যায়, তাহলে সে মজুরিবৃদ্ধি বা অন্য কেনও দাবিতে ধর্মঘট করবে না। কিন্তু চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বেশি থাকলেও জনহিতৈষী বা দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ধর্মঘট করে। প্রতিবেশীর দুর্দশা দেখলে তার সঙ্গে হাত মেলাবার ইচ্ছা তার হয়। বলাই বাহুল্য, আমি যে ধরনের নাগরিক ধর্মঘটের কথা বলছি, তার মধ্যে ভীতিপ্রদর্শন, অগ্নিসংযোগ, বা অন্য কোনও রকম হিংসার স্থান নেই।[৫১]

....তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, ধর্মঘটভঙ্গকারী দালালদের কী হবে। দুর্ভাগ্যবশত, তারা থাকবেই। কিন্তু আমি বলব, ওদের সঙ্গে মারপিট কোর না। ওদের বোঝাও

যে ওদের নীতি সংকীর্ণ আর তোমরা কাজ করছ সামগ্রিক শ্রমিক স্বার্থে। এমন হতেই পারে যে দালালরা তোমাদের কথা শুনবে না। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে সহ্য করতে হবে তোমাদের, মারামারি করা চলবে না।[৫২]

চতুর্দিকে এই ধর্মঘটের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ার মৌলিক কারণ হল, অন্য সব জায়গার মতোই এখানেও জীবনের শিকড় মূল থেকে উৎপাটিত হয়ে গেছে। ধর্মই সেই মূল ভিত্তি। তার জায়গায় এসেছে "অর্থ লেনদেনের সম্পর্ক", একজন ইংরেজ লেখক যেমন বলেছেন। এ সম্পর্ক বড়ই বিপজ্জনক। কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তি যখন থাকবে, তখনও ধর্মঘট হবে। কারণ, সকলের ক্ষেত্রেই ধর্ম জীবনের ভিত্তি হয়ে উঠবে এ কল্পনাই করা যায় না। তাই একদিকে চলবে শোষণের চেষ্টা, অন্যদিকে ধর্মঘট। কিন্তু এই ধর্মঘটগুলি হবে সম্পূর্ণ অহিংস চরিত্রের।

এ ধরনের ধর্মঘটে কখনও কারও ক্ষতি হয় না। এমন একটি ধর্মঘটই বোধ হয় জেনারেল স্মাট্‌সকে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল। জ্যান স্মাট্‌স বলেছিলেন, "যদি একজন ইংরেজকেও আঘাত করতে, আমি তোমাকে গুলি করতাম,—তোমার লোকদেরও দেশছাড়া করতাম। এখন তোমাকে জেলে ভরেছি। তোমাকে ও তোমার লোকদের সবরকমভাবে হাত করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমরা যখন ফিরে আঘাত হানছ না, তখন কতক্ষণ আমি এ-ভাবে চালাতে পারি?" এ-ভাবেই 'কুলি'দের তরফের এক সামান্য 'কুলি'র সঙ্গে তাঁকে আপস করতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন সকল ভারতীয়কেই 'কুলি' বলা হতো।[৫৩]

৪৩. যে জমি চাষ করে

রায়তের স্বীকৃতি

শান্তিপূর্ণ পথে ভারতীয় সমাজকে যদি যথার্থ অগ্রগতি ঘটাতে হয়, তাহলে ধনিক শ্রেণীকে স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের ও রায়তের আত্মা একই, ধনসম্পদও গরিবের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয় না। জাপানী অভিজাতদের মতোই তারা যেন নিজেদের সন্তানদের তথা রায়তদের মঙ্গলের জন্য, নিজেদেরকে সম্পত্তির নিছক অছিধারী বলে মনে করে। এর পর নিজেদের শ্রমের জন্য তারা অর্থের এক যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ কমিশন হিসেবে নিতে পারে।

বর্তমানে ধনিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ অনাবশ্যক জাঁকজমক ও ব্যয়বহুল জীবনযাপনের সঙ্গে, কদর্য পরিবেশে ও দারিদ্রের পেষণে নিষ্পিষ্ট রায়তদের জীবনের কোনও সামঞ্জস্য নেই....

এখন, একমাত্র এই পুঁজিবাদী শ্রেণী যদি কালের সংকেত ঠিকমতো বুঝে, অভাবনীয় কম সময়ের মধ্যে এই ধারণা সংশোধন করে যে, তাদের যা-কিছু আছে তা ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার, কেবল তাহলেই গ্রাম বলে আজ যে সাত লক্ষ গোবরের স্তূপ রয়েছে, সেগুলি শান্তি, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের আবাসে পরিণত হতে পারবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পুঁজিপতিরা যদি জাপানের সামুরাইদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তবে তারা কিছুই খোয়াবে না, বরং অনেক লাভবান হবে। এখন আমাদের সামনে সম্ভাবনা রয়েছে দুটি: হয় পুঁজিপতিরা স্বেচ্ছায় তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত বাহুল্য বর্জন করবে, পরিণামে সকলের জীবনে সুখ এনে দেবে। নতুবা, সময় থাকতে যদি পুঁজিপতিরা জেগে না ওঠে—জেগেও যদি ঘুমের ভান করে তাহলে ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশকে যে বিপর্যয়ের মধ্যে নিয়ে যাবে, এক শক্তিশালী সরকারের সেনাবাহিনী নিয়োগ করেও তা রোধ করা যাবে না। এই দুটি ছাড়া নান্য পন্থা। আমি আশা করি, ভারত সাফল্যের সঙ্গে এই বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হবে।[৫৪]

আমি যে স্বপ্নের কথা বলছি, ব্যক্তিমালিকদের সম্পত্তি গায়ের জোরে দখল করে তা বাস্তবায়িত করতে চাই না, তবে তারা তাদের ভোগবিলাসের লাগাম টেনে রাখুক এটা অবশ্যই চাই। যাতে সকল নিঃস্বতা ও দারিদ্রজনিত ক্ষোভ দূর হয়। ধনী ও দরিদ্রের জীবন ও পরিবেশের মধ্যে আজ যে ভয়ংকর কুৎসিত বৈষম্য রয়েছে তা এড়ানো যায়। গরিবদের বোঝাতে হবে, যাতে তারা ভাবতে পারে, তারা জমিদারদের সহযোগী, তাদের দাস নয় যে মালিকের মর্জিমাফিক খাটতে হবে, যে-কোনও ছুতোনাতায় সবরকম খেসারত দিতে হবে।[৫৫]

আমি জমিদার ও পুঁজিপতিদের জনগণের সেবার কাজে লাগাতে চাই। পুঁজিপতিদের মুখ চেয়ে আমরা জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারি না। ওদের হাতে আমরা কখনওই খেলব না। জনগণের সেবায় তারা তাদের সম্পত্তি যতটুকু দিতে পারবে ঠিক সেই অনুপাতে আমরা তাদের বিশ্বাস করতে পারি। তারা মহত্তর আবেদনে সাড়া না দিয়ে চুপ করে থাকবে না। ভালো কথা বললে তাদের মাথায় ঢোকে, এটা আমার বরাবরের অভিজ্ঞতা। তাদের আস্থা অর্জন করে আমরা যদি ওদের আশ্বস্ত করতে পারি, তাহলে দেখব, জনগণের সঙ্গে নিজেদের সম্পত্তি ভাগ করে নিতে তাদের আপত্তি থাকবে না।[৫৬]

জমিদারদের হৃদয়-পরিবর্তন

আমি জমিদারদের উৎসাদন চাই না। আবার তাদের টিকিয়ে রাখতেই হবে, তা-ও মনে করি না। ...আমি আশা করি, অহিংস উপায়ে জমিদার ও পুঁজিপতিদের হৃদয়ে পরিবর্তন আনা সম্ভব। অতএব শ্রেণীসংঘর্ষের অনিবার্যতা বলে আমার কাছে কিছু নেই। অহিংসার একটি আবশ্যিক অঙ্গ হল, ন্যূনতম প্রতিরোধের পথে চলা।

চাষীরা যখন নিজেদের ক্ষমতা উপলব্ধি করবে, জমিদারী নামক পাপ তখন দূষণ মুক্ত হবে। চাষীরা যদি বলে যে তাদের, এবং তাদের সন্তানদের, ভদ্রভাবে অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য পর্যাপ্ত মজুরি না দিলে তারা জমিতে কাজ করবে না, তাহলে বেচারা জমিদার কী-ই বা করতে পারে? বাস্তবে, কৃষক যা ফলায় সে তার মালিক। কৃষকরা যদি বুদ্ধিমানর মতো জোট বাঁধে তাহলে তারা একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে উঠবে। এই কারণেই আমি শ্রেণীসংঘাতের প্রয়োজন দেখি না। যদি মনে করতাম তা অবশ্যম্ভাবী, তবে আমি নিজেই তা প্রচার করতাম ও শেখাতাম।[৫৭]

আমি হিটলারের ক্ষমতা চাই না। আমি চাই এক স্বাধীন কৃষকের ক্ষমতা। এত বছর ধরে আমি কৃষকদের সঙ্গে অভিন্ন একাত্মতা স্থাপনের চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু এখনও সফল হতে পারিনি। আজ তার সঙ্গে আমার যে পার্থক্য, তা হল সে অবস্থার চাপে কিষাণ ও শ্রমজীবী, স্বেচ্ছায় নয়,—আর আমি স্বেচ্ছায় কিষাণ ও শ্রমিজীবী হতে চাই। যখন তাকে আমি নিজের ইচ্ছায় চালিত এক কিষাণ ও শ্রমজীবী হিসেবে তৈরি করতে পারব, তখন সে আজকের এই শৃঙ্খলের বন্ধন ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে, মালিকের ইচ্ছায় কাজ করার জোয়াল কাঁধ থেকে নামাতে পারবে।[৫৮]

কিষাণ

কিষাণ বা কৃষকের স্থান সবার আগে—তা সে ভূমিহীন খেতমজুর বা শ্রমজীবী জমিমালিক, যা-ই হোক। সে এই মৃত্তিকার সন্তান। এই মাটি আসলে তার বা তারই হওয়া উচিত। অনুপস্থিত ভূস্বামী, বা জমিদারের নয়। কিন্তু পথ যেখানে অহিংস, সেখানে শ্রমজীবী বলপ্রয়োগ করে অনুপস্থিত ভূস্বামীকে বিতাড়িত করতে পারে না। তাকে এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে ভূস্বামীর পক্ষে তাকে শোষণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

কৃষকদের মধ্যে ঘনিষ্টতম সহযোগিতা থাকা খুবই দরকার। যেখানে নেই, সেখানে বিশেষ সাংগঠনিক সংস্থা বা কমিটি গঠন করতে হবে। যেখানে আছে, সেখানে সেগুলিকে প্রয়োজন বুঝে সংস্কার করে নিতে হবে।

কৃষকরা বেশির ভাগ নিরক্ষর। বয়স্ক ও স্কুলে পড়ার উপযোগী তরুণ, উভয়কেই শিক্ষিত করতে হবে। এটা পুরুষ ও নারী, উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেখান ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা আছে, তাদের মজুরি এমন পর্যায়ে আনতে হবে, যাতে তারা ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে পারে। এর অর্থ মজুরি এমন হওয়া চাই, যাতে সুষম খাদ্য, বাসগৃহ ও পরিধেয়-র ব্যবস্থা হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটে।[৫৯]

অহিংসা, আইন প্রণয়ন নয়

সমগ্র জনগণের প্রচেষ্টায় যদি স্বরাজ অর্জন সম্ভব হয় এবং অবশ্যই অহিংসার পথে, তাহলে কিষাণ তার যোগ্য আসন খুঁজে পাবে, তার কণ্ঠ শোনা হবে সবার আগে। এটা যদি না হয়, সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণ ও সরকারের মধ্যে যদি একটা কার্যকর সমঝোতা হয়, তাহলে কৃষকের স্বার্থের প্রতি সতর্ক নজর রাখতে হবে। আইনপ্রণেতারা যদি কিষাণের স্বার্থরক্ষা করতে না পারে, তাহলে কিষাণের হাতে সবসময়েই নাগরিক আইন অমান্য ও অসহযোগের সার্বভৌম প্রতিষেধক থাকবে।

কিন্তু ....শেষ পর্যন্ত কাগুজে আইন নয়, সাহসী কথাবার্তা নয়, অগ্নি-বর্ষী ভাষণও নয়, বরং অহিংস সংগঠনের ক্ষমতা, শৃঙ্খলা ও আত্মোৎসর্গই অন্যায় বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের রক্ষাপ্রাচীরের ভূমিকা পালন করে।

আমরা যদি গণতান্ত্রিক স্বরাজ অর্জন করি, অহিংসার পথে স্বাধীনতা অর্জিত হলে

সেটা হবেই,—তাহলে এর প্রতিটি পর্যায়ে, রাজনৈতিক ক্ষমতা সমেত, সকল ক্ষমতায় কিষাণের অধিকার থাকবে, এ-নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই।[৬০]

বহুবছর আগে আমি একটি কবিতা পড়েছিলাম, যাতে কৃষককে বিশ্বপিতা বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। ঈশ্বর যদি দাতা হন, তবে কৃষক হচ্ছে তাঁর হাত। তার কাছে আমাদের যে ঋণ, তা শোধ করতে হলে কী করতে হবে? এতদিন তো আমরা তার শ্রমের ফলের ওপরে নির্ভর করে প্রাণধারণ করেছি শুধু।[৬১]

৪৪. শ্রমিক কোন পথ বেছে নেবে

ভারতের সামনে আজ দুটি পথ খোলা। হয় তাকে "জোর যার মুলুক তার"—এই পশ্চিমী নীতি প্রবর্তন করতে হবে, নতুবা প্রয়োগ করতে হবে প্রাচ্যের এই নীতি একমাত্র সত্যই জয়ী হয়, সত্য কোনও বিপত্তি ঘটায় না, এবং ন্যাবিচারে সবল ও দুর্বল, উভয়য়েরই সমান অধিকার।

পথ নির্বাচনের এই ব্যাপারটি শ্রমজীবী শ্রেণীকে দিয়েই শুরু হোক। হিংসার সাহায্যে মজুরি বাড়ানো যদি সম্ভব হয়ও, তবু কি শ্রমজীবীর তা করা উচিত? তাদের দাবি যত যুক্তিসঙ্গতই হোক, হিংসার পথে তারা যেতে পারে না।

মনে হতে পারে, অধিকার অর্জনের জন্য হিংসাই সহজ পথ। কিন্তু পরে দেখা যায় পথটি কণ্টকাকীর্ণ। যারা তরবারির সাহায্যে বাঁচে, তারা তববারির দ্বারাই নিহত হয়। অনেকসময় সাঁতারুকেও ডুবে মরতে হয়। ইউরোপের দিকে তাকাও। সেখানে কেউ-ই যেন সুখী নয়, কেন না কেউ-ই সন্তুষ্ট নয়। শ্রমিক পুঁজিপতিকে বিশ্বাস করে না, আর পুঁজিপতিরও শ্রমিকের ওপরে কোনও আস্থা নেই। দু'পক্ষেরই শক্তিসামর্থ্য আছে, কিন্তু সে তো বলীবর্দেরও থাকে। তারা শেষ পর্যন্ত লড়েই চলে, লড়েই চলে।

গতি মানেই অগ্রগতি নয়। ইউরোপের জনগণ প্রগতি অর্জন করছে, এ-কথা বিশ্বাস করারও কোনও কারণ আমাদের নেই। তাদের সম্পদ দখলের মধ্যে নৈতিক বা আত্মিক গুণাবলী অধিকার করার কোনও তাগিদ নেই। রাজা দুর্যোধন অপরিমিত সম্পদের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বিদুর ও সুদামার তুলনায় তিনি ছিলেন নিতান্তই অকিঞ্চন। আজ বিদুর ও সুদামা সর্বজনশ্রদ্ধেয়, আর, কতকগুলি বর্জনীয় পাপাচার প্রসঙ্গে প্রবাদ-বাক্য হিসেবে স্মরণ করা হয় দুর্যোধনের নাম....

শ্রমিকের ক্ষমতা

পুঁজি ও শ্রমিকের সংগ্রামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুঁজিপতিরাই অন্যায় ক'রে থাকে, সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু শ্রমিক যখন নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত, তখন, সে যে পুঁজির চেয়েও অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারে আমি তা জানি। শ্রমিকদের যদি

মিলমালিকদের মতো বুদ্ধি থাকত, তাহলে শ্রমিকদের শর্তে মিলমালিক কাজ করতে বাধ্য হতো। স্পষ্টতই, শ্রমিক কখনওই সেই বুদ্ধির অধিকারী হবে না। যদি হয়, তবে শ্রমিক আর শ্রমিক থাকবে না। নিজেই সে তখন প্রভু হয়ে উঠবে। পুঁজিপতিরা শুধু টাকার জোরেই লড়ে না। তাদের বুদ্ধি ও কৌশল আছে....

এই দুই দলের মধ্যে এক তৃতীয় দল গজিয়েছে। এরা হল শ্রমিক-বন্ধু। এমন একটি দলের দরকার আছে। শ্রমিকদের প্রতি এদের বন্ধুত্ব কতটা নিঃস্বার্থ, সেই অনুপাতে শ্রমিকদের উচিত এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা।

এমন একটা সময় এসেছে যখন দাবার ঘুঁটির মতো নানাভাবে শ্রমিকদের ব্যবহার করার চেষ্টা হবে।

যারা রাজনীতি করবে, এই বিষয়টি নিয়ে তাদের এখন ভাবনাচিন্তা করতে হবে। তারা কোন পথ বেছে নেবে? নিজের কোলে ঝোল টানবে, না, শ্রমিক ও জাতির সেবা করবে? শ্রমিকদের আজ বন্ধুর খুব প্রয়োজন। নেতৃত্ব ছাড়া তারা এগোতে পারবে না। কারা এই নেতৃত্ব দেবে তার ওপরে নির্ভর করবে শ্রমিকদের ভালো-মন্দ।

ধর্মঘট, কর্মবিরতি ও হরতাল খুবই উত্তম তাতে সন্দেহ নেই। তবে এগুলির অপব্যবহাব করা খুবই সহজ। শ্রমিকদের অবশ্যই শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়নে সংগঠিত হতে হবে, এবং কোনওমতেই ইউনিয়নের সম্মতি ছাড়া তারা ধর্মঘট করতে পারবে না।

মিলমালিকদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে ধর্মঘটের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। মিলমালিক যদি মধ্যস্থতার পথ নেয়, তাহলে পঞ্চায়েতের নীতি গ্রহণ করা উচিত। এবং পঞ্চজন নিযুক্ত হবার পরে তাদের সিদ্ধান্ত ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক, উভয়পক্ষকেই মেনে চলতে হবে।[৬২]

৯. সর্বোদয়

৪৫. সর্বোদয় সুসমাচার

মানব ঐক্য

....একজন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতা অর্জন করবে আর তার চারপাশে সবাই দুঃখকষ্টে পড়ে থাকবে...আমি বিশ্বাস করি না। আমি অদ্বৈতে বিশ্বাসী। মানুষের ঐকান্তিক ঐক্যে বিশ্বাসী। যা-কিছু প্রাণবন্ত তারই ঐক্যে বিশ্বাসী। তাই আমি বিশ্বাস করি, একজন মানুষও যদি আত্মিক দিক দিয়ে লাভবান হয়, তার সঙ্গে সারা বিশ্বই লাভবান হয়। একজনও যদি বিফল হয়, বিশ্বও তদনুপাতে পিছিয়ে পড়ে।[১]

আত্মিক আইন শুধু তার নিজস্ব ক্ষেত্রেই কার্যকর—এ আমি মানি না। বরং জীবনের সাধারণ কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশলাভ করে। এইভাবে আত্মিক আইন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে।[২]

আমাদের যদি তাঁর সেবা করতে হয় এবং তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে হয়, তাহলে কাজের ক্ষত্রেও আমাদের তাঁরই মতো অক্লান্ত হতে হবে। সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন জলের বিন্দু তিলেক বিশ্রাম নিতে পারে, কিন্তু সেই বিন্দু যখন সমুদ্রে থাকে, তখন সে বিশ্রাম কাকে বলে জানে না। এই একই কথা আমাদের বেলাতেও খাটে।

ঈশ্বররূপী সাগরের সঙ্গে আমরা যখন মিশে যাব, তখন আমাদের আর বিশ্রাম থাকবে না, বিশ্রামের প্রয়োজনও থাকবে না। তখন আমাদের নিদ্রাও একরকম সক্রিয়তা। কারণ ঈশ্বরচিন্তা হৃদয়ে নিয়েই আমরা ঘুমোব। এই অস্থিরতাই হল প্রকৃত বিশ্রাম। এই নিরবচ্ছিন্ন আলোড়নই হল অনির্বচনীয় শান্তির চাবিকাঠি। নিঃশেষ সমর্পণের এই তূরীয় অবস্থার বর্ণন কঠিন, তবে তা মানুষী অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। বহু সমর্পিত প্রাণ এটা অর্জন করেছেন। হয়তো আমরাও পারব।[৩]

দরিদ্রের সঙ্গে একাত্মতা

গরিব যে শ্রম করে, ধরা যাক দিনে এক ঘন্টা, আমাদের সকলেরই সেটা করা উচিত। এইভাবে তাদের সঙ্গে, এর মাধ্যমে মানবজাতির সঙ্গে আমরা একাত্মতা স্থাপন করতে পারি। এর চেয়ে মহত্তর, বা অধিক জাতীয়তাবাদী কিছু আমি ভাবতে পারি না। এর

চেয়ে ভালো ঈশ্বরোপাসনাও আমি কল্পনা করতে পারি না। তাঁর নামে, গরিবদের জন্যে আমাকে গরিবদের মতো শ্রমই করতে হবে।[৪]

একমাত্র প্রাপণীয় যথার্থ স্বাধীনতার জন্য ঈশ্বর যে মূল্য চান তা আত্ম-সমর্পণ—তার চেয়ে কম কিছু নয়। এইভাবে মানুষ যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তৎক্ষণাৎ সে দেখে, সে ঈশ্বরের সৃষ্টির সেবা করছে।[৫]

আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত সত্য। সত্য হবে আমাদের জীবনের প্রাণবায়ু। তীর্থযাত্রী যখন এই পর্যায়ে এসে পৌঁছয়, তখন যথার্থ জীবনধারণের অপরাপর নিয়ম অনায়াসে আয়ত্ত হয় এবং এগুলি মেনে চলার ব্যাপারটি সহজভাবেই আসে। কিন্তু সত্য বাদ দিয়ে জীবনে কোনও নীতি বা নিয়ম মেনে চলা সম্ভব নয়।[৬]

ঈশ্বর-কৃপায় আস্থা

যে সত্যের সন্ধান করে, প্রেমের নিয়মের অনুগমন করে, সে কখনও আগামীকালের কথা চিন্তা করে না। ঈশ্বর আগামীকালের কথা ভাবেন না। দৈনন্দিন ন্যূনতম প্রয়োজনের বেশি তিনি সৃষ্টি করেন না। আমরা যদি তাঁর কৃপায় আস্থা রাখি, তাহলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে তিনি আমাদের প্রতিদিনের আহার জোগাবেন। যা দরকার, অকৃপণ হাতে তা দেবেন।[৭]

মানব-সেবা

ঈশ্বরোপলব্ধি মানুষের পরম অভীষ্ট। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়—তার সকল কর্মই ঈশ্বর-দর্শনের ওই পরম লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সকল মানুষের সেবায় আশু যোগদান এই প্রচেষ্টার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কারণ, ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁকে দর্শন করা। তার সঙ্গে অভিন্নতা স্থাপন করা। আমি সেই সমগ্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানবজাতির বাকি অংশের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও তাঁকে আমি খুঁজে পাব না।

আমাদের দেশবাসীই আমার নিকটতম প্রতিবেশী। তারা এত অসহায়, দরিদ্র ও নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছে যে, তাদের সেবায় আমাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। যদি নিজেকে বোঝাতে পারতাম যে হিমালয়ের কোনও গুহায় আমি তাঁর দর্শন পাব, তাহলে তৎক্ষণাৎ চলে যেতাম সেখানে। কিন্তু আমি জানি, মানবসমাজের বাইরে আর কোথাও তাঁকে খুঁজে পাব না।[৮]

আমার ঈশ্বর অযুতরূপে বিরাজমান। কখনও চরকার মধ্যে, কখনও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই। আবার কখনও বা দেখি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজে। আত্মা যে-ভাবে আমাকে চালিত করে, সে-ভাবেই তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই।[৯]

চরকা এক উপায়

গরিবদের কাছে গিয়ে যে চরকায় কাটে, তাদেরও এতে যোগ দিতে বলে, তার মতো

ঈশ্বরসেবা কেউ করে না। ভাগবদ্গীতায় ঈশ্বর বলেছেন, "ভক্তিভরে যে আমাকে সামান্য ফল বা ফুল, কি একটি পাতাও দেয়, সে-ই আমার সেবক।"

সবার পিছে, সবার নিচে, সব হারাদের মাঝেই তো তিনি আছেন। চরকা কাটা তাই মহত্তম উপাসনা, মহত্তম পূজা, মহত্তম নিবেদন।[১০]

যুদ্ধের পরিণতি দেখে পৃথিবী অবসন্ন হয়ে পড়েছে। চরকা আজ ভারতকে সহায়তা দিচ্ছে, কাল হয়তো দেবে বিশ্বকে, কারণ এ-তো শুধু বৃহত্তম জনসংখ্যার মহত্তম কল্যাণের জন্য নয়, চরকা সকলের সর্বোত্তম মঙ্গলসাধনের জন্য।[১১]

'আনটু দিস লাস্ট' (শেষ অবধি)—এই বাক্যে যা বোঝানো হয়েছে, আমি তা সমর্থন করি। এই বইটিই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়েছিল। পৃথিবীর প্রতি আমাদের যা কর্তব্য বলে আমরা মনে করি,—তাই আমাদের শেষ পর্যন্ত করে যেতে হবে। সকলের সমান সুযোগ থাকা উচিত। সুযোগ পেলে প্রতিটি মানুষেরই আত্মিক বিকাসের সমান সম্ভাবনা রয়েছে। চরকা হল তারই প্রতীক।[১২]

আত্মশুদ্ধি

যা-কিছু প্রাণময় তার সঙ্গে একাত্মতাবোধ আত্মশুদ্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। আত্মশুদ্ধি না হলে অহিংসার নিয়ম মেনে চলা এক অলীক স্বপ্ন। যার হৃদয় শুদ্ধ নয় সে কখনও ঈশ্বরোপলব্ধি করতে পারে না। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুদ্ধিকরণের অর্থ আত্মশুদ্ধি। এবং শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াটি অতীব সংক্রামক বলে একজন শুদ্ধ হলে সে তার পারিপার্শ্বিককেও শুদ্ধ করে তোলে।

কিন্তু শুদ্ধিকরণের পথটি যেমন কঠিন, তেমনি দুরাবোহ। সম্পূর্ণ শুদ্ধতা অর্জনের জন্য 'কায়েনমনসাবাচা' সম্পূর্ণ ভাবাবেগমুক্ত হতে হয়। প্রেম ও ঘৃণা, আসক্তি ও অনাসক্তির, বিপরীতমুখী প্রবাহের ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। আমি জানি, আমার নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওই ত্রিশুদ্ধি আমার হয়নি। তাই বিশ্বের প্রশস্তি আমাকে মোহিত করে না। বরং প্রায়ই তা আমার বিবেককে দংশন করে।

অস্ত্রের জোরে দুনিয়া দখল করার চেয়ে সূক্ষ্ম ভাবাবেগ জয় করার কাজ অনেক কঠিন। সুপ্ত আবেগ যে আমার মধ্যেও লুকিয়ে আছে, তা আমি জানি। জেনে আমি অবমানিত বোধ করেছি, যদিও নিজেকে পরাজিত মনে করিনি। এই অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা আমাকে ভরসা জুগিয়েছে। গভীর আনন্দ দিয়েছে। তবে জানি, এখনও আমার সামনে কঠিন পথ পড়ে রয়েছে। নিজেকে অহং-শূন্যে পরিণত করতে হবে। মানুষ যতক্ষণ না নিজেকে, সবার পিছে, সবার নিচে নিয়ে যেতে পারছে, তার মুক্তি নেই। বিনম্রতার চূড়ান্ত সীমা অহিংসা।[১৩]

লক্ষ্য ও উপায়

আমার জীবনদর্শনে, উপায় ও লক্ষ্যের সংজ্ঞা পরিবর্তনীয়।[১৪]

উপায়কে বীজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লক্ষ্য হল গাছ। উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে সেই একই অলঙ্ঘনীয় সম্পর্ক রয়েছে, যা বীজ ও গাছের মধ্যে বর্তমান।[১৫]

কোনও ব্যবধান নেই

লোকে বলে "উপায়, উপায়মাত্র"। আমি বলি "উপায়ই সব।" পন্থা যেমন, গন্তব্যও তেমনই...উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে কোনও ব্যবধানের পাঁচিল নেই। সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্যের ওপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেননি, দিয়েছেন উপায়ের ওপর (সেও খুব সীমাবদ্ধ)। উপায় যে-রকম, লক্ষ্যও সেই অনুপাতে সাধিত হবে। এক্ষত্রে কোনও ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই।[১৬]

সবকিছুর জন্যই তিনি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমরা শুধুমাত্র চেষ্টা করতে পারি। ইচ্ছামত ফললাভ করতে পারি না। নিজের বিষয়ে শুধু বলতে পারি, আমার ওপরে ন্যস্ত কর্তব্যসাধনের চেষ্টা সর্বতোভাবে করেছি, এ-টুকুই যা পরম তৃপ্তি।[১৭]

অধিকার ও কর্তব্য

অধিকারের প্রকৃত উৎস কর্তব্য। আমরা যদি কর্তব্য সম্পন্ন করি, তাহলে দূরে গিয়ে অধিকার খুঁজতে হবে না। কর্তব্য না করেই যদি অধিকারের পেছনে ছুটি, তবে তা আলেয়ার মতোই অধরা থেকে যাবে। যত ধরতে যাব, ততই দূরে সরে যাবে। কৃষ্ণের অমর উক্তি—"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন", [কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নেই।]—আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। কর্মই হল কর্তব্য, ফল হচ্ছে অধিকার।[১৮]

আপন কর্তব্য যে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে, অধিকার তার ওপরে আপনা থেকেই বর্তায়। সত্যি বলতে কি, নিজের কর্তব্য করার অধিকারই হল একমাত্র অধিকার, যার জন্য জীবনধারণ এবং যার জন্য মৃত্যুবরণ করা যায়। এই অধিকাবেব মধ্যেই রয়েছে অন্য সব বৈধ অধিকার। বাকি সবকিছু, নানা ছদ্মবেশে যেনতেন প্রকাবেন ছিনিয়ে নেবার ব্যাপার, যার মধ্যে থাকে হিংসার বীজ।

পুঁজিপতি ও জমিদার তাদের অধিকারের কথা বলে, অন্যদিকে শ্রমিক বলে তার অধিকারের কথা। রাজপুত্র বলে তার শাসন করার দৈব অধিকারের কথা, রায়ত বলে ওই শাসন প্রতিরোধ করার অধিকার তার আছে। সকলেই যদি কর্তব্যের কথা না বলে, শুধুই অধিকারের কথা বলে, তাহলে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ও অরাজকতা দেখা দেবে।[১৯]

বরং, অধিকার নিয়ে জোরাজোরি না করে সকলেই যদি তার কর্তব্য করে, তাহলে অচিরেই মানবজাতির মধ্যে শৃঙ্খলার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হবে...আমি আরও বলব,—যে অধিকার সু-সম্পাদিত কর্তব্য থেকে সরাসরি উপজাত নয়, তা ভোগ করার অযোগ্য। সে শুধু অন্যায়ভাবে দখল করা। যত তাড়াতাড়ি একে বর্জন করা যাবে, ততই মঙ্গল। যে কর্তব্যভ্রষ্ট পিতামাতা প্রথমে সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন না ক'বে, পরে তাদের কাছে বাধ্যতা আশা করে, তারা নিছক ঘৃণার পাত্র।

কোনও লম্পট স্বামী যদি তার কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রীর কাছে প্রতি পদে বশ্যতা আশা করে, তাহলে ধর্মীয় অনুশাসন বিকৃত করা হয়। কিন্তু সন্তানদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে নিয়ত প্রস্তুত যে পিতামাতা, তাদের সন্তান যদি বাপ-মার অবাধ্য হয়, তাহলে তারা

অকৃতজ্ঞ বলে পরিগণিত হবে। পিতামাতার চেয়ে নিজেদের ক্ষতি করবে বেশি। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

এই সহজ ও বিশ্বজনীন নিয়মটি যদি মালিক ও শ্রমিক, জমিদার ও রায়ত, রাজন্যবর্গ ও তাদের প্রজা, অথবা হিন্দু ও মুসলিম, সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, দেখবে, ভারত ও বিশ্বের অন্যত্র, জীবন ও কার্যক্ষেত্রে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে, তা কিছুই ঘটবে না। জীবনের সকলক্ষেত্রেই সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে। যাকে আমি সত্যাগ্রহের আইন বলি, তা হল কর্তব্যের তাৎপর্য এবং তৎসঞ্জাত সকল অধিকার হৃদয়ঙ্গম করা।[২০]

৪৬. যজ্ঞের দর্শন

যজ্ঞের অর্থ

অন্যের হিতের জন্য যে ক্রিয়া, তাকেই যজ্ঞ বলে। যার প্রতিদানে, বৈষয়িক বা আধ্যাত্মিক কোনও কিছু কামনা করতে নেই। "ক্রিয়া"কে ধরতে হবে চিন্তা, বাক্ ও কর্ম-সহ এক ব্যাপকতম অর্থে। "অন্যের"—বলতে বুঝতে হবে মানবজাতি সহ সকল প্রাণী....

তাছাড়া, প্রাথমিক উৎসর্গ হবে এমন এক ক্রিয়া, যা ব্যাপকতম এলাকায় সর্বাধিক সংখ্যক মানুষেব কল্যাণে সহায়ক হবে। যে কাজ ন্যূনতম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই বৃহত্তম সংখ্যার নারী ও পুরুষের সাধ্যায়ত্ত। তথাকথিত কোনও উচ্চতর স্বার্থের জন্যও কারও অমঙ্গল বা অমঙ্গলের চিন্তা করা যজ্ঞ নয়, মহাযজ্ঞ তো কখনওই নয়। যে-সকল কর্ম যজ্ঞের আওতায় পড়ে না, তা দাসত্বের বন্ধনকেই দৃঢ়তর করে—এটা যেমন 'গীতা'র শিক্ষা তেমনই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য।

এই অর্থে, যজ্ঞ বাদ দিয়ে জগৎ এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। তাই 'গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথার্থ প্রজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে কী পন্থায় তা আয়ত্ত করত হবে, এবং সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে: 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা', (সৃষ্টির প্রথমেই যজ্ঞসহ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।) তাই এ-দেহ আমাদের দেওয়া হয়েছে শুধু সমগ্র সৃষ্টির সেবা করার জন্য। তাই 'গীতা' বলেছেন, যজ্ঞ না করে যে অন্ন ভোগ করে, সে চুরি করা খাদ্য খায়। যে শুদ্ধতার জীবনযাপন করে, তার প্রতিটি কর্মই হবে যজ্ঞধর্মী।

জন্মলগ্ন থেকেই যজ্ঞ আমাদের সঙ্গী। তাই আজীবন আমরা ঋণী এবং সমগ্র জগতের সেবা করার জন্য চিরন্তন দায়বদ্ধ। ক্রীতদাস যেমন তার প্রভুর কাছে অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি পায়, তেমনই বিশ্বপিতার অনুরূপ দানও আমাদের কৃতজ্ঞতচিত্তে গ্রহণ করা উচিত। যা-কিছু আমরা পাই, তাকে দান বলেই মনে করতে হবে, কেননা অধমর্ণ হিসেবে দায়িত্বপালনে আমাদের কোনওরকম শিথিলতাই বরদাস্ত করা হবে না। তাই এই দান না পেলে

আমরা যেন বিশ্বপিতাকে দোষ না দিই। আমাদের এই দেহ তাঁর। একে তিনি পালন করবেন, না, ভাসিয়ে দেবেন, সে তাঁর মর্জি।

এ-কোনও অনুযোগ বা এমনকি অনুকম্পার ব্যাপার নয়। বরং বিপরীত। বিশ্বপিতার রাজ্যে আমরা যদি আমাদের যথার্থ স্থানটি পেতে চাই, তাহলে ওটাই হল সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং মনোরম ও বাঞ্ছিত অবস্থা। বাস্তবিক, বিশ্বাসে আমরা যদি দৃঢ় হতে পারি তাহলেই এই পরম আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হবে। "নিজেকে নিয়ে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা কোর না। সব দুশ্চিন্তা ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দাও"—সর্ব ধর্মেই-এ কথা বলা হয়েছে।

এতে কারও শঙ্কিত হবার দরকার নেই। সুনির্মল বিবেক নিয়ে যে সেবাকার্যে নিজেকে নিবেদন করে, সে প্রতিদিন এর প্রয়োজন আরও বেশি অনুভব করে। তার বিশ্বাসও প্রতিনিয়ত দৃঢ়তর হয়। যে নিজের স্বার্থ ত্যাগ ক'রে জন্মকালীন শর্তাবলীকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়, সে কখনও সেবার পথ অতিবাহন করতে পারে না। আমরা প্রত্যেকেই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেবার কাজ করে থাকি, তা যে-ভাবে বা যে-ধরনেরই হোক-না-কেন। স্বেচ্ছায় এই সেবাপরায়ণতার অভ্যাস রপ্ত করলে আমাদের সেবার অভীপ্সা ক্রমশ শক্তিশালী হবে। ফলে শুধু আমাদেরই নয়, সমগ্র জগতের সুখের সরণি সুগম হবে।[২১]

ব্যবহারিক যজ্ঞ

দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার করণীয় কর্ম হল যজ্ঞ বা সেবা। ....বাসনামুক্ত হয়ে সেবা করা, অন্যদের অনুগ্রহ করা নয়, নিজেদেরই অনুগৃহীত কবা। ঠিক যেমন, ঋণ শোধ করে নিজেদেরই সেবা করি, বোঝা হালকা করি ও কর্তব্য সম্পন্ন কবি। যারা উত্তম শুধু তারাই নয়, আমবা সকলেই নিজেদের সকল সম্পদ মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত করতে দায়বদ্ধ। নিয়ম যদি এটাই হয়—সন্দেহ নেই এটাই নিয়ম—তাহলে জীবনে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কোনও স্থান নেই। আছে ত্যাগের। ত্যাগের কর্তব্যই মানবজাতিকে পশুজগৎ থেকে আলাদা করেছে....

কিন্তু এখানে ত্যাগ বলতে জগৎ-সংসাব ছেড়ে বনবাসী হওয়া নয়। ত্যাগের মনোভাব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। গৃহস্থ যদি জীবনকে ইন্দ্রিয়সেবার পরিবর্তে কর্তব্য বলে গ্রহণ করে তাহলে সে গৃহস্থই থেকে যায়। নিবেদনের মনোভাব নিয়ে যে ব্যবসায়ী কাজ করে তার হাত দিয়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হলেও, সে যদি ওই নিয়ম মেনে চলে, তাহলে বুঝতে হবে, নিজের কর্মক্ষমতাকে সে সেবায় নিয়োজিত করেছে। তখন সে কাউকে ঠকাবে না। ফাটকাবাজী করবে না। অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে। কোনও জীবাত্মাকে আঘাত করবে না। লক্ষ টাকা খেসারত দেবে তবু কারও ক্ষতি করবে না।

এই ধরনের ব্যবসায়ী কেবল আমার কল্পনাতেই বাস করে, এ-কথা যেন কেউ না ভাবে। বিশ্বের সৌভাগ্য বলতে হবে, এ-রকম ব্যবসায়ী প্রাচ্য-পাশ্চাত্য—দু'জায়গাতেই

আছে। তবে, এদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়, এ-কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু এমন ব্যবসায়ী বাস্তবে যদি একজনও দেখা যায়, তাহলে ব্যাপারটি আর কল্পলোকের ব্যাপার থাকে না। ...বিষয়টি আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি, তাহলে জীবনের সর্বস্তরেই এমন মানুষের দেখা আমরা পাব যারা পরার্থে নিবেদিত জীবন যাপন করে। এই নিবেদিত প্রাণ মানুষরাও, নিঃসন্দেহে কর্মের দ্বারাই তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই জীবিকা তাদের লক্ষ্য নয়, কর্মের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র....

উৎসর্গীকৃত জীবন শিল্পের শিখরস্পর্শী রূপ এবং পরম আনন্দময়। যজ্ঞ যদি গুরুভার বা বিরক্তিকর মনে হয়, তখন তা আর যজ্ঞ থাকে না। নিজের ইন্দ্রিয়সেবা আনে ধ্বংস এবং ত্যাগের পরিণতি অমরত্বে। আনন্দের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এটা নির্ভর করে জীবন সম্বন্ধে আমাদের মনোভঙ্গির ওপর। কারও কাছে হয়তো নাটকের চিত্রিত দৃশ্যপট প্রিয়। কেউ ভালবাসে আকাশের স্বরচিত নিত্যনতুন দৃশ্যের আলপনা। তাই, আনন্দ হল ব্যক্তিগত ও জাতীয় শিক্ষার ব্যাপার। শিশুকালে যাতে আমাদের আনন্দ পেতে শেখানো হয়েছে, তাতেই আমরা আনন্দ পাই। বিভিন্ন জাতীয় রুচির ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ সহজেই হাজির করা যায়....

স্বেচ্ছা-সেবা

যে সেবক, নিজের আরামের কথা সে অযথা ভাববে না। এটা থাকা-না-থাকার ব্যাপারটা সে ছেড়ে দেবে পরম পিতার হাতে। তাই জীবনের পথে যা কিছুই আসে, তাই দিয়ে সে নিজেকে ভারাক্রান্ত করবে না। যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকুই সে নেবে, বাকিটা বাদ দেবে। অসুবিধার মধ্যে পড়লেও সে মনকে শান্ত, ক্রোধমুক্ত ও অচঞ্চল রাখবে। সেবকের গুণাবলীর মতো, তার সেবাই তার সেবাকার্যের পুরস্কার। তাই নিয়েই সে তৃপ্ত থাকবে।

আবার, সেবার ব্যাপারে কেউ যেন অবহেলা করার বা পিছিয়ে পড়ার কথা মনেও ঠাঁই না দেয়। যে মনে করে, শুধু তার নিজের কাজটুকুই যত্ন করে করতে হয়, আর যে-কাজে পয়সা মেলে না, সেই জনসেবার কাজ হেলাফেলায়, তার ইচ্ছেমত যে-কোনও সময়ে করা চলে, ত্যাগের বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠটুকু নেওয়াই তার বাকি রয়ে গেছে। অপরের জন্য স্বেচ্ছা-সেবার কাজে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত, নিজের কাজের চাইতেও এ-কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বস্তুত, একনিষ্ঠ সেবক নিজের কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করেই মানবজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে।[২২]

৪৭. শয়তানের সভ্যতা

আজকের ইউরোপ ঈশ্বর বা খ্রীস্টান ধর্ম, কোনওটিরই প্রতিভূ নয়,—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে শয়তানের প্রতিনিধি। আর শয়তানের সাফল্য তো তখনই সবচেয়ে বেশি

হয় যখন সে ঈশ্বরের নাম মুখে নিয়ে আসে। ইউরোপ আজ নামেই খ্রীস্টান। আসলে সে কুবেরের উপাসক।[২৩]

রেলপথ বা হাসপাতাল ধ্বংস আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এগুলি ধ্বংস হলে আমি স্বাগত জানাব। না রেলপথ, না হাসপাতাল,—কোনওটিই উচ্চতর ও বিশুদ্ধ সভ্যতার পরিচায়ক নয়। বড়জোর তারা অপরিহার্য পাপ-মাত্র। এর কোনওটি থেকেই কোনও জাতির এক তিল নৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না।

আইন-আদালত চিরতরে ধ্বংস করাও আমার কাম্য নয়, যতই আমি মনেপ্রাণে তাদের বিনাশ চাই-না-কেন। পাইকারি হারে যন্ত্র ও মিল ধ্বংসের চেষ্টাও আমি করছি না। এ-কাজ করতে গেলে যে অনাবিল অকপটতা ও ত্যাগের প্রয়োজন, জনগণ এখনও তার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি।[২৪]

আত্মার মহিমা

আমি শ্রীবৃদ্ধি চাই। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ চাই। আমি স্বাধীনতা চাই। কিন্তু এ-সবই চাই আত্মার জন্য। প্রস্তরযুগের পরে লৌহযুগ কোনও অগ্রগতি কি-না, এ-নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। কারণ, আসল কথা হল, আত্মার বিকাশ। তারই উদ্দেশে আমাদের সকল মেধা ও কর্মনৈপুণ্য সমর্পণ করতে হবে।[২৫]

ভারতের পথ

আমি চাই, নেতারা আমাদের নৈতিক দিক দিয়ে বিশ্ববরেণ্য হতে শেখাক। শুনেছি, আমাদের এই দেশে নাকি একদা দেবতারা বাস করতেন। কিন্তু অমরগণের বাসভূমিরূপে এমন একটি দেশকে মেনে দেওয়া কঠিন, যে-দেশকে মিলের চিমনি ও কলকারখানার ধোঁয়া ও কোলাহল কদর্য করে তুলেছে, যার পথে পথে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে এঞ্জিন, টেনে নিয়ে চলেছে অসংখ্য গাড়ি, গাড়ি বোঝাই যাত্রী, যাদের বেশির ভাগ জানে না তারা কী চায়, প্রায়শ যারা অন্যমনস্ক, টিনভর্তি মাছের মতো বাক্সবন্দী হয়ে থাকার অস্বাচ্ছন্দ্যে যাদের মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে, কামরায় উঠে একেবারে অপরিচিতদের হাবভাব দেখে মনে করে, ওরা বুঝি নবাগতদের গলাধাক্কা দিয়ে বাইরে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য মুখিয়ে আছে, আর এরাও ভাবে ওদের বাইরে বের করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। বৈষয়িক প্রগতির প্রতীক হিসেবে এগুলির গুণগান করা হয় বলেই আমি এত-সব কথা বললাম। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের সুখের সঞ্চয় এত তিলও বাড়ে না।[২৬]

আধুনিক সভ্যতা

আগে, যখন একজন আর একজনের সঙ্গে হাতহাতি লড়াই করতে চাইত, তারা পরস্পরের দৈহিক শক্তি মেপে নিত। আজ, পাহাড়ের ওপরে একটা বন্দুক নিয়ে বসে যে-কেউ হাজারটি প্রাণ কেড়ে নিতে পারে—এই হল সভ্যতা। আগে মানুষ ইচ্ছেমত ফাঁকা জায়গায় কাজ করত। আজ, হাজার হাজার শ্রমিককে একসঙ্গে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কারখানা

বা খনিতে কাজ করতে হয়। তাদের হাল পশুরও অধম। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপজ্জনক সব বৃত্তিতে তাদের কাজ করতে হয় ধনকুবেরদের জন্য....এই সভ্যতা এমনই, যে আপনা থেকেই এ ধ্বংস হয়ে যাবে,—শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।[২৭]

দ্রুতগতি রেল এঞ্জিনের আগমনে বিশ্বের অবস্থা কি উন্নত হয়েছে? এই যন্ত্র কীভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতির সহায়ক হয়েছে? শেষ পর্যন্ত এ-সব কি প্রগতিরই প্রতিবন্ধক নয়? মানুষের উচ্চাশার কী কোনও সীমা আছে? ঘণ্টায় কয়েক মাইল যেতে পারলেই একসময়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম। আজ ঘণ্টায় শত শত মাইল পাড়ি দিতে চাই। একদিন আমাদের মহাকাশে ওঠার ইচ্ছাও হবে। ফল কী দাঁড়াবে? মহাবিশৃঙ্খলা।[২৮]

স্থানের দূরত্ব ও সময়ের সীমাকে বিনাশ করার, জান্তব ক্ষুধা-বৃদ্ধি করার ও তা নিবারণের জন্য বিশ্বের কোণে কোণে গিয়ে হানা দেবার এই উন্মত্ত বাসনাকে আমি সর্বতোভাবে ঘৃণা করি। আধুনিক সভ্যতা যদি এই হয়, আমি যদি একে ঠিক চিনে থাকি, তবে বলব, এ এক শয়তানের সভ্যতা...[২৯]

শিল্পায়নের পরিণাম

এই শিল্পোন্নত সভ্যতা একটি ব্যাধি, কারণ তা সর্বাংশে পাপে পরিপূর্ণ। চটকদার বাক্যজালে আমরা যেন ঠকে না যাই। বাষ্পচালিত জাহাজ বা তাড়িতবার্তা সম্বন্ধে আমার কোনও আপত্তি নেই। শ্রমশিল্পবাদ বলতে যা-কিছু বোঝায় তার সাহায্য ছাড়া এগুলি টিকে থাকতে পারলে থাকুক। এগুলিই শেষ কথা নয়। বাষ্পীয় জাহাজ ও টেলিগ্রাফের জন্য শোষণ সহ্য কবা আমাদের উচিত নয়। মানবজাতির চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্য এগুলি কোনওভাবেই অপরিহার্য নয়। বাষ্প ও বিদ্যুতের ব্যবহার আমরা শিখেছি। তাই শিল্পায়ন এড়িয়ে চলতে শেখার পর, ওগুলিকে যথাসময়ে যথাযোগ্য কারণে ব্যবহার করতে পারা আমাদের উচিত।

আমাদের কাজ, যে-কোনও মূল্যে শ্রমশিল্পবাদকে ধ্বংস কবা।[৩০]

আজ যারা উন্মত্তের মতো নিজেদের চাহিদা বাড়িয়ে চলেছে, ভ্রান্ত ধারণার বশে ভাবছে যে তারাই বিশ্বের প্রকৃত সম্পদ ও জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, একটা সময় আসছে, যখন তারাই একদিন পেছিয়ে এসে বলবে, "এ আমরা কী করেছি?"

একের পর এক সভ্যতা এসেছে ও গেছে। আমাদের এই সদম্ভ প্রগতি সত্ত্বেও বারংবার আমার জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয়, "কী লাভ হল এতে?" ডারউইনের সমসাময়িক ওয়ালেসও এই একই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পঞ্চাশ বছরব্যাপী অনবদ্য সব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার মানবজাতির নৈতিক উচ্চতা এক ইঞ্চিও বাড়াতে পারেনি। তলস্তয় নামধারী এক স্বপ্নচারী এবং দ্রষ্টাও এই একই কথা বলেছিলেন। একই উক্তি করেছিলেন, যীশু, বুদ্ধ ও মহম্মদ,—যাঁদের ধর্ম আজ আমার নিজের দেশে উপেক্ষিত হচ্ছে, বিকৃত রূপ নিচ্ছে।

ঈশ্বর ও কুবের

পর্বতে প্রদত্ত উপদেশে তোমাকে যে প্রস্রবণ দেওয়া হয়েছে, অবশ্যই তার জল আকণ্ঠ পান ক'রো। কিন্তু তখন, তোমাকে "শোক ও অনুতাপের পরিচ্ছদ" পরতে হবে। এই ধর্মাদেশের শিক্ষা আমাদের সকলের জন্য। একই সঙ্গে তুমি ঈশ্বর ও কুবেরের আরাধনা করতে পার না। দয়া, করুণা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, সর্বংসহা ঈশ্বর কুবেরকেও তার নয় দিনের খেলা দেখাতে দেন। [যা অল্প সময়ের জন্য মহা উত্তেজনার সঞ্চার করে অচিরে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়।] কিন্তু আমি তোমাদের বলছি....আত্মবিনাশী কুবেরের এই সর্বনাশা আস্ফালন থেকে দূরে পালাও।[৩১]

আমার ক্ষমতা থাকলে আজই এই ব্যবস্থাকে আমি ধ্বংস করতাম। যদি বিশ্বাস কবতাম যে সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা এ-ব্যবস্থা ধ্বংস সম্ভব, তাহলে আমি তা-ই ব্যবহার করতাম। তবে করব না কেবল একটি কথা ভেবে। এর ফলে ব্যবস্থার বর্তমান প্রশাসকরা বিনষ্ট হলেও, ব্যবস্থাটি আরও পাকাপাকি কায়েম হয়ে বসবে।[৩২]

পাশ্চাত্য

সবিনয়ে বলি, পশ্চিমে এমন অনেক কিছু আছে যা আত্মস্থ করলে আমাদের লাভই হবে। প্রজ্ঞা কোনও মহাদেশ বা জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতাব বিরুদ্ধে আমার প্রতিরোধ আসলে—পাশ্চাত্যোব যা-কিছু, এশীয়রা কেবল তা অনুকবণের যোগ্য-মাত্র,—এই ধারণাব বশবর্তী হয়ে পাশ্চাত্যের যদৃচ্ছ ও বিবেচনাহীন অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, ভারত যদি কষ্টস্বীকারেব অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সহিষ্ণুতা দেখাতে পারে, সন্দেহাতীত নানা ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এ-যাবৎ বহমান তার নিজস্ব সভ্যতার ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার ধৈর্য দেখাতে পারে, তাহলে সে বিশ্বের শান্তি ও বলিষ্ঠ অগ্রগতিতে স্থায়ী অবদান বাখতে পারবে।[৩৩]

৪৮. মানুষ বনাম যন্ত্র

সমস্ত যন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে আমি অশ্রুপাত করব না, বা তাকে মহাবিপর্যয় বলে মনে করব না। কিন্তু যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র আমার নেই।[৩৪]

মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই, নেই কিছু মহীয়ান। তাই তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা করা যন্ত্রের উচিত নয়।[৩৫]

আমার বিশ্বাস, যন্ত্রযুগের এ-সব সাফল্য যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখনও আমাদের

হস্তশিল্প থাকবে। যখন সকল শোষণের অবসান হবে, তখন সেবা ও সৎশ্রম থাকবে। এই বিশ্বাস আমাকে শক্তি দেয় বলেই আমি কাজ করতে পারি...নিজের কাজের ওপর অদম্য আস্থাই স্টিফেনসন ও কলম্বাসকে শক্তি জুগিয়েছিল। কর্মের উপর আস্থাই আমাকে শক্তিদান করে।[৩৬]

নিজের কাজের ওপর আস্থাই আমাকে শক্তি জোগায় বটে, তবে, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস হল: যা-কিছু আমার আস্থার বিরুদ্ধে 'রণং দেহি' বলে ধেয়ে আসে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার...আমার কাছে এটা স্পষ্ট যে, এই যন্ত্রযুগের লক্ষ্য যখন মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা, তখন আমার লক্ষ্য, যন্ত্রে-পরিণত মানুষকে তার স্ব-স্থানে পুনর্বাসিত করা।[৩৭]

আদর্শ অবস্থাটি হল...আমি সমস্ত যন্ত্র বাতিল করে দেব, ঠিক যেমন, মুক্তির সহায়ক না হলে এই দেহও খারিজ করে দেব। সন্ধান করব আমার পরম মুক্তির। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি সকল যন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে চাই, যদিও এই দেহের মতো যন্ত্রও থাকবেই, তা অবধারিত। এ দেহ যান্ত্রিক কলাকৌশলের শুদ্ধতম রূপ। কিন্তু তা যদি আত্মার পরমার্থলাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।[৩৮]

যন্ত্রের পাপ

যন্ত্র এমন এক সাপের গর্ত, যে বিবরে এক থেকে একশোটা সাপও থাকতে পারে। যেখানে যন্ত্র, সেখানেই বড় বড় শহর। যেখানে বড় শহর, সেখানেই ট্রাম ও রেলপথ। একমাত্র সেখানেই দেখা যায় বিজলী বাতি। সৎ চিকিৎসকরা বলবেন, যেখানে কৃত্রিম গতির সাহায্যে গমনাগমন বাড়ে সেখানেই মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। আমার মনে পড়ছে, এক ইউরোপীয় শহরে একবার মুদ্রা-সংকট দেখা দেয়। তখন ট্রামকোম্পানি, আইনজীবী ও চিকিৎসকদের আয় কমে গিয়েছিল, মানুষের অসুস্থতাও হ্রাস পেয়েছিল। যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত অথচ প্রশংসনীয়, এমন একটি ব্যাপারও আমার মনে পড়ে না।[৩৯]

শ্রমের সাশ্রয়

আমার বিরোধিতা যন্ত্রের হুজুগের বিরুদ্ধে, ঠিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। তথাকথিত শ্রমসাশ্রয়কারী যন্ত্র নিয়ে এই হুজুগ। যতক্ষণ না হাজার হাজার কর্মহীন মানুষ খোলা রাস্তায় পড়ে অনাহারে মরে, মানুষেরা "শ্রম বাঁচাও" চালিয়ে যাবে। মানবজাতির এক ভগ্নাংশের জন্য আমি শ্রম ও সময় বাঁচাতে চাই না, চাই সকলের জন্য।

উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ব্যক্তি মানুষের শ্রম বাঁচানো। মানুষের লোভ যেন এর প্রেরণা না হয়। যেমন, চরকার টাকু বেঁকে গেলে তা সোজা করার জন্য একটি যন্ত্রকে আমি স্বাগত জানাব। তার মানে এই নয় যে, কামাররা টাকু বানাবে না। তারা টাকুর জোগান দিয়ে চলবে। তবে টাকু বেঁকে গেলে, প্রতি চরকাকাটুনীর কাছে একটা যন্ত্র থাকবে, যেটা দিয়ে সে বাঁকা-টাকু সিধা করবে। লোভের জায়গায় আনো প্রেম, সব ঠিক হয়ে যাবে।[৪০]

বহুজনের ক্ষতি করে মুষ্টিমেয় ক'জনকে ধনী করবার জন্য, অথবা বিনা কারণে বহুজনের প্রয়োজনীয় শ্রম থেকে তাদের ছাঁটাই করার জন্য যে যন্ত্র তাতে আমার কোনও সমর্থন থাকতে পারে না।[৪১]

করণীয় কাজের ক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা খুব কম থাকলে যন্ত্রীকরণ স্বাগত। ভারতের মতো যেখানে কাজের জন্য কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি, সেখানে এটা অন্যায়। গ্রামবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য অবসর খুঁজে বের করাটা আমাদের কোনও সমস্যা নয়। সমস্যা হল, বছরে ছয়মাস কর্মদিবসের সমান, এই কর্মহীন ঘণ্টাগুলিকে কী করে কাজে লাগানো যায়।[৪২]

প্রশ্ন করা হয়, লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রম বাঁচিয়ে বুদ্ধিগত কাজকর্মের জন্য তাদের বেশি অবসর দাও না কেন? অবসর কিছুদূর পর্যন্ত দরকার, ভালোও বটে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি রোজগার করবে বলেই ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। গ্রাসাচ্ছাদনসহ আমাদের দরকারি সবকিছুই আমরা বাজিকরের টুপি থেকে বের করতে পারছি, এমত সম্ভাবনা ভয় পাই।

একটি কারখানা একশো-জনকে কাজ দেয়, হাজার হাজার জনকে বেকার করে। তেলকলে আমি টন টন তেল উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু আমি হাজার হাজার কলুকে বেকারও করে দিই। একে আমি বলি বিনাশক শক্তি। আর লক্ষ কোটি হাতের শ্রমে উৎপাদন হল গঠনমূলক শক্তি ও জনসাধারণের কল্যাণ-সাধক। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হলেও বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রেব গণ-উৎপাদনে কোনও কাজ হবে না।[৪৩]

যন্ত্রের প্রতি আমার বিরোধিতাকে খুব ভুল বোঝা হয়। আমি ঠিক যন্ত্রের বিরোধী নই। যে যন্ত্র শ্রমিককে কর্মচ্যুত ক'রে বেকার ক'রে দেয়, আমি তার বিরোধী।[৪৪]

যন্ত্রের আপাত-সাফল্যে মোহিত হতে আমি নারাজ। আমি আপসহীনভাবে সকল বিনাশক যন্ত্রের বিরোধী। কিন্তু যে সাদামাটা যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম, ব্যক্তির শ্রম লাঘব করে ও লক্ষ লক্ষ কুটিবের বোঝা হালকা করে আমি তাকে স্বাগত জানাই।[৪৫]

অন্য কাজে যুক্ত না থাকলে লক্ষ লক্ষ কর্মী যে কাজ সহজে করতে পারে, সেই কাজের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতি ক্ষতিকর বলে আমি মনে করি। উনিশশো মাইল দীর্ঘ ও পনেরোশো মাইল প্রস্থেব ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের মানুষ, যে-ভাবে নিজেদের খাদ্যের জোগান নিজেরাই দেয়, সে-ভাবে যদি নিজ নিজ গ্রামে নিজেদের বস্ত্রও তৈরি করে নেয় তাহলে তাদের পক্ষে তা অনেক শ্রেয়, অনেক নিরাপদ। জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, গ্রামগুলি যুগ যুগ ধরে ভোগ করে আসা স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে পারবে না।[৪৬]

গণ-উৎপাদন

ভোক্তার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা কী, গণ-উৎপাদন ব্যবস্থা তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। গণ-উৎপাদন নিজেই যদি এক সদ্‌গুণ হয় তবে, পরিমাণে অশেষ বৃদ্ধি পাবার ক্ষমতা এর থাকা উচিত। গণ-উৎপাদনের মধ্যেই যে তার সীমাবদ্ধতা বর্তমান, এটা দেখাতে

বিশেষ বেগ পেতে হয় না। সকল দেশ যদি গণ-উৎপাদন নীতি গ্রহণ করে, তবে তো তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য যথেষ্ট বড় বাজারই মিলবে না। তখন গণ-উৎপাদন বন্ধ হতে বাধ্য।[৪৭]

গণ-উৎপাদনের উন্মত্ত মোহের জন্যই বিশ্বের এই সংকট—আমার এই বিশ্বাসের কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই। সাময়িকভাবে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, যন্ত্র মানুষের সব প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করতে সক্ষম, তবুও নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রেই যন্ত্র তার উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ রাখবে, তখন তোমাকে উলটোপথে ঘুরে বণ্টনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, সেখানে যদি উৎপাদন ও বণ্টন করা হয়, তাহলে তা আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হবে। জাল-জুয়াচুরির সুযোগ কমে যাবে, ফাটকাবাজির সুযোগই থাকবে না।

গণ-উৎপাদন অবশ্যই (আমি চাই) কিন্তু তা জোর করে নয়। চরকার বাণীই হচ্ছে তাই। এটাও গণ-উৎপাদনই, তবে জনগণের নিজ-গৃহে গণ-উৎপাদন। তুমি যদি ব্যক্তিগত উৎপাদনকে লক্ষগুণ করো, তাহলে কি তা বিশাল পর্যায়ের গণ-উৎপাদনে দাঁড়ায় না?[৪৮]

সম্পদের কেন্দ্রীকরণ

আমি সম্পদের কেন্দ্রীকরণ চাই। তবে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে নয়, সকলের হাতে। বর্তমানে যন্ত্রের সহায়তায় মুষ্টিমেয় মানুষই লক্ষ লক্ষ মানুষের পিঠে সওয়ার হয়েছে। এর পেছনে যে প্রেরণা রয়েছে, তা শ্রম বাঁচাবার শুভবুদ্ধি নয়, লোভ। এই ধরনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমি সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করছি...।[৪৯]

আমি মনে কবি, সামান্য কয়েকজনের হাতে সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বহুজনকে শোষণের জন্য যন্ত্রের ব্যবস্থাপনা করা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত। বর্তমান যুগে যন্ত্রের ব্যবস্থাপনা অনেকটাই এইরকম। যন্ত্রকে এই বিশেষ ও শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চরকা একটি সংগঠিত প্রচেষ্টা। আমার পরিকল্পনা অনুসারে যন্ত্রের দায়িত্বে যারা থাকবে, তারা নিজেদের এমন কি নিজেদের জাতির কথাও ভাববে না, ভাববে সমগ্র মানবজাতির কথা।[৫০]

ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত যন্ত্রের প্রতিনিধি যে গ্রামবাসী, তাদের বিরুদ্ধে প্রাণহীন যন্ত্রকে খাড়া করা চলবে না। যন্ত্রের সুব্যবহার মানে, মানুষের প্রচেষ্টায় সহায়তা ও তাকে সহজ করে তোলা। বর্তমানে যন্ত্র-ব্যবহারের লক্ষ্য, কতিপয়ের হাতে সম্পদ জমানো ও হেলাভরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়া।[৫১]

বিকেন্দ্রীকরণ

যখন উৎপাদন ও ভোগ, উভয়েই আঞ্চলিক হয়ে ওঠে, তখন যে-কোনও মূল্যে অনির্দিষ্টভাবে উৎপাদন ত্বরান্বিত করার মোহ লোপ পায়। বর্তমানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে অসংখ্য জটিলতা ও সমস্যার শিকার, সেগুলিরও অবসান ঘটবে...তখন আর মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পদের অস্বাভাবিক সঞ্চয় থাকবে না, বাকিদেব থাকবে না প্রাচুর্যের মধ্যেও দাবিদ্র....

আমার ব্যবস্থায়. শ্রমই হবে প্রচলিত মুদ্রা, ধাতু নয়। যে-ই শ্রম ব্যবহার করতে পারবে, সে-ই ওই মুদ্রা বা সম্পদ পাবে। সে তার শ্রমকে পরিণত করবে বস্ত্রে, শস্যে। সে যদি প্যারাফিন তেল চায়, যা সে নিজে উৎপাদন করতে পারে না, তার উদ্বৃত্ত শস্য দিয়ে সে তা জোগাড় করবে। এ-হল স্বাধীন, ন্যায্য ও সমানাধিকারের শর্তে শ্রমের বিনিময়—অতএব এ ডাকাতি নয়। তুমি হয়তো আপত্তি জানিয়ে বলবে, এ হল মান্ধাতার আমলের সেই বিনিময়-ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন। কিন্তু ওই বিনিময়-ব্যবস্থাই কী সকল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি নয়?[৫২]

ব্যক্তিগতভাবে আমি বহু যন্ত্রের সাহায্যে বড় বড় বাণিজ্য সংস্থার গঠন ও শিল্পের কেন্দ্রীকরণের বিরোধী। ভারত যদি খদ্দর ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু গ্রহণ করে, তাহলে আমি এ-আশা ছাড়ব না যে, আরামপ্রদ জীবন ও শ্রম-সাশ্রয়ের জন্য যতটুকু আবশ্যক সেই পরিমাণে আধুনিক যন্ত্রই ভারত সংগ্রহ করবে।[৫৩]

শোষণ নয়

এইভাবে, ল্যাঙ্কাশায়ারের লোকরা, ভাবত ও অন্যান্য দেশকে তাদের যন্ত্র দিয়ে শোষণ করা বন্ধ করবে। তারা এমন উপায় উদ্ভাবন করবে, যার সহায়তায় ভারতের গ্রামে তুলোকে কাপড়ে পরিণত করা যাবে। আমার পরিকল্পনা চালু হলে মার্কিনরাও বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে তাদের উদ্ভাবনী দক্ষতার দ্বারা শোষণ ক'রে নিজেদের সম্পদ সৃষ্টির চেষ্টা করবে না।[৫৪]

বর্তমান বিশৃঙ্খলার কারণ কী? আমি বলব, শোষণ। কিন্তু তা শক্তিমান জাতির দ্বারা দুর্বলতর জাতির শোষণ নয়। এ হল ভগিনীপ্রতিম জাতিকে ভগিনীপ্রতিম জাতিগুলির দ্বারা শোষণ। যন্ত্রের সাহায্যেই এই জাতিগুলি অন্যদের শোষণ করতে সক্ষম হয়েছে—যন্ত্রের প্রতি আমার মূলগত বিরোধিতা এই জন্যই। যন্ত্র নিজে একটি প্রাণহীন বস্তু এবং একে ভালো বা মন্দ যে-কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি, মন্দ উদ্দেশ্যেই একে ব্যবহার করা সহজ।[৫৫]

যন্ত্রের স্থান

যন্ত্রের নিজস্ব স্থান আছে। থাকার জন্যই যন্ত্র এসেছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রয়োজনীয় মানবিক শ্রমের স্থানচ্যুতি ঘটতে দেওয়া উচিত নয়....

একটি উন্নতর লাঙ্গল অতি উত্তম বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু দৈবাৎ যদি কেউ তার কোনও যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সাহায্যে ভারতের সমস্ত জমি চষে ফেলে, যাবতীয় কৃষি-উৎপাদন কব্জা করে বসে, যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্য কোনও কাজের অভাবে বেকার থাকে, তাহলে তারা অনাহারে থাকবে, অলস বসে থাকতে থাকতে নির্বোধে পরিণত হবে—যেমন অনেকেই ইতিমধ্যে হয়েছে এবং আরও অনেকের ক্ষেত্রেই এই অনভিপ্রেত পরিণতির আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে।

গৃহস্থালীর যন্ত্রের উন্নতিসাধনকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু আমি জানি যদি কোটি

কোটি কৃষককে তাদের ঘরে-বসে করার মতো কোনও কাজ দেওয়া না হয়, তাহলে বিদ্যুৎচালিত টাকুর প্রবর্তন ঘটিয়ে হাতের শ্রমকে বাতিল করে দেওয়া অপরাধ।[৫৬]

সকলের কল্যাণার্থে বিজ্ঞানের প্রতিটি উদ্ভাবনকেই আমি মূল্যবান মনে করি। অবশ্য একটি উদ্ভাবনের সঙ্গে আর একটির পার্থক্য আছে। বহু মানুষকে একসঙ্গে মেরে ফেলার ক্ষমতাসম্পন্ন শ্বাসরোধকারী গ্যাসের বিষয়ে নিশ্চয় আমি বলছি না। জনকল্যাণকর কোনও কাজ, যা মানুষের শ্রমে সম্ভব নয়, তার জন্য ভারি যন্ত্রের নিশ্চয় অবধারিত স্থান রয়েছে। কিন্তু এর মালিকানা হবে রাষ্ট্রের। ওই যন্ত্রর ব্যবহার করতে হবে শুধুমাত্র জনকল্যাণে।[৫৭]

যন্ত্রযুগের চ্যালেঞ্জ

যন্ত্র আমাদের অর্থনীতির ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে বলে আমাদের যুগকে যন্ত্রযুগ বলা হয়েছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "যন্ত্র কী?" এক অর্থে, সৃষ্টিকাণ্ডের সবচেয়ে আশ্চর্য যন্ত্র হল মানুষ। এর নকল বা অনুকরণ সম্ভব নয়। আমি কিন্তু "যন্ত্র" শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করিনি। আমি বলতে চেয়েছি, এ হল এমন এক সরঞ্জাম, যা মানুষের বা পশুর শ্রমের পরিপূরক বা ক্ষমতাবর্ধক না হয়ে তাকে স্থানচ্যুত করতে চায়।

এটা হল যন্ত্রের প্রথম নির্দিষ্ট বিশেষত্ব। এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এর বিকাশ বা বিবর্তনের কোনও সীমা নেই। মানুষের শ্রম নিয়ে এ-কথা বলা চলে না। মানুষের যান্ত্রিক দক্ষতার সামর্থ্য একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে পারে না। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই যন্ত্রের বিশেষত্ব গড়ে উঠেছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যন্ত্রের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি বা প্রতিভা রয়েছে। যন্ত্র মানুষের শ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী। এ শুধু মানুষকে কর্মচ্যুত করতে চায়। একটি যন্ত্র, একশো কি হাজার লোকেব শ্রম করে, আর কর্মচ্যুত সেই মানুষেব দল বেকার বা আধাবেকারদের বাহিনী বাড়িয়েই চলে। যন্ত্রের অভিপ্রায় হয়তো এটা নয় তবে এটাই হল যন্ত্রের আইন। প্রক্রিয়াটি সম্ভবত চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে আমেরিকায়।

আজ থেকে নয়, ১৯০৮ সালের আগে থেকেই আমি যন্ত্রবিরোধী। তখন আমি যন্ত্র-পরিবৃত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম। যন্ত্রের অগ্রগতি আমাকে শুধু বিস্মিতই করেনি, বীতশ্রদ্ধও করেছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে দমন ও শোষণ করতে দানবীয় যন্ত্রের কোনও জুবি নেই। মনে হয়েছিল, সামাজিক একক হিসেবে সব মানুষ যদি সমান হয়, তাহলে মানুষের অর্থনীতিতে এর কোনও স্থান নেই। আমার বিশ্বাস, যন্ত্র মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি। একে এর যোগ্য জায়গায় রাখতে না পারলে, যন্ত্র বিশ্বকে সহায়তা করার বদলে তাকে বিপদে ফেলবে।

এর পর রেলে ডারবান যাওয়ার পথে আমি রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পড়ি এবং বইটি তৎক্ষণাৎ আমাকে গ্রাস করে ফেলে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম যে, মানবজাতিকে যদি প্রগতি অর্জন করতে হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই 'আনটু দিস লাস্ট'—এর

আদর্শ গ্রহণ করে তদনুযায়ী কাজ করতে হবে। সঙ্গে নিতে হবে মূক, পঙ্গু ও খঞ্জকেও। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও কি তাঁর বিশ্বস্ত সারমেয়টিকে বাদ দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেননি?[৫৮]

পশ্চিমের যন্ত্রের এমন এক প্লাবন আজ ভারতের ওপর আছড়ে পড়েছে যে, ভারত যদি একে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পারে, তাহলে সেটা অলৌকিক বলেই পরিগণিত হবে।[৫৯]

৪৯. শিল্পায়নের অভিশাপ

মানবচরিত্রে আস্থা রাখা ভালো। সেই আস্থা আছে বলেই আমি বেঁচে আছি। কিন্তু এই আস্থা আমাকে ইতিহাসের একটি অমোঘ সত্য সম্পর্কে অন্ধ করে রাখে না। তা হল, শেষ বিশ্লেষণে সবই উত্তম বলে বিবেচিত হলেও ব্যক্তি এবং জাতি বলে পরিচিত নানা গোষ্ঠী অতীতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। রোম গ্রীস, বাবিলন, মিশর ও অন্য বহু প্রমাণ থেকে দেখা যায় নিজেদের অপকর্মের জন্যই এই সব জাতি বিনষ্ট হয়েছিল।

এইটুকু অন্তত আশা কবা যেতে পারে, ইউরোপ তার সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির সুবাদে এই অবধারিত বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে পথ পালটাবে। এই নৈরাশ্যজনক শিল্পায়নের বাইরে এক অন্য পথ খুঁজে নিতে পারবে। তার মানে কিন্তু পুরাকালের অবিমিশ্র সরলতায় প্রত্যাবর্তন নয়। এ হবে এমন এক পুনর্সংগঠন, যেখানে গ্রামজীবন অগ্রাধিকার পাবে। আত্মিক ক্ষমতার কাছে পাশবিক ও বৈষয়িক শক্তি বশ্যতা স্বীকার করবে।[৬০]

শিল্পবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইংল্যাণ্ড ইতিমধ্যেই আমেরিকা জাপান, ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান পেয়েছে। ভারতে এক জাগরণ এসেছে বলে, ভারতের হাতে-গোনা কয়েকটি মিলও তাব প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। প্রচুর সমৃদ্ধতর প্রাকৃতিক, মানবিক ও খনিজ সম্পদের দৌলতে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও জাগরণ আসবে। আফ্রিকার মহান জাতিগুলির সামনে মহাবলী ইংরেজদের খর্বকায় বামনের মতো দেখায়। তোমবা বলবে, তারা হল মহান বর্বর। ওরা মহান ঠিকই, কিন্তু বর্বর নয়। আর কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিমী দেশগুলি দেখবে তারা আফ্রিকাতে তাদের পণ্যদ্রব্য গাদা করবাব জায়গা আর পাচ্ছে না। যদি পাশ্চাত্যে শিল্পবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়, ভারতে কি তা আরও তমসাচ্ছন্ন হবে না?[৬১]

আমার আশঙ্কা, শিল্পবাদ মানবজাতির পক্ষে অভিশাপে পরিণত হতে চলছে। এক জাতির দ্বারা অপর জাতিকে শোষণ অনাদি অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। তোমার শোষণ করাব ক্ষমতা, তোমার সামনে খোলা বাজারের অস্তিত্ব এবং প্রতিযোগী না-থাকার ওপরে শিল্পবাদ পুরোপুরি নির্ভরশীল....[৬২]

যেখানে শিল্পায়নের ওপবে দেবত্ব আরোপ করা হযেছে. সেই রাশিয়ার দিকে তাকালে,

সেখানকার জীবন আমার মনে কোনও রেখাপাত করে না। বাইবেলের ভাষায় বললে, "মানুষ যদি তার আত্মাকে হারিয়ে ফেলে, তাহলে সমগ্র জগৎ পেলেই বা তার কী লাভ হবে?" আধুনিক অর্থে, ব্যক্তিগত নিজস্বতা হারিয়ে নিছক এক যন্ত্রাংশে পরিণত হওয়া মর্যাদাহানিকর। আমি চাই, প্রতিটি ব্যক্তি সমাজের তেজোদ্দীপ্ত ও পূর্ণ-বিকশিত সদস্য হয়ে উঠুক।[৬৩]

ঈশ্বর করুন, ভারত যেন পশ্চিমের অনুকরণে শিল্পবাদ গ্রহণ না করে। ত্রিশ কোটির এই জাতি যদি ইউরোপের দেখাদেখি অর্থনৈতিক শোষণের পথ নেয়, তাহলে বিশ্বকে এরা পঙ্গপালের মতো উজাড় করে দেবে। এই বিয়োগান্ত ঘটনা ঠেকানোর জন্য ভারতের পুঁজিপতিরা যদি জনকল্যাণের অছিধারী না হয়ে ওঠে, নিজেদের জন্য সম্পদ জড়ো করাবর পরিবর্তে যদি মহত্তর মনোভাব নিয়ে জনগণের সেবার কাজে নিজেদের প্রতিভা নিয়োগ না করে, তাহলে শেষ পর্যন্ত, হয় তারা জনগণকে ধ্বংস কববে, নতুবা নিজেরাই জনগণের হাতে বিনষ্ট হবে।[৬৪]

শিল্পে উন্নতিলাভ করে ভারত যখন অবধারিতভাবে অন্যান্য জাতিকে শোষণ করতে শুরু করবে, তখন সে অপরাপর জাতিব কাছে এক অভিশাপ, বিশ্বের কাছে এক মহাবিপদে পরিণত হবে। অন্যান্য জাতিকে শোষণ করার জন্য ভারতের শিল্পায়নেব কথা আমি কেন ভাবব? অবস্থা যে কতটা শোচনীয়, তোমরা দেখতে পাও না: আমরা আমাদের ৩০ কোটি বেকারের জন্য কর্মসংস্থান করতে পারি, কিন্তু ইংল্যাণ্ড তার ৩০ লক্ষের জন্য তা পাবে না। উপবন্তু এমন সব সমস্যায় তারা জর্জরিত যা ইংল্যাণ্ডের বাঘা বাঘ মস্তিষ্ককেও ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে।[৬৫]

শিল্পোন্নয়নের বিকল্প

কোনও কারণে কোনও দেশের পক্ষেই শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজনীয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। ভারতের ক্ষেত্রে তো এই আবশ্যকতা আরও কম। সত্যি বলতে কি, আমি মনে করি, স্বাধীন ভারত যদি বেদনাজর্জর বিশ্বের প্রতি নিজেব কর্তব্য পালন করতে চায় তাহলে তাকে তার হাজার হাজার কুটিরের উন্নয়ন ঘটিয়ে, এক অনাড়ম্বর অথচ মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে সারা বিশ্বের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে হবে। কুবেরের উপাসকরা তীব্র গতিময় যে জটিল বৈষয়িক জীবন আমাদেব ওপর চাপাতে চায়, তার সঙ্গে উচ্চমার্গীয় চিন্তার সঙ্গতি নেই। মহৎভাবে বাঁচার শিল্প যখন আমরা শিখব, তখনই জীবন সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠবে....

সংশয়ীর মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে, আপাদমস্তক অস্ত্রেসজ্জিত এক বিশ্বের সামনে, আড়ম্বর ও সর্বাঙ্গীণ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে, ওইরকম সরলজীবন যাপন কবা কোনও বিচ্ছিন্ন জাতির পক্ষে সম্ভব কি না—আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে তা যত বড়ই হোক-না-কেন। এর জবাব একেবারে সাদামাটা। বাঁচার পক্ষে অনাড়ম্বর জীবন যদি আদৌ যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলে তার জন্য চেষ্টাটাও চালাতেই হবে। তা, সে প্রয়াস একেজনেই চালাক বা একটি গোষ্ঠী।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

একই সঙ্গে আমি এ-কথাও বিশ্বাস করি যে, কয়েকটি মূল শিল্পের প্রয়োজন আছে। আমি আরামকেদারার সমাজতন্ত্র বা সশস্ত্র সমাজতন্ত্র — এর একটিতেও বিশ্বাসী নই। আমি আমূল পরিবর্তনের অপেক্ষায় না থেকে, নিজের বিশ্বাস মতে কাজ করে যেতে চাই। তাই মূল শিল্পে আমি চাই রাষ্ট্রীয় মালিকানা, যেখানে বহুসংখ্যক মানুষ একসঙ্গে কাজ করবে। দক্ষ বা অদক্ষ যেমন শ্রমিকই হোক-না-কেন, তাদের শ্রমজাত উৎপাদনের মালিকানা রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাদেব ওপরেই ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু আমার ধারণার অনুরূপ ওই রাষ্ট্র শুধুমাত্র অহিংসাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠতে পারে। আমি বলপ্রয়োগ করে ধনবান ব্যক্তিদের সম্পদহীন করব না। বরং রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তাদের সহযোগিতা করতে আহ্বান জানাব। সমাজে কেউ অপাংক্তেয় নয়, সে কোটিপতিই হোক, কি কপর্দকহীন। ওই দুটি ক্ষত একই ব্যাধির থেকে জাত। আর 'দোষেগুণে' মানুষ তো সকলেই।[৬৬]

গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন

গ্রামীণ জীবনকে যারা ভালবাসে, গ্রামগুলিতে ভাঙন ধরার বিয়োগান্ত পরিণতি সম্পর্কে যারা অবহিত, তাবা যা করছে, যা করতে চাইছে, আমিও সেই কাজই করতে চাইছি....পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাময় গ্রামীণ শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন ঘটিয়ে। গ্রামবাসীকে তার খাদ্য নিজেই পিষে নিতে ব'লে, পুষ্টিকর ভুসিসহ সবটাই খেতে ব'লে, আমি বিক্রির জন্য না হলেও, নিজের দবকারের জন্য তার আখ থেকে গুড় বানাতে ব'লে, কি আধুনিক সভ্যতাব ধারাটি উলটো-পথে চালাতে চেষ্টা করছি? আমি আধুনিক সভ্যতার ধারাকে ঘুরিয়ে দিতে চাই বলেই কি গ্রামবাসীকে শুধু কাঁচামাল উৎপাদন না করে তাকে বিপণনযোগ্য পণ্যে পরিণত করতে বলি, যাতে তাদেব দৈনিক রোজগারে দু'এক পয়সা বাড়তি যোগ হয়?[৬৭]

গ্রামগুলি যখন শোষণমুক্ত হবে একমাত্র তখনই তাদেব পুনরুজ্জীবন সম্ভব। ব্যাপক হারে শিল্পায়ন ঘটলে যখনই প্রতিযোগিতা ও বাজাবের সমস্যা দেখা দেবে, তখনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রামগুলিকে শোষণের মুখে নিয়ে যাবে। তাই গ্রামগুলিকে স্বয়ম্ভর করে তোলার দিকে আমাদের জোর দিতে হবে। সেখানে পণ্য প্রস্তুত হবে মূলত ব্যবহারেরই জন্য। গ্রামীণ শিল্পের এই চাবিত্র্য যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তখন তারা যা বানাতে ও ব্যবহার করতে পারে, সেইসব আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, গ্রামবাসীরা তৈরি ও ব্যবাহার করলে কোনও আপত্তি উঠবে না। শুধু দেখতে হবে, সেগুলি যেন অন্যকে শোষণ করার কাজে ব্যবহৃত না হয়।[৬৮]

প্রকৃত পরিকল্পনা

যে-পরিকল্পনা একটি দেশের কাঁচা-মাল কাজে লাগায় এবং অধিকতর শক্তিধর মানব-ক্ষমতার বিষয়টি অবহেলা করে, তা উন্মার্গগামী এবং কখনও তা মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে না—আমি এই বক্তব্য পূর্ণ সমর্থন করি।

প্রকৃত পরিকল্পনা হবে সেটাই, যার ফলে ভারতের সমগ্র মানবসম্পদকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যাবে, বিদেশে কাঁচা-মাল পাঠিয়ে, উদ্ভট চড়া দামে সেগুলি তৈরি পণ্য হিসেবে পুনরায় না কিনে, ওই কাঁচা-মাল ভারতের অসংখ্য গ্রামে বন্টন করা হবে।[৬৯]

৫০. সমাজতন্ত্র

আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃত সমাজতন্ত্র আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁরা শিখিয়েছেন, "সব জমিই যখন গোপালের তখন কোথায় এর সীমারেখা? মানুষই ওই সীমারেখার স্রষ্টা। তাই মানুষই একে মুছে দিতে পারে।" আক্ষরিক অর্থে গোপাল হল গো-পালক, এর অর্থ ঈশ্বরও বটে। আধুনিক ভাষায় এব অর্থ রাষ্ট্র, অর্থাৎ জনগণ। জমি আজ জনগণের নয়, এটাই প্রকট সত্য। ভ্রান্তি কিন্তু শিক্ষার মধ্যে নেই, ভ্রান্তি আমাদের। আমরা এর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারিনি।

আমি এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, রাশিয়াসহ, যে-কোনও জাতির পক্ষে যতখানি শুভেচ্ছা-প্রাণোদিত মনোভাব গ্রহণ করা সম্ভব, ততটা আমরাও গ্রহণ করতে পারি, এবং সেটাও হিংসা বাদ দিয়েই।[৭০]

আত্মমর্যাদা বজায় রেখে ভরণপোষণের জন্য যতটুকু দরকার, তার চেয়ে বেশি জমি কারো থাকা অনুচিত। জনগণের নির্মম দারিদ্রের কারণ হল, নিজের বলে দাবি করার মতো জমি তাদের নেই। এ সত্য কে অস্বীকার করবে?[৭১]

পশ্চিমী সমাজতন্ত্র

পশ্চিমী সমাজব্যবস্থার এক দরদী ছাত্র হিসেবে আমি আবিষ্কার করেছি, পশ্চিমের অন্তরে যে উন্মাদনা, তার অন্তরালে রয়েছে এক অস্থির সত্যান্বেষা। এই মানসিকতা আমার কাছে মূল্যবান। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মনোভাব নিয়ে যদি আমরা প্রাচ্যের আদর্শগুলি অধ্যয়ন করি, তাহলে সত্যতর এক সমাজতন্ত্র, অধিকতর সত্য এক সাম্যবাদের সন্ধান আমরা পেতে পারি, বিশ্ব যা স্বপ্নেও ভাবেনি। গণদারিদ্র সম্পর্কে পশ্চিমী সমাজতন্ত্র বা সম্যবাদই যে শেষ কথা, সেটা ধরে নেওয়া অবশ্যই ভুল।[৭২]

পুঁজিপতিরা পুঁজির অপব্যবহার করে—এটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়নি। সমাজতন্ত্র, এমন কি সাম্যবাদও যে ঈশোপনিষদের প্রথম স্তোত্রে বর্ণিত হয়েছে সে-কথা আমি আগেই বলেছি। আসল ঘটনা হল, কয়েকজন সংস্কারক যখন মানুষকে পরিবর্তিত করার ব্যাপারে আস্থা হারালেন, তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা আজ যে সমস্যার মুখোমুখি, আমি তারই সমাধান করার চেষ্টা করেছি।

যাই হোক, আমার পথ যে সর্বদা নির্ভেজাল অহিংসার মাধ্যমে কাজ করা তাতে কোনও সংশয় নেই। আমি ব্যর্থ হতে পারি। যদি হই, তার কারণ হবে অহিংসার

প্রকরণ সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা। যে-মতবাদে আমার বিশ্বাস প্রতিদিন দৃঢ়তর হচ্ছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা হয়তো আমার নেই।[৭৩]

আমার সমাজতন্ত্র

আমি বলেছি, ভারতে আজ যারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করে, তাদের অনেক আগে থেকেই আমি সমাজতন্ত্রী। কিন্তু আমার সমাজতন্ত্র এসেছিল স্বাভাবিকভাবে। পুঁথি থেকে তা গৃহীত হয়নি। অহিংসায় আমার অবিচল বিশ্বাসই এর উৎস। সামাজিক অবিচার যেখানেই ঘটুক না কেন, কোনও ব্যক্তি সক্রিয় অহিংসাপন্থী অথচ সে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না, এ হতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, আমি যতদূর জানি, সমাজতান্ত্রিক নীতি কায়েম করার জন্য পশ্চিমী সমাজতন্ত্রীরা হিংসার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে।

যারা সবার নিচে, সবার পিছে, বলপ্রয়োগ করে তাদের জন্যও যে সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন করা সম্ভব নয়—এ-কথা আমার সবসময় মনে হয়েছে। আমি এ-ও বিশ্বাস করি, নিচুতলার মানুষকে ঠিকমতো অহিংস উপায়ের অর্থাৎ অহিংস অসহযোগের তালিম দিলে তারা যে-সব অন্যায়ের শিকার, তার প্রতিকার সম্ভব।[৭৪]

আমার সমাজতন্ত্রী বন্ধুদের আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গের মনোভাবের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তাদের পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতির দুস্তর ব্যবধানের কথাটি আমি কখনও গোপন করিনি। হিংসা এবং হিংসাশ্রয়ী সবকিছুতে তাদের অকপট বিশ্বাস। আমি আগাগোড়া অহিংসার বিশ্বাসী।

আমার সমাজতন্ত্রের অর্থ "শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যেতে হবে।" অন্ধ, বধির ও মূকের দেহভস্মের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত হোক, আমি চাই না। ওদের (অর্থাৎ ভারতীয়) সমাজতন্ত্রে সম্ভবত এদের কোনও স্থান নেই। ওদের একমাত্র লক্ষ্য, বৈষয়িক উন্নতি।

যেমন, আমেরিকার লক্ষ্য তার নাগরিকের জন্য জন-প্রতি একটা মোটরগাড়ির ব্যবস্থা করা। আমি তা চাই না। আমি চাই আমার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশের স্বাধীনতা। আমার যদি ইচ্ছা হয়, সিরিয়াস নক্ষত্র অবধি একটি সিঁড়ি তৈরি করব, তাহলে সেই স্বাধীনতা আমার চাই। তার মানে এই নয়, আমি সত্যিই অমন কিছু করতে চাই। অন্য সমাজতন্ত্রে কোনও ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। কোনও কিছুরই মালিকানা নেই তোমার, এমন কি নিজের দেহেরও নয়।[৭৫]

সমাজতন্ত্রে সাম্য

সমাজতন্ত্র এক চমৎকার শব্দ। আমি যতটা জানি, সমাজতন্ত্রে সমাজের সবাই সমান। কেউ নীচু, কেউ উঁচু নয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাথাটি দেহের ওপরে অবস্থিত বলে তার স্থান উচ্চে নয়। পদতল ভূমি স্পর্শ করে বলে তা নীচে নয়। দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন সমান, তেমনি সমাজের সদস্যরাও সমান। এ-ই হল সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রে রাজপুত্র ও কৃষক, ধনী ও দরিদ্র, নিয়োগকারী ও চাকুরে, সকলে একই স্তরভুক্ত। ধর্মের নিরিখে সমাজতন্ত্রে কোনও দ্বৈত নেই, সবই অ-দ্বৈত।

বিশ্বের নানা জায়গার সমাজে দেখা যায়, দ্বৈত বা বহুত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। অদ্বৈত নির্দিষ্টভাবে অনুপস্থিত। এই ব্যক্তি উচ্চ, ওই ব্যক্তি নীচের মানুষ, এ হিন্দু, ও মুসলিম, তৃতীয় জন খ্রীস্টান, চতুর্থজন পারসী। পঞ্চমজন শিখ, ষষ্ঠ জন আবার ইহুদি—এদের মধ্যে আবার বিভাজন রয়েছে। আমার অদ্বৈতের ধারণায় বিন্যাসের এই বহুত্বের মধ্যেই চূড়ান্ত অদ্বৈত বর্তমান। এই অবস্থায় পৌঁছনোর জন্য আমরা দার্শনিক দৃষ্টিতে সবকিছু না দেখেই বলতে পারি, সকলে সমাজতন্ত্রে মতান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কিছু করণীয় নেই। নিজেদের জীবন না পালটে আমরা ভাষণ দেব, দল গড়ব, শিকারী পাখির মতো সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকব, এটা কোনও সমাজতন্ত্র নয়। যতই এটাকে আমরা শিকার-খেলা বলে মনে করব, ততই সমাজতন্ত্র আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

উপায়

প্রথম বিশ্বাসীকে দিয়েই সমাজতন্ত্রের সূত্রপাত। একজনও যদি এ-রকম থাকে, তাহলে সেই একের পাশে তুমি শূন্য বসিয়ে যেতে পারো। প্রথম শূন্যতে সংখ্যা দাঁড়াবে দশ। এবং পরবর্তী প্রতিটি শূন্য পূর্ববর্তী সংখ্যার দশগুণ বেশি হবে। কিন্তু প্রথমজনই যদি শূন্য হয় তাহলে কিছুই শুরু হয় না। শূন্যের পাশে শূন্য বসালে যা হয়, তার মূল্যও শূন্য। শূন্য লিখে লিখে যে কাগজ ও সময় খরচ হয় তা এক বিরাট অপচয়।

এই সমাজতন্ত্র হবে স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ। অতএব তা পাবার জন্য স্ফটিক-শুভ্র উপায় অবলম্বন করতে হবে। অশুদ্ধ উপায়ের ফল অশুদ্ধই হবে। কাজেই, রাজপুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ করে রাজপুত্র ও কৃষকের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। কোতলের এ পদ্ধতি নিয়োজক ও নিয়োজিতের মধ্যে সমতা আনতে পারবে না।

অসত্য পথে সত্যে পৌঁছনো যায় না। একমাত্র সৎ আচরণই তা পারে। অহিংসা ও সত্য কি যমজ নয়? জোর গলায় এর উত্তর হল: না। অহিংসা সত্যে নিহিত, সত্য অহিংসায়। তাই বলা হয়েছে, এরা একই মুদ্রার দুই পিঠ। পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। মুদ্রাটির এ-পিঠ—ও-পিঠ পড়ো। শব্দের বানান আলাদা, মূল্য একই।

পরিপূর্ণ শুদ্ধতা ছাড়া এই পূত অবস্থায় উন্নীত হওয়া যায় না। মনে বা দেহে অশুদ্ধতা পোষণ করো, তোমার মধ্যে অসত্য ও হিংসা থেকে যাবে।

অতএব, কেবলমাত্র সৎ, অহিংস ও শুদ্ধ হৃদয়বান সমাজতন্ত্রীরাই ভারতে ও বিশ্বে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারবে। আমার জ্ঞানত বিশ্বে এখন এমন একটি দেশও নেই, যা সর্বতোভাবে সমাজতান্ত্রিক। উপরোক্ত উপায় অবলম্বন বাদ দিয়ে অনুরূপ সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব।[৭৬]

সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা বলে, অর্থনৈতিক সমতা আনার জন্য কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা শুধু এর সপক্ষে প্রচার চালিয়ে যাবে। এই লক্ষ্যের জন্য ঘৃণার সৃষ্টি করে তাকে তীব্রতর করে তোলায় এরা বিশ্বাসী। বলে, "যখন তারা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে, তখন তারা জোর করে সমতা আনবে।"

...আমি নিজেকে প্রথম সারির সাম্যবাদী বলে দাবি করি, যদিও ধনীদের দেওয়া গাড়ি ও অন্যান্য সুবিধা কাজে লাগাই। আমার ওপরে এদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। জনগণের স্বার্থে এক মুহূর্তে এ-সব ত্যাগ করতে পারি।[৭৭]

শিক্ষার মাধ্যমে

মনে রাখতে হবে, সংস্কারের কাজটি চট-জল্‌দি হতে পারে না। এটা অহিংস পদ্ধতিতে আনতে হলে সম্পন্ন ও দরিদ্রদের শিক্ষার মাধ্যমেই তা একমাত্র সম্ভব। প্রথমোক্তদের এই বলে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তাদের বিরুদ্ধে কখনও বলপ্রয়োগ করা হবে না। দরিদ্রদের শেখাতে হবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাদের দিয়ে কেউ কিছু করাতে পারে না। অহিংসা, অর্থাৎ কষ্টস্বীকারের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে তারা মুক্তি অর্জন করতে পারে।

এই লক্ষ্য যদি সাধন করতে হয়, তাহলে যে শিক্ষার কথা আমি বলেছি, তা এখনই শুরু হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার পরিবেশ স্থাপন করতে হবে। তাহলে বিভিন্ন শ্রেণী ও জনগণের মধ্যে কোনও সহিংস সংঘাত ঘটবে না।[৭৮]

ঈশ্বরে বিশ্বাস

সমাজতন্ত্র হবে সত্য ও অহিংসার প্রতিমূর্তি। তার জন্য চাই সমাজতন্ত্রের উপাসকদের মধ্যে ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস। সত্য ও অহিংসার প্রতি আনুগত্য যদি যান্ত্রিক হয়, সংকটময় মুহূর্তে তা ভেঙে পড়তে পারে। তাই আমি বলেছি, সত্যই ঈশ্বর।

এই ঈশ্বর এক জীবন্ত শক্তি। আমাদের জীবন সেই শক্তিরই অংশ। সে শক্তি আমাদের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু তা দেহ নয়। এই মহান শক্তির অস্তিত্ব যে অস্বীকার করে সে নিজে এই অমিত শক্তি ব্যবহার করে না, হীনবল হয়ে পড়ে। সে এক মাস্তুলবিহীন জাহাজের তুল্য, যা কোথাও না-যেতে পেরে ঢেউয়ের আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়। ওই সামজতন্ত্র তাদের কোথাও পৌঁছে দেয় না। যে সমাজে তারা বাস করে তার অবস্থাও হয় তথৈবচ।

তাই যদি হয়, তবে কি বুঝতে হবে, কোনও সমাজতন্ত্রীই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না? তেমন কেউ যদি থেকেও থাকে তাহলে কেন তারা চোখে পড়ার মতো উন্নতি দেখাতে পারে নি? বহু দেবোপম মানুষও তো আগে কাজ করেছেন। তাঁরাই বা কেন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি?

এই দুটি সংশয়কে পুরোপুরি উপেক্ষা করা কঠিন। তবু, এ-কথা বোধহয় বলা যায়, এতদিন কোনও ঈশ্বরবিশ্বাসী সমাজতন্ত্রীর মনে হয়নি, যে তার সমাজতন্ত্র ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে। ঝুঁকি না নিয়ে বলতে পারি, দেবোপম মানুষেরা, সাধারণত জনগণের কাছ সমাজতন্ত্রের সপক্ষে কিছু বলেননি।

দেবোপম নর-নারী থাকা সত্ত্বেও বিশ্বে কুসংস্কারের রমরমা। সেদিন পর্যন্ত হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতার আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত।

এই মহান শক্তি ও তার অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনা জেনে ওঠার ব্যাপারটা চিরকালই শ্রমসাধ্য গবেষণার বিষয় হয়ে থেকেছে। এটা ঘটনা।

নিশ্চিত পন্থা হল সত্যাগ্রহ

আমার দাবি, এইরকম অন্বেষণের পথেই সত্যাগ্রহের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সত্যাগ্রহের সব নিয়ম বিধৃত হয়েছে, বা তার সন্ধান পাওয়া গেছে এমন দাবি করা হচ্ছে না। নির্ভয়ে দৃঢ়চিত্তে আমি বলছি, প্রতিটি মূল্যবান ধ্যেয়ই সত্যাগ্রহের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। এ হল সর্বোচ্চ ও অপ্রতিরোধ্য পন্থা, মহত্তম শক্তি। অন্য কোনও পথে সমাজতন্ত্র অর্জন সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক,—সর্ববিধ পাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে সত্যাগ্রহ।[৭৯]

জাতীয়করণ

মূল ও প্রধান শিল্পগুলির জাতীয়করণে আমি বিশ্বাসী। এ-ব্যাপারে করাচি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তেব সঙ্গে আমি একমত। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি আমি ভাবতে পারি না। উৎপাদনের সব উপায়ের জাতীয়করণ আমি চাই না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও কী জাতীয়করণ করা হবে? এ সব নিছক দিবাস্বপ্ন।[৮০]

আমি ব্যক্তি উদ্যোগে, সেইসঙ্গে পরিকল্পিত উৎপাদনেও বিশ্বাসী। যদি শুধুই রাষ্ট্রীয় উৎপাদন থাকে, তাহলে মানুষ নৈতিক ও বুদ্ধিগত দিক থেকে নিঃসম্বল হয়ে পড়বে। তারা নিজেদের দায়িত্বও ভুলে যাবে। তাই, পুঁজিপতি ও জমিদারকে আমি কারখানা ও জমি রাখতে দেবো। তবে দেখব, তারা যেন নিজেদের আপন সম্পত্তির অছিদার ছাড়া আর কিছু মনে না করে।[৮১]

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও জাতীয়করণ হতে পারে। শ্রমিকদের সুবিধার কথা ভেবে আমি একটা মিল চালু করতে পারি।[৮২]

৫১. সমাজের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ

যদি দেশকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চালাতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতের সমাজ-ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হবে চরকা ও তার আনুষঙ্গিক সব-কিছু। গ্রামবাসীদের কল্যাণসাধনের সহায়ক যা-কিছু, সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। শিল্পের চাপে যতক্ষণ না গ্রাম ও গ্রামজীবনের নাভিশ্বাস ওঠে ততক্ষণ তাকে...একঘরে করা হবে না।

আমার মনে ছবি ভেসে ওঠে: গ্রামীণ হস্তশিল্পের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে চলেছে,

বিদ্যুৎশক্তি, জাহাজনির্মাণ, লৌহকারখানা, মেশিন নির্মাণ ও এইরকম আরও সব। তবে নির্ভরশীলতার ব্যাপারটি উলটে যাবে। এতকাল, শিল্পায়নের পরিকল্পনা করা হতো গ্রাম ও গ্রামীণ শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। ভবিষ্যতের রাষ্ট্রে গ্রাম ও গ্রামীণ শিল্পের সেবা করবে শিল্পায়ন।

অহিংস ভিত্তি

কেন্দ্রায়ত শিল্পগুলির পরিকল্পনা ও মালিকানা যখন রাষ্ট্রের হবে, জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির কেন্দ্রীকরণ তখনই জনসাধারণের কল্যাণে লাগবে,—এই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের আমি অংশীদার নই। হিংসাশ্রয়ী এক বাতাবরণে পশ্চিমের সমাজতান্ত্রিক ধারণা রূপ নিয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রের মূল অভিপ্রায় একই: সমগ্র সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ, লক্ষ লক্ষ 'নিঃস্ব' ও কতিপয় 'ধনবানে'র মধ্যেকার কুৎসিত বৈষম্যের অবসান। আমি মনে করি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণ যখন নির্মীয়মাণ যথার্থ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে অহিংসাকে গ্রহণ করবে, কেবল তখনই এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে। আমার মতে, সহিংস পথে সর্বহারার ক্ষমতার আগমন, পরিণামে ব্যর্থ হতে বাধ্য। হিংসার দ্বারা যা অর্জিত হয়, বৃহত্তর হিংসার কাছে তার বিনাশ অবধারিত।[৮৩]

একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে স্বাধীনতার সূত্রপাত ঘটা উচিত। এ-ভাবে প্রতিটি গ্রামই হবে এক প্রজাতন্ত্র বা পঞ্চায়েত, যার হাতে থাকবে পূর্ণ ক্ষমতা। এ-থেকে বোঝা যায়, প্রতিটি গ্রামই হবে স্বনির্ভর, নিজেদের কাজ-কারবার চালাবার সামর্থ্যও এদের থাকবে। প্রয়োজনে এরা সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করবে। বহিরাগত আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ এদের থাকবে।

তাই, শেষ পর্যন্ত, ব্যক্তিই হচ্ছে একক। প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভরতা, তাদের স্বেচ্ছা-সহায়তা বা বিশ্বের সহায়তা কিন্তু এর ফলে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে না। এটা হবে বিবিধ মিত্রশক্তির স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আচরণ। ওই রকম একটি সমাজের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে খুবই উঁচু মানের হবে, কারণ এর প্রতিটি নর-নারী জানে সে কী চায়, এটাও জানে, সমান খেটেও অন্যে যা পায় না, তা চাওয়া অনুচিত।

অসংখ্য গ্রাম নিয়ে গঠিত এই কাঠামোতে চিরপ্রসারমান, অনুচ্চাভিমুখী বৃত্ত থাকবে। জীবন পিরামিডের মতো হবে না। যার শীর্ষকে টিকিয়ে রাখে তার তলদেশ। বরং এ-হবে এক মহাসামুদ্রিক বৃত্ত, যার কেন্দ্রে থাকবে ব্যক্তি। যে তার গ্রামের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত, গ্রাম প্রস্তুত থাকবে গ্রামবৃত্তের স্বার্থে ধ্বংস হতে। এ-রকম হতে হতে সমগ্রটি হয়ে উঠবে অসংখ্য ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি জীবন, যা অহমিকার বশে আগ্রাসী নয়, বরং সর্বদা বিনয়াবনত। এরা মহাসামুদ্রিক বৃত্তের মহত্ত্বের অংশীদার হবে—হবে সেই বৃত্তের অবিচ্ছেদ্য একক অংশ।

অতএব, সবচেয়ে বাইরের পরিধি, ভিতরের বৃত্তটিকে চূর্ণ করার জন্য বলপ্রয়োগ করবে না। বরং অভ্যন্তরীণ সকল বৃত্তকে শক্তি জোগাবে। নিজেও শক্তি আহরণ করবে। আমাকে হয়তো এই বলে ঠাট্টা করা হবে—এ-সবই আজগুবি কল্পনা, এর জন্য মাথা

ঘামানো অর্থহীন। মানুষ আঁকতে না পারলেও, ইউক্লিডের জ্যামিতিক বিন্দুর যদি অক্ষয় মূল্য থাকে, তাহলে মানবজাতির ক্ষেত্রে আমার ওই চিত্রও ফেলনা নয়। যদিও এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, তবুও এই সত্য-চিত্রের জন্যই ভারত বেঁচে থাকুক। আমরা যা চাই তার একটা পরিষ্কার ছবি নিয়েই তার দিকে এগোন উচিত। ভারতের প্রতিটি গ্রামে যদি একটি করেও প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, তাহলে আমার ভাবনার চিত্র সত্য হবে। তখন, সবার শেষে যে আছে, সে হবে প্রথম জনের সমান,—বা অন্যভাবে বললে, প্রথম বা শেষ বলে কেউ আর থাকবেই না।[৮৪]

ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস

স্বাভাবিকভাবেই এই সমাজ গড়ে উঠবে সত্য ও অহিংসাকে আশ্রয় করে। আমার মতে, ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস না থাকলে এটা সম্ভব নয়। ঈশ্বর এখানে এক স্বয়ম্ভূ, সর্বজ্ঞ জীবন্ত শক্তি, যা বিশ্বের সকল জ্ঞাত শক্তির মধ্যে বিদ্যমান, যা কোনও কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। অন্য সব শক্তি যখন ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, তখনও এ-শক্তি সপ্রাণ থাকবে। এই সর্বস্পর্শী জীবন্ত আলোকে বিশ্বাস না রেখে আমি নিজের জীবনের হিসেব-নিকেশ করতে পারি না।

আমার এ-চিত্রে সর্ব ধর্মের পূর্ণ ও সমান মর্যাদা। আমরা এক বিশাল বনস্পতির পাতা। যার কাণ্ডকে তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, কেন না তা পৃথিবীর গভীর জঠরে প্রোথিত। দুরন্ত ঝঞ্ঝাও একে টলাতে পারে না।

এর মধ্যে যন্ত্রের কোনও স্থান নেই, যা মানবশ্রমকে স্থানচ্যুত করবে, মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত করবে ক্ষমতা। সংস্কৃতিসম্পন্ন মানব-পরিবারে শ্রমের অনন্য স্থান রয়েছে। স্থান রয়েছে প্রতিটি যন্ত্রের, যা প্রতিটি ব্যক্তিকে সাহায্য করে। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হবে, সে যন্ত্র কী, তা আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি। আমি সিঙ্গারের সেলাই কলের কথা ভেবেছি। কিন্তু সেটাও বাহুল্য। আমার চিত্রে একে জায়গা দেবার দরকার নেই।[৮৫]

৫২. সাম্যবাদী মতবাদ

মূল বিষয়

"সহিংস—হ্রস্বতর—রাস্তায়" অর্জিত সাফল্যে আমার কোনও বিশ্বাস নেই....যোগ্য উদ্দেশ্য বিষয়ে আমার যতই সহানুভূতি থাকুক। তার যত বড় গুণগ্রাহীই হই না কেন। আমি সহিংস পদ্ধতির আপসহীন বিরোধী। যদি তা মহত্তম উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়, তবুও। এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে আমি হিংসার ঘরানার সঙ্গে হাত মেলাতে পারি।

আমার অহিংস মতবাদের জন্যই আমি নৈরাজ্যবাদী-সহ হিংসায় বিশ্বাসী অন্যদের

সঙ্গে মিশতে বাধ্য। অহিংসা আমাকে এ-ব্যাপারে বাধা দেয় না। এ-মেলামেশার উদ্দেশ্য, যে পথকে আমি ভ্রান্ত মনে করি, তা থেকে ওদের সরিয়ে আনা। অভিজ্ঞতায় জেনেছি, অসত্য ও হিংসা থেকে কোনও স্থায়ী শুভ হতে পারে না। আমার এ-বিশ্বাস এক স্নেহান্ধ মোহ বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মোহ হিসেবে এটি অসামান্য।[৮৬]

স্বীকার করি, এখনও বলশেভিকবাদের অর্থ আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। যতটুকু জেনেছি, এর লক্ষ্য ব্যক্তিমালিকানার বিলুপ্তি। এ হল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপরিগ্রহের নৈতিক আদর্শের প্রয়োগ। স্বেচ্ছায় বা শান্তিপূর্ণ পথে জনগণ যদি এ-আদর্শ গ্রহণ করে তাহলে তো কোনও কথাই নেই।

তবে বলশেভিকবাদ বিষয়ে যতটুকু জেনেছি, তাতে বলপ্রয়োগে বাধা দেওয়া দূরে থাক, সে বরং ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার, যৌথ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তা বজায় রাখার জন্য অবাধ বলপ্রয়োগের ঢালাও অনুমতি দেয়। তাই যদি হয়, তবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এখনকার এই বলশেভিক হুকুমতের আয়ু বেশিদিনের নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হিংসার ভিত্তিতে স্থায়ী কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

যাই হোক-না-কেন, এ-কথা অনস্বীকার্য, বলশেভিক আদর্শের পেছনে রয়েছে অসংখ্য নর-নারীর শুদ্ধতম আত্মত্যাগ, যারা এই আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। যে-আদর্শ লেনিনের মতো মহাত্মার আত্মোৎসর্গে পূত, তা ব্যর্থ হতে পারে না। তাঁদের ত্যাগের মহান উদাহরণ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সময় যত এগোবে, বলশেভিক আদর্শকে তা আরও গতিমান ও নির্মলতর করে তুলবে।[৮৭]

পশ্চিমে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ভিত্তি-মূলে রয়েছে এমন কিছু ধারণা, যার সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই রকম একটি ধারণা হল, মানবচরিত্রের স্বার্থপরতায় বিশ্বাস। এতে আমার সায় নেই। আমি জানি, মানুষ ও পশুর মধ্যে মূল প্রভেদ হল, মানুষ আত্মার ডাকে সাড়া দিতে পারে। পশুর মতো তারও রিপু আছে, কিন্তু মানুষ তা জয় করতে পারে। স্বার্থপরতা ও হিংসা, যা পাশব চরিত্রের পরিচায়ক, সে তার ওপরে উঠতে পারে। ওই পাশব চরিত্র মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার সঙ্গে বেমানান।

এটাই হল হিন্দুধর্মের মূল ধারণা। যে সত্য আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে তার বহু বর্ষের তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন। এই কারণেই আমাদের দেশে এমন সাধক এসেছেন, যাঁরা দেহকে ক্ষয় করে, জীবন দিয়ে আত্মার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যের মতো কেউ প্রাণ দেননি, বিশ্বের প্রত্যন্ততম স্থান আবিষ্কার করার জন্য বা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার জন্য। তাই আমাদের সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের ভিত্তি হবে অহিংসা, শ্রমিক ও পুঁজি, জমিদার ও প্রজার মধ্যে সুসঙ্গত সহযোগিতা।[৮৮]

সাম্যবাদের অর্থ

রুশী ধাঁচের সাম্যবাদ, অর্থাৎ যে সাম্যবাদ জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা ভারতে খাপ-খাবে না। বিনা হিংসায় সাম্যবাদ এলে তাকে স্বাগত জানানো হতো। তখন কাউকে কোনও সম্পত্তি রাখতে হলে রাখতে হতো জনগণের হয়ে, বা জনগণের

জন্য। কোটিপতির কোটি কোটি টাকা থাকলেও সে তা জনগণের জন্য রাখত। যখনই সাধারণের স্বার্থে ওই অর্থ প্রয়োজন হতো, রাষ্ট্র তা নিতে পারত।[৮৯]

শেষ বিশ্লেষণে, সাম্যবাদের অর্থ তাহলে কী? এর অর্থ এক শ্রেণীহীন সমাজ। এ এমন এক আদর্শ, যে-জন্য চেষ্টা চালানো উচিত। যখনই তা অর্জনে সহায়তা করার জন্য বলপ্রয়োগের আহ্বান আসে, তখনই আমি সরে দাঁড়াই। সকলে আমরা সমান হয়েই জন্মাই। কিন্তু শত শত বছর ধরে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এসেছি। "উচ্চ ও নীচ" অসাম্যের এই ধারণা এক পাপ। কিন্তু বেয়নেটের ফলা দিয়ে মানুষের হৃদয় থেকে পাপ দূব করায় আমার বিশ্বাস নেই। ওইভাবে মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে সাড়া জাগানো যায় না।[৯০]

সদাশয় বা অন্য কোনওরকম একনায়কতন্ত্রই আমি গ্রহণ করতে পারি না। এতে বড়লোকরা উবে যাবে না, গরিবও সুবক্ষিত হবে না। কিছু ধনী অবশ্যই খুন হবে, কিছু গরিবকে খাবার দেওয়া হবে। একনায়কতন্ত্র "সদাশয়" নামধারী হলেও সেখানে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী থাকবে। প্রকৃত ঔষধ হল অহিংস গণতন্ত্র। যার অর্থ, সকলের জন্য প্রকৃত শিক্ষা। ধনীকে শেখাতে হবে, কী করে দক্ষ নেতৃত্বের যোগ্য হওয়া যায়। আর দরিদ্রকে, কীভাবে নিজেই নিজের সহায়তা করতে হয়।[৯১]

শ্রেণীহীন সমাজই হচ্ছে আদর্শ। একে ধ্যেয় হিসেবে রাখলেই হবে না, এর জন্য কাজ করতে হবে,—সেই সমাজে শ্রেণী বা গোষ্ঠীব কোনও স্থান থাকবে না।[৯২]

আমি নিজেকে সাম্যবাদীও বলি....আমাব সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র থেকে খুব ভিন্ন নয়। এতে দুইয়ের সুসমঞ্জস মিশ্রণ ঘটেছে। আমি যেমন বুঝেছি, সাম্যবাদ হল, সমাজতন্ত্রেব স্বাভাবিক উপসিদ্ধান্ত।[৯৩]

১০. অছিরক্ষণ

৫৩. অছিরক্ষণের সুসমাচার

অহিংস স্বাধীনতার মূল চাবিকাঠি অর্থনৈতিক সাম্য। অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য কাজ করার অর্থ, পুঁজি ও শ্রমিকের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্বের বিলোপ। তার মানে, একদিকে জাতীয় সম্পদের অধিকাংশ যাদের হাতে কেন্দ্রীভূত সেই মুষ্টিমেয় ধনীকে নামিয়ে আনা, অন্যদিকে অর্ধভুক্ত নগ্ন লক্ষ লক্ষ মানুষকে ওপরে তোলা।

মুষ্টিমেয় ধনী ও অসংখ্য দরিদ্রের মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ অহিংস ব্যবস্থার সরকার স্পষ্টতই এক অসম্ভব ব্যাপার। স্বাধীন ভারতে দেশের দরিদ্ররাও সবচেয়ে ধনীদের সঙ্গে সমান ক্ষমতা ভোগ করবে। সেখানে নয়াদিল্লির বড় বড় প্রাসাদ ও তার লাগোয়া দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীর জীর্ণ চালাঘরের বৈপরীত্য একদিনও থাকতে পারে না।

সকলের মঙ্গলের জন্য, সম্পদ ও সম্পদের দৌলতে প্রাপ্ত ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে, সকলের সঙ্গে সম্পদ ও ক্ষমতার সমান অংশীদার না হলে একদিন সহিংস ও রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ঘটবেই।[1]

এ-নিয়ে যতই বিদ্রূপ হোক-না-কেন, আমি আমার অছিরক্ষণের মতবাদে অবিচল থাকব। সেখানে পৌঁছনো কঠিন, এ-কথা ঠিক। তেমনই কঠিন হল অহিংসা। কিন্তু ১৯২০ সালেই আমরা মনস্থির করেছিলাম, এই খাড়াই বেয়ে উঠব। আমরা দেখেছি, এই প্রচেষ্টা অপাত্রে ব্যয়িত হয়নি।[2]

অহিংস পথ

অহিংস পদ্ধতিতে আমরা পুঁজিবাদ ধ্বংস করতে চাই, পুঁজিপতিকে নয়। পুঁজিপতি তার পুঁজির সৃষ্টি। রক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য যাদের ওপরে নির্ভর করে তাদের অছিধারী হিসেবেই সে নিজেকে মনে করুক, এটাই আমরা চাই। কবে পুঁজিপতির সুমতি হবে তার জন্য শ্রমিকের অপেক্ষা করার দরকার নেই। পুঁজি যদি শক্তি হয় তাহলে শ্রমও তা-ই। উভয় শক্তিই বিনাশাত্মক বা সৃজনমূলক লক্ষ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। একে অপরের ওপরে নির্ভরশীল। শ্রমিক তার ক্ষমতা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই পুঁজিপতির দাস হয়ে থাকার বদলে তার সহ-অংশীদার হওয়ার অবস্থানে চলে আসবে।

শ্রমিক একাই মালিক হতে চাইলে, সম্ভবত, স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হাঁসটিকেই সে বধ করবে।

আমি যখন অসহযোগ করব তখন আমার জায়গাটি অন্য কেউ নিয়ে নেবে মনে ক'রে ভয় পেলে চলবে না। কারণ মালিকের অন্যায় কাজে সহায়তা না করার জন্য আমি আমার সহ-শ্রমিকদের প্রভাবিত করার আশা রাখি। রাতারাতি শ্রমিকদের সবাইকে এটা শেখানো যাবে না। প্রক্রিয়াটি মন্থর। কিন্তু একইসঙ্গে সবচেয়ে নিশ্চিত এবং সবচেয়ে দ্রুতগতিও বটে। পুঁজিপতিকে ধ্বংস করলে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক নিজেই ধ্বংস হবে। পাপস্খালনের অযোগ্য নরাধম যেমন কেউ নয় তেমনি অন্যকে ভুলভাবে সর্বাংশে পাপী মনে ক'রে বিনষ্ট করার মতো সর্বগুণান্বিত নরোত্তমও কেউ নয়।[৩]

সমাজকল্যাণ

আজ যারা নিজেদের মালিক বলে মনে করে আমি তাদের নিজেদের অছিধারী বলে গণ্য করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই অছিধারী অর্থাৎ মালিক তারা নিজেদের অধিকারবলে হবে না, হবে যাদের তারা শোষণ করেছে তাদের অধিকারবলে।[৪]

সমাজের সংগঠন বা পরিচালন অহিংস পথে হতে পারে না, এই কথা বলা আজ একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে নিজের বক্তব্য আমি বলছি। পরিবারে পিতা যখন অবাধ্য সন্তানকে চড় মারে, সন্তান বদলা নেওয়ার কথা ভাবে না। বাবাকে সে মানে চড়ের ভয়ে নয়, মানে এর পেছনে যে ক্ষুব্ধ ভালবাসা রয়েছে তার জন্য। সমাজ কী এবং কীভাবে তাকে চালানো উচিত এটাই হল তার সেরা শিক্ষা। পরিবারের পক্ষে যা সত্য, সমাজের পক্ষেও তা সত্য। সমাজ একটি বৃহত্তর পরিবার বই আর কিছু নয়।[৫]

ধরা যাক, উত্তরাধিকারসূত্রে বা বাণিজ্য ক'রে বা শিল্পর কল্যাণে আমি বেশকিছু অর্থলাভ করেছি। তখন আমাকে বুঝতে হবে, এই অর্থ একা আমারই নয়। অন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুতেই আমার অধিকার। বাকি অর্থ সমাজের। তাকে সমাজকল্যাণের কাজে লাগানোই উচিত।

জমিদার ও শাসক-রাজাদের সম্পদের বিষয়ে দেশের সামনে যখন সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব পেশ করা হয়েছিল তখন এই তত্ত্বের কথা আমি বলেছিলাম। তারা চেয়েছিল এই সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি তুলে দিতে। আমি চাই, তারা তাদের লোভ, সম্পদ অধিকারের মোহ কাটিয়ে উঠুক। নিজেদের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যারা শ্রমের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে, তাদের স্তরে নিজেদের নামিয়ে আনুক। শ্রমজীবীকে বুঝতেই হবে যে সে *তার নিজের* অর্থাৎ কাজ করার ক্ষমতার যতটা মালিক, ধনী তার সম্পদের মালিক ততটা নয়।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে

এই সংজ্ঞানুযায়ী কতজন যথার্থ অছিধারী বলে গণ্য হবে—এই প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

তত্ত্বটি যদি ঠিক হয়, তাহলে এর উপযুক্ত লোক একজন কি বহুজন তাতে কিছু যায় আসে না। আসল প্রশ্নটি বিশ্বাসের দৃঢ়তার। তুমি যদি অহিংসার নীতি গ্রহণ করো, তাহলে সাফল্য বা ব্যর্থতার কথা না ভেবে তোমাকে এর যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। এই তত্ত্বে এমন কিছু নেই যা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে, প্রয়োগের পক্ষে ব্যাপারটি কঠিন, এ-কথা বলা অন্যায় হবে না।[৬]

বহু পুঁজিপতি আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং তারা আমাকে ভয় করে না। একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। সর্বাগ্রগণ্য সমাজতন্ত্রী বা এমনকি সাম্যবাদীরা যেভাবে চায় অবিকল সে-ভাবে না হলেও আমারও ইচ্ছা যে পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো, সেটা ঐ পুঁজিপতিরাও জানে। কিন্তু আমাদের পদ্ধতি আলাদা, মনোভাবও পৃথক।

কোনও জোড়াতালি নয়

আমার 'অছিরক্ষণের' তত্ত্ব কোনও জোড়াতালির ব্যাপার নয়। কোনও ছদ্মবেশ তো নয়ই। আমি নিশ্চিত, এই তত্ত্ব অন্য সব তত্ত্বের চেয়ে দীর্ঘজীবী হবে। এর পেছনে রয়েছে দর্শন ও ধর্মের অনুমোদন। সম্পদের অধিকারীরা এখনও তত্ত্বের যোগ্য কাজ করেনি বলে তত্ত্বটি ভ্রান্ত, এমন প্রতিপন্ন হয় না। এতে ধনীদের দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়। অন্য কোনও তত্ত্বই অহিংসার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অহিংস পদ্ধতিতে অন্যায়কারী নিজের অন্যায় না শুধরালে নিজের ধ্বংসের পথই সুগম করে। হয় অহিংস অসহযোগের মাধ্যমে তার ভুল দেখতে সে বাধ্য হয়, নতুবা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[৭]

অর্থার্জন

যারা আজ অর্থের অধিকারী তাদের বলা হচ্ছে অছিধারী হিসেবে আচরণ করে তারা তাদের সম্পদ গরিবের হয়ে গচ্ছিত রাখুক। তোমরা বলতে পারো, অছিরক্ষণ হচ্ছে একটি আইনগত জল্পনামাত্র। কিন্তু লোকে যদি ক্রমাগত একে ধ্যান করে, এর যোগ্য কাজ করার চেষ্টা করে, তাহলে এখনকার তুলনায় পৃথিবী অনেকবেশি ভালবাসার দ্বারা পরিচালিত হবে। চূড়ান্ত অছিরক্ষণ ইউক্লিডের বিন্দুর সংজ্ঞার মতোই বিমূর্ত, তার মতোই এর বাস্তবায়ন অসাধ্য। কিন্তু আমরা যদি এর জন্য সচেষ্ট হই, তাহলে অন্য কোনও পদ্ধাতির চেয়ে বিশ্বে সাম্য অর্জনের পথে অনেক বেশি এগোতে পারব।[৮]

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সচেতনভাবে অন্যায় না করেও সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। ধরা যাক, আমার এক একর জমিতে আমি একটি স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়ে গেছি। কিন্তু আমি এই প্রস্তাবিত বিষয়টি মেনে নিচ্ছি যে, অর্থ অর্জনের তুলনায় অর্থের লোভ মন্দ কাজ, আর তাই আমার উচিত একে অছি হিসেবে রাখা। অনেক আগেই আমি আমার সম্পদ ত্যাগ করেছি, তাই অন্যের কাছে আমি কী প্রত্যাশা করি ওটাই তার প্রমাণ। কিন্তু যারা ধনী বা ধনের মোহ ত্যাগ করতে রাজি নয় তাদের আমি কী পরামর্শ দিতে পারি। আমি শুধু বলব, তাদের উচিত ঐ সম্পদ সেবার কাজে লাগানো।

ধনীরা সাধারণত নিজেদের পেছনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করে এটা ঠিক। কিন্তু

তা এড়ানো যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁর সমপর্যায়ের লোক বা বহু মধ্যবিত্তের চেয়েও যমনালালজী নিজের জন্য কম খরচ করেন। আমি এরকম বহু ধনী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যারা নিজের ব্যাপারে রীতিমত ব্যয়কুণ্ঠ। নিজের জন্য প্রায় কিছুই ব্যয় না-করা অনেকেরই স্বভাবের অঙ্গ। এটা ক'রে কোনও গুণ অর্জন করছে বলে তারা মনেও করে না।

ধনীপুত্রদের বেলাতেও একই কথা খাটে। ব্যক্তিগতভাবে আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদে বিশ্বাসী নই। অবস্থাপন্নদের উচিত, লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের সন্তানদের এমনভাবে মানুষ করা যাতে তারা স্বাধীন হতে শেখে। দুঃখের ব্যাপার, তারা এটা করে না। এদের ছেলেপুলেরা শিক্ষা কিছুটা লাভ করে ঠিকই, দারিদ্রের প্রশংসাসূচক কবিতাও তারা বলতে জানে। কিন্তু পৈতৃক অর্থ করায়ত্ত করতে কোনও বিবেকদংশন বোধ করে না। অবস্থা এরকম বলেই আমি আমার কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ ক'রে যা করা সম্ভব তাই করতে বলছি।

যাই হোক, আমাদের মধ্যে যারা দারিদ্র বরণ করাকে কর্তব্য বলে মনে করে, অর্থনৈতিক সাম্যে বিশ্বাস রাখে ও তা চায়, ধনীদের হিংসা করা তাদের উচিত নয়। বরং দারিদ্রে তাদের প্রকৃত আনন্দ পাওয়া উচিত, অন্যদের যা উদ্বুদ্ধ করবে। এই রকম সুখী লোকের সংখ্যা খুবই কম, এটাই যা খেদের কথা।[৯]

জনসাধারণ বাদে অছিধারীর কোনও উত্তরাধিকারী নেই। অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে অছিধারীদের প্রাপ্য অর্থের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্যান্য ধনীদের সঙ্গে রাজকুমার ও জমিদারদের কোনও ফারাক থাকবে না।[১০]

বেছে নেওয়া

শ্রেণীযুদ্ধ অথবা স্বেচ্ছায় আপন-সম্পদের অছিতে নিজেদের পরিণত করা : আপন-সম্পদের বর্তমান মালিকদের এই দুইয়ের একটিকে বেছে নিতে হবে। সম্পদের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে নিজ প্রতিভা ব্যবহার করার ও সম্পদ বৃদ্ধি করার অধিকার তাদের থাকবে। কিন্তু তা নিজেদের জন্য নয়, জাতির জন্য। অতএব তারা শোষণ করতে পারবে না।

তাদের প্রাপ্য অর্থের হারটি নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। সমাজের প্রতি প্রদত্ত সেবা ও তার মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা ঐ প্রাপ্য পাবে। তাদের সন্তানরা নিজেদের দক্ষতা দেখাতে পারলে তবেই উত্তরাধিকারসূত্রে পরিচালনের অধিকার পাবে।

ধরা যাক, ভারত কাল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। তখন সব পুঁজিপতিই আইনগতভাবে অনুমোদিত অছিধারী হওয়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু সেই অনুমোদন ওপর থেকে চাপানো হবে না। একে আসতে হবে তলা থেকে।

জনগণ যখন অছিরক্ষণের কার্যকারণ বুঝবে, পরিবেশ যখন এর উপযুক্ত হবে, তখন তারা নিজেরাই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অনুরূপ আইন প্রবর্তন শুরু করবে। তৃণমূল স্তর থেকে এলে ব্যাপারটি সহজে গ্রহণীয় হবে। ওপর থেকে চাপালে এটা গুরুভার বলে মনে হবে।[১১]

জমিদার, কিষাণ

জমিদাররা নানা অপরাধ ও অকাজ-কুকাজের দোষে দোষী—তর্কের খাতিরে এ-কথা মেনে নিতে আমি রাজি। কিন্তু তাই বলে কিষাণ ও কৃষিশ্রমিকরাও ওই অপরাধ অনুকরণ করবে, এটা কোনও যুক্তি নয়। তারাই তো "পৃথিবীর লবণ। কিন্তু লবণের লোনা স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যাইবে?"....

জমিদারদের আমি সতর্ক করে দিয়ে বলছি, তোমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে জেনে রেখো দিন তোমাদের ঘনিয়ে এসেছে। মালিক ও প্রভু হিসেবে বেশিদিন তোমরা চালাতে পারবে না। যদি তোমরা গরিব কৃষকদের অছিধারী হও তাহলে তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শুধু নামে নয়, আমি বাস্তবে অছিধারী হওয়ার কথা বলছি। নিজেদের শ্রম ও যত্নের জন্য যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি তারা নিজেদের জন্য নেবে না। তখন তারা দেখবে, কোনও আইন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কিষাণরা হবে সেই অছিধারীদের বন্ধু।[১২]

জমিদাররা যদি রায়তদের স্বার্থে তাদের জমিদারির প্রকৃত অছিধারী হয়ে ওঠে তাহলে কখনও কোনও অশুভ আঁতাত (দুপক্ষের মধ্যে) গড়ে উঠবে না। জমিদারির জটিল প্রশ্নটি সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে...যেটা সব দিক দিয়ে শ্রেয় তা হল, বড়-ছোট নির্বিশেষে জমিদার, রায়ত ও সরকারের মধ্য এক যথোপযুক্ত নিরপেক্ষ ও সন্তোষজনক সমঝোতা। এই আইন যখন অনুমোদিত হবে তখন সেটা যেন নিষ্প্রাণ একটি মুসাবিদা না হয়। আবার, জমিদার বা রায়তদের বিরুদ্ধে যেন বলপ্রয়োগও না হয়। সারা ভারত জুড়ে রক্তপাত ও বলপ্রয়োগ ছাড়া এইসব পরিবর্তন ঘটে যাবে যার মধ্যে আমূল বৈপ্লবিক ধরনের কিছু আছে।[১৩]

*অছিরক্ষণের কার্যকর সূত্র**

১. অছিরক্ষণ হল বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজকে সমতাবাদী সমাজে পরিবর্তিত করার উপায়। এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না, কিন্তু বর্তমান মালিক শ্রেণীকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দেয়। মানবচরিত্র কখনওই পাপমোচনের অতীত নয়—এই বিশ্বাসই হল এই তত্ত্বের ভিত্তি।

২. সমাজ তার নিজস্ব কল্যাণের জন্য যতটা অনুমোদন করে তা ছাড়া সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা এই তত্ত্ব স্বীকার করে না।

৩. মালিকানা এবং সম্পদের ব্যবহার সম্বন্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এই তত্ত্ব নাকচ করে না।

৪. অতএব, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অছিরক্ষণে আত্মতৃপ্তির জন্য বা সমাজের স্বার্থ উপেক্ষা করে সম্পদ রাখার বা তা ব্যবহার করার অধিকার কারও থাকবে না।

* কিশোরলাল মাশরুওয়ালা ও নরহরি পারিখ এই "সরল, কার্যকর অছিরক্ষণের সূত্রটি" রচনা করেন এবং কয়েকটি পরিবর্তনের পর গান্ধীজি এটি অনুমোদন করেন।

৫. ভদ্রোচিত জীবনধারণের জন্য যেমন ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব রয়েছে, তেমনই সমাজের কোনও ব্যক্তির আয়ের সর্বোচ্চ সীমাও নির্ধারণ করা আবশ্যক। এই ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ আয়ের মধ্যেকার ফারাক যুক্তিযুক্ত, সমতাভিমুখী এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনীয় হতে হবে। যার লক্ষ্য ওই ব্যবধান দূর করা।
৬. গান্ধীবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের চরিত্র নির্ধারণ করবে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা। ব্যক্তিগত মর্জি বা লোভ নয়।[১৪]

৫৪.অহিংস অর্থনীতি

অর্থনীতি, নীতিবোধ

আমাকে স্বীকার করতেই হবে, অর্থনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে কোনও স্পষ্ট বিভাজন আমি করি না। যে অর্থনীতি কোনও ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা অনৈতিক, অতএব পাপযুক্ত। তাই, যে অর্থনীতি এক দেশকে অন্য দেশের শিকারে পরিণত করে তা নীতিবর্জিত। ঘামঝরানো শ্রমের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি কেনা বা ব্যবহার করাও পাপ।[১৫]

যে অর্থনীতি নৈতিক বা অনুভূতির বিষয়গুলি বিচার করে না, তা মোমের পুতুলের মতো। দেখতে জীবন্ত হলেও এতে জীবন্ত দেহের প্রাণ নেই। প্রতিটি সংকটের মুহূর্তেই এই নতুন ধারার অর্থনৈতিক সূত্রগুলি বাস্তবে ধসে পড়েছে। যে জাতি বা ব্যক্তি এগুলিকে নিয়ামক-নীতি হিসেবে গ্রহণ করবে তারাও ধ্বংস হতে বাধ্য।[১৬]

নৈতিক মূল্যবোধগুলি যে অর্থনীতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে তা অসত্য। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অহিংসার নীতির সম্প্রসারণের অর্থ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি উপাদান হিসেবে নৈতিক মূল্যবোধের বিচার।[১৭]

আদর্শ অর্থনীতি

আমার মতে, ভারত তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংবিধান এমনভাবে প্রণীত হওয়া উচিত যাতে কেউ অন্নবস্ত্রের অভাব বোধ না করে। অন্যভাবে বললে, প্রত্যেকেরই পর্যাপ্ত কাজ থাকতে হবে যাতে সে ওই দুটি সমস্যা মেটাতে পারে।

এই আদর্শ তখনই বিশ্বময় বাস্তবায়িত হতে পারে যখন জীবনের মৌলিক প্রয়োজন-সাধক উৎপাদনের উপায় জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এগুলি ঈশ্বরপ্রদত্ত বাতাস ও জলের মতোই বিনামূল্যে পাওয়া উচিত বা তার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এগুলিকে অন্যদের শোষণ করার সচল যন্ত্র হিসেবে কাজে লাগানো চলবে না। এইভাবে কোনও দেশ, জাতি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ অন্যায় বলে গণ্য হবে। কেবল এই অভাগা দেশেই নয় বিশ্বের অন্যত্রও আজ যে দুঃখদুর্দশা দেখি, এই সহজ নীতিটিকে উপেক্ষা করাই তার কারণ।[১৮]

প্রকৃত অর্থনীতি কখনও উচ্চতম নৈতিকতার প্রতিকূল হয় না। তেমনই নীতিবোধ যদি সত্যিই যথার্থ হয়, তাহলে অর্থনীতি হিসেবেও তা শুভ। যে অর্থনীতি কুবেরের উপাসনা করে, দুর্বলকে শোষণ করে, শক্তিমানকে সম্পদ আহরণে সহায়তা করে, তা মিথ্যা ও অপবিজ্ঞান। এ অর্থনীতি মরণই ডেকে আনে। অন্যদিকে, প্রকৃত অর্থনীতি সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায়, দুর্বলতমসহ সমভাবে সকলের মঙ্গল করে। ভদ্র জীবনযাপনের পক্ষে এটা অপরিহার্য।[১৯]

আমরা যদি শুধু আমাদের ঘরবাড়ি, আমাদের প্রাসাদ ও মন্দিরগুলিকে সম্পদের প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত ক'রে সেখানে নৈতিকতার গুণাবলী আরোপ করি, তাহলে সজ্জিত এক সেনাবাহিনীর খরচ বহন না করেও বিরোধী শক্রশক্তির যে-কোনও জোটের সঙ্গে লড়াই করতে পারব। এ-জন্য প্রথমেই আমরা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ন্যায়বিচার প্রার্থনা করব। তাহলেই সেই অপরিবর্তনীয় প্রতিশ্রুতির আশীর্বাদে সবই আমাদের হবে। এই হল প্রকৃত অর্থনীতি। তুমি ও আমি একে যেন মহার্ঘ বলে রক্ষা করতে পারি, কাজে লাগাতে পারি নিজেদের জীবনে![২০]

ন্যূনতম হিংসা

সত্যি কথা বলতে কি, কোনও কাজ বা কোনও শ্রমশিল্পই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হিংসা ছাড়া হতে পারে না, তা সে যত অল্পই হোক-না-কেন। এমনকি জীবনধারণের প্রক্রিয়াটিও কিছু পরিমাণ হিংসা বাদে সম্ভব নয়। আমাদের কাজ হবে এর পরিমাণ একেবারে কমিয়ে আনা। বস্তুত, অহিংসা শব্দটি নেতিবাচক। যার অর্থ, জীবনে যা অপরিহার্য সেই হিংসা পরিহার করার প্রয়াস। অতএব অহিংসায় বিশ্বাসী প্রত্যেককে এমন বৃত্তি বেছে নিতে হবে যেখানে হিংসার পরিমাণ কম।

যেমন, কসাইয়ের কাজ করে অথচ অহিংসায় বিশ্বাসী, এমন কোনও লোকের কথা ভাবাই কঠিন। মাংসাশী ব্যক্তি অহিংস হতে পারে না এমন নয়.... কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাসী কোনও মাংসাশী ব্যক্তিও শিকার করতে যাবে না, যুদ্ধ বা যুদ্ধপ্রস্তুতির সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না। এমন বহু কাজ ও বৃত্তি আছে যার সঙ্গে হিংসা জড়িত। অহিংস ব্যক্তির উচিত সেগুলি পরিহার করা।

এছাড়াও রয়েছে কৃষি। যা বাদ দিয়ে জীবনযাপন অসম্ভব। কিছুটা হিংসা এর সঙ্গেও জড়িত। অতএব, জীবিকাটি হিংসাব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কি না, এটাই হবে নিয়ামক ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু সব কাজেই কিছুটা হিংসার অবকাশ থেকেই যায় তাই আমাদের উচিত সেই হিংসাকে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনা। অহিংসায় হার্দিক বিশ্বাস বাদে এটা সম্ভব নয়।

কোনও ব্যক্তি হয়তো প্রত্যক্ষভাবে হিংসাত্মক কিছু কবে না। রুজি রুটির জন্য সে শ্রম করে। কিন্তু অন্য লোকের সম্পদ বা প্রতিষ্ঠা দেখে হিংসায় জ্বলে মরে। সে অহিংস নয়। অতএব অহিংস জীবিকা হল তা-ই যা মৌলিকভাবে হিংসামুক্ত। যার মধ্যে শোষণ ও ঈর্ষা নেই।

গ্রামীণ অর্থনীতি

ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভারতে একসময় গ্রামীণ অর্থনীতি ওই রকম অহিংস জীবিকার ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। যার মূলে ছিল মানুষের কর্তব্য, অধিকার নয়। যারা ওই সব পেশায় নিযুক্ত ছিল তারা বাঁচার জন্য আয় করত। কিন্তু তাদের শ্রম সমাজের কল্যাণে কাজে লাগত....।

এই সব বৃত্তি ও শিল্পের মূলে ছিল কায়িক শ্রম। যেখানে কোনও বড় ধরনের যন্ত্র ছিল না। যতটা জমি সে নিজে চাষ করতে পারে তাই নিয়েই যদি একজন সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে অন্যদের শোষণ করতে পারে না। কুটিরশিল্পে শোষণ ও দাসত্ব নেই।

বড় বড় যন্ত্র একজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে। সে বাকিদের ওপরে প্রভুত্ব ফলায়। তারা তার দাস হয়ে থাকে। তার কর্মীদের জন্য আদর্শ কাজের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হয়তো সে করতে পারে কিন্তু তাতে শোষণ বিন্দুমাত্র কমে না। এটা এক ধরনের হিংসা।

যখন আমি বলি, এমন একটা সময় ছিল যখন সমাজ, শোষণের বদলে ন্যায়বিচারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এই কথাই বোঝাতে চাই যে সত্য ও অহিংসা কেবল ব্যক্তিত্ব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, জনগোষ্ঠীও তা কাজে লাগাত। কোনও গুণ যদি শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেই সাধ্য বা তার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহলে সে-গুণ আমাব কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।[২১]

৫৫. অর্থনৈতিক সমতা

বুদ্ধিবৃত্তির বা এমনকি সুযোগের ক্ষেত্রে অসাম্য চিরকাল থাকবে। যে নদীর ধারে বাস কবে সে মরুবাসীর তুলনায় অনেক সহজেই শস্য ফলাতে পারে। এই প্রকট অসাম্যের মধ্যেও মূলগত যে সাম্য সেটাও কিন্তু নজর এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।[২২]

আমার ভাবনায় সমাজ

সমাজ সম্বন্ধে আমরা ধারণা এইরকম: যদিও আমরা সকলেই সমান হয়ে জন্মাই অর্থাৎ সমান সুযোগের অধিকার আমাদের থাকলেও সকলের ক্ষমতা সমান হয় না। প্রকৃতির কারণেই এটা সম্ভব নয়। যেমন, উচ্চতা, গায়ের রঙ বা বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাণ সকলের সমান হতে পারে না। অতএব ওই প্রকৃতিগত কারণেই উপার্জনের ক্ষমতা কারও বেশি থাকে, অন্যদের কম।

যাদের প্রতিভা আছে তাদের উপার্জনও বেশি হবে। তাদের দক্ষতা এই উদ্দেশ্যে তাবা কাজে লাগাবে। তারা যদি শুভেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে তাদের প্রতিভা কাজে লাগায়

তাহলে রাষ্ট্রের কাজ করবে। এরা অছিধারী হিসেবেই থাকবে, অন্যভাবে নয়।

আমি বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বেশি রোজগার করতে দেব। তার প্রতিভাকে বেড়ি পরিয়ে রাখব না । কিন্তু তার বাড়তি রোজগারের বেশির ভাগই রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। যেমন পিতার রোজগেরে পুত্রদের যাবতীয় অর্থ সাধারণ পারিবারিক তহবিলে জমা হয়। এরা শুধু অছিধারী হিসেবে নিজেরা রোজগার করতে পারবে।[২৩]

এর কারণ, আমি চাই মর্যাদার সমতা। এতকাল ধরে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিচের স্তরে ফেলে রাখা হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে শূদ্র। আর শব্দটির ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যাতে হীনতর বর্গকেই বোঝায়। তাঁতি, কৃষিজীবী আর স্কুলশিক্ষকের পুত্রদের মধ্যে কোনও প্রভেদ আমি মানি না।[২৪]

অসাম্য দূরীকরণ

আক্ষরিক অর্থেই সকলে সম-পরিমাণ পাবে—আমার অর্থনৈতিক সাম্যের ধারণা কিন্তু তা নয়। এর সহজ অর্থ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে। ....অর্থনৈতিক সাম্যের প্রকৃত অর্থ, "প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী"—এটা মার্কস-এর সংজ্ঞা। একা একজন ব্যক্তি যদি, স্ত্রী ও চার সন্তানসহ আর এক ব্যক্তির সমান দাবি করে তাহলে অর্থনৈতিক সাম্য লঙ্ঘন করা হয়।

উচ্চশ্রেণী ও জনগণ, রাজপুত্র ও ভিখারি—এদের মধ্যেকার আকাশ-পাতাল ফারাককে কেউ যেন এই বলে বোঝাতে চেষ্টা না করে যে প্রথমোক্তদের দরকার বেশি। এটা অযথা কুতর্ক। আমার যুক্তিকে প্রলাপে পরিণত করার চেষ্টা।

আজ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার বৈপরীত্য এক পীড়াদায়ক দৃশ্য। গরিব গ্রামবাসীদের শোষণ করছে...তাদেরই দেশের মানুষ, নগরবাসীরা। তারা খাদ্য উৎপাদন করছে। অথচ অনাহারে মরছে। দুধের জোগান দিচ্ছে কিন্তু তাদের শিশুরা দুধ পাচ্ছে না। এ অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার।

প্রত্যেকেরই দরকার সুষম খাদ্য, ভদ্রস্থ বাসস্থান, সন্তানের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত চিকিৎসার সহায়তা....

আমার পরিকল্পনায়, রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করবে। তাদের হুকুম করবে না বা নিজের ইচ্ছানুযায়ী চালাতে জোর ফলাবে না। আমি অহিংসার পথে অর্থনৈতিক সাম্য আনব। তার জন্য বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রেমের শক্তি জাগ্রত ক'রে আমি মানুষকে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে মতান্তরিত করব। গোটা সমাজকে আমার মতে আনার জন্য আমি অপেক্ষা করব না। বরং সরাসরি নিজেকে দিয়ে এর সূচনা করব। আমার নিজেরই যদি পঞ্চাশটা মোটরগাড়ি বা এমনকি দশ বিঘা জমিও থাকে তাহলে আমার ধারণাগত অর্থনৈতিক সাম্য যে আমি কখনও আনতে পারব না সে-কথা বলা বাহুল্যমাত্র। সেই জন্য আমাকে দরিদ্রের জগতে যে দরিদ্রতম তার জায়গায় যেতে হবে।[২৫]

সকলেরই সমান সুযোগ থাকতে হবে। সুযোগ পেলে প্রত্যেকেরই আধ্যাত্মিক বিকাশের সমান সম্ভাবনা রয়েছে।[২৬]

সহিংস পদ্ধতি বাদে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত [পুঁজি] অর্জন অসম্ভব। কিন্তু অহিংস সমাজে রাষ্ট্র কর্তৃক পুঁজি আহরণ শুধু সম্ভবই নয়, এটা কাম্য ও অবধারিত। ['সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তা বা সহযোগিতায় সঞ্চিত বৈষয়িক বা নৈতিক সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করার'] নৈতিক অধিকার [কোনও ব্যক্তির নেই]।[২৭]

আজ চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অসাম্য রয়েছে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই হচ্ছে অর্থনৈতিক সাম্য। অন্যায় অসাম্যের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে, যেখানে মুষ্টিমেয় সম্পদে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর জনগণ প্রয়োজনীয় খাদ্যটুকুও পাচ্ছে না, সেখানে কোনও রামরাজ্য হতেই পারে না।[২৮]

সমবণ্টনের মতবাদ

আমাদের জাতীয় ক্ষমতা আমরা সংগঠিত করতে চাই। শুধুমাত্র উৎপাদনের সর্বোত্তম পদ্ধতি এর জন্য গ্রহণ করলেই চলবে না, উৎপাদন ও বণ্টন, এই উভয়ক্ষেত্রে সেরা পদ্ধতি গ্রহণ করলে তবেই এটা সম্ভব।[২৯]

ভারতের আজ যা দরকার তা মুষ্টিমেয়র হাতে পুঁজির কেন্দ্রীভবন নয় বরং সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের মধ্যে এর বণ্টন। এই গ্রামগুলির জন্যই তো এই দেশ আয়তনে এত বিশাল—দৈর্ঘ্যে ১৯০০ মাইল ও প্রস্থে ১৫০০ মাইল।[৩০]

আমার আদর্শ: সমবণ্টন। কিন্তু আপাতত যতদূর দেখতে পাচ্ছি তা হবার নয়। তাই আমি সমতামুখী বণ্টনের জন্য কাজ করছি।[৩১]

সমবণ্টনের প্রকৃত অর্থ প্রত্যেকে তাব স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুযায়ী যা-যা অবশ্যক সবই পাবে কিন্তু তার বেশি নয়। যেমন ধবা যাক, হজমশক্তি দুর্বল বলে এক ব্যক্তির রুটি তৈবিব জন্য আটা লাগে সিকি পাউণ্ড। অন্য আর একজনের লাগে এক পাউণ্ড। এরা দু'জনেই তাদের প্রয়োজন মতো পাবে।

নয়া সমাজব্যবস্থা

এই আদর্শ রূপায়িত করার জন্য গোটা সমাজব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। অহিংসাভিত্তিক কোনও সমাজ অন্য কোনও আদর্শ লালন করতে পাবে না। আমরা হয়তো এই অভীষ্টসাধনে সমর্থ হব না। কিন্তু এই লক্ষ্যের কথা মনে রেখে, সেখানে পৌঁছবার জন্য নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে।

আমাদের লক্ষ্যের দিকে আমরা যত এগিয়ে যাব সেই অনুপাতে পরিতৃপ্তি ও সুখ লাভ করব। সেই অনুপাতে একটি অহিংস সমাজ গড়ার কাজে আমরা অবদান রাখতে পারব।

অন্যের প্রতীক্ষায় না থেকে, একা একজনেব পক্ষে এই জীবনধারা গ্রহণ করা খুবই সম্ভব। একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট আচরণ বিধি মেনে চলতে পারে তাহলে একটি দলও যে সেটা পারে তা অনায়াসে বোঝা যায়। এখানে একটা ব্যাপারের ওপরে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। ঠিক পথে চলার জন্য অন্যের মুখ চেয়ে বসে থাকার প্রয়োজন নেই।

অভীষ্ট সর্বাংশে সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থাকে বলেই মানুষ সাধারণত প্রথম পদক্ষেপটি নিতে ইতস্তত করে। এই মনোভাব প্রগতির পথে বাধা।

অহিংসার মাধ্যমে

অহিংসার মাধ্যমে কীভাবে সমবণ্টন আনা যায় তা দেখা যাক। এই আদর্শ যে নিজের সত্তার অংশে পরিণত করেছে তার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে নিজের জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা। সে ভারতের দারিদ্রের কথা মনে রেখে ব্যক্তিগত চাহিদা ন্যূনতমে নামিয়ে আনবে। তার রোজগার অসাধুতা থেকে মুক্ত হবে। ফাটকার বাসনা সে বর্জন করবে। জীবনের এই নতুন ধারার সঙ্গে তার ঘর-করার ব্যাপারটিও সঙ্গতিপূর্ণ হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে আত্মসংযমের পরিচয় দেবে। নিজের জীবনে যা-কিছু করা সম্ভব সেটা করার পর সে এই আদর্শ তার সহযোগী ও প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচার করার যোগ্যতা লাভ করবে।

সমবণ্টনের এই মতবাদের মূলে থাকবে, ধনীদের বাড়তি সম্পদ সম্বন্ধে অছিরক্ষণের বিষয়টি। কারণ এই মতবাদ অনুযায়ী তারা তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে এক কপর্দকও বেশি রাখতে পারে না।

এটা কীভাবে সম্ভব? অহিংস পথে, নাকি ধনীদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে? তা করতে হলে স্বভাবতই আমাদের হিংসার পথ নিতে হবে। এই সহিংস-ক্রিয়া সমাজের মঙ্গল করতে পারে না। সমাজই এর ফলে দরিদ্রতর হবে। সে এমন একটি লোকের প্রতিভা হারাবে যে ধন অর্জন করতে জানে। অতএব, অহিংস পথটি অবশ্যই শ্রেয়। ধনী কেবল তার ধনের অধিকারী থাকবে। তার যা ব্যক্তিগত প্রয়োজন তা যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে নেবে। বাকিটুকু সমাজের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সে অছিধারী হিসেবে রক্ষা করবে। এ-ক্ষেত্রে অছিধারীর সততার বিষয়টি ধরেই নেওয়া হয়েছে।

মানবপ্রকৃতিতে পরিবর্তন

মানুষ যখন নিজেকে সমাজের সেবক বলে মনে করে, তারই জন্য আয় করে, সমাজেরই কল্যাণার্থে তা খরচ করে, তখন তার আয় সততাযুক্ত হয়। তার উদ্যোগের মধ্যে অহিংসা বিরাজ করে। এছাড়াও এই জীবনধারার দিকে মানুষের মন যদি ফেরে তাহলে সমাজে কোনও তিক্ততা ছাড়াই এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লব আসবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মানবপ্রকৃতিতে ওই রকম পরিবর্তনের কোনও নজির কী ইতিহাসে রয়েছে? ওই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে ব্যক্তিজীবনে ঘটেছে। সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে হয়তো দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু এর একমাত্র কারণ হল, এখন পর্যন্ত ব্যাপক ক্ষেত্রে অহিংসার কোনও পরীক্ষা হয়নি।

অহিংসার প্রযোজ্যতা

কোনও-না কোনওভাবে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসটি আমাদের মধ্যে এসেছে যে, অহিংসা হল মূলত ব্যক্তিবিশেষের আয়ুধ এবং এর ব্যাপারও ওই বৃত্তের মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে। আদপে ব্যাপারটা তা নয়। অহিংসা নিঃসন্দেহে সমাজেরই বিষয়। জনগণকে এই সত্য সম্বন্ধে অবহিত করাটাই আমার চেষ্টা, আমার পরীক্ষা।

বর্তমান বিস্ময়ের যুগে, একটি জিনিস বা ধারণা নতুন বলে কেউ তাকে মূল্যহীন বলবে না। কঠিন বলেই এটি অসম্ভব বলাটাও যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। স্বপ্নেও যা কেউ দেখেনি তা প্রতিদিনই দৃশ্যমান হচ্ছে। অসম্ভব হয়ে উঠছে সম্ভব। আমরা আজকাল প্রায় রোজই হিংসার ক্ষেত্রে সাঙ্ঘাতিক সব উদ্ভাবন দেখে হতবাক হচ্ছি। কিন্তু আমি মনে করি, আরও অকল্পনীয় ও আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব সব উদ্ভাবন অহিংসার ক্ষেত্রে ঘটতে চলেছে। ধর্মের ইতিহাসে এরকম উদাহরণ অনেক....

এর পরেও, যদি সব চেষ্টা সত্ত্বেও, ধনীরা প্রকৃত অর্থে দরিদ্রদের অভিভাবক না হয়ে ওঠে এবং দরিদ্ররা যদি দিনকে-দিন আরও বেশি নিষ্পেষিত হয়, ক্ষুধায় মারা পড়ে, তাহলে কী করা যাবে? এই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমি সঠিক ও অভ্রান্ত উপায়ের সন্ধান পেয়েছি— অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য। সমাজের দরিদ্রদের সহযোগিতা ভিন্ন ধনীরা সম্পদ আহরণ করতে পারে না।

মানুষ গোড়া থেকেই হিংসার সঙ্গে পরিচিত। কারণ এই ক্ষমতা সে তার স্বভাবের পাশবিকতা থেকে পেয়েছে। যখন সে চতুষ্পদের (পশু) পর্যায় থেকে দ্বিপদের (মানুষ) পর্যায়ে উঠেছে তখন অহিংসার ক্ষমতা বিষয়ক জ্ঞান তার আত্মায় জাগরিত হয়েছে। ধীরে হলেও নিশ্চিত গতিতে তার মধ্যে এই জ্ঞান বিকাশলাভ করেছে। এই জ্ঞান যদি দরিদ্রদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও প্রসার লাভ করে তাহলে তারা শক্তিধর হয়ে উঠবে। যে ভয়াবহ অসাম্য তাদের অনাহারের প্রান্তবাসী করে রেখেছে তার থেকে অহিংস উপায়ে নিজেদের মুক্ত করতে শেখাবে।[৩২]

১১. ব্রহ্মচর্য

৫৬. ব্রহ্মচর্যের সুসমাচার

আত্মসংযম

মানবসমাজ এক নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ, আধ্যাত্মিক অর্থে এক উন্মোচন। তাই যদি হয় তাহলে এর ভিত্তি হওয়া উচিত দেহের চাহিদার ওপরে ক্রমবর্ধমান সংযম। অতএব বিবাহকে মনে করতে হবে অংশীদারদের এক পবিত্র শৃঙ্খলার বন্ধন। যার ফলে শুধু মাত্র জন্মদানের জন্য দু'পক্ষ ইচ্ছুক ও প্রস্তুত থাকলে দৈহিক মিলন ঘটাতে পারে।[১]

মানুষের সঙ্গে পশুর মূল পার্থক্য হল, মানুষ চোদ্দ বছর বয়স থেকে ক্রমাগত আত্মসংযমের জীবন যাপন করে। ঈশ্বর পুরুষকে তার বোন, তার মা, তার কন্যা ও তার স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ করতে শিখিয়েছেন।[২]

ব্রহ্মচর্যের আবশ্যকতা

বর্তমানের এই দুর্দশার একটা বড় অংশ এড়ানো সম্ভব যদি নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ককে আমরা স্বাস্থ্যকর ও অমল আলোকে দেখি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক কল্যাণের অছিধারী বলে নিজেদের মনে করি।[৩]

ব্রহ্মচর্য-বর্জিত জীবন আমার কাছে পানসে ও পশুসুলভ। পশু তার প্রকৃতিগত কারণেই কোনও আত্মসংযম জানে না। আত্মসংযমের সামর্থ্য মানুষের আছে। তবে এই আত্মসংযম যতখানি সে প্রয়োগ করে, ততটাই সে মানুষ নামের যোগ্য। আমাদের ধর্মগ্রন্থে ব্রহ্মচর্যের যে প্রশস্তি রয়েছে, আগে তা আমার কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হতো। এখন, যত দিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে ওই প্রশংসা যথার্থ এবং অভিজ্ঞতানির্ভর।[৪]

আমি মনে করি, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য আবশ্যক চিন্তায়, কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ সংযমের এক জীবন। যে জাতির তেমন মানুষের অভাব, তারা বড়ই দীন।[৫]

ঈশ্বরে বিশ্বাস

ঈশ্বরে অর্থাৎ জীবন্ত সত্যে জীবন্ত বিশ্বাস না থাকলে ইন্দ্রিয়-সংযমের নিয়ম মেনে চলা অসম্ভব, এ-কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য। আজকাল ঈশ্বরকে পুরোপুরি অস্বীকার

ক'রে, জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস বাদ দিয়ে উচ্চতম জীবনে পৌঁছনোর সম্ভাবনায় জোর দেওয়া প্রায় কেতায় পরিণত হয়েছে। ঈশ্বরে যাদের বিশ্বাস নেই, যারা তাদের থেকে অনন্তগুণে বৃহত্তর এক ক্ষমতার কোনও প্রয়োজন অনুভব করে না, তাদের এই সত্য বোঝাবার সাধ্য আমার নেই তা আমি স্বীকার করছি। নিজের অভিজ্ঞতায় যা জেনেছি তা হল, যে-প্রাণবন্ত নিয়ম মেনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে তাতে অবিচলিত বিশ্বাস না থাকলে পূর্ণতম জীবন অসম্ভব।[৬]

যে জীবন্ত শক্তিকে আমরা ঈশ্বর বলি .....তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব যদি আমরা তাঁর নিয়ম অনুসরণ ক'রে আমাদের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করি। ঈশ্বরের নিয়ম খুঁজে পেতে হলে কঠোরতর পরিশ্রম দরকার এটা স্বতঃ প্রমাণিত। এই নিয়মকে এককথায় ব্রহ্মচর্য বলা যায়। ব্রহ্মচর্য চর্চার সহজ পথ রামনাম উচ্চারণ।[৭]

প্রকৃত অর্থ

ব্রহ্মচর্যের পূর্ণ ও যথার্থ অর্থ হল ব্রহ্ম-র অন্বেষণ। ব্রহ্ম যেহেতু প্রতিটি সত্তায় পরিব্যাপ্ত, অতএব অন্তঃসত্তাব মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে উপলব্ধি ক'রে সন্ধান করা যায়। ইন্দ্রিয়ের পূর্ণনিবৃত্তি ব্যতীত এই উপলব্ধি অসম্ভব। তাই ব্রহ্মচর্যের অর্থ সর্বক্ষণ ও সর্বত্র চিন্তায়, কথায় ও কাজে সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ।

পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্যপালনকারী পুরুষ বা নারী সম্পূর্ণ রিপুমুক্ত। সে শুধু ঈশ্বরের সমীপস্থ নয়, সে ঈশ্বরোপম। চিন্তায়, কথায় ও কাজে অনুরূপ ব্রহ্মচর্য পূর্ণভাবে পালন করা যে সম্ভব, তাতে আমার সন্দেহ নেই।[৮]

ব্রহ্মচর্য কী? এ হল এমন এক জীবনধারা যা আমাদের ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) কাছে নিয়ে যায়। জন্মপ্রদানের প্রক্রিয়ার ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যার অন্তর্গত। এই নিয়ন্ত্রণ 'কায়েনমনসাবাচা' হতে হবে। চিন্তা যদি অনিয়ন্ত্রিত হয়, কথা ও কাজের কোনও মূল্য থাকে না। হিন্দুস্থানিতে একটি প্রবাদ রয়েছে, "হৃদয় যার শুদ্ধ—তারই গৃহে রয়েছে গঙ্গার পতিতপাবনী পবিত্রবারি।" চিন্তা যার নিয়ন্ত্রণে তার কাছে অন্যগুলি ছেলেখেলা। আমি যে ব্রহ্মচারীর কথা বলছি সে হবে স্বাস্থ্যবান। সহজেই দীর্ঘজীবী হবে। এমনকি মাথাও ধরবে না। মানসিক ও কায়িক শ্রম তাকে দুর্বল করবে না। সবসময়েই সে প্রাণোচ্ছল, কখনও আলসে নয়। বহিরঙ্গের পরিচ্ছন্নতা হবে তার অন্তরের যথাযথ প্রতিফলন। 'গীতা'য় যে স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলা হয়েছে তার সব গুণই তার থাকবে। এ বর্ণনার সঙ্গে একজনেরও যদি মিল না-দেখা যায় তাহলেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

যে-ব্যক্তি মানবসৃষ্টিক্ষম শুক্রের সঞ্চয়কারী ও উর্ধ্বরেতা, সে-ই যদি উপরোক্ত প্রতিটি গুণ প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়—তাতে বিস্ময়ের কিছু আছে কি? ওই অস্খলিত বীর্যের সৃজনশীল ক্ষমতা কে পরিমাপ করতে পারে, যার এক বিন্দু স্খলন একটি প্রাণের রূপকার হবার যোগ্য?[৯]

সংজ্ঞা

চিন্তা যতক্ষণ না ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে, ততক্ষণ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য অনুপস্থিত। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিন্তা, মনের একটি আসক্তি। চিন্তার নিবৃত্তি অতএব চিত্তের নিবৃত্তি। বাতাস নিয়ন্ত্রণের চেয়েও এটা কঠিন। তবুও অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি চিত্তের নিয়ন্ত্রণও সম্ভব ক'রে তোলে। কঠিন বলে এটা অসম্ভব, কেউ যেন তা মনে না করে। এ হল সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তাই বোঝা কঠিন নয়, কেন তা অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস দরকার।[১০]

মন

অন্যসব সমাচরণের মতোই ব্রহ্মচর্যও চিন্তায়, কথায় ও কাজে পালন করতে হবে। 'গীতা'য় বলা হয়েছে এবং অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, কোনও নির্বোধ আপাতদৃষ্টিতে তার দেহ নিয়ন্ত্রণ ক'রেও যদি মনে কু-চিন্তা লালন করে, তার সকল চেষ্টাই বিফল। মন যদি একইসঙ্গে চঞ্চল হয়ে ইতস্তত ধাবিত হয় তাহলে দেহকে পীড়ন করা হয়তো ক্ষতিকর। মন যেখানে যাবে, দেহও সেখানেই যাবে—হয় এখন, নয়তো পরে.....

....মনের মধ্যে অশুদ্ধ চিন্তা পুষে রাখা এক ব্যাপার, আর সম্পূর্ণ ভিন্ন হল, মন যদি আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও এখানে-সেখানে পালিয়ে বেড়ায়। মনের পাপাচারী ভ্রমণের সঙ্গে আমরা যদি অসহযোগ করি তাহলে শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই।[১১]

অন্তরের অবস্থা

ব্রহ্মচর্য একটি মানসিক অবস্থা। কোনও মানুষের বাইরের ব্যবহার একইসঙ্গে তার অন্তরাবস্থার চিহ্ন ও প্রমাণ। নিজের মধ্যে যৌন চাহিদা যে সম্পূর্ণ দমন করেছে সে কোনওভাবেই এর দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে না। কোনও নারী যতই আকর্ষণীয় হোক-না-কেন, যে মানুষের যৌন চাহিদা নেই তার ওপরে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। নারীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য.....

ব্রহ্মচর্য এমন গুণ নয় যে বহিরাগত সংযমের সাহায্যে এর চর্চা সম্ভব। যে পুরুষ নারীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা থেকে পলায়ন করে, সে কখনও ব্রহ্মচর্যের পূর্ণ অর্থ বোঝে না...

প্রকৃত ব্রহ্মচারী মিথ্যা সংযম ঘৃণা করে। নিজের সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী সে নিজেকে ঘিরে বেড়া দেয়। যখন অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, ভেঙে ফেলে। প্রথম কাজ হল প্রকৃত ব্রহ্মচর্য বোঝা। তারপর, এর মূল্য উপলব্ধি। শেষে এই অমূল্য গুণটির অনুশীলন। আমি মনে করি, দেশের প্রকৃত সেবার জন্য ব্রহ্মচর্য আবশ্যক।[১২]

ইন্দ্রিয়সংযম

...নিছক পাশবিক রিপু নিয়ন্ত্রণ করাকেই ব্রহ্মচর্য পালনের সমতুল বলে ধরে নেওয়া হয়, এই ধারণা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত। ব্রহ্মচর্যের অর্থ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি অঙ্গের

সংযম। যে শুধু একটিকেই সংযত করে, অন্যগুলিকে অবাধে চলতে দেয়, তার চেষ্টা বিফল হবেই।

কানে ইঙ্গিতবাহী গল্প শোনা, চোখে ব্যঞ্জনাময় দৃশ্য দেখা, জিহ্বা দিয়ে উত্তেজক খাদ্যের স্বাদগ্রহণ করা, হাত দিয়ে উত্তেজক বস্তু স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বাকি দেহাঙ্গটি নিয়ন্ত্রণে রাখার বাসনা, আর আগুনে হাত দিয়ে অক্ষত রাখার আশা করা একই ব্যাপার। অতএব, একটিকে যে সংযত রাখতে চায় তাকে অন্যগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দৃঢ়চেতা হতে হবে।

আমি বরাবরই অনুভব করেছি, ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ ব্যাখ্যার ফলে অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমরা যদি সবদিকে সংযম অভ্যাস করি তাহলে সেই প্রচেষ্টা হবে বিজ্ঞানসম্মত। তাই এর সাফল্য সম্ভবপর হতে পারে। স্বাদগ্রন্থিটিই বোধহয় প্রধান অপরাধী।[১৩]

স্থিতপ্রজ্ঞ

স্থিতপ্রজ্ঞ...কাকে বলব? কচ্ছপ যেভাবে তার খোলার মধ্যে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লুকিয়ে রাখে, ঠিক সেইভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে তার ইন্দ্রিয় সংবরণ ক'রে আত্মার বর্মে যে ঢেকে রাখে, সে-ই হল স্থিতপ্রজ্ঞ। যার প্রজ্ঞা স্থিত হয়নি সে রেগে যেতে পারে, কু-চিন্তা করতে পারে বা কটুবাক্য বলতে পারে। অন্যদিকে, যে স্থিতপ্রজ্ঞ সে প্রশংসা বা নিন্দায় নির্বিকার থাকে। সে উপলব্ধি করে, যে-জিহ্বা নিন্দা করে সে কেবল জিহ্বাকেই নষ্ট করে। যার বিরুদ্ধে নিন্দা, তার কিছু হয় না। যে স্থিতপ্রজ্ঞ সে কখনও কারও ক্ষতি চায় না বরং আমৃত্যু এমনকি তার শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করে।[১৪]

আমার ব্রহ্মচর্য

শুধুমাত্র দেহগত ব্রহ্মচর্য মেনে চলার ক্ষেত্রেও আমাকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আজ হয়তো বলতে পারি, নিজেকে আমি মোটের ওপর নিরাপদ মনে করি। কিন্তু এখনও চিন্তার ওপরে আমার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হয়নি, যা একান্তই আবশ্যক। ইচ্ছাশক্তি বা প্রচেষ্টার ত্রুটি নেই, কিন্তু অবাঞ্ছিত চিন্তা কীভাবে যে তাদের জঘন্য আক্রমণ চালায় তা এখনও আমার কাছে সমস্যা।

আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, অবাঞ্ছিত চিন্তার দুয়ারে তালা দেবার এক চাবি রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেককে সেটা নিজের মতো সন্ধান করতে হয়। সন্ত ও দ্রষ্টারা তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের দিয়ে গেছেন কিন্তু কোনও অভ্রান্ত ও বিশ্বজনীন সূত্র বাৎলে যাননি। কারণ পূর্ণতা বা ভ্রান্তি থেকে মুক্তি আসে কৃপা হতে। তাই ঈশ্বরসন্ধানীরা তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা মহিমান্বিত, তাঁদের শুদ্ধতার দ্বারা পরিপূর্ণ, রামনামের মতো মন্ত্র আমাদের দিয়ে গেছেন।

তাঁর মহিমার কাছে সার্বিক সমর্পণ ছাড়া চিন্তার ওপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অসম্ভব। প্রতিটি মহান ধর্মগ্রন্থই এই শিক্ষা দেয়। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের জন্য আমার প্রয়াসের প্রতিটি মুহূর্তে আমি তার সত্যতা উপলব্ধি করছি।[১৫]

সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকেও ত্রিশ বছরেরও বেশিসময় ধরে আমি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য অভ্যাস ক'রে আসছি। ব্রহ্মচারীর জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া বাইরের আচরণে সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে...

বই পড়ে আমি আমার ব্রহ্মচর্য শিখিনি। আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য নিজস্ব নিয়ম তৈরি করেছি। আমার আহ্বানে যারা আমার সঙ্গে এই পরীক্ষায় যোগ দিয়েছে তাদের জন্যও নিয়ম তৈরি করেছি। কোনও প্রদত্ত সূত্র যেমন অনুসরণ করিনি, তেমনই, নারীই হল সকল পাপ ও প্রলোভনের উৎস—ধর্মীয় গ্রন্থের এইসব কথাও বিশেষ আমল দেইনি। আমার মধ্যে ভালো যদি কিছু থেকে থাকে তা আমার মা-র জন্যই। এই কথা মনে রেখে নারীদের আমি কখনও যৌনবাসনা চরিতার্থ করার উপায় বলে মনে করিনি। মা-কে যেমন শ্রদ্ধা করি তেমনই শ্রদ্ধা করেছি তাদের। পুরুষ লোভ দেখায় ও আক্রমণ চালায়। নারীর স্পর্শে পুরুষ কলঙ্কিত হয় না, বরং পুরুষ নিজেই প্রায়শ নারীকে স্পর্শ করার অযোগ্য অতীব কলুষিত হয়ে থাকে....

আমি পরীক্ষা করছি। আমার ধারণানুগ নিখুঁত ব্রহ্মচারী হয়ে উঠেছি, এমন দাবি কখনও করিনি। অহিংসা নিয়ে গবেষণাব জন্য আমার চিন্তার ওপরে যে নিয়ন্ত্রণ আসা দরকার, এখনও তা আয়ত্ত করতে পারিনি। আমাব অহিংসাকে যদি সংক্রামক ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হয় তাহলে চিন্তার ওপবে আমাকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করতে হবে।[১৬]

যেদিন থেকে আমি ব্রহ্মচর্য শুরু কবি, আমাদেব মুক্তিও শুরু হয়। আমার স্ত্রী তাঁর কর্তা ও প্রভু হিসেবে আমাব কর্তৃত্ব থেকে একজন স্বাধীন নারী হিসেবে মুক্ত হলেন। আমি মুক্ত হলাম আমার ক্ষুধার দাসত্ব থেকে, যা তিনি মেটাতে বাধ্য হতেন। আমার স্ত্রী আমাকে যতটা আকৃষ্ট করতেন সে অর্থে অন্য কোনও নারী আমাকে আকর্ষণ করেনি। স্বামী হিসেবে আমি তাঁব অতীব বিশ্বস্ত ছিলাম। মা-র কাছে শপথ করেছিলাম, কোনও নারীর দাস হব না। এই শপথের প্রতিও সমান বিশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু যে ভাবে আমার কাছে ব্রহ্মচর্য এল তাতে মাতৃরূপা নারীদেব প্রতি আমি এক অদম্য আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম। যৌনপ্রেমের পক্ষে তিনি বড় বেশি পবিত্র হয়ে উঠলেন। অতএব প্রতিটি নারীই একসঙ্গে আমার কাছে ভগিনী বা কন্যারূপে প্রতিভাত হয়ে উঠল।[১৭]

নারীদের প্রতি আমার যদি যৌন আকর্ষণ থাকত তাহলে জীবনের এই বয়সেও বহুবিবাহ করাব মতো যথেষ্ট সাহস আমার রয়েছে। আমি গোপন বা প্রকাশ্য মুক্ত-প্রেমে বিশ্বাসী নই। মুক্ত, প্রকাশ্য প্রেম আমার কাছে সারমেয়র প্রেম বলে মনে হয়। গোপন প্রেম, অন্য সব বাদ দিলেও, কাপুরুষোচিত।[১৮]

৫৭. বিবাহের আদর্শ

বিবাহের আদর্শ হল, দেহের মাধ্যমে আত্মিক মিলন। বিবাহের মাধ্যমে যে মানসিক প্রেম গড়ে ওঠে তা ঈশ্বর বা বিশ্বপ্রেমের দিকে একটি ধাপ।[১৯]

চূড়ান্ত ত্যাগ, চূড়ান্ত ব্রহ্মচর্য হচ্ছে আদর্শ অবস্থা। একথা ভাবার সাহস তোমার না থাকলে অবশ্যই বিবাহ করো কিন্তু এর পরেও আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ক'রো।[২০]

চূড়ান্ত ব্রহ্মচর্য বা বিবাহোত্তর ব্রহ্মচর্য কেবল তাদের জন্য যারা আধ্যাত্মিক বা উচ্চতর জীবনের অভিলাষী। অনুরূপ জীবনের পক্ষে এটা অপরিহার্য।[২১]

বিবাহ জীবনের এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনও অর্থে একে হেয় করা একেবারে ভুল....বিবাহকে পবিত্র বন্ধন হিসেবে জ্ঞান করা উচিত। বিবাহিত অবস্থায় আত্মসংযমের জীবনযাপন একান্ত বাঞ্ছনীয়।[২২]

যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ, বিবাহ-ই নয়। নিতান্ত ব্যভিচার—ইন্দ্রিয়লালসা।[২৩]

মনু বলেছেন, প্রথম সন্তান ধর্মজ অর্থাৎ যার জন্ম কর্তব্যবোধ থেকে। এর পরে যারা জন্মায় তারা কামজ, অর্থাৎ লালসাজাত। যৌন সম্পর্কের নিয়মের এই হল সংক্ষিপ্তসার। আর ঈশ্বর এই নিয়ম ছাড়া আব কিছু নন। তাই, ঈশ্বরকে মেনে চলা, নিয়ম অনুসারে চলা।[২৪]

দৈহিক পবিতৃপ্তির জন্য যৌনমিলন, পাশবিকতায় প্রত্যাবর্তন। তাই মানুষের চেষ্টা হওয়া উচিত নিজেকে এর ঊর্ধ্বে উন্নীত করা। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী এটা পালন করতে ব্যর্থ হলেই তা পাপ বা লজ্জাব বস্তু নয়। বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ রসনা পরিতৃপ্তির জন্য খায়। তেমনি লক্ষ লক্ষ স্বামী-স্ত্রী দৈহিক তৃপ্তির জন্য যৌনক্রীড়া করে। করেও চলবে। আর, প্রকৃতিব নিয়ম ভাঙলে যেমন সে অসংখ্য অনিষ্টের রূপ ধরে হানা দেয়, তেমনই তারাও এই নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য অনিবারণীয় মাশুল গুনে চলবে।[২৫]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকলুষ প্রেম অন্য যে কোনও প্রেমের তুলনায় মানুষকে ঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি নিয়ে যায়। এই প্রেমের সঙ্গে যৌনতা যুক্ত হলে মানুষ স্রষ্টার কাছ থেকে দূরে সরে আসে। তাই কোনও যৌনচেতনা ও যৌনসম্পর্ক না থাকলে বিবাহ প্রয়োজন কি-না এ-প্রশ্ন উঠতে পারে।[২৬]

বিবাহের লক্ষ্য

যৌথ কর্ম সম্পাদনের জন্য যে-সব বিবাহ হয়, তার মধ্যে অন্তর্লীন থাকে আশীর্বাদ। যে-বিবাহ শুধু আত্মতৃপ্তির জন্য, তা মূল্যহীন।[২৭]

সত্যি বলতে কি, বিবাহের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত পুরুষ ও নারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও সখ্য ভাব। এর মধ্যে যৌন পরিতৃপ্তির কোনও স্থান নেই। যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য যে-বিবাহ হয় তা বিবাহ অভিধার যোগ্য নয়। ওই পরিতৃপ্তি প্রকৃত বন্ধুত্বের বিপ্রতীপ।

সখ্য ও পারস্পরিক সেবার মনোভাব নিয়ে ইংরেজদের মধ্যে বিবাহ হয় বলে আমি জানি। আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনা যদি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে না হয় তাহলে বলতে পারি। আমার স্ত্রী এবং আমি বিবাহিত জীবনের প্রকৃত আনন্দ তখনই উপলব্ধি করলাম যখন আমরা যৌনসম্পর্ক ত্যাগ করলাম। আর সেটাও ঘটল আমাদের যৌবনের সেরা সময়ে। একমাত্র তখনই আমাদের সখ্যভাব বিকশিত হল। ভাবত ও সাধাবণভাবে

মানবজাতির প্রতি প্রকৃত দায় আমরা পালন করতে পারলাম.....এই আত্মত্যাগের উৎস ছিল সেবার জন্য আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।

বলাই বাহুল্য, স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে অসংখ্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এগুলি তেমনই চলবে। এসব বিবাহে দেহগত দিকটিকেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অসংখ্য লোক রসনার তৃপ্তির জন্য খায় বলেই তা একজনের কর্তব্যে পর্যবসিত হয় না। খুব কম লোকই বাঁচার জন্য খায়। কিন্তু এরাই আসলে খাদ্যগ্রহণের নিয়মটি জানে। একইভাবে প্রকৃত বিবাহ তারাই করে যারা বিবাহবন্ধনের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিবাহ করে। এর মাধ্যমে নিহিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।[২৯]

দাম্পত্য সম্পর্ক

স্ত্রী, স্বামীর মুচলেকা-দেওয়া দাস নয় ববং তার সঙ্গী ও সহযোগী। তার সকল আনন্দ ও দুঃখেব সমভাগী। স্বামীর মতোই তার নিজের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে।[৩০]

অন্য সব ক্ষেত্রের মতোই দাম্পত্যজীবনও আমার কাছে একটি শৃঙ্খলার অবস্থা। জীবন কর্তব্য। এক দায়। বিবাহিত জীবনের লক্ষ্য ইহলোকে ও লোকান্তরে উভয়ের মঙ্গল। বিবাহের অর্থ মানবসেবাও বটে।

একপক্ষ যখন শৃঙ্খলার নিয়ম ভঙ্গ কবে তখন অন্যপক্ষেরও বন্ধন ভাঙবাব অধিকার বর্তায়। এই ভঙ্গের ব্যাপারটি নৈতিক, দৈহিক নয়। এতে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে না। স্ত্রী বা স্বামী আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু যে লক্ষ্যে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই লক্ষ্যসাধন ক'রে চলে।

হিন্দুধর্মে প্রত্যেককেই পূর্ণরূপে অপরের সমান বলে মনে করা হয়। অবশ্যই একটি ভিন্নতর অভ্যাস গড়ে উঠেছে। কেউ জানে না কখন এর সূত্রপাত। কিন্তু এছাড়াও অন্য বহু পাপ এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এইটুকু কিন্তু আমি জানি, আত্মোপলব্ধির জন্য প্রত্যেকের জন্ম। তার জন্য নিজের-নিজের অভিরুচি পূর্ণ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের রয়েছে।[৩১]

আমার কাছে আদর্শ স্ত্রী সীতা, আদর্শ স্বামী রাম। কিন্তু সীতা রামের দাসী ছিলেন না বা, একে অপরের। রাম সর্বদা সীতার প্রতি সুবিচার করেছেন।[৩২]

তুমি তোমার স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করবে। তার প্রভু না হয়ে হবে প্রকৃত বন্ধু। তুমি তার দেহ ও আত্মাকে পবিত্র জ্ঞান করবে, যেমন সে করবে তোমাব দেহ ও আত্মাকে। এই লক্ষ্যেই তোমাদের প্রার্থনাময়, শ্রম, সারল্য ও আত্মসংযমের এক জীবনযাপন করতে হবে। তোমরা যেন কেউ একে-অপরকে তার লালসাব বস্তু বলে মনে না করো।[৩৩]

আমি মনে করি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোপনীয় কিছু থাকা উচিত নয়। আমি চাই তারা হবিহরাত্মা হয়ে যাক। তারা দুইয়ের মধ্যে এক বা একের মধ্যে দুই।[৩৪]

জোর করে বিবাহ প্রদান

অভিভাবকদের পক্ষে জোর করে তাদের কন্যার ওপরে বিবাহ চাপিয়ে দেওয়া একেবারেই ভুল। এমনভাবে কন্যাদের মানুষ কবা উচিত যাতে তারা নিজেদের রোজগার নিজেরাই

করতে শেখে। তা না করলে অন্যায় হবে। বিবাহ্ করতে অস্বীকার করলে, কন্যাকে পথে বের ক'রে দেওয়ার অধিকার কোনও পিতার নেই।[৩৫]

আইনী বিবাহ

(আইনী বিবাহে) আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু এই আইনসম্মত বিবাহ-ব্যবস্থাকে আমি সংস্কারমুখী একটি অতীব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে স্বাগত জানাই।[৩৬]

৫৮. শিশুসন্তান

ভারতেব দুর্বলতমদের দুঃখের সঙ্গে যদি আমাকে অভিন্নতা অনুভব করতে হয়, বিশ্বের দুর্বলতমদের সঙ্গেও যদি তাই করার ক্ষমতা আমার থাকে, তাহলে যে শিশুরা আমার কাছে রয়েছে তাদেব অপরাধের সঙ্গে আমি যেন একাত্মতা অনুভব করি। অহঙ্কারশূন্য হয়ে এই কাজ করে একদিন আশা করি, ঈশ্বর বা সত্যকে আমি মুখোমুখি দেখতে পাবো।[৩৭]

চরিত্র

সন্তানবা উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের পিতামাতার চেহারা যতটুকু পায়, তাদের গুণাগুণ তার থেকে কিছুমাত্র কম পায় না। পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কিন্তু যে প্রাথমিক পুঁজি নিয়ে শিশু জীবন শুরু করে তা তার পূর্বপুরুষদের কাছে উত্তরাধিকাব হিসেবে পাওয়া। আমি সবসময়েই শিশুদের পাপপূর্ণ উত্তরাধিকারের প্রভাব সাফল্যের সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে দেখেছি। এর কারণ, শুদ্ধতা হল আত্মার এক অন্তর্নিহিত গুণ।[৩৮]

পেঁজা তুলোয় মুড়ে রাখলেই যে শিশুরা সবসময়ে সর্ববিধ প্রলোভন বা মালিন্য থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, তা নয়।[৩৯]

পিতামাতা প্রতিটি সন্তানকে সমানভাবে সত্যকার যে সম্পত্তি দিতে পারে, তা হল, পিতা বা মাতার চরিত্রগুণ এবং শিক্ষার সুযোগসুবিধা। পুত্রকন্যাকে স্বনির্ভর হতে শেখানো পিতামাতাব কর্তব্য। যাতে তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সৎপথে জীবিকা নির্বাহ করতে পাবে।[৪০]

শিশুদের কাছ থেকে শেখার আছে

যত উদাসীনভাবেই হোক-না-কেন, আমি আমার সত্তার প্রতিটি তন্তুতে প্রেমকে প্রকাশিত করার চেষ্টা করি। এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। সবিনয়ে আমি তা স্বীকার করছি। যিনি আমার কাছে মূর্ত সত্য, সেই স্রষ্টার উপস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য আমি অস্থির। আমার কর্মকাণ্ডের প্রথম দিকে আবিষ্কার করেছিলাম, যদি সত্যকে পেতে হয় তাহলে আমাকে জীবনের মূল্য দিয়েও প্রেমের নিয়ম মানতেই হবে। সন্তানলাভের আশীর্বাদের ফলে আবিষ্কার

করলাম, ছোট্ট শিশুদের মধ্য দিয়েই প্রেমের নিয়ম সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় ও শেখা যায়।

আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, কোনও শিশুই খারাপ অর্থে দুষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পিতামাতা যদি সন্তানের জন্মের আগে ও পরে, তার বড় হওয়ার সময়, সদাচারী হয়, তাহলে যে শিশু সহজাতভাবে সত্য ও প্রেমের আইন মেনে চলে এটা সকলেই জানে। জীবনের প্রথম দিকে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করার পর আমার জীবনে ক্রমান্বয়ে কিন্তু স্পষ্টভাবে পরিবর্তনের সূচনা ঘটলো.....

শত শত, বা বলতে গেলে হাজার হাজার শিশু সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, তোমার বা আমার চেয়ে শিশুদের সূক্ষ্মতর মর্যাদাবোধ রয়েছে। জীবনের মহত্তম শিক্ষা হল, আমরা তথাকথিত অজ্ঞ শিশুদের কাছ থেকেই শিখব—বয়স্ক, শিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে নয়।

যীশু বলেছিলেন, শিশুদের মুখ থেকেই জ্ঞানের কথা শোনা যায়। এর চেয়ে মহান বা দীপ্যমান সত্য তিনি আর বলেননি। তাঁর এই উক্তি আমি বিশ্বাস করি। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমরা যদি বিনয় ও সারল্যের সঙ্গে শিশুদের কাছে যাই তাহলে তাদের কাছে জ্ঞানলাভ করতে পারি....

বিশ্বে যদি আমাদের প্রকৃত শান্তি স্থাপন করতে হয়, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ যদি ঘোষণা করতে হয় তাহলে আমাদের শুরু করতে হবে শিশুদের দিয়ে। তারা যদি তাদের স্বাভাবিক নিষ্পাপ সারল্যে বড় হতে পারে তাহলে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে না। অর্থহীন অলস প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে না। বরং আমরা প্রেম থেকে মহত্তর প্রেমে ও শান্তি থেকে অপার শান্তির পথে যাত্রা করতে পারব। অবশেষে বিশ্বের প্রতিটি কোণ সেই শান্তি ও প্রেমে আবৃত হয়ে পড়বে। যার জন্য সমগ্র পৃথিবী আজ সচেতন বা অচেতনভাবে বুভুক্ষু হয়ে রয়েছে।[৪১]

৫৯. জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রজন্মের কাজ

আহার-নিদ্রার মতোই মৈথুনকে একটি প্রয়োজনীয় পৃথক কাজ বলে মনে করা অতীব মূঢ়তার পরিচায়ক। বিশ্ব তার অস্তিত্বের জন্য জন্মপ্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ব যেহেতু ঈশ্বরের লীলাভূমি ও তাঁর মহত্ত্বের প্রতিফলন, তাই বিশ্বের বিকাশের জন্য জন্মের প্রক্রিয়াটিও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এটা যে উপলব্ধি করবে সে সর্ব প্রযত্নে লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তার সন্তানের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানে নিজেকে সজ্জিত করবে। এই জ্ঞান তার পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে প্রদান করবে।[৪২]

যৌনমিলন আনন্দের জন্য নয়, সন্তানজন্মের জন্য। যখন সন্তানলাভের বাসনা থাকে না তখন যৌনমিলন অপরাধ।[৪৩]

একবার যখন পুরুষ ও নারী এই ধারণা গ্রহণ করবে যে, যৌনাঙ্গের একমাত্র ও সংগত ক্রিয়া হচ্ছে সন্তান উৎপাদন, তখন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে মিলনকে তারা প্রাণসৃষ্টিকারী ধাতুর অপরাধমূলক অপচয় বলে মনে করবে। এর ফলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাকেও শক্তির অপরাধমূলক অপচয় বলে গণ্য করবে।[৪৪]

আইনগত পথে ঋণ নিলে তা শোধ করা যেমন বাধ্যতামূলক কর্তব্য, তেমনি যৌন তাড়নার পরিতৃপ্তিও এক কর্তব্য। এটা উপেক্ষা করার শাস্তি নাকি বুদ্ধিবৃত্তির অবক্ষয়। এই বাক্যসুধা ইদানীং অনবরত কানে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে যৌন চাহিদাকে সন্তানলাভের বাসনা থেকে আলাদা করা হয়েছে। গর্ভনিরোধকের প্রবক্তারা বলে, গর্ভসঞ্চার একটি দুর্ঘটনা। তাই সন্তানলাভের বাসনা না থাকলে তা এড়াতে হবে। আমি বলতে চাই, এটা খুবই বিপজ্জনক মতবাদ।

যৌন চাহিদা খুবই সুন্দর ও মহৎ ব্যাপার। এর জন্য লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। তবে, কেবলমাত্র সৃষ্টির জন্যই এটি রয়েছে। এর অন্য কোনও ব্যবহার ঈশ্বর ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।[৪৫]

শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি

মানুষ নিঃসন্দেহে একজন শিল্পী ও স্রষ্টা। অতএব সৌন্দর্য ও বর্ণের বোধ তার অবশ্যই থাকবে। সর্বোচ্চ অবস্থায় তাব শৈল্পিক ও সৃজনশীল চরিত্র তাকে বাছাই করতে শেখাবে। এ-ও শেখাবে, যে-কোনও রঙের মিশেলই সৌন্দর্য বহন করে না বা সব আনন্দের বোধই ভালো নয়। শিল্প সন্ধানী চোখই মানুষকে উপযোগিতার মধ্যে আনন্দ খুঁজতে শিখিয়েছে।

তাই, তার বিবর্তনের এক প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ শিখেছিল শুধু খাওয়ার জন্যই সে খাদ্যগ্রহণ করে না। আমাদের মধ্যে আজও কেউ কেউ যা করে। সে খায় বাঁচার জন্য। পরবর্তী এক পর্যায়ে সে আরও শিখল যে শুধুমাত্র প্রাণধারণের মধ্যেই সৌন্দর্য বা আনন্দ নেই। তার চারপাশের মানুয বা তাদের মধ্য দিয়ে তার স্রষ্টাকে সেবা করার জন্য তাকে বাঁচতে হবে।

একইভাবে যৌনমিলনের আনন্দদায়ক ঘটনাটি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ক'রে সে আবিষ্কার করল, যে-কোনও একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মতো এই জননেন্দ্রিয়টিরও যথার্থ প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ সম্ভব। সে এ-ও দেখল, জন্মদানের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই হল এর প্রকৃত ব্যবহার। এর অন্যতর ব্যবহার তার কাছে কদর্য বলে মনে হল। সে আরও বুঝতে পারল, অপব্যবহারের ফলাফল ব্যক্তি তথা জাতিব পক্ষে মাবাত্মক হতে পারে।[৪৬]

জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে, এর একমাত্র পদ্ধতি হল যুগে যুগে পরম্পরাগতভাবে পাওয়া স্ব-নিয়ন্ত্রণ বা ব্রহ্মচর্য। এটি একটি অভ্রান্ত ও সার্বভৌম

নিরাময়ের ব্যবস্থা। যা ব্যবহারকারীর মঙ্গল করে। চিকিৎসাজগৎ যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম পদ্ধতি উদ্ভাবন না ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজে বের করে, তাহলে মানবজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হবে...

কৃত্রিম পদ্ধতি পাপাচারকে সমাদরের যোগ্য ক'রে তোলে। এর ফলে, পুরুষ ও নারী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ওইসব পদ্ধতি সামাজিক মর্যাদা পেয়ে যায় বলে, জনমতের চাপে ব্যক্তির ওপরে আরোপিত নিয়ন্ত্রণ অচিরাৎ নষ্ট হয়ে যায়। কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ করলে বুদ্ধির জড়তা ও স্নায়বিক বৈকল্য ঘটতে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, অসুখের চেয়েও ওষুধটি বেশি ক্ষতিকর।

কৃতকর্মের ফলপরিণাম এড়াতে চাওয়া ভুল ও অনৈতিক। পেটুকের পক্ষে পেটব্যথা ও উপবাস দুই-ই শ্রেয়। বরং সে যদি রসনার তৃপ্তির জন্য খেয়েই চলে এবং বলবর্ধক বা অন্য ওষুধ দিয়ে ফলাফল এড়িয়ে চলে, তাহলে সেটা তার পক্ষে খারাপ। তার চেয়েও খারাপ হল কোনও ব্যক্তি যদি তার পাশবিক রিপুর দাসত্ব ক'রেও তার ফলপরিণাম এড়িয়ে যায়। প্রকৃতি সদাসচেতন। কোনওভাবে তার নিয়ম লঙ্ঘন করলে সে পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়। নৈতিক সংযমের দ্বারাই নৈতিক প্রাপ্তি সম্ভবপর। অন্য সর্ববিধ সংযম, তার লক্ষ্যকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।[৪৭]

জনসংখ্যাস্ফীতি

যদি যুক্তি তোলা হয়, জনসংখ্যাস্ফীতির জন্য জাতির পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণের দরকার—আমি সেই যুক্তির বিরুদ্ধে। এটা কখনও প্রমাণিত হয়নি। আমার মতে, যথার্থ ভূমিব্যবস্থা, উন্নততর কৃষি ও এক পরিপূরক শিল্পের সাহায্যে এই দেশ এখনকার জনসংখ্যাব দ্বিগুণ লোককে খাওয়াতে পারবে।[৪৮]

ক্রমবর্ধমান জন্মহারের জুজু দেখানো নতুন কিছু নয়। বারবারই দেখানো হয়েছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি কোনও বিপর্যয় নয়। এড়ানোর মতো কোনও বিপর্যয় বলে মনে করাও উচিত নয়। আমরা জানি বা না জানি কৃত্রিম পদ্ধতিতে এর নিয়ন্ত্রণ বা সংকোচন একটি নিশ্চিত বিপর্যয়। এই পদ্ধতি যদি বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে, তাহলে মানবজাতি নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তা কখনওই সম্ভবপর হবে না। অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্য দায়ী লালসা। সেই অভিশপ্ত লালসার বিষের পাল্টা বিষ হল মহামারী, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ। এই তিন ধরনের অভিশাপ আমরা কাটতে পারি যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের সার্বভৌম নিরাময় পদ্ধতিটি প্রয়োগ ক'রে অবাঞ্ছিত সন্তানের অভিশাপটিকে এড়ানো যায়। কৃত্রিম পদ্ধতির নেতিবাচক পরিণতি আজ বিবেকবান ব্যক্তিরা অনুধাবন করছে। নৈতিক অধিকাবে হস্তক্ষেপ না ক'রে আমি বলতে চাই, খরগোশের মতো মানুষের এই বংশবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু আরও বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনার জন্য নয়। এমন পদ্ধতি দিয়ে প্রক্রিয়াটি বন্ধ করতে হবে, যা মানবজাতিকে মহত্তর করে তোলে। অন্যভাবে বললে, এটি হল প্রকৃত শিক্ষার বিষয় যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র স্পর্শ করবে। একটি অভিশাপের মোকাবিলা সম্ভব হলে অন্যগুলির নিরসনও সম্ভব হবে। পথ উচ্চগামী

তথা খাড়াই বলেই যে সেটি পরিহার করতে হবে এমন হওয়া উচিত নয়। মানুষের উচ্চাভিমুখী প্রগতির অর্থ ক্রমবর্ধমান জটিলতা, যাকে স্বাগত জানানো প্রয়োজন।[৪৯]

আরোহণ, না, অবরোহণ—এই দুইয়ের মধ্যে একটি মানুষকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু তার মধ্যে যেহেতু পশুও রয়েছে তাই সে সহজেই ঊর্ধ্বগামীর বদলে নিম্নগামী পথটিকেই বাছবে। বিশেষত সেই পথটিকে যখন সুন্দর মোড়কে মুড়ে দেখানো হয়। যখন পুণ্যের মোড়কে পাপ উপস্থিত করা হয় মানুষ সহজেই আত্মসমর্পণ করে। এই কাজই মেরি স্টোপ্‌স ও অন্যান্যরা করছেন।[৫০]

আমি মনে করি, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা এটা ধরেই নেয় যে, পাশবিক আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এটি বেশ কাঙ্ক্ষিত বস্তু। নারীজাতির প্রতি এরা যে করুণা দেখায় তা যেন আরও বেদনাদায়ক। আমার মতে, কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থনে নারীর দিকটি তুলে ধরে নারী জাতিকেই অবমাননা করা হয়। যা অবস্থা তাতে পুরুষ তার নিজের লালসার জন্য নারীকে যথেষ্ট নীচে নামিয়েছে। কৃত্রিম পদ্ধতির প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য যতই সাধু হোক-না-কেন এর ফলে নারীর স্থান আরও অধোগামী হবে।

কৃত্রিম পদ্ধতির প্রবক্তাদের বলব, তারা যেন এর পরিণামের কথাটি ভেবে দেখেন। ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহারের সম্ভাব্য ফল, বিবাহবন্ধনেব অবসান ও অবাধ প্রেমের সূত্রপাত। পুরুষ যদি শুধু পাশবিক রিপুর তাড়নাতেই একে প্রশ্রয় দেয় তাহলে, যখন সে গৃহ থেকে দীর্ঘসময় দূরে থাকবে বা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ব্যস্ত থাকবে বা অকৃতদার হবে বা যখন কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহার করলেও তার অসুস্থ স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ঘটবে, তখন সে কী রকম আচরণ করবে?[৫১]

আমার কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি অতলান্তিক দুর্ভোগ। এ হল অজানা শক্তির সঙ্গে খেলার সামিল। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে নির্দিষ্ট কয়েকটি অবস্থায় কৃত্রিম পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ যুক্তিযুক্ত, তবুও লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে এর প্রয়োগ একান্তই অসম্ভব। আমার মনে হয় গর্ভনিরোধকের ব্যবহারের বদলে তাদের স্ব-নিয়ন্ত্রণ শেখানো সহজতর পথ।

আমাদের এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলটি গতকালের কোনও খেলনা নয়। অগণন লক্ষ লক্ষ বছরের যাত্রায় সে কখনও জনসংখ্যাধিক্যের ভারে পীড়িত হয়নি। আজ অকস্মাৎ কয়েকজনের মনে এই সত্য হঠাৎ উদিত হল কেন যে গর্ভনিরোধক দিয়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ না করলে খাদ্যাভাবে পৃথিবী মারা পড়বে?[৫২]

বৃহত্তর পাপ

অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দেওয়া পাপ। কিন্তু আমার মতে, তার চেয়েও বড় পাপ নিজের কৃতকর্মের ফলপরিণাম এড়িয়ে চলা। এ হল নিছক মানুষকে অমানবিক করে তোলা।[৫৩]

ঈশ্বর পুরুষকে এক আশীর্বাদী বীজ দিয়েছেন যা সর্বাধিক শক্তিশালী। নারীকে দিয়েছেন বিশ্বের যে কোনও উর্বরতম স্থানের চেয়েও সুফলা জন্মক্ষেত্র। তাই পুরুষের পক্ষে তার

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটির অপচয় ঘটতে দেওয়া এক অপরাধমূলক নির্বুদ্ধিতা। তার কাছে মহামূল্যবান যে রত্নরাজি আছে তার চেয়েও বেশি সতর্কতার সঙ্গে এই সম্পদ তার রক্ষা করা উচিত।

একই অপরাধে নারীও অপরাধী হবে যদি সে তার জীবনসৃষ্টিকারী ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নষ্ট করার অভিপ্রায় নিয়ে ঐ বীজ ধারণ করে। যে-ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়েছিল তার অপব্যবহারকারী বলে বিচারে উভয়েই অভিযুক্ত হবে। যে ক্ষমতা তারা পেয়েছিল সেই ক্ষমতাচ্যুত হবে।[৫৪]

আমি বলব, নিজের কাজের ফলপরিণামের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করা কাপুরুষোচিত। যারা গর্ভনিরোধক ব্যবহার করে তারা কখনও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণচর্চা করতে শিখবে না। এর প্রয়োজন তাদের হবে না। গর্ভনিরোধকের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রশ্রয় হয়তো শিশুজন্মে বাধ সাধবে কিন্তু পুরুষ ও নারী উভয়েই তাদের প্রাণশক্তি হারাবে। হয়তো পুরুষের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় এটা বেশিই ঘটবে। শয়তানের সঙ্গে লড়াইতে রণে ভঙ্গ দেওয়া অপুরুষোচিত।[৫৫]

সামাজিক পাপ

গোপন পাপাচার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে কী শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা আমি জানি। বিজ্ঞানের নামে গর্ভনিরোধকের প্রবর্তন ও সমাজের পরিচিত নেতাদের প্রশস্তি এই জটিলতাকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে। সমাজজীবনে শুদ্ধতাব জন্য যারা কাজ করে সেই সংস্কারকদেব ক্রিয়াকর্ম প্রায় অসম্ভব ক'রে তুলেছে....[৫৬]

নারীত্বের অসম্মান

আমি জানি, আধুনিক নারীরা এই সব পদ্ধতির পক্ষে ওকালতি করে। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, প্রভূত সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী এগুলিকে মর্যাদাহানিকর বলে প্রত্যাখ্যান করবে। পুরুষ যদি নারীর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েই থাকে তাহলে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুক। নারী তাকে লোভ দেখায় না। বাস্তবে, আগ্রাসী বলে পুরুষই আসল অপরাধী ও প্রলোভনকারী।[৫৭]

আমি চাই, গর্ভনিরোধকের প্রবক্তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে প্রাজ্ঞ তারা এর ব্যবহার সেই বিবাহিতা নারীদের মধ্যে সীমিত রাখুক যারা নিজেদের ও তাদের স্বামীদের যৌনক্ষুধা মেটাতে চায়. কিন্তু সন্তান চায় না। মানবপ্রজাতির ক্ষেত্রে এই বাসনাকে আমি অস্বাভাবিকে বলে গণ্য করি। মনে করি এর পরিতৃপ্তি মানব পরিবারের আধ্যাত্মিক প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর।[৫৮]

খুব কম করে বললেও, ভারতের নারীদের গর্ভনিরোধক ব্যবহার করতে বলা মানে ঘোড়ার সামনে গাড়ি জুতে দেওয়ার সামিল। প্রথম কাজ হল তাকে মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। তাকে তার দেহের পবিত্রতা সম্বন্ধে অবহিত করা, জাতীয় কর্তব্য ও মানবজাতির সেবার মর্যাদা শেখানো।[৫৯]

গর্ভনিরোধক নারীত্বের অসম্মান। কোনও গণিকা ও গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারী নারীর মধ্যে একমাত্র প্রভেদ হল প্রথমোক্ত বহু পুরুষকে দেহ বিক্রয় করে আর শেষোক্ত বিক্রয় করে একজন পুরুষকে। যতক্ষণ না কোনও নারী সন্তান চায় ততক্ষণ তাকে স্পর্শ করার অধিকার কোনও পুরুষের নেই। এমনকি নিজের স্বামীকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছাশক্তি নারীর থাকা উচিত।[৬০]

জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা যে গর্ভনিরোধকের ব্যবহার সম্পর্কে ঝটিকা-প্রচার চালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তার পেছনে যে সেবার মনোভাব রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত দয়ার মনোভাব যে কী মারাত্মক পরিণাম ডেকে আনবে সেটা ভাববার জন্য তাদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি। যাদের কাছে তারা পৌঁছতে চায় তারা কখনও ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার করবে না। যাদের এটা ব্যবহার করা অনুচিত তারা এটা অবশ্যই ব্যবহার করবে। ক'রে নিজেদের ও সহযোগীদের ক্ষতিসাধন করবে। সন্দেহাতীতভাবে যদি প্রমাণিত হতো যে গর্ভনিবোধকের ব্যবহার দৈহিক ও নৈতিক দিক দিয়ে সঠিক তাহলে এসব কথা উঠতই না।[৬১]

সংযম

প্রতিটি স্বামী ও স্ত্রী এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে পারে যে রাতে তারা এক ঘরে বা এক বিছানায় থাকবে না। মানুষ ও পশুর ক্ষেত্রে যে একই উদ্দেশ্যে যৌনমিলনের প্রয়োজন তা ছাড়া যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। পশু কিন্তু এই নিয়ম অবধারিতভাবে মেনে চলে। মানুষের ক্ষেত্রে বাছাই-এর পথ ছিল। কিন্তু ভ্রান্ত পছন্দ ক'রে সে মহাভুল করেছে। ....পুরুষ ও নারী উভয়েরই জানা উচিত যে যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তি থেকে নিবৃত্তিব ফলে অসুখ হয় না বরং স্বাস্থ্য ভালো হয়, শক্তিও বাড়ে। অবশ্য, মন যদি দেহের সঙ্গে সহযোগিতা করে।[৬২]

'না' বলার সাহস

নারীদেরই তাদের স্বামীদের প্রতিরোধ করতে হবে। গর্ভনিরোধক ব্যবহার করা হলে ভয়াবহ ফল দেখা দেবে। পুরুষ ও নারী শুধু যৌনতার জন্যই বাঁচবে। তারা তরলমতি, অস্থিরচিত্ত, বস্তুত, মানসিক ও নৈতিক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।[৬৩]

আমার মনে হয়, আরও যে-কটা বছর আমি বাঁচব, তার মধ্যে যদি নারীদের এই সত্যটি বিশ্বাস করাতে পারি যে তারা স্বাধীন, তাহলে ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকবে না। লালসার বশে স্বামীরা যখন তাদের কাছে আসবে তখন শুধু তাদের 'না' বলা শিখতে হবে। এটা হলেই...সব শুভ হবে...আসল সমস্যা হল, স্বামীদের প্রতিরোধ করতে তারা চায় না। এর মূল কারণ শিক্ষা। আমি চাই, নারীরা প্রতিরোধের প্রাথমিক অধিকারটি শিখুক। সে এখনও ভাবে, তার সেই অধিকার নেই।[৬৪]

নারীরা পুরুষের মতোই যৌনকামনার শিকার, এ আমি বিশ্বাস করি না। পুরুষের তুলনায় তার পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করা সহজতর।[৬৫]

আত্মনিয়ন্ত্রণ

আমরা যদি বিশ্বাস করতে শুরু করি যে, পাশবিক রিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া প্রয়োজন, এতে কোনও দোষ, কোনও পাপ নেই, তাহলে আমরা একে লাগামছাড়া ক'রে তুলব। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারাবো। অন্যদিকে, আমরা যদি নিজেদের এইভাবে শিক্ষিত করি যে, অনুরূপ প্রশ্রয়দান ক্ষতিকর, এটা পাপ, এর কোনও প্রয়োজন নেই, একে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব নয়, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।[৬৬]

গর্ভনিরোধকের প্রবক্তারা এটা ধরেই নেয় যে, সাধারণ নশ্বর মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণে অপারগ—ওদের সঙ্গে আমার বিবাদের মূল এটাই। কেউ কেউ আবার একথাও বলে, যদি-বা তারা সেটা করতে পারে তবু তা করা ঠিক নয়। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা যতই দিকপাল হোক না কেন, তাদের আমি সবিনয়ে ও গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছি যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছাড়াই তারা কথা বলছে। মানুষেব আত্মার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়ার কোনও অধিকার তাদের নেই।

ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বলতে চাই, সত্য ও অহিংসা যেমন মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিব প্রাত্যহিক অনুশীলনের বস্তু, তেমনই আত্মনিয়ন্ত্রণ কতিপয় 'মহাত্মার' জন্য নয়, ববং সমগ্র মানবজাতির জন্যই। বহু লোক অসৎ ও সহিংস বলেই মানবজাতি যেমন তার মানের অবমূল্যায়ন করতে পারে না, তেমনই অনেকে, এমনকি অধিকাংশ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণেব ডাকে সাড়া না দেয়, তবু আমাদের নিজস্ব মানটি নিচে নামানোর দরকাব নেই।[৬৭]

নির্বীজকরণ

জনগণের ওপরে নির্বীজকবণ আইন চাপানো আমি অমানবিক বলে মনে করি। কিন্তু যাদের জন্মগত ব্যাধি আছে তারা যদি বাজি থাকে তাহলে তাদের বন্ধ্যা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বন্ধ্যাত্বকবণ এক ধরনের গর্ভনিবোধক। যদিও আমি নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের বিরোধী, তবুও পুরুষেব ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক নির্বীজকরণের আমি বিরোধী নই—কারণ সে-ই হল আগ্রাসী।[৬৮]

৬০. নারী: সমাজে তার স্থান ও ভূমিকা

পুরুষ যেসব অপরাধে অপরাধী তার মধ্যে মানবসমাজের 'শ্রেষ্ঠতর অর্ধাংশ' নারীজাতির (দুর্বলতর নয়) প্রতি অবমাননার মতো এত নীচ, ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর আমার কাছে আর কিছু নয়। দুইয়ের মধ্যে নারীই মহত্তর। আজও সে আত্মত্যাগ, নীরব মর্মপীড়া, নম্রতা, বিশ্বাস ও জ্ঞানের মূর্ত রূপ।[৬৯]

নিজেকে পুরুষের লালসার বস্তু হিসেবে মনে করার অভ্যাস নারীকে ছাড়তেই হবে।

এর প্রতিকার ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে তার বেশি। নিজের স্বামীসহ্ পুরুষের জন্য নিজেকে সাজাতে সে কিছুতেই রাজি হবে না। শরীরী আকর্ষণ দিয়ে রামকে ভোলাবার জন্য সীতা একটি মুহূর্তও অপচয় করছেন—এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।[৭০]

নারীজন্ম তার ক্রীড়নক হবার জন্য—এ নিয়ে পুরুষের যে ধারণাই থাকুক, আমি নারী হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতাম। নারীর হৃদয় জয় করার জন্য মনে মনে আমি নারী হয়ে গেছি। আমার স্ত্রীর প্রতি অভ্যস্ত আচরণ না পালটানো পর্যন্ত আমি তাঁর হৃদয় জয় করতে পারিনি। তাই, তাঁর স্বামী হিসেবে তথাকথিত অধিকার পুরোপুরি ত্যাগ ক'রে তাঁকে তাঁর সকল অধিকার ফিরিয়ে দিলাম। আজ দেখছ, তিনি আমার মতোই সাদাসিধা। তাঁর গলায় কোনও হার বা দেহে সালঙ্কার সাজসজ্জা দেখতে পাবে না। আমি চাই, তোমরা যেন তেমনই হও।

নিজেদের শখ-শৌখিনতার গোলাম হয়ো না। হয়ো না পুরুষের গোলাম। নিজেকে সাজাতে চেয়ো না। সুগন্ধি বা ল্যাভেণ্ডার মেখো না। তোমরা, নারীরা যদি সুরভি বিতরণ করতে চাও, সে সুরভি যেন তোমাদের অন্তর নিঃসৃত হয়। তাহলে মানবসমাজই তোমাদের বশীভূত হবে। এ তো তোমাদের জন্মস্বত্ব। পুরুষ জন্ম নেয় নারী থেকে, সে নারীর মাংসের মাংস, অস্থির অস্থি। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করো, আবার প্রচার করো তোমার বাণী।[৭১]

নারী অবলা নয়

নারীকে দুর্বলতর বলা অন্যায়। নারীর প্রতি পুরুষের এটা অবিচার। শক্তি বলতে যদি পশুশক্তি বোঝায়, তবে পুরুষের তুলনায় নারী কম বর্বর। শক্তি বলতে যদি নৈতিক শক্তি বোঝায়, তবে পুরুষের চেয়ে নারী এত উপরে, যার পরিমাপ হয় না। নারীর স্বজ্ঞা বেশি। সে কি অধিকতর আত্মত্যাগী নয়? সহনশক্তি তার বেশি নয়? তার সাহসও কি বেশি নয়? নারী না থাকলে পুরুষ থাকতেই পারত না। আমাদের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার নীতি যদি হয় অহিংসা, তাহলে ভবিষ্যৎ নারীর হাতে...হৃদয়ে অধিকতর ফলপ্রসূভাবে আবেদন পৌঁছতে নারীর মতো আর কে পারে?[৭২]

স্বার্থান্ধ পুরুষ যেভাবে নারীর আত্মাকে ধ্বংস করেছে, তা যদি না করত, বা নারী যদি ভোগবিলাসের কাছে নিজেকে বিলিয়ে না দিত, তা হলে নারীর মধ্যে যে অসীম শক্তি ঘুমিয়ে আছে, পৃথিবীকে তা দেখিয়ে দিতে পারত। সে শক্তির চমৎকারিত্ব ও মহিমা পৃথিবী একদিন দেখবে। যেদিন নারী পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা নিঃশেষে পাবে, সেদিন পারস্পরিক সহায়তার, সংযোগের ক্ষমতার পূর্ণবিকাশ ঘটাবে।[৭৩]

আমি বলছি, নারী হল আত্মত্যাগের মূর্তরূপ। দুর্ভাগ্য, পুরুষের উপরে তার কী প্রচণ্ড ক্ষমতা আজ সে তা উপলব্ধি করে না। তলস্তয় যেমন বলতেন, নারী পুরুষের মোহপ্রভাবে শ্রম করে চলেছে। নারী যদি অহিংসার শক্তি বুঝত, তাহলে দুর্বলতর বলে অভিহিত হতে রাজি হতো না।[৭৪]

সমাজে নারীর স্থান নির্ণয়ে অপকৌশল

নারী পুরুষের সঙ্গী। সমান মানসিক শক্তির আশীর্বাদধন্য। পুরুষের কাজকর্মের সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটিতে অংশগ্রহণে তার অধিকার আছে। আর, পুরুষের সঙ্গে স্বাধীন আচরণে আছে সমানাধিকার। নারী তার নিজের কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানলাভের অধিকারী, ঠিক পুরুষ যেমন তার স্ব-ক্ষেত্রে। এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার হওয়া উচিত ছিল, কেবল লিখতে-পড়তে জানার ফল হিসেবে নয়।

নিষ্ঠুর প্রথার বলে এমনকি সবচেয়ে অজ্ঞ এবং অযোগ্য পুরুষরাও নারীদের উপর আধিপত্য করে চলেছে। যে অধিকার তার প্রাপ্য নয়, যা তার থাকা অনুচিত। নারীদের অবস্থার জন্য আমাদের অনেক আন্দোলনই মাঝপথে থেমে যায়।[৭৫]

তথাকথিত দুর্বলতর নারীজাতির ওপর যে অবমাননা জারি রেখেছে ন্যায়বিধায়ক পুরুষ, সে জন্য তাকে ভয়ঙ্কর দাম দিতে হবে। পুরুষের নাগপাশ কাটিয়ে নারী যেদিন পূর্ণজাগ্রত হয়ে পুরুষের ন্যায়বিধান, পুরুষের তৈরি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, সে-বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে হবে অহিংস, তবু তা কম ফলপ্রসূ হবে না।[৭৬]

নারী তার অসচেতন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপায়ে পুরুষকে নানাদিকে ঘিরে রেখেছে। আবার পুরুষ অসার আত্মগর্বেও সমান অসচেতনভাবে সংগ্রাম করেছে নারীকে দাবিয়ে রাখতে। যাতে নারী তাকে ছাপিয়ে যেতে না পারে। পরিণামে হয়েছে এক বদ্ধাবস্থা। এভাবে দেখলে ভারতমাতার আলোকপ্রাপ্তা দুহিতাদের এক কঠিন সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে হবে। পাশ্চাত্যের রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ করার দরকার নেই তাদের। সে-সব ওদেশের পারিপার্শ্বিকতার অনুকূল। তারা সেইসব নীতি প্রয়োগ করবে যা ভারতীয় প্রতিভা ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খায়। তাদের হাত হতে হবে বলিষ্ঠ, নিয়ন্ত্রণকারী, শুদ্ধকারী। ভারসাম্য রক্ষায় সক্ষম। সে হাত রক্ষা করবে আমাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ যা কিছু, নির্দ্বিধায় বর্জন করবে যা নীচ ও অবমাননাকর। এটা সীতা-দ্রৌপদী-সাবিত্রী ও দময়ন্তীদের কাজ, রণরঙ্গিণী বা শালীনতার ভানে-ভরা-রমণীদের কাজ নয়।[৭৭]

পুরুষ, নারীকে দেখেছে তার কাজের হাতিয়ার হিসেবে। নারীও তাই হতেই শিখেছে। দেখেছে পরিণামে এরকম হওয়া সহজ, আনন্দদায়ক। কেন না একজন অপরকে যখন অধঃপাতের দিকে টানে, নেমে যাওয়াটা সহজ হয়।[৭৮]

আমার মতে, এদেশে সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যা নারীকে, এমনকি তার স্বামীকেও 'না' বলতে শেখায়। যা শেখায়, স্বামীর কাজ বাগাবার হাতিয়ার বা হাতের পুতুল হওয়াটা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তার অধিকারও আছে।[৭৯]

প্রকৃত শিক্ষা

আমি মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষায় বিশ্বাসী। কিন্তু এটাও বিশ্বাস করি, পুরুষদের অনুকরণ ক'রে, বা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দৌড়ে নারী পৃথিবীতে তার নিজস্ব অবদান রেখে যাবে না। প্রতিযোগিতায় সামিল হতে পারে, কিন্তু পুরুষকে অনুকরণ করলে, সে যতটা উঁচুতে উঠতে সক্ষম, তা উঠতে পারবে না। তাকে পুরুষের পরিপূরক হতে হবে।[৮০]

আত্মরক্ষা

যাঁরা সীতাকে রামের স্বেচ্ছাদাসী হিসাবে দেখে তাঁরা তাঁর স্বাধীনতার গরিমা, অথবা তাঁর বিষয়ে রামের সার্বিক বিবেচনা, কিছুই উপলব্ধি করে না। সীতা আদৌ অসহায়, দুর্বল নারী ছিলেন না, যিনি নিজেকে বা নিজের সম্মান রক্ষা করতে অক্ষম।[৮১]

আমার আশঙ্কা হয়, আধুনিক মেয়ে গণ্ডাকয়েক রোমিও-র জুলিয়েট হতে চায়। সে অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে....পোষাক পরে বাতাস, বৃষ্টি, রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয়, মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। সে রং মেখে খোদার ওপর খোদকারি করে। দেখায় তাকে অস্বাভাবিক। অহিংসার পথ তেমন মেয়েদের জন্য নয়।[৮২]

তাকে রক্ষা করবার জন্য নারী যেন পুরুষের ভরসায় না থাকে। প্রাচীনকালে দ্রৌপদী যা করেছিলেন, নারীরা তেমনি যেন তাদেব আত্মশক্তি, চরিত্রের পবিত্রতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে।[৮৩]

যথাযোগ্য স্থান

জীবনে যা কিছু পবিত্র ও ধর্মশীল, নারীরা তার বিশিষ্ট জিম্মাদার। স্বভাবত রক্ষণশীল বলে কুসংস্কারজাত অভ্যাসগুলি ত্যাগ করতে যদি তাদের সময় লাগে, তবে জীবনে যা পবিত্র ও মহৎ, তা ছাড়তেও তারা বেশিসময় নেয়।[৮৪]

স্ত্রী, তার স্বামীকে বাদ দিয়ে স্বাধীনবৃত্তি গ্রহণ করছে এ তো আমার চোখেই পড়ে না। তার উদ্যমকে পুরো কাজে লাগাবার জন্য সন্তান প্রতিপালন ও ঘরগেরস্থালী সামলানোই যথেষ্ট।

এক সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থায় পরিবার-ভরণপোষণের বাড়তি দায়িত্ব নারীর উপর বর্তানো ঠিক নয়। পরিবার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে পুরুষ, আর নারী সংসার দেখাশোনা করবে। এভাবে একে-অপরের কাজের সহায়ক ও পরিপূরক হবে।

এর মধ্যে নারীর অধিকারের উপর আক্রমণ, বা তার স্বাধীনতা হরণ করার মতো কোনও কিছু দেখতে পাই না.....আমাদের সাহিত্যে নারীবর্ণনায় ব্যবহৃত বিশেষণ হল অর্ধাঙ্গনা, 'শ্রেষ্ঠতর অর্ধ' এবং সহধর্মিণী 'সহায়ক-বন্ধু'। স্বামী যখন স্ত্রীকে 'দেবী' বলে সম্বোধন করে, তাতে কোনও অবমাননা প্রকাশ পায় না।

....যে নারী তার কর্তব্য জানে এবং তা সম্পাদন করে, সে তাঁর সম্মানজনক অবস্থিতি উপলব্ধি করে, যে সংসারে সে কর্ত্রী সেখানে সে রানী। দাসী নয়।[৮৫]

কিন্তু যেভাবেই হোক, সুদূর অতীত থেকে পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে এসেছে। ফলে নারীরও জন্মেছে হীনম্মন্যতা। নারী পুরুষের তুলনায় হীন, পুরুষের এই স্বার্থোদ্ভূত শিক্ষার যথার্থতায় নারী বিশ্বাস করেছে। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে যাঁরা দ্রষ্টা, তাঁরা নারীর সমান অবস্থান মেনে নিয়েছেন।

সে যাই হোক, এতে সন্দেহ নেই যে কোনও এক জায়গায় দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। নারী ও পুরুষ মূলত অভিন্ন হলেও, এ-কথা মানতেই হবে, দুইয়ের মাঝে শারীরিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। তাই দুইয়ের বৃত্তিও পৃথক।[৮৬]

নারী ও অহিংসা

অহিংসার সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ রূপটি প্রকাশ করাই নারীর জীবনব্রত—আমি তা বিশ্বাস করি। ....অহিংসা বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে সাহসিক কর্মসূচী নেবার ব্যাপারে নারী পুরুষের চেয়ে যোগ্যতর......আত্মত্যাগের সাহসের প্রশ্নে নারী পুরুষের অনেক উপরে। পুরুষ বলবত্তার সাহসে নারীর চেয়ে ওপরে, এ আমার বিশ্বাস।[৮৭]

আমার নিজস্ব মত হল, মূলে নারী ও পুরুষ যখন অভিন্ন, তাদের সমস্যাও মূলত এক। দুজনের মধ্যে সেই এক আত্মা। দুজনে জীবনযাপনে এক। দুইয়ের অনুভূতি সমান। এ-ওর পরিপূরক। একে-অপরের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না।[৮৮]

আমি বলেছি....অহিংসার সজীব মূর্তি নারী। অহিংসা মানে অন্তহীন ভালবাসা, যার অর্থ, সহ্য করার অসীম ক্ষমতা। নারী, যে পুরুষের জন্মদাত্রী, সে ছাড়া কে এই ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ধরে? সন্তান বহন করার নয় মাস কালে সে ভ্রূণকে পুষ্টি দেয়, যন্ত্রণা সয়েও আনন্দ পায়। প্রসব যন্ত্রণার মতো নিদারুণ আর কী আছে? কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে নারী তা ভুলে যায়।

নারী ছাড়া কে প্রত্যহ কষ্ট সয়ে চলে যাতে তার শিশু দিনে-দিনে বড় হয়? এই ভালবাসা সে সমগ্র মানবজাতিকে বিতরণ করুক। সে যে পুরুষের লালসার শিকার ছিল, বা হতে পারে, তা সে ভুলে যাক। তাহলে পুরুষের পাশে তার জননী, স্রষ্টা, ও নীরবনেত্রী হিসেবে নিজের সম্মানিত আসন সে অধিকার করবে। আজকের যুযুধান জগৎ খুঁজছে শান্তির অমৃত। সেই শান্তির কৌশল শেখাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নারীকে।[৮৯]

বিশেষ ব্রত

মেয়েদের অধিকাংশ সর্বদা মাতৃত্বের কর্তব্য পালন করবে। তার জন্য যে-সকল যোগ্যতা আবশ্যক তা পুরুষের থাকার দরকার নেই। নারী অক্রিয়, পুরুষ সক্রিয়। নারী প্রধানত গৃহকর্ত্রী। পুরুষ অন্ন রোজগার করে। নারী অন্ন রক্ষা ও বিতরণ করে। সর্বার্থেই সে তত্ত্বাবধায়িকা। জাতির শিশুদের বড় করা নারীর নিজস্ব বিশিষ্ট দায়িত্ব। নারীর যত্ন না পেলে জাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

নারীকে ঘর-সংসার ফেলে রেখে আবার সেই ঘর-সংসার বাঁচাবার জন্যই কাঁধে বন্দুক তুলে নিতে বলা, বা বোঝানো—নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবমাননাকর বলে আমার মনে হয়। এ একেবারে বর্বরতায় প্রত্যাবর্তন, সমাপ্তির শুরু। পুরুষ যে ঘোড়া চড়ে, সে-ঘোড়ায় চাপতে চেষ্টা করলে নারী নিজেও নিচে পড়বে, পুরুষকে নিচে ফেলে দেবে।

নারীকে তার বিশেষ কর্তব্যক্ষেত্র ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ বা বাধ্য করলে সে পাপ পুরুষের। ঘর গৃহস্থালীকে সুন্দর সুশৃঙ্খল রাখতে, আর বহিরাক্রমণ থেকে ঘরকে রক্ষা করতে সমান সাহসিকতা লাগে......

কি ব্যক্তির কি জাতির, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসাকে গ্রহণ করার জন্য উপস্থাপনাই হল এ-বিশাল সমস্যা সমাধানে আমার অবদান। এ-কাজে নারী হবে অবিসংবাদী

নেতা। এভাবে সে মানবের পুনরাবর্তনে নিজের জায়গা খুঁজে পাবে। স্বীয় হীনম্মন্যতা ত্যাগ করবে।

আধুনিক শিক্ষা বলে যৌনতাড়নাই নাকি সবকিছু স্থির ও নিয়ন্ত্রণ করে। এ কাজে সফল হলে নারী দৃঢ়তার সঙ্গে তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে....[১০]

প্রকৃতিগতভাবে নারী বেশি কষ্টসহিষ্ণু। ফলে অহিংসা তার পক্ষে সহজতর হবে।[১১]

পুরুষের চেয়ে মেয়েদের কাছে আমি বেশি ভালবাসা ও সহনশীলতা প্রত্যাশা করি। অবাক হয়ে ভাবি, কোথায় তারা ভেসে যাচ্ছে। তাদের হৃদয় যদি ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে থাকে, তারা স্বীয় সন্তানদের কী-বা শেখাতে পারবে।[১২]

নারী ও পুরুষের সমতা

নারীর অধিকার বিষয়ে কোনও সমঝোতায় পৌঁছতে আমি নারাজ। আমি মনে করি, পুরুষকে সইতে হয় না এমন কোনও আইনগত অসমতার অধীনে সে শ্রম করবে না। সম্পূর্ণ সাম্যের ভিত্তিতে আমি ছেলে ও মেয়েকে দেখব।[১৩]

স্ত্রী-পুরুষের সাম্য মানে পেশাগত সাম্য নয়। একজন নাবী শিকার করবে বা বর্শা চালাবে, এর বিরুদ্ধে কোনও আইনী বাধা হয়তো নেই। কিন্তু পুরুষেব যে-কাজ তা থেকে নারী সংকুচিত হয়ে সরে আসে সহজাত লজ্জায়। প্রকৃতি লিঙ্গভেদ তৈরি করেছে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে। তাদের গঠন ও আকৃতিই নিরূপণ করে দেয় তাদের কাজ।[১৪]

আইনপ্রণয়ন প্রধানত পুরুষের কাজ হয়েই থেকেছে। এবং পুরুষ, এই স্বনিযুক্ত কাজের বেলা সবসময়ে ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দেয়নি। মেয়েদের পুনরুজ্জীবনের কাজে এগিয়ে চলতে হলে, আমাদের মূলত চেষ্টা করতে হবে সেইসব কলঙ্কমোচনে, যা, আমাদের শাস্ত্রে নারীর সহজাত, প্রয়োজনীয় চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য বলে কথিত। কে এ কাজ করার চেষ্টা করবে? কেমন ক'রে?

সবিনয়ে বলি, আমার মতে, এ চেষ্টা করতে হলে সীতা, দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর মতো পবিত্র, দৃঢ়চিত্ত ও আত্মসংযমী নারী দরকার। তেমন নারী তৈরি করতে পারলে সেই আধুনিক যুগের বোনরা হিন্দু সমাজের কাছে অতীতের পূর্বসূরীদের সমান শ্রদ্ধাই পাবেন। শাস্ত্রের মতোই ওজন থাকবে তাঁদের কথায়। স্মৃতিশাস্ত্রে নারী বিষয়ে যে-সব বিক্ষিপ্ত চিন্তা আছে, সে-বিষয়ে আমরা লজ্জা পাব। শীঘ্র ভুলে যাব সে-সব। অতীতে হিন্দুবাদে এমন বিপ্লব ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। ফলে আমাদের বিশ্বাসে স্থায়িত্ব আসবে।[১৫]

আমি নারী ও পুরুষে কোনও তফাৎ করি না। পুরুষের মতো নারীরও নিজেকে স্বাধীন বলে ভাবা উচিত। বীরত্ব পুরুষের একচেটিয়া নয়।[১৬]

আজ খুব কমসংখ্যক নাবী রাজনীতিতে অংশ নেন। যাঁরা নেন, তাঁরাও স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন না। পিতামাতা, বা স্বামীর নির্দেশ পালন করেই তাঁরা তৃপ্ত। নিজেদের পরনির্ভরতা বুঝে, তাঁরা নারীর অধিকারের জন্য গলা ফাটান। এর বদলে, নারী কর্মীদের উচিত, ভোটাদাতা হিসাবে মেয়েদের নাম তালিকাভুক্ত করা। কার্যকর শিক্ষা দেওয়া

স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখানো। উচিত, জাতিভেদের যে শৃঙ্খলে নারী বন্দী, তা থেকে তাকে মুক্তিদান। যাতে নারীর মধ্যে সেই পরিবর্তন আসে, যা দেখে নারীর শক্তি এবং ত্যাগের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পুরুষ বাধ্য হবে। নারীকে দেবে মর্যাদার আসন।[৯৭]

এমন কথা ভাবার কোনও কারণ নেই যে নারীরা পুরুষের অধীন বা তার চেয়ে নিকৃষ্ট। বিভিন্ন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, নারী পুরুষের অর্ধাংশ। একই যুক্তিতে, পুরুষ নারীর অর্ধাংশ। তারা স্বতন্ত্র নয়। একই সত্তার এ অর্ধেক, ও অর্ধেক। ইংরেজি ভাষায় আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা হয় নারী পুরুষের 'শ্রেয়তর অর্ধাংশ'।

তাই, নারীদের বলব, সকল অবাঞ্ছিত, অযোগ্য বাধাবন্ধের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ করতে। যে-সকল নিয়ন্ত্রণ সুফলদায়ী, তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হতে হবে। গণবিদ্রোহ থেকে কোনও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এর পূর্বশর্ত পবিত্রতা, এবং যুক্তিপূর্ণ প্রতিরোধ।[৯৮]

নারীকে যোগ্যস্থান ছেড়ে দেবার কথা পুরুষের শেখা উচিত। যে দেশে বা মানবসম্প্রদায়ে নারী সম্মানিত নয়, তাকে সভ্য বলা চলে না।[৯৯]

পর্দাপ্রথা

নারীর শুচিতা নিয়ে এত ভয়ঙ্কর উদ্বেগ কেন? পুরুষের পবিত্রতা বিষয়ে নারীব কিছু বলার অধিকার আছে কী? পুরুষের চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে নারীর উদ্বেগের কথা তো শুনি না। নারীর পবিত্রতা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কোন সাহসে পুরুষ নিজের কাঁধে নিয়েছে? এতো বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। এটা অন্তরের বিকাশেব ব্যাপার। তাই ব্যক্তির সচেষ্টতার ব্যাপারও বটে।[১০০]

বদ্ধ ঘরে কৃত্রিম উষ্ণতা সৃষ্টি ক'রে তাতে উদ্যান সৃজন করা চলে—পবিত্রতা সেভাবে তৈরি করা যায় না। পর্দার ঘেরাটোপ দিয়ে পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। অন্তরের অন্তস্তল থেকেই একে জন্ম নিতে হবে। যদি এই পবিত্রতার কোনও মূল্য থাকে, তাহলে সকল অহেতুক প্রলোভনকে জয় করবার ক্ষমতা এর থাকবে।[১০১]

পণপ্রথা

প্রথা উন্মূলিত হতেই হবে। বিবাহ মানে অভিভাবকদের উদ্যোগে টাকার জন্য ব্যবস্থা, এটা চলবে না। পণপ্রথার সঙ্গে জাতের প্রশ্নও জড়িত। কোনও বিশেষ জাতের কয়েকশো তরুণ ছেলেমেয়ের মধ্যেও যদি ব্যাপারটা আবদ্ধ থাকে, পণপ্রথা চলতেই থাকবে। তার বিরুদ্ধে যত কথাই বলা হোক-না-কেন। এ পাপ নির্মূল করতে হলে ওই ছেলেমেয়েদের বা ওদের অভিভাবকদের জাতপাতের বন্ধন ভাঙতে হবে। অর্থাৎ জাতির তরুণ প্রজন্মের মানসিকতায় বিপ্লব ঘটাবার উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে।[১০২]

যে যুবক পণকে বিয়ের শর্ত বলে দাবি করে, সে তার শিক্ষাকে, স্বদেশকে হেয় করে। নারীত্বকে করে অসম্মান।

.....ঘৃণ্য পণপ্রথাকে ধিক্কার দেবে এমন এক শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলা দরকার। যে যুবকরা ওই পাপেব টাকা নিয়ে হাতে কলঙ্কের দাগ লাগায়, সমাজে তাদের একঘরে

করা উচিত। মেয়েদের বাপ-মা যেন বিলিতি ডিগ্রি দেখে মুগ্ধ না হয়। কন্যাদের জন্য সত্যিকারের সাহসী পাত্র জোগাড় করতে তারা যেন নিজ জাতি, নিজ প্রদেশের সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বাইরে বেরোতে ইতস্তত না করে।[১০৩]

বিধবার পুনর্বিবাহ

যে রমণী তার জীবনসঙ্গীর প্রকৃত প্রেম পেয়েছে, সে যখন স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে বৈধব্য স্বীকার করে নেয়, তখন সে জীবনে নিয়ে আসে লাবণ্য ও সম্মান, গৃহকে করে পবিত্র। ধর্ম হয় মহিমান্বিত। ধর্ম বা প্রথা যে বৈধব্য চাপিয়ে দেয় সে এক দুঃসহ বোঝা। তাতে গোপন পাপে গৃহ কলঙ্কিত হয়, ধর্মেরও অবনয়ন ঘটে।

আমরা যদি শুদ্ধ হতে চাই, হিন্দুত্বকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে এই চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্যের বিষ থেকে নিজেদের মুক্ত করতেই হবে। যাদের ঘরে বালবিধবা আছে আপন দায়িত্বে সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে তাদেরই। তারা দেখবে যাতে ওই বালাবিধবাদের যথাযোগ্য শুভবিবাহ হয়। এটা 'পুনর্বিবাহ' হবে না। আসলে তাদের তো বিয়েই হয়নি।[১০৪]

বিবাহবিচ্ছেদ

বিবাহ নারী ও পুরুষের মিলনের অধিকার দেয়। সেখানে কোনও তৃতীয় পক্ষের স্থান নেই। যখন তারা একমত হয়ে মনে করে, এ-মিলন তারা চায়, তখন বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহ এই দম্পতির একজনকে এমন অধিকার দেয় না, যাতে তার মিলনের ইচ্ছা মেনে নিতে অপরজন বাধ্য, এমন দাবি সে করতে পারে। দম্পতির একজন, নৈতিক বা অন্য কোনও কারণে অপবেব সঙ্গে যখন সহমত হতে পারে না, তখন কী কর্তব্য, সে প্রশ্ন আলাদা। একেবাবে নৈতিক কারণে নিজেকে সংযত রাখতে চাই এটা ধরেই নেব। নিজের নৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা আসতে দেব না। তাবপর বিবাহবিচ্ছেদে যদি একমাত্র বিকল্প হয়, আমি তা মেনে নিতে দ্বিধা করব না।[১০৫]

৬১. যৌনশিক্ষা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যৌনবিজ্ঞান শিক্ষার স্থান কী? আদৌ কোনও স্থান আছে কি? যৌনবিজ্ঞান দু'বকম। একটি শিক্ষার দ্বারা যৌন আবেগ নিয়ন্ত্রণ বা জয় করা যায়। অপরটির দ্বারা যৌনাবেগে ইন্ধন জোগানো এবং যৌনলালসা পূরণ করা যায়। শিশুশিক্ষার এক দরকারি অংশ হল প্রথমটি। দ্বিতীয়টি ক্ষতিকারক, বিপজ্জনক, তা নিষিদ্ধ হবারই যোগ্য। সব বড়-বড় ধর্মই কামকে ন্যায্যতই মানবের প্রথম রিপু বলেছেন। ক্রোধ বা ঘৃণাকে দিয়েছেন দ্বিতীয় স্থান। 'গীতা' বলেছেন, ক্রোধ ও ঘৃণা কাম হতে উৎপন্ন। 'গীতা'য় 'কাম' শব্দের সংজ্ঞা বিস্তৃততর। তা কামনার বিস্তার। এখানে 'কাম' সংকীর্ণতর অর্থেই ব্যবহৃত।

জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও প্রক্রিয়া বিষয়ে তরুণ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদান উচিত কি না,

সে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মিলল না। আমি মনে করি, এ জ্ঞানশিক্ষা খানিকটা দেওয়া আবশিক। বর্তমানে তারা নিজেরা এ-বিষয়ে যে যেভাবে পারে জেনে নেয়। পরিণামে ভুলপথে যায়। হানিকরভাবে সেই জ্ঞান ব্যবহার করে। চোখ বুজে এড়িয়ে গেলে তো আমরা যৌনকামনা নিয়ন্ত্রণ ও জয় করতে পারি না। তাদের জননেন্দ্রিয়ের গুরুত্ব এবং সঠিক ব্যবহার বিষয়ে তরুণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমার জোর সমর্থন আছে। যেসব ছেলেমেয়ের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব আমরা উপর ছিল, তাদের আমি এ-শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমি যে-যৌনশিক্ষার সপক্ষে, তার লক্ষ্য যৌনকামনা জয় করা। তাকে মহত্তর স্তরে উন্নীত করা। তেমন যৌনশিক্ষা শিশুদের বোঝাবে, মানুষ ও পশুর মধ্যে মৌল পার্থক্য কী। তারা উপলব্ধি করবে, হৃদয় ও মস্তিষ্ক, দুটোই যে মানুষের ক্ষেত্রে সক্রিয়, এ এক বিশেষ প্রাপ্তি। মানুষ এমন এক প্রাণী যে শুধু আবেগতাড়িত নয়। তার চিন্তাশক্তি আছে। 'মনুষ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকেই তা বোঝা যায়। অন্ধ আবেগের কাছে যুক্তির সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়ার মানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব পরিহার কবা। মানুষের মধ্যে যুক্তি দ্রুতগামী, তা আবেগকে নির্দেশ দেয়। পশুর মধ্যে আত্মা অচেতন, সুপ্ত। হৃদয়ের জাগরণ মানে সুপ্ত আত্মার জাগরণ। যুক্তির জাগরণ। ভালো ও মন্দের মধ্যে তফাৎ করবার ক্ষমতা।

এই প্রকৃত যৌনবিজ্ঞান কে শেখাবে ? স্পষ্টতই যে কামনাকে জয় করেছে সে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অনুরূপ বিজ্ঞানের শিক্ষকরা ওই সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। স্ব-স্ব বিদ্যায় দক্ষ হয়েছেন। সেভাবেই যৌনবিজ্ঞান, যা আত্মসংযমের বিজ্ঞান, সে-বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে চাইব তাঁদেরই যাঁরা এটি অধ্যয়ন করেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছেন। যাতে আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য নেই, সে জ্ঞানগর্ভ উক্তি নির্জীব। ফাঁকা বুলি মনে হবে। সে উক্তি মানুষের অন্তরকে স্পর্শ বা সঞ্চালিত করতে পারবে না। আবার, আত্মোপলব্ধি ও সত্য অভিজ্ঞতা দ্বারা যে উক্তি প্রাণিত, তা সর্বদাই সফল হয়।

আজ আমাদের সমগ্র সমাজ-পরিবেশ, পড়াশোনা, চিন্তাধারা, সামাজিক আচার-আচরণ, সাধারণত যৌনকামনা দ্বারা অধিকৃত। তা পূরণের জন্যই তদ্‌গত। এর বাঁধন কাটানো সহজ কাজ নয়। তবে আমাদের সর্বাধিক উদ্যম ব্যয় করার মতো কাজ বটে। যাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, আত্মসংযম অর্জন করাকে আদর্শ এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করেন, এ-কাজে যারা অতন্দ্র প্রহরী ও সক্রিয়, তাদের পরিশ্রমই তরুণদের আলো দেখাবে..., যৌনতার পাঁকে নিমজ্জন থেকে অসতর্কদের বাঁচাবে। যাঁরা তাঁদের পরিত্রাণ করবে।[১০৬]

৬২. নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ

নারীর মর্যাদা

আমি বরাবর বলেছি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও নারীর ওপর বলাৎকার করা শারীরিকভাবে অসম্ভব। এ অন্যায় তখনই ঘটে, যখন ভয়ের কাছে নারী হার মানে। অথবা নিজের নৈতিক শক্তি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। যদি সে ধর্ষকের সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে

না ওঠে, তার পবিত্রতাই তাকে শক্তি জোগাবে। যার জোরে, পুরুষটি তাকে ধর্ষণ করার আগেই, সে মরে যাবে।

যেমন ধরা যাক, সীতা। গায়ের জোরে তো তিনি রাবণের তুলনায় অতি দুর্বল। কিন্তু তাঁর শুচিতা ছিল রাবণের পরাক্রমের চেয়েও শক্তিশালী। রাবণ তাঁকে নানাভাবে প্রলোভন দেখায়। কিন্তু তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে পাশবলালসা তাঁকে স্পর্শও করতে পরেনি। অপরপক্ষে, যদি কোনও নারী স্বীয় দেহশক্তি বা কোনও হাতিয়ারের ওপব নির্ভর করে তবে অবসন্ন হলেই সে কাবু হয়ে পড়বে।[১০৭]

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নির্ভীক নারী জানে যে শুচিতাই তার শ্রেষ্ঠ বর্ম। সে কখনও অসম্মানিত হতে পারে না। পুরুষটি যতই পশুস্বভাবের হোক-না-কেন সেই নারীর জ্যোতির্ময় শুচিতার সামনে সে লজ্জায় মাথা নত করবে...

তাই আমি নাবীদের বলি....এই সাহস অর্জন করতে তারা চেষ্টা করুক। যদি পারে, তাবা ভয়কে নিঃশেষে জয় করবে। আজ যেমন আক্রমণের ভয়ে কাঁপে, তা বন্ধ হবে....বাবা-মা এবং স্বামীদেরও উচিত নারীদের নির্ভীক হতে শিক্ষা দেওয়া। ঈশ্বর বিষয়ে জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকলে এটা সবচেয়ে ভালো শেখা যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা মানুষকে বক্ষা কবেন। যার এ বিশ্বাস আছে সে সবচেয়ে নির্ভীক....

আক্রান্ত হবার সময় কোনও বমণী হয়তো হিংসা বা অহিংসার কথা ভাববার সময় পায় না। তার প্রথম কর্তব্য আত্মরক্ষা। নিজ মর্যাদা রক্ষার জন্য তার যা করার উচিত বলে মনে হয়, তা-ই কবার অধিকার তাব আছে। সৃষ্টিকর্তা তাকে নখ ও দাঁত দিয়েছেন। সর্বশক্তিতে সে এগুলি ব্যবহার করবে, তাতে মৃত্যু হলে, তাও ভালো। যে পুরুষ বা নারী মৃত্যুভয় জয় কবেছে, আত্মবিসর্জন দ্বারা শুধু নিজেকে নয়, অন্যদেরও সে রক্ষা করে।[১০৮]

যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেখানে এমন দৌরাত্ম্য তো ঘটেই....অহিংসায় বিশ্বাসী নারী বা পুরুষ, আত্মরক্ষার জন্য অথবা নারীর সম্মান রক্ষার জন্য, প্রতিশোধ, বা ক্রোধ, বা হিংসা ব্যতিরেকেই মরবে। মরা উচিতও হবে। এটাই সর্বোচ্চ স্তরের সাহস।[১০৯]

সাহস ও সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণের জন্য কোনও বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার হয় না। ঈশ্বরে প্রদীপ্ত বিশ্বাস থাকলেই চলে।[১১০]

গণিকাবৃত্তি

পৃথিবীর মতোই এ-বৃত্তি প্রাচীন। তবে নগরজীবনে আজ যেমন দেখি, এ বৃত্তি চিরকালই তেমনভাবেই বিদ্যমান ছিল কিনা, তাই ভাবি। যাই হোক, তেমন দিন নিশ্চয় আসবে, যখন মানুষ এ-কলঙ্কের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। গণিকাবৃত্তিকেও নির্বাসন দেবে আরও বহু কলঙ্কিত প্রাচীন প্রথার মতোই। সেগুলি যতই কালবাঞ্ছিত হোক-না-কেন, মানুষ তো তার উচ্ছেদ করেছে।[১১১]

গণিকালয় বন্ধ করার সবচেয়ে ভালো উপায়, মেয়েদের দ্বিমুখী প্রচারাভিযান। এই অভিযান : **ক.** চালাবে সেই মেয়েদের মধ্যে, যাবা জীবিকার্জনের জন্য ইজ্জত বেচে ;

খ. এবং পুরুষদের মধ্যেও—যাতে লজ্জা পেয়ে তারা তাদের বোনদের সঙ্গে অসদাচরণ না করে। এরা তো অজ্ঞতায় অথবা ঔদ্ধত্যে নারীদের অবলা বলে।

আমার মনে আছে, বহুকাল আগে, উনিশ শতকের প্রথম দিকে, স্যালভেশান আর্মির লোকেরা জীবনের তোয়াক্কা করত না। তারা বোম্বাই শহরের গণিকালয় অধ্যুষিত কুখ্যাত সব রাস্তায় পিকেটিং করত। অনেক বড় করে তেমন কোনও আন্দোলন কেন গড়ে তোলা যাবে না, তার কোনও যুক্তি নেই।[১১২]

সাধারণত কামাতুরা চরিত্রের মেয়েদের বেলায় 'বেশ্যা' শব্দ ব্যবহার হয়। কিন্তু যে-পুরুষরা এ-পাপে প্রশ্রয় দেয় তারা ওই নারীদের মতো, হয়তো বা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি 'বেশ্যা'। মেয়েরা তো অনেক ক্ষেত্রেই জীবিকার্জনের জন্য দেহবিক্রি করতে বাধ্য হয়। এ কলঙ্কিত প্রথাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা উচিত। তবে আইনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আইন আছে তবু প্রতি দেশে গোপনে এ-কলঙ্কিত প্রথা চলছে। বলিষ্ঠ জনমত আইনকে বাধা দিতে যেমন পারে, তেমনই পারে সাহায্য করতে।[১১৩]

৬৩. আশ্রম-শপথ

ধর্মের দ্বারা প্রাণিত নয়, এমন মানুষ যত মহানই হোক-না-কেন, তার কীর্তি কখনও মহান হবে না—জীবনের এই সারসত্য আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল ধর্ম কী? ....আমি বলব, পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থ পড়ে যা শেখ, তা ধর্ম নয়। এশুধু মগজ দিয়ে আয়ত্ত করা যায় না। হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। এটি বাইরের নয়, আমাদের অন্তরেই নিহিত। কিন্তু তবু তাকে নিরন্তর চর্চা করতে হয়। সতত তা অন্তরে আছে। কারও বেলা সচেতনে। কারো বেলা অচেতনে। তবু তা আছে। আমরা যদি সঠিক পন্থায় এমন কিছু করতে চাই যা স্থায়ী হবে, তাহলে অন্তরে ধর্মবোধ জাগাতেই হবে। সে বাইরের সহায়তা নিয়েই হোক, বা অন্তরে এ বোধের বিকাশ ঘটিয়েই হোক। কোন পন্থায় হবে তাতে কিছু এসে যায় না। তবে এটা করতেই হবে।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ কিছু নীতিকে জীবননীতি বলে নির্দেশ করেছে। সেগুলি স্বতঃসিদ্ধও বটে। স্ব-প্রমাণিত সত্য হিসাবে আমরা সেগুলি মেনেও নিয়েছি....দীর্ঘকাল ধরে আমরা এগুলি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছি। এ সকল বিধিনিষেধ মেনে কাজ করতে চেষ্টা করেছি.... যাঁরা আমার সমভাবনাসম্পন্ন, এ-আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তাঁদের সাহচর্য আমার কাছে দরকারি বলে মনে হয়েছে....যে-সব নীতি আমরা গ্রহণ করেছি এবং ওই আশ্রমের সদস্য হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে যে-নীতি মেনে চলতে হবে (সেগুলি এ-রকম):

সত্যের শপথ

"সত্য" বলতে সাধারণত যা বুঝি, সে সত্য নয়। "সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি" এ বাক্যে যা বুঝি, সে সত্য নয়। কেননা তাতে এ-ও বোঝায়, যে সততা যদি শ্রেষ্ঠ নীতি

না হয়, তাহলে সে-নীতি ত্যাগ করাও চলে। এখানে এ-হল সেই সত্য, যে সত্যের শাসনে আমাদের জীবন চালাতে হবে—তার জন্য যে দামই দিতে হোক-না-কেন। সত্যের সংজ্ঞা বোঝাতে আমি কীর্তিত চরিত্র প্রহ্লাদের কথা বলি। সত্যের খাতিরে সে নিজের পিতার বিরোধিতা করার সাহস দেখিয়েছিল। প্রতিহিংসায়, বা পিতৃআচরিত পন্থায় নয়, সে আত্মরক্ষা করেছিল তার জ্ঞানবুদ্ধি মতো সত্যরক্ষার্থে। বাবা তাকে যে আঘাত করেন, পিতার নির্দেশে অন্যেরা যে প্রহার করে তার প্রত্যুত্তরে প্রত্যাঘাত না হেনেই সে মরতে প্রস্তুত ছিল। শুধু তাই নয়, প্রহার এড়াতে সে চেষ্টাও করেনি। বরঞ্চ হাসিমুখে অসংখ্য অত্যাচার সয়েছে। পরিণামে সত্যই জয়ী হল। জীবিতকালেই সত্যনীতির অমোঘতা বোঝাতে পারবে এমন জেনেশুনে প্রহ্লাদ অত্যাচার সয়নি। সত্য জয়ী হয়েছিল। কিন্তু অত্যাচারে, নির্যাতনে মৃত্যু হলেও সে সত্যকেই আঁকড়ে থাকত। এই সত্য আমি অনুসরণ করতে চাই....আমাদের আশ্রমনীতি হল, যখন "না" বলবার "না" বলব, তার পরিণাম কী হবে তা ভাবব না।

অহিংসানীতি

আক্ষরিক অর্থে "অহিংসা" মানে হল "হত্যা নয়"। আমার কাছে এ-শব্দের অর্থ বিশাল ও ব্যাপক। তা আমাকে অনেক উচ্চমার্গে নিয়ে যায়..."অহিংসা"র প্রকৃত অর্থ হল, তুমি কারও মনে আঘাত দিতে পার না। যে-লোক নিজেকে তোমার শত্রু বলে জানে, তাকেও না। এনীতি যে মেনে চলে তার মনে শত্রুতার কোনও জায়গা নেই...তবে এমন মানুষ থাকতে পারে, যারা নিজেদের ওই ব্যক্তির শত্রু বলে মনে করে...তাই আমরা বলি, তেমন লোকের বেলায়ও আমরা মনে কোনও কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দেব না। আমরা যদি আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করি, তাহলে অহিংসার নীতি থেকে ভ্রষ্ট হব। আরও বিশদ করি প্রসঙ্গটি। কোনও বন্ধু, বা তথাকথিত শত্রুর কাজে যদি মনে ক্ষোভ হয়, তাহলেও আমরা অহিংসানীতি থেকে সরে যাই। যখন বলি, ক্ষুব্ধ হব না, তার অর্থ এই নয় যে, নত হয়ে মেনে নেব। "ক্ষোভ" দ্বারা বোঝাতে চাইছি, শত্রুর কোনও ক্ষতি হোক, অথবা আমাদের হাতে না হলেও অপরের হাতে বা দৈবী উপায়ে তার মৃত্যু হোক এমন ইচ্ছা লালন করা। এমন ইচ্ছা লালন করলেও আমরা অহিংসার পথ থেকে ভ্রষ্ট হই। যাঁরা আশ্রমে যোগ দেন, তাঁদের "অহিংসা" শব্দের আক্ষরিক অর্থই মেনে নিতে হয়। এর অর্থ এই নয় যে, এ-নীতি আমরা সম্পূর্ণ আচরণ করি। একেবারেই নয়। এ এক আদর্শ, যা আয়ত্ত করতে হবে। যদি পারি, তাহলে তা এখনই, এই মুহূর্তেই আয়ত্ত করতে হবে। এটি কোনও জ্যামিতিক প্রমাণ নয়। এমন কি উচ্চতর গণিতের সমস্যা সমাধানও নয়। তার চেয়ে এটি অনেক কঠিন। তোমাদের অনেকে রাত জেগে সে-সব সম্পাদ্য সমাধানের চেষ্টা করেছ, যদি এ নীতি অনুসরণ করতে চাও, তাহলে রাত জাগার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ করতে হবে। বহু রাত কাটবে নিদ্রাহীন। মন নির্যাতিত, যন্ত্রণার্ত হবে। তবে যদি লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারো। "ধার্মিক জীবন" বলতে কী বোঝায় তা যদি জানতে চাই, তবে তোমাকে ও আমাকে ওই লক্ষ্যেই পৌঁছতে হবে।

...যে এই নীতির সার্থকতায় বিশ্বাস করে, লক্ষ্যের পথে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সে যখন পৌঁছয়, দেখে তার পদতলে বিশ্বসংসার পড়ে আছে.... "অহিংসা" শব্দটি উচ্চারণ দ্বারা তোমার ভালবাসা এমনভাবে যদি জানাতে পারো যাতে তা তোমার তথাকথিত শত্রুর মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে, তবে সে ভালবাসার প্রতিদান দেবেই....সংগঠিত গোপন হত্যা, অথবা প্রকাশ্য হত্যা, অথবা দেশের জন্য বা তোমার দায়িত্বে যারা আছে সেই প্রিয়জনদের সম্মান রক্ষার্থে হিংসাকার্যের কোনও জায়গা এই নীতিতে নেই। এমন কাজ করলে তাদের সম্মান রক্ষার্থে সামান্যই করা হবে। আমাদের ওপর যাদের দায়িত্ব, তাদের সম্মান রক্ষার্থে যে বিনাশ করবে তার হাতে নিজেদেরও তুলে দাও, এ-নীতি তাই বলে। দৈহিক আঘাত হানার চেয়ে এ-কাজে অনেকবেশি দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন ...যদি প্রত্যাঘাত না করো, প্রতিপক্ষ ও তোমার শরণাগতর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকো অটল হয়ে। কোনও বাধা না দিয়ে একতরফা মার খেয়ে যাও। তখন কী হয়? আমি কথা দিচ্ছি, প্রতিপক্ষের হাতে মার খাবে তুমি। তোমার বন্ধু বেঁচে যাবে। ঐ জীবনপরিকল্পনায় সেই স্বদেশপ্রেমের কল্পনা নেই যা, আজ তোমরা 'ন্যায়যুদ্ধ' বলে ইউরোপে দেখছ।

ব্রহ্মচর্যের শপথ

বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে, যারা দেশের কাজ করতে, বা প্রকৃত ধার্মিকজীবনের স্বাদ পেতে চায়, তাদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। বিবাহ একটি নারীকে এক পুরুষের কাছে আনে মাত্র, তারা এক বিশেষ অর্থে বন্ধু হয়। এ বন্ধন জন্ম জন্মান্তরের। বিবাহ বিষয়ে আমাদের যে ধারণা তাতে লালসা প্রবেশ করা উচিত বলে আমি মনে করি না। সে যা-ই হোক, আশ্রমে যাঁরা আসেন, তাঁদের এ-কথা জানানো হয়। এনিয়ে আমি বিশদে যাই না।

রসনাসংযমের শপথ

যে ব্যক্তি তার পাশব আবেগ দমন করতে চায়, রসনা সংযত করলে সে-কাজ সে সহজেই পারে। আমার শঙ্কা এটি এক কঠিনতম শপথ....দেহ উদ্দীপক, তাপবর্ধক, উত্তেজক মশলাপাতি ত্যাগে যদি সম্মত না হই....তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় পাশব-কামনার উত্তেজক উদ্দীপনা দমনে আমরা সমর্থ হব না... যদি তা না করি.... তাহলে শরীরের পবিত্র বিশ্বাসকে আমরা কলুষিত করব। তখন পশুর মতোই আমাদের যে-সব, লালসা আছে সেই পানভোজন ও কামনাকে প্রশ্রয় দেব। পরিণামে পশু বা বর্বরের চেয়ে নিচে নেমে যাব। তবে আমাদের মতো রসনালোলুপ কোনও ঘোড়া বা গোরুকে দেখেছ? খাদ্য বস্তুতে আমরা তো এতো বৈচিত্র্য এনেছি! তোমরা কি মনে কর এটা সভ্যতার পরিচয়? সত্যকার জীবনের কোনও চিহ্ন? বিচিত্র খাদ্যের খোঁজে আমরা পাগল হয়ে খবরের কাগজের জন্য দৌড়ই। কাগজই তো নানা খাদ্যবস্তুর বিজ্ঞাপন দেয়, তাই না?

চুরি না-করার শপথ

আমি বলি, এক অর্থে আমরাও তস্কর। যদি কিছু দ্রব্য নিয়ে রেখে দেই, যা এখনই আমার কাজে লাগছে না, তাহলে সেটা অন্য কারও থেকে চুরি করাই হল। প্রকৃতির মূলনীতি হল, আমাদের প্রত্যহ যা প্রয়োজন, তা প্রকৃতি দিচ্ছে। প্রত্যেকে যদি নিজের দরকার মতো নিত, তাহলে দুনিয়ায় দারিদ্র থাকত না, অনাহারে কেউ মরত না। আমি সমাজবাদী নই। যার আছে, তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাই না। তবে, যে-সব ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রত্যাশী তাদের এ নীতি মানতে হবে। কেউ সম্পত্তি হারাক, এ আমি চাই না। চাইলে তো আমি অহিংসানীতি থেকে ভ্রষ্ট হব। যদি কারও আমার চেয়ে বেশি থাকে, থাকুক। তবে নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণকালে, আমি যা চাই না, তার মালিক হবার সাহস আমার নেই। ভারতে লক্ষকোটি মানুষ আছে যাদের দিনান্তে একবেলা আহার জোটে। সে আহারও তেল ঘি বর্জিত একটি চাপাটি ও একটি চিমটে নুন। যতদিন না এই লক্ষকোটি মানুষ অন্ন ও বস্ত্র পায় ততদিন তোমার-আমার যা আছে তা রাখার অধিকার আমাদের নেই। তুমি-আমি এ-সব কথা তো ভালো করেই জানি। আমাদের অভাববোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ওই জনগণ যাতে অন্নবস্ত্র-সেবাশুশ্রূষা পায়, সে-জন্য স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করতে হবে।

সম্পত্তি না-রাখার শপথ

(এটি) এখানকার নিত্য কার্যক্রম।

স্বদেশীর শপথ

স্বদেশী (ব্যবহারের) শপথ এক পবিত্র শপথ। আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন মেটাবার জন্য স্বীয় এলাকা ছেড়ে যখন অন্য কোথাও চলে যাই আমরা, তখন আমাদের সত্তার সঙ্গে একীভূত কতকগুলি মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হই। যদি এমন কোনও ব্যবসায়ী তোমার দোরগোড়াতেই থাকে যে মাদ্রাজে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তাহলে বোম্বাই থেকে কোনও ব্যক্তি এসে যদি তোমাকে তার পণ্য দেখায়, তাকে সহায়তা করলে অন্যায় করবে।

"স্বদেশী" সম্বন্ধে এটাই আমার দৃষ্টিভঙ্গি। মাদ্রাজ থেকে খুব কর্মদক্ষ শৌখিন কোনও নাপিত তোমার গ্রামে এলেও, তাকে বাদ দিয়ে স্বগ্রামে তুমি গ্রামের নাপিতকেই মদত দিতে বাধ্য। যদি মনে করো গ্রামের নাপিতটির, মাদ্রাজের নাপিতটির মতো দক্ষ হওয়া দরকার, তাকে প্রশিক্ষণ দাও। চাও তো তাকে মাদ্রাজে পাঠাও যাতে সে নিজের কাজটি ভালো শিখতে পারে। এ-কাজ যতক্ষণ না করছ, তোমার অন্য নাপিতের কাছে যাওয়া অন্যায়। এটাই "স্বদেশী"। তাই, যখন দেখি, অনেককিছুই আছে যা ভারতে মেলে না, চেষ্টা করতে হবে সে-সব বাদ দিয়েই চলতে। হয়তো অনেককিছু বাদ পড়বে। তবু বিশ্বাস করো, তোমার মন যখন ওই পর্যায়ে পৌঁছবে, দেখবে কাঁধ থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেছে। সেই অতুলনীয় বই "পিলগ্রিমস প্রগ্রেস"-এ তীর্থযাত্রীটির যেমন মনে হয়েছিল, ঠিক তেমনই হবে। তীর্থযাত্রীটি যে ভারি বোঝা বইছিল, একসময়ে

কখন অজানতে সেটা পড়ে গেল। শুরু করার সময়ের চেয়ে এখন তার নিজেকে অনেক হালকা আর স্বচ্ছন্দ মনে হল। "স্বদেশী" মতে জীবনযাপন শুরু করো। তাহলে এখনকার চেয়ে নিজেদের অনেক হালকা আর স্বচ্ছন্দ বোধ হবে।

ভয়কে জয় করবার শপথ

ভারতের নানা জায়গায় ঘুরতে-ঘুরতে আমার মনে হয়েছে, দেশ এক ভয়ংকর ভয়ের কবলিত, চলচ্ছক্তিরহিত। এ-নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলি না। স্বীয় মতামত বলি গোপনে। যা চাই ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে তা করি, বাইরে পাঁচ-কান করি না।

যদি বুঝতাম মৌনতার শপথ নিয়েছি, কিছু বলার থাকত না। আমি মনে করি, একজনকেই ভয় পাওয়া চলে, তিনি ঈশ্বর। ভগবানকে যখন ভয় পাই, তখন কোনও মানুষকে ভয় পাব না। সে লোক যত কেষ্টবিষ্টু হোক-না-কেন। যদি সত্যের শপথ মেনে চলো, তবে ভয়হীনতা একান্ত আবশ্যক। ভারতের ভাগ্য নির্দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে আনার আগে আমাদের নির্ভীক হবার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে।

'অস্পৃশ্যদের' বিষয়ে শপথ

আজ হিন্দুধর্ম এক অনপনেয় কলঙ্ক বহন করে চলেছে। এটা প্রাচীন যুগ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার এ আমি বিশ্বাস করি না। মনে করি, আমরা যখন চূড়ান্ত অধঃপতিত ছিলাম, তখনই অস্পৃশ্যতার এই মর্মান্তিক, জঘন্য গোলামির মনোভাব জন্ম নেয়। এ-কলঙ্ক আজও রয়েছে। আমার মতে এ-এক অভিশাপ বর্তেছিল আমাদের ওপর। এটা যতদিন থাকবে, ততদিন এ-কথাই ভাবব, এই পবিত্র দেশে প্রতিটি উৎপীড়ন হল আমরা যে নিদারুণে অপরাধ করে চলেছি তারই যোগ্য শাস্তি। কোনও লোককে তার জন্মের কারণে অস্পৃশ্য বলা হবে, এ আমার ধারণাতীত। তোমরা ছাত্ররা, যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছ তোমরা যদি এ-পাপের অংশীদার হও, তাহলে কোনও শিক্ষাই না পেলে বরং তোমাদের ভালো ছিল।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

ইউরোপে সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ শুধু মাতৃভাষা নয়, অন্যান্য ভাষাও শেখে।

ভারতে ভাষাসমস্যা সমাধানের জন্য আমরা এ আশ্রমে যতগুলি সম্ভব ভারতীয় ভাষা শেখার ওপর জোর দেব। ইংরেজি দুরস্ত করতে যা ঝামেলা সে তুলনায় এ-সব ভাষা শিক্ষা কোনও সমস্যাই নয়। শৈশবের দিনগুলির স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলব কোন স্পর্ধায়? কিন্তু তাই তো করি আমরা, যখন এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা শুরু করি। এর ফলে এক ব্যবধান রচিত হচ্ছে। যার জন্য চড়া দাম দিতে হবে। এই শিক্ষা আর অস্পৃশ্যতার মধ্যে যোগ কোথায়, তা বলছি। জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার ঘটছে, তা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস থেকে যাচ্ছে। শিক্ষার ফলে আমরা বুঝছি, এটা নৃশংস

অপরাধ। কিন্তু ভয় আমাদের কবজা করেছে। তাই যা বুঝছি, সে-নীতি নিজের সংসারে প্রয়োগ করতে পারছি না।

খাদির শপথ

তুমি বলতে পারো, "কেন হাত লাগিয়ে কাজ করব?" বলতে পারো, "কায়িক পরিশ্রম করতে হবে নিরক্ষরদের। আমি শুধু সাহিত্য এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধ নিয়ে থাকব।" শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে হবে আমাদের। কোনও নাপিত বা মুচি কলেজে পড়লেও নিজ-ব্যবসায় ছাড়া তার উচিত নয়। আমার মতে, এসব পেশা, চিকিৎসা-পশার সমতুল।

পবিশেষে, এসব নিয়ম যদি মেনে নাও, তোমাকে ভাবতে হবে:

রাজনীতিতে ধর্মীয় চেতনা

ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন রাজনীতি অর্থহীন। ছাত্রজগৎ যদি রাজনীতির মঞ্চে ভিড় জমায়, সেটা জাতির উন্নতির খুব স্বাস্থ্যকর চিহ্ন হয়তো হবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তোমরা ছাত্রজীবনে রাজনীতি অধ্যয়ন করবে না। রাজনীতি আমাদের জীবনের এক অঙ্গ। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বুঝতে হবে আমাদের। এ কাজ আমরা শৈশব থেকেই করতে পারি। তাই আমাদের আশ্রমে প্রতিটি শিশুকে দেশের রাজনীতিক সংগঠনগুলিকে বোঝার শিক্ষা দেওয়া হয়। কিভাবে দেশ উদ্বেল হচ্ছে নতুন ভাবাবেগে, নতুন আশায়, নতুন জীবনচেতনায়—তা জানার শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার আমরা চাই সেই অকম্প্র-শিক্ষা, ধর্মবিশ্বাসেব অভ্রান্ত আলোকবর্তিকা। সেই বিশ্বাস নয় যার আবেদন শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য। সেই ধর্মবিশ্বাস যা অনপনেয়ভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত। ধর্মীয়চেতনা প্রথমে উপলব্ধি করতে চাই। সে কাজ হলে আমাদের চোখে জীবন এক সমগ্রতায় ধরা দেয়। তখন এটি সকলের কাছেই এক পবিত্র, বিশেষ প্রাপ্তি। ফলে তরুণরা যখন পূর্ণবয়স্ক হচ্ছে, তারা জীবনের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য একেবারে তৈরি হতে হতে বড় হবে। আজ যা হয় তা এই: বাজনীতিক জীবন ছাত্রজীবনে সীমাবদ্ধ। ছাত্রাবস্থা পেরোলেই এরা বিস্মৃত হয়ে যায়। তোমাদের যা বললাম, সেসব নিয়ম মানলে যা হয়, এরা তা জানে না। ঈশ্বর, মুক্ত বাতাস, উজ্জ্বল আলো, যথার্থ প্রাণোচ্ছল স্বাধীনতা—এ-সবের কিছুই না জেনে এরা নগণ্য সব চাকরি খোঁজে....[১১৪]

১২. স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

৬৪. স্বাধীনতার শপথবাণী

ধীরগতি স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। স্বাধীনতা নবজন্মের তুল্য। পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া অবধি আমরা ক্রীতদাস। সকল জন্মই হয় নিমেষে।[১]

গিলটি করা দাসত্ব

এক আত্মসম্মানী ব্যক্তির কাছে সোনার শিকল, লোহার শিকলের চেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। দংশন আছে শিকলটিতে, ধাতুতে নয়।[২]

আমার মনে হয়, লৌহশৃঙ্খলেব চেয়ে সোনার শিকল অনেক খারাপ। লৌহশৃঙ্খল সেই পীড়া ও যন্ত্রণা দেয় যা সোনার শিকল ভুলিয়ে দিতে পারে। তাই ভারতকে যদি শৃঙ্খলিতই রাখতে হয়, সোনা বা অন্য দামী ধাতু নয়, লোহার শিকলই আমি চাইব।[৩]

স্বাধীনতালাভের অধিকার

ভুল বা পাপ করার অধিকার যে স্বাধীনতা দেয় না, সে স্বাধীনতা প্রাপ্তির যোগ্যই নয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি তাঁর নগণ্যতম সৃষ্টিকেও ভুল করার স্বাধীনতা দিতে পেরে থাকেন, তবে মানুষ যত দক্ষ বা যোগ্য হোক-না-কেন অন্য মানুষদের এই মূল্যবান অধিকারে বঞ্চিত রেখে কী করে আনন্দ পায়, তা আমার বোধের অগম্য।[৪]

প্রতি দেশ যেমন পানাহার করতে, শ্বাস নিতে সমর্থ, তেমনি প্রতি জাতিই নিজের ব্যাপার নিজে সামলাতে সমর্থ, তা সে যত খারাপভাবেই হোক-না-কেন।[৫]

উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই মন্দ।...এ-নিয়ন্ত্রণ সরে গেলে জাতি স্বস্তিতে শ্বাস নেবে, ভুলভ্রান্তি করার অধিকার তার থাকবে। ভুল করা এবং সে ভুল সংশোধন করতে করতে এগিয়ে যাবার প্রাচীন নিয়মটিই সঠিক পন্থা।[৬]

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

নিজের ব্যর্থতা ব্যতীত অন্য কোনও কারণে কোনও মানুষ নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হারায় না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।[৭]

ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আমি দাম দিই। কিন্তু এ-কথা ভুলে যেও না, মানুষ মূলে সমাজবাসী। সমাজের অগ্রগতির প্রয়োজনের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খাপ খাইয়ে চলতে শিখেই মানুষ সমাজে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। বাঁধনছাড়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বনের পশুর নীতি। সামাজিক বিধিনিষেধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা, দুইয়ের মাঝে কোনও মধ্যাবস্থান খুঁজতে হবে আমাদের। যাতে সমগ্র সমাজের হিতার্থে সামাজিক বিধিনিষেধের কাছে স্বেচ্ছায় মাথা নোয়ালে ব্যক্তিটি, এবং যার সে সদস্য সেই সমাজ, উভয়েই লাভবান হয়।[৮]

ব্যক্তি-স্বাধীনতা চলে গেলে সবই চলে যায়। কেন-না ব্যক্তি যদি না থাকে, সমাজের কতটুকু থাকবে? একমাত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাই পারে, সমাজসেবায় ব্যক্তিটিকে স্বেচ্ছায় আত্মদান করাতে। এ-স্বাধীনতা কেড়ে নিলে সে হয় এক নিষ্প্রাণ যন্ত্রমানব। সমাজ ধ্বংস হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকৃত হলে তার ভিত্তিতে কোনও সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এটা মানবস্বভাবের পরিপন্থী। মানুষের শিং বা লেজ গজাবে না নিশ্চয়। কিন্তু নিজস্ব মতামত না থাকলে সে মানুষ হিসেবেও টিকে থাকবে না। বাস্তব জগতে, যারা ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসই করে না, তারা নিজেদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। চিঙ্গিজ খাঁ-র নতুন সংস্করণ যারা, তারা নিজেদের অধিকারটি বজায় রাখে।[৯]

স্বাধীনতার ধারণা

আমার স্বাধীনতা বিষয়ক ধারণা কোনও সংকীর্ণ ধাবণা নয়। মানবের স্বাধীনতার সকল মহিমার সঙ্গে সে সমব্যাপী।[১০]

প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণতম স্বাধীনতা থাকবে স্বীয় গুণকে কাজে লাগাবার। তার প্রতিবেশীদের কাজে তা লাগাবে সঙ্গতি রেখে। কিন্তু সে গুণ থেকে যা পাওয়া যাবে, তা কেউ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে না। জাতির অথবা তার চারপাশের সমাজের এক অংশ ব্যক্তি। তাই, যে সমাজের সে অঙ্গ, যার অনুমোদনে সে বেঁচে আছে— তার জন্যও সে নিজ গুণের ব্যবহার করবে। শুধু নিজের জন্য নয়।[১১]

স্বাধীন হবার ইচ্ছা

কোনও অত্যাচারী স্ব-উদ্দেশ্যে একা সফল হয় না। প্রায়ই বলপ্রয়োগ ক'রে অত্যাচারিতকেও বহন করতে হয় তাকে। অধিকাংশ লোকই, অত্যাচারের প্রতিরোধ করার পরিণতি ভোগ করার চেয়ে অত্যাচারীর ইচ্ছার কাছে হার মেনে নেওয়াই বেছে নেয়। তাই অত্যাচারী সন্ত্রাসই চালায়। এতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে সন্ত্রাসকারী তার শিকারের উপর নিজের যদৃচ্ছা জারি করতে গিয়ে দেখেছে সন্ত্রাসন হার মানে।[১২]

শাসিতজনের অনুমোদন না থাকলে সবচেয়ে স্বৈরাচারী সরকারও টিকে থাকতে পারে না। এ-অনুমোদন প্রায়ই ওই সরকার বলপ্রয়োগ করে আদায় করে। যখনই প্রজা ওই স্বৈরাচারীর শক্তি বিষয়ে ভয়মুক্ত হয়, অত্যাচারীর ক্ষমতা চলে যায়।[১৩]

যে মুহূর্তে কোনও ক্রীতদাস সিদ্ধান্ত নেয়, সে আর দাসত্ব মানবে না, তখনই তার

শিকল খসে পড়ে। স্বাধীনতা, দাসত্ব, সবই মনের ব্যাপার। তাই নিজেকে সর্বাগ্রে বলো, "আমি আর দাস হয়ে থাকব না। মানব না হুকুম। আমার বিবেকের সঙ্গে সংঘর্ষ হলেই হুকুম অমান্য করব।"

এই তথাকথিত মালিক চাবুক মেরে তোমাকে হুকুম মানাতে চেষ্টা করতে পারে। তুমি বলবে, "পয়সা দাও বা শাসাও, আমি তোমার হুকুম মানব না।" এর ফলে অত্যাচার হতে পারে। তা সইবার জন্য তোমার প্রস্তুতিই স্বাধীনতার অনির্বাণ মশাল জ্বালবে।[১৪]

স্বাধীনতার মূল্য

আত্মসম্মানের বা সযত্নলালিত বিশ্বাসের মূল্যে স্বাধীনতা ক্রয় করতে রাজি হব না কিছুতে, সে আমরা একজন হই, বা অনেক। যা করতে চায় তা করতে না দিয়ে দেখেছি, ছোট শিশুরাও রুখে দাঁড়ায়। অথচ, তাদের মা-বাপের কাছে হয়তো কারণটা তুচ্ছ।[১৫]

স্বাধীন নর-নারী হিসেবে যদি বাঁচতে না পারি, মরে গেলেও ক্ষোভ থাকবে না আমাদের।[১৬]

পরাধীনতার জন্য মানুষ নিজে দায়ী। যখনই চাইবে, তখনই সে স্বাধীন হতে পারে।[১৭]

স্বাধীনতার জন্য কোনও মূল্যই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা হল, প্রাণবায়ু। বেঁচে থাকার জন্য এমন কী দাম আছে, যা মানুষ দেবে না?[১৮]

দীনাতিদীনের স্বাধীনতা

বেদনা পাই, বিস্ময় জাগে, যখন দেখি স্বাধীন ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে, তাই নিয়ে মানুষ চিন্তিত। কোনও কৃত্রিম সীমারেখার মধ্যেকার ভূখণ্ডে নয়, প্রাকৃতিক সীমারেখার বিধৃত যে ভারত, সে ভারতে সব চেয়ে নীচে যাদের জন্ম, তাদেরকে যে-ভারত স্বাধীনতা দিতে পারে না তা স্বাধীন ভারত নয়।

ভয় আমাদের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছে। নচেৎ আমরা নিমেষে বুঝতাম, স্বাধীনতা এক বিশেষ অবস্থা। বর্তমানে প্রতিটি সৎ নরনারীর যে অবস্থা, তার চেয়ে তা ভালো। স্বাধীনতার উদয়কে ভয় পাবে শোষকরা, অর্থলোভীরা, এবং লুঠেরাগণ।[১৯]

আমি এমন এক সংবিধানের জন্য চেষ্টা করব, যা ভারতকে গোলামি ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মুক্ত করবে। দরকারে তাকে পাপ করার অধিকার দেবে। কাজ করে যাব, সেই ভারতের জন্য যেখানে দরিদ্রতম মানুষও মনে করবে এ-দেশ তাদের। এ-দেশ গঠনে তাদের কার্যকর বক্তব্য থাকবে। সে ভারতে মানুষের মধ্যে উচ্চ বর্গ ও নিম্ন বর্গ থাকবে না। সেখানে সকল সম্প্রদায় সম্প্রীতিতে বাস করবে। সে ভারতে অস্পৃশ্যতা-কলঙ্কের কোনও জায়গা থাকবে না। অভিশাপ নেই নেশা ধরানো মদ ও মাদকদ্রব্যের। নারী পাবে পুরুষের সমান অধিকার।

বাকি দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক হবে শান্তির। শোষিত হব না। শোষণ করব না। আমাদের সেনাবাহিনী হবে যতদূর সম্ভব, ক্ষুদ্রতম। মূক, নিঃস্ব অগণন মানুষের স্বার্থের সঙ্গে

যে-সব স্বার্থের সংঘর্ষ নেই তা নিঃশেষে সম্মানিত হবে। সে বিদেশী বা স্বদেশী যা-ই হোক-না-কেন। এই ভারত আমার স্বপ্নের ভারত। অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না।[২০]

কোনও শোষণ নয়

দেশের স্বাধীনতা আমার কাম্য কিন্তু তার মানে এই নয়, আমি যে জাতির অন্তর্গত, তাতে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ মানুষ আছে বলেই সে জাতি পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিকে, বা ব্যক্তিকে শোষণ করবে বলে এই স্বাধীনতা আমি চাইছি। দুর্বল বা সবল, প্রতিটি জাতির স্বাধীনতায় সমান অধিকার থাকাকে আমি যদি মূল্য না দিতাম, তাহলে আমি যে স্বাধীনতা চাইছি, তার যোগ্য হতাম না।[২১]

যে মানুষ নিজে মুক্ত হতে চায়, অন্যদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধার কথা সে ভাবতেই পারে না। যদি ভাবার চেষ্টা করে, তবে তারা নিজেদের দাসত্ব শৃঙ্খলকেই আরো আঁটোসাঁটো করবে।[২২]

তোমার অন্তরে ও এ-পৃথিবীতে "স্বর্গরাজ্য" বলতে যা বোঝায়, আমার স্বাধীনতার ধারণা ঠিক তা-ই। এ স্বপ্ন বাস্তব হয়ে না উঠলেও এর জন্যই কাজ করতে ও মরতে আমি রাজি। এর জন্য চাই অশেষ ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম।

শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েই যদি ভারত তৃপ্ত হয়, এর চেয়ে ভালো আমার যদি কিছু কাজ করার না থাকে, তাহলে দেখবে আমি হিমালয়ে চলে গেছি। অবসর নিয়ে সকলকে ছেড়ে। যারা আমার কথা শুনতে চায়, তারা সেখানে যাবে।।[২৩]

মোদ্দা কথা.....স্বাধীনতা হবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক। "রাজনৈতিক" মানে হল, ব্রিটিশ সেনার সকলপ্রকার নিয়ন্ত্রণের অপসারণ। "অর্থনৈতিক" মানে, ব্রিটিশ পুঁজি ও পুঁজিবাদ এবং তাদের ভারতীয় সংস্করণের হাত থেকে মুক্তি। দীনতম যেন উচ্চতম মানুষের সঙ্গে নিজেকে সমান মনে করে। এটা তখনই হতে পারে যখন ঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী, দীনতম মানুষের সঙ্গে স্বীয় দক্ষতা ও পুঁজি ভাগ করে নেবে।

"নৈতিক" মানে সশস্ত্র প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি।[২৪]

শান্তির উপায়

ভারত কখনও কোনও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। নিছক অত্মরক্ষার জন্য ভারত যেমনতেমন ভাবে সংগঠিত বা অর্ধসংগঠিত প্রতিরোধ খাড়া করেছে। তাই, শান্তির কামনা গড়ে তোলার দরকার নেই তাব। ভারত জানুক বা না জানুক, শান্তিকামনা তার মধ্যে প্রচুর আছে।

শান্তিপূর্ণ পন্থায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ভারত শান্তি প্রচার করতে পারে। অর্থাৎ, শান্তিপূর্ণ উপায়ের মাধ্যমে তাকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে....যদি তা পারে, তাহলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনও একটি জাতির তরফে এটা হবে বৃহত্তম 'অবদান।[২৫]

রক্তাক্ত হিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে প্রয়োজনে আমি যুগযুগান্ত

অপেক্ষা করব। পঁয়ত্রিশ বছরের এক টানা রাজনীতিক অভিজ্ঞতা আমার। অন্তরের অন্তস্তলে বুঝি যে রক্তপাতে বিশ্ব এখন ক্লান্ত, বিরূপ। বিশ্ব কোনও পন্থা খুঁজছে। এক তৃষিত বিশ্বকে সে পথ দেখাবার সৌভাগ্য হয়তো প্রাচীন ভারতেরই হবে, আমার তাই মনে হয়।

ভারতের এই মহান সংগ্রামে আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য বিশ্বের বড় বড় দেশ গুলিকে আমন্ত্রণ জানাতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। কোটি কোটি মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করছে। প্রতিহিংসা নিচ্ছে না, যাতে তারা দেশের সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখতে পারে। এ ঘটনা চিন্তা করবার, সম্মান পাবার যোগ্য।[২৬]

সত্যকে বলিদান দিয়ে স্বাধীনতা লাভের বদলে ভারত বরং ধ্বংস হয়ে যাক, আমার কাছে তা-ও শ্রেয়।[২৭]

ভারত স্বাধীন হল, অথচ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনও কাজ করলাম না, এতে আমার আত্মা তৃপ্ত হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংল্যাণ্ড যখন ভারতে দমন-পীড়ন থামাবে, তখন অন্যান্য দেশও এ-কাজে বিরত হবে। রক্তপাত করার অপরাধবোধে ভারতের কোনও ভূমিকা থাকবে না।[২৮]

ভারতের স্বাধীনতার অর্থ

...যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের স্বাধীনতা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেবে। ভারতের অক্ষমতা সমগ্র মানবতাকে প্রভাবিত করছে।[২৯]

আমার উচ্চাশা স্বাধীনতালাভের চেয়ে অনেক বেশি। ভারত-উদ্ধারের মধ্য দিয়ে আমি পৃথিবীর তথাকথিত দুর্বলতর দেশগুলিকে পাশ্চাত্য শোষণের পাদ-পেষণ থেকে উদ্ধার করতে চাই....।[৩০]

জাতীয় স্বাধীনতা কোনও গল্পকথা নয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার মতোই তা আবশ্যিক। জাতি বা ব্যক্তি, যার ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা আসুক সেটা কখনও ক্ষতিকারক হবে না, যদি তা অহিংসাভিত্তিক হয়। ব্যক্তিক বা জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যা সত্য আন্তর্জাতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তাই।

আইনী অনুশাসনও সমানভাবে নৈতিকতা পূর্ণ: "নিজ সম্পত্তি এমন ভাবে ব্যবহার করো, যাতে অপরের অধিকার আঘাত না পায়।" ঠিকই বলা হয়েছে যে, একটি অণু বিশ্বকে ধারণ করে আছে। অণুর জন্য এক আইন, বিশ্বের জন্য অন্য আইন, তা তো নয়।[৩১]

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

বিপন্ন সভ্যতাকে উদ্ধার করার জন্য আমি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাই, তবে, তা উপযুক্ত স্বাধীন দেশগুলির সহযোগিতা।[৩২]

শোষিত জাতিগুলির স্বাধীনতা

আমি যখন থাকব না, ভারত স্বাধীন হবে। শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবী। আমি বিশ্বাস করি না, আমেরিকান বা ইংরাজরা স্বাধীন। যতদিন কৃষ্ণাঙ্গ দেশগুলিকে অবদমিত রাখার শক্তি থাকবে, ততদিন তারা স্বাধীন হবে না। আমি জানি আমার উদ্দেশ্য, জানি স্বাধীনতা কী। ইংরেজ শিক্ষকরা আমাকে তার মানে শিখিয়েছেন। আমি যা দেখছি, যা আমার অভিজ্ঞতা, সেই মতোই আমি স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করব।[৩৩]

ভারতের স্বাধীনতা পৃথিবীর সকল শোষিত দেশকে জানিয়ে দেবে যে তাদের স্বাধীনতাও এসে পড়েছে। এর পর থেকে তারা আর শোষিত হবে না।[৩৪]

৬৫. স্বরাজ আমার কাছে কী

আমার কাছে স্বরাজ হল দেশের দীনতম মানুষের মুক্তি। শুধুমাত্র ইংরেজ শাসনের জোয়াল থেকে ভারতকে মুক্ত করায় আমার আগ্রহ নেই। যে-কোনও জোয়াল থেকেই ভারতকে মুক্ত করতে আমি বদ্ধপরিকর। এক রাজার বদলে আর এক অপদার্থ রাজা আসবে, তা আমি চাই না।[৩৫]

সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী, জন্ম স্বদেশে হোক বা বিদেশে, তাদের সম্মতিতে গঠিত ভারত সরকার আমার কাছে স্বরাজ। সেই সব মানুষ, যারা রাষ্ট্রের সেবা করেছে গায়ে গতরে খেটে, ভোটদাতা হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি করেছে।

স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন শাসনভার করায়ত্ত করলে প্রকৃত স্বরাজ আসবে না। শাসনে বিচ্যুতি ঘটলে সরকারের বিরোধিতা করার ক্ষমতা থাকতে হবে সকলের। অন্যভাবে বলা যায়, সরকাব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার যে ক্ষমতা তাদের আছে, সে-বিষয়ে জনগণকে সচেতন করলে স্বরাজ মিলবে।[৩৬]

স্বায়ত্তশাসন মানে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার জন্য লাগাতাব প্রচেষ্টা। সে সরকার বিদেশী, বা স্বদেশী, যা-ই হোক।[৩৭]

স্বরাজ এক পবিত্র শব্দ, বৈদিক শব্দ। এর অর্থ স্ব-শাসন, আত্ম-সংযম। "স্বাধীনতা" বলতে যেমন সব বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি বোঝায়, স্বরাজ তা নয়।[৩৮]

গরিবের জন্য স্বরাজ

আমার, আমাদের স্বপ্নের স্বরাজ কোনও জাতি বা ধর্মের ব্যবধান মানে না। স্বরাজ, শিক্ষিত বা ধনী লোকের একচেটিয়া নয়। তা হবে সকলের, শিক্ষিত বা ধনী লোকেরও। তবে বিশেষ গুরুত্ব দেবে সেই অসংখ্য মানুষের ওপর, যারা অন্ধ, খঞ্জ, উপবাসী, মেহনতী।[৩৯]

আমার স্বপ্নের স্বরাজ, গরিবের স্বরাজ। রাজকুমার ও ধনী লোকদের মতো তোমরাও

জীবনের আবশ্যিক যা কিছু, ভোগ করবে। তার মানে, গরিবদেরও প্রাসাদ থাকবে তা নয়। সুখের জন্য তা দরকারি নয়। তুমি বা আমি সে-প্রাসাদে হারিয়ে যাব। তবে জীবনের যে-সব সাধারণ সুখসুবিধা ধনীরা ভোগ করে তা তোমাদেরও পাওয়া উচিত। তোমাদের এ সকল সুখসুবিধার প্রতিশ্রুতি যে স্বরাজ দিতে পারে না, তা পূর্ণ স্বরাজ নয়।[৪০]

.....পূর্ণ স্বরাজের মাধ্যমে আমরা যা চাই তা হল ....জনগণের মধ্যে জাগরণ। তারা নিজেরা জানুক তাদের প্রকৃত স্বার্থ। সে স্বার্থ অর্জন করার জন্য সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সামর্থ্য...সম্প্রীতি, ভিতর বা বাইরের আক্রমণ থেকে মুক্তি, জনগণের আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নয়ন... [৪১]

নারী, পুরুষ, শিশু সকলে যেন উপলব্ধি করে এটা প্রকৃত স্বরাজ। সে কাজে সিদ্ধিলাভের জন্য শ্রম করাই হল যথার্থ বিদ্রোহ। পৃথিবীর সকল শোষিত মানুষের সামনে ভারত এক দৃষ্টান্ত। কেননা আগ্রাসককে আঘাত না করেই ভারত খোলাখুলি নিরস্ত্র সংগ্রাম করে। এ সংগ্রাম সকলের আত্মবলিদান দাবি করে। এই প্রকাশ্য নিরস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত ভারতের কোটি কোটি মানুষ জাগত না। এই সোজা পথ থেকে যখনই বিচ্যুতি হয়, সাময়িকভাবে বিদ্রোহের অনুবর্তন থেমে যায়।[৪২]

সংখ্যাগুরুর শাসন নয়

বলা হয়েছে, ভারতীয় স্বরাজ হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়—হিন্দুদের শাসন। এর চেয়ে বড় বিভ্রান্তি আর হয় না। এ যদি সত্যি হতো, আমি একে স্বরাজ বলতাম না। আমার সাধ্যমত সকল শক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করতাম। আমার কাছে হিন্দ্‌স্বরাজ হল সকল জনগণের ও ন্যায়ের শাসন। যে শাসনকার্যে মন্ত্রীরা হিন্দু মুসলমান, শিখ যা-ই হোন-না-কেন,—বিধানসভায় শুধু হিন্দু, অথবা মুসলিম, অথবা যে-কোনও সম্প্রদায় থাকুক না কেন, তাদের নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করতে হবে।[৪৩]

আজ আমাদের মন বিভ্রান্তিতে মেঘাচ্ছন্ন। অজ্ঞতার বশে আমরা এ-ওর সঙ্গে বিবাদ করি। ভাইয়ের সঙ্গে দাঙ্গা করি। এরা উদ্ধার পাবে না। স্বরাজও পাবে না। স্ব-শাসন বা স্ব-রাজের প্রথম শর্ত, নিজেকে শাসনে আনা, বা জয় করা।[৪৪]

মত-প্রকাশের স্বাধীনতা

এমন এক বিশাল দেশে সব ধরনের সৎচিন্তার জায়গা থাকতে হবে। নিজেদের বা অন্যদের প্রতি যা ন্যূনতম কর্তব্য তা হল, প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে চেষ্টা করা। যদি মেনে নিতে না-ও পারি, তাকে ততটাই শ্রদ্ধা করব, যতটা শ্রদ্ধা আমরা আমাদের বেলায় আশা করি। স্বরাজলাভের যোগ্যতা, এবং সুস্থ সমাজজীবনের জন্য এ-এক অবশ্যম্ভাবী পরীক্ষা।[৪৫]

বলার ও লেখার স্বাধীনতা স্বরাজের ভিত। ভিত্তিপ্রস্তর যদি বিপন্ন হয়, তোমাকে সর্বশক্তি দিয়ে ওই একটি পাথরকে রক্ষা করতে হবে।[৪৬]

স্বরাজ অর্জন

আমি এমন কথা বলারও ধৃষ্টতা দেখিয়েছি যে, ঈশ্বরও স্বরাজ দিতে পারেন না। এ আমাদের নিজেদেরই অর্জন করতে হবে। স্বরাজ এমনই বস্তু যে কারও সাধ্য নেই তা দেয়।[৪৭]

স্বরাজ হল, মৃত্যুভয় বর্জন। যে-জাতি মৃত্যুভয়ে ভীত সে স্বরাজ লাভ করতে পারে না। কোনও মতে পেলেও, রাখতে পারে না।[৪৮]

একটি জাতি অপরকে দেবে, স্বরাজ এমন কোনও মাগনা উপহার নয়। জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষদের রক্ত দিয়ে এ দুর্মূল্য বস্তু কিনতে হয়। যখন চড়া দাম দেব, তখন এটি আর উপহার থাকবে না। .... অবিরত শ্রম করলে, অপরিমেয় যন্ত্রণা ভোগ করলে স্বরাজ মিলবে।[৪৯]

স্বরাজ আকাশ থেকে পড়বে না। ধৈর্য, অব্যবসায়, নিরন্তর শ্রম, সাহস, বুদ্ধি দিয়ে সমাজ পবিবেশ উপলব্ধি, এ সবের মিলিত ফল হল স্বরাজ।[৫০]

আমার মতে, স্বরাজের প্রশিক্ষণ বলতে শুধু দরকার, সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, পূর্ণ স্বাধীনতায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। এতে অনেক খুঁত থাকতে পারে। ভালো সরকার স্বায়ত্ত শাসনের কোনও বিকল্প নয়।[৫১]

স্বরাজ-তীর্থে যাত্রা বড় কষ্টসাধ্য আরোহণ। এতে খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হয়। এতে দরকার বিশাল সাংগঠনিক দক্ষতা। এর অর্থ, শুধু গ্রামবাসীদের সেবার্থে গ্রামের হৃদয়ে প্রবেশ করা। অন্যভাবে বলা যায়, এর মানে জাতীয় শিক্ষা অর্থাৎ জনগণকে শিক্ষিত করা। জনগণেব মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করা। বাজিকবের ভোজবাজি-আমের মতো এ সহসা মাটি ফুঁড়ে উঠবে না। ধীরে ধীরে জাগবে। চেতনা বটগাছের মতো, যার বৃদ্ধি চোখেই পড়বে না। কোনও রক্তাক্ত বিপ্লবে কাজ হবে না। তাড়াতাড়ি করতে গেলে তা সুনিশ্চিত অপচয়ে পর্যবসিত হবে।[৫২]

মাঝে মাঝে এ-কথা বলতে শোনা যায়, "আমাদের হাতে ভাবত শাসন চলে আসুক, স-ব ঠিক হয়ে যাবে।" এর চেয়ে বড় অন্ধসংস্কার আর হয় না। এ-ভাবে কোনও জাতি স্বাধীনতা লাভ করেনি। বসন্ত ঋতুর বৈভব তো প্রতিবিম্বিত হয় প্রতিটি গাছে। তখন সারা পৃথিবী ভরে ওঠে যৌবনের লাবণ্যে। ঠিক তেমনি, যেদিন স্বরাজের উদ্দীপনা সত্যি সত্যি সমাজের মর্মমূলে প্রবেশ করবে যেদিন আমাদেব দেশে হঠাৎ কোনও বিদেশী এলে দেখবে জীবনেব সকল ক্ষেত্রে উদ্যম, দেখবে জাতির সেবকরা যে-যার ক্ষমতানুযায়ী নানাবকম কাজ করছে জনসাধারণের জন্য।[৫৩]

আত্মোৎসর্গের বনিয়াদ

অনুগত ও দেশভক্ত লোকেরাই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ কেবল সেখানেই স্বরাজ সুরক্ষিত হতে পারে। তাদের কাছে ব্যক্তিগত লাভ সহ অন্য সব বিবেচনার তুলনায় জাতির মঙ্গল থাকবে সর্বোচ্চ আসনে।[৫৪]

আমার স্বরাজ....অন্যদেব হত্যা করার পরিণাম নয়। তা স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ, যা

চলবে অবিরাম। রক্তপাত ঘটিয়ে জোর করে অধিকার আদায়, সে আমার স্বরাজ নয়। ক্ষমতা করায়ত্ত হবে উত্তমরূপে, যথার্থ কর্তব্য পালনের স্বাভাবিক, সুন্দর পরিণতি। তাতে প্রচুর উত্তেজনা উদ্দীপনা থাকবে, কিন্তু তা নীরো প্রদর্শিত পথের নয়, শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত পথে। ...এরকম হতে পারে, হয়ও, যখন দিকচক্রবাল গভীরতম অন্ধকারে আবৃত। কিন্তু আমি জানি তার আগে এগিয়ে আসবে এক শ্রেণীর তরুণ তরুণী, যারা সকল উত্তেজনা খুঁজে পাবে জাতির জন্য কাজ করে চলার মধ্যে, আর কিছুতে নয়।[৫৫]

আত্মবলিদানকারী, দৃঢ়চিত্ত কর্মীদের এক সুবিশাল সেনাদল ব্যতীত, জনগণের প্রকৃত অগ্রগতি আমার কাছে এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। সেই অগ্রগতি না ঘটলে স্বরাজ হলেও কিছু হবে না। যারা গরিবের স্বার্থে নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করার সাহস রাখে,—তেমন কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঠিক সঙ্গতি রেখে চলবে স্বরাজের পথে অগ্রগমন।[৫৬]

একটি জাতির জন্য স্ববাজ, এর অর্থ হল ব্যক্তিবর্গের আত্মশাসনের সমাহাব। এই স্বরাজ আসতে পারে কেবলমাত্র ব্যক্তির নাগরিক কর্তব্য পালনে। এ-কাজে কেউই তার একক ব্যক্তি-অধিকারেব কথা ভাবে না। তারা আসে কর্তব্য কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনে, যখন তাদেব প্রয়োজন হয়।[৫৭]

সত্য এবং অহিংসার পথে

সত্য এবং অহিংসার পথে যদি স্ববাজ পেতে চাই, তাহলে ধীর গতিতে, দৃঢ়তার সঙ্গে তৃণমূল থেকে গঠনমূলক প্রয়াস চালানো ছাড়া আমাদের পথ নেই। এ-পথ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে এক নৈবাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি যা স্থিতিশীল ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে দেয়, যাতে এব মধ্য থেকেই গড়ে উঠতে পারে এক একনায়ক। যে চালাবে লৌহশাসন, বিশৃঙ্খলাকে ফিরিয়ে আনবে শৃঙ্খলায়।[৫৮]

শাসক ও শাসিত, আমরা সকলেই এত বছর ধরে এক শ্বাসরোধকারী, অস্বাভাবিক পরিবেশে বাস করছি যে, শুরুতে আমাদের মনে হতেই পাবে, আমাদেব শ্বাসনালী স্বাধীনতার সঞ্জীবনী বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারবে না। যদি কোনওদিন তা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে অহিংসার পথে (স্বাধীনতা) বাস্তবায়িত হয়, দলগুলি মনে করে এটাই সঠিক পথ, তবে তা হবে পৃথিবীর কাছে এক বিস্ময়কর শিক্ষা।[৫৯]

আমাদের সভ্যতার অনন্যতা

আমার স্বরাজ, আমাদের সভ্যতার অনন্যতা অবিকৃত রাখবে। আমার ইচ্ছা অনেক নতুন বিষয়ে লেখার। কিন্তু সেগুলি লেখা উচিত একান্ত ভারতীয় প্রেক্ষিতে। যখন সুদসমেত ফেরত দেওয়া যাবে, তখন আমি খুশি মনে পশ্চিম থেকে ধার করব।[৬০]

যদি স্বরাজ আমাদের সভ্য না করে, শুদ্ধ না করে, আমাদের সভ্যতাকে স্থিতি না দেয়, তাহলে এর কোনও মূল্য নেই। আমাদের সভ্যতার সার কথা হল, ব্যক্তিগত, কি জনগণের—সকল ক্ষেত্রেই আমরা নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ আসন দিতে চাই।[৬১]

৬৬. আমি ব্রিটিশবিরোধী নই

মানবচরিত্রে আমার আস্থা অপ্রতিরোধ্য। বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমি দেখেছি ইংরেজরা যুক্তি এবং বুদ্ধির কাছে নতি স্বীকার করে। বাস্তবে তারা অন্যায়কারী কিন্তু সর্বদা নিজেদের ন্যায়পরায়ণ বলে দেখাতে চায়। এ জন্য, অন্যদের চেয়ে তাদের লজ্জায় ফেলে সঠিক কাজটা করানো অপেক্ষাকৃত সহজ।[৬২]

ইংরেজ বা অন্য কাউকেই আঘাত না দিয়েও আমি আমার দেশবাসীর সেবা করতে পারি—আমার নিজস্ব ধর্ম....আমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে। আমার সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে যা করতে পারি না, তা কোনও ইংবেজের বেলায়ও পারি না। রাজ্যলাভের জন্য তাকে আঘাত করব না। তবে প্রয়োজনে সহযোগিতা গুটিয়ে নেব। প্রয়োজনে যেমনটি করেছিলাম আমার নিজের ভাইয়ের (এখন সে মৃত) বেলায়। ব্রিটিশ-কৃত অন্যায়ে অংশ নিতে অস্বীকার করার সুবাদে আমি সম্রাটের সেবা করি।[৬৩]

আমি ইংবেজবিরোধী নই, আমি ব্রিটিশবিরোধী নই। আমি কোনও সরকারেরই বিরোধী নই। কিন্তু আমি অসত্যের বিরোধী, আত্মম্ভবিতার বিরোধী, অবিচারের বিরোধী। যতদিন সবকাব অবিচার চালাতে থাকবে, ততদিন সে আমাকে তার শত্রু, এক অনমনীয় শত্রু বলে ভাবতেই পারে।[৬৪]

কেউ আমাকে ইংরেজ-বিবোধী প্রবণতাব দোষে দোষী করতে পারবে না। আমি তো আমাব পক্ষপাতিত্বের জন্য গর্ববোধ করি। সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তাদের অনেক কিছু অনুকরণ করেছি। যেমন, নিয়মানুবর্তিতা, বাক্‌সংযম, জনস্বাস্থ্য, স্বাধীন চিন্তা, ন্যায়বিচার। এমন অনেক কিছুই তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ঘটেছে।[৬৫]

আমার জাতীয়তাবাদ এত সংকীর্ণ নয়, যে (ইংরেজদের) দুর্দশা অনুভব না করে তা নিয়ে উল্লাস করব। আমি অন্য জাতিব দুর্দশার বিনিময়ে আমার জাতির সুখসমৃদ্ধি চাই না।[৬৬]

আমার মধ্যে কোনও তিক্ততা নেই। আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীরও বন্ধুতা চাই। অতএব, ইংবেজদের সঙ্গেই বা নয় কেন? এক শতাব্দীরও বেশি তাদের সঙ্গে আমরা ভালোয়-মন্দয় এক বন্ধনে জড়িয়ে আছি। তাদের কয়েকজন আমার প্রিয়তম বন্ধুও বটে। তোমরা (ইংরেজরা) ভাবো আমাকে কায়দা করা বুঝি সহজ। কিন্তু যদি তোমরা আমার অগ্রগতি রোধ করো, আমি চলে যাব কোনও তিক্ততা ছাড়াই। কিন্তু এটা বুঝে যাব যে, আমি হয়তো তোমাদের অন্তরে ঠাঁই পাবার মতো পবিত্র ছিলাম না।[৬৭]

ব্রিটিশদেব আমি আমার স্বদেশবাসীর সমানই ভালবাসি। এর জন্য কোনও কৃতিত্ব দাবি কবি না, কেননা আমি সমগ্র মানবজাতিকেই ভালবাসি। এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। এ-ভালোবাসা প্রতিদান প্রত্যাশী নয়। আমার পৃথিবী নিঃশত্রু। এ-ই আমার ধর্মবিশ্বাস।[৬৮]

জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও আমার জীবনের অখণ্ড উনত্রিশ বছর ধরে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমি যেমন সহযোগিতা করে চলেছি, অন্য কোনও ভারতীয়ই তা করেনি। তা-ও

এমন সব পরিস্থিতিতে, যা অন্য মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারত...

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে আমি চারবার আমার জীবনকে সংকটে ফেলেছি। বুয়র যুদ্ধের সময়ে। যখন আমি অ্যামবুলেন্স কোরের দায়িত্বে ছিলাম। যার কথা জেনারেল বুলার উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রতিবেদনে। জুলু বিদ্রোহের সময়ে নেটালে। যখন আমি অনুরূপ একটি কোরের দায়িত্বে ছিলাম। বিগত যুদ্ধের সময়ে। যখন আমি এক অ্যামবুলেন্স কোর গড়ে তুলি। সেখানকার প্রশিক্ষণের অতি-পরিশ্রমে আমি প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হই। সর্বশেষে দিল্লিতে যুদ্ধ-সম্মেলনে লর্ড চেম্‌সফোর্ডের কাছে প্রতিশ্রুতি রাখতে আমি কয়রা জেলার সেনাদলে রংরুট করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সে-সময়ে কষ্টসাধ্য দীর্ঘ বন্ধুর পথ হেঁটেছি। ফলে আমি আমাশয়ে আক্রান্ত হই। যা যে-কোনও সময়ে প্রাণঘাতী হতে পারত। এই পূর্ণবিশ্বাসে আমি কাজ করি যে, এ-সব কাজের ফলে আমার দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সম-মর্যাদা পাবে।[৬৯]

স্বৈরাচারী শাসন

মূলত, ভারত সরকারের মতো কোনও একচ্ছত্র সংগঠনে তা থাকতে পারে না। (*১৯৪৭ সালের আগে)। এটাই সর্বাধিক বড় স্বৈরাচারী শাসন বলে পৃথিবী জানে। গণতন্ত্র কেবলমাত্র গ্রেটব্রিটেনের জন্য সংরক্ষিত। যখন এরা অন্য জাতির লক্ষ কোটি লোকের ওপর শাসন ও শোষণ চালায়, তখন সে এক ভয়ংকর পাপ। সমগ্র গ্রেটব্রিটেন এই দূষিত ধারণা সংক্রামিত করে যে, এবম্প্রকার শোষণ এক আলোকপ্রাপ্ত গণতন্ত্রের পক্ষে সর্বোত্তম। আমি যদি সঠিক মূল্যায়ন করে থাকি, তবে এই মূলসত্যকে মনে রাখা সঠিক হবে। এটা যদি মেনে নিই, তাহলে আপতিক সংকটের সঙ্গে মুখোমুখি হবার সময়ে, বর্তমান কুশীলবদের বিষয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য আমাদের অত্যাচারের মোকাবিলা করার উপযুক্ত তালিম দেবে।[৭০]

যে-কোনও সত্যকার বন্ধুকেই আমরা স্বাগত জানাতে বাধ্য, যদি সে শ্রেষ্ঠত্বের বদলে সেবার মনোভাব নিয়ে আসে। ভারত যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তার এই ধরনের সহায়তাই দরকার হবে। ইংরেজদের প্রতি অবিশ্বাস....অবশ্যই আছে। তা দূর হবে না। ভারত থেকে ছাত্রদের ইংল্যাণ্ডে পাঠালেও নয়। তোমাদের এটা বুঝতে হবে, মেনে নিতে হবে। এর শিকড় প্রোথিত আছে ইতিহাসে।[৭১]

...এযাবৎ ভারতীয়রা ইংরেজদের জেনেছে শাসক জাতির লোক হিসাবে। তারা পিঠচাপড়ায় না। তারা উন্নাসিক। এক ইংরেজ ও এক সৎ, বিনয়ী ইউরোপীয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য সাধারণ মানুষ করে না। তাদের পরিচিত সাবেক ধরনের সাম্রাজ নির্মাণকারী ইংরেজ এবং পূর্বপুরুষদের কাজের অপবাদ ঘুচাতে যে নতুন প্রজন্ম আসছে, তাদের মধ্যেও কোনও তফাৎ সে দেখে না।[৭২]

এক নতুন অধ্যায়

ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সংযোগের কাহিনী যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের, এবং আশাপূরণে ব্যর্থতার

এক বিয়োগান্ত নাটক, এ-আমি ভুলতে পারি না। তবু, আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখতে হবে। যে সত্যানুসন্ধানী, সে কখনও প্রথম থেকেই তার প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিশ্বাসের অযোগ্য বলে ভাববে না। সুতরাং, কোনও দায়িত্বশীল ভারতবাসীই অন্যরকম ভাবে না। এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী। আমার বিশ্বাস, এবার ব্রিটিশ সত্য কথাই বলছে। তবে (স্বাধীনতার) প্রস্তাবটা এল আকস্মিক....

তিক্ততার ঢেউ তুঙ্গে উঠেছে। এটা আত্মার পক্ষে ভালো নয়....এ-এক বিশাল পদক্ষেপ। শুধু ভারত এবং ব্রিটেনের ইতিহাসে নয়, বরং পৃথিবীর ইতিহাসে...[৭৩]

জাতিসমূহের কমনওয়েল্‌থ

প্রথম সুযোগেই বিতাড়নযোগ্য এক দুর্দমনীয় শত্রু হিসেবে ইংরেজকে না-দেখে বরং এক নতুন জাতিসমূহের কমনওয়েলথে তাকে বন্ধু ও অংশীদার করে নেবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভারতের মহত্তম গৌরব। এই কমনওয়েল্‌থ আসবে এক সাম্রাজ্যের জায়গায়,—যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর দুর্বলতর, অনুন্নত জাতি ও মানুষকে শোষণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, শেষ বিচারে, শক্তিপ্রয়োগের ভিত্তিতে।[৭৪]

এণ্ড্রুজ আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজা-সম্রাটের ভূমিকার তাৎপর্য। ব্রিটেনের রাজা, তাঁর শাসিত দেশগুলিতেও রাজা। কিন্তু ভারতে তিনি সম্রাট। ভারত একাই তাঁর সাম্রাজ্য। ডোমিনিয়নগুলি তোমাদের (ব্রিটিশের) আত্মীয় জ্ঞাতি-গুষ্টির লোকে বোঝাই। কিন্তু আমরা, ভারতীয়রা তো কিছুতেই ব্রিটিশ পরিবারের সদস্য হতে পারি না। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আলাদা। আমরা বরং বিশ্বব্যাপী জাতিসমূহের পরিবারের সদস্য হতে পারি। তবে প্রথমে মুক্ত হতে হবে শৃঙ্খল থেকে। তাই আমি স্বাধীনতা জয়ের কাজে নেমেছি...

ইংরেজকে ব্রাহ্মণ হতে শিখতে হবে, বেনে নয়। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। বেনেরা হল ব্যবসায়ী, অথবা নেপোলিয়নের ভাষ্যে দোকানদার। আর সে-ই ব্রাহ্মণ, জীবনের নৈতিক মূল্যকে বস্তুগত মূল্যের উপরে স্থান দেবার বুদ্ধি যার আছে। ব্রিটিশ-ব্রাহ্মণত্বের ব্যাপারটি ইংরেজদের শিখতে হবে...

ভারত যদি স্বাধীনতা-সূর্যের স্পর্শ পায়, তবে সম্ভবত সে (ব্রিটেনের সঙ্গে প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রীর) কোনও চুক্তি করবে স্বেচ্ছায়। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে যে স্বতোৎসারিত বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে, তা অন্যান্য শক্তির প্রতিও প্রসারিত হবে। তাদের মধ্যেই থাকবে ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব। কেননা নৈতিক শক্তি শুধু তাদেরই থাকবে। এ-স্বপ্নের সার্থকতা দেখে যাবার জন্য আমি ১২৫ বছর বাঁচতে চাই।[৭৫]

৬৭. রামরাজ্য

রামরাজ্য বলতে আমি হিন্দু রাজত্ব বোঝাতে চাইছি না। রামরাজ্য আমার কাছে ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজ্য। আমার কাছে রাম ও রহিম একই দেবমূর্তি। অন্য কোনও দেবতাকে আমি

স্বীকার করি না। একমাত্র স্বীকার করি, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দেবতাকে।

আমার কল্পনার রাম কোনওদিন এই পৃথিবীতে থাকুন, বা না থাকুন, রামরাজ্যের প্রাচীন আদর্শ, নিঃসন্দেহে ছিল এক প্রকৃত গণতন্ত্র। এক বিশাল ও ব্যয়বহুল নিয়মকানুন ব্যতিরেকেই নগণ্যতম নাগরিকও জানত, সে দ্রুত ন্যায়বিচার পাবে। কবির বর্ণনা মতে রামরাজ্যে একটি কুকুরও সুবিচার পেয়েছিল।[৭৬]

আমার স্বপ্নের রামরাজ্য রাজপুত্র থেকে নিঃস্বজন সকলকে সমানাধিকার দেয়।[৭৭]

স্বাধীনতার সংজ্ঞা

রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আমি, ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স্; অথবা রাশিয়াতে সোভিয়েত শাসন; ইতালীতে ফাসিস্ত শাসন; জার্মানীতে নাৎসী শাসনের অনুকবণ বোঝাতে চাইছি না। তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী তারা শাসনব্যবস্থা বেছে নিয়েছে। আমাদের যাতে সুবিধা, আমরা তা-ই বেছে নেব। এর বেশি কী আর বলতে পারি। আমি এটাকে রামরাজ্য বলেছি। অর্থাৎ শুদ্ধ নৈতিকতার ভিত্তিতে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা।[৭৮]

বন্ধুরা বারবার আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন স্বাধীনতার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করার জন্য। বাধ্য হয়েই আমাকে আবার বলতে হচ্ছে, আমার স্বপ্নের স্বাধীনতার নাম রামরাজ্য, অর্থাৎ পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব। জানি না স্বর্গে ঈশ্বরের রাজত্ব কী রকম। আগ্রহ নেই অত দূরকে জানার। বর্তমান যদি যথেষ্ট শোভন সুন্দর হয় ভবিষ্যৎ খুব একটা অন্যরকম হতে পারে না।[৭৯]

কোনও দমননীতির শাসন নয়

আমার ধারণার রামরাজ্য মানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জায়গায় জাতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান নয়। যে দেশ এমনকি তার দেশীয় সেনাবাহিনীর শাসনেও থাকে, সে কখনও নৈতিকভাবে স্বাধীন হতে পারে না। সে দেশে তথাকথিত দুর্বলতম মানুষটি কখনওই নৈতিকভাবে উঁচে উঠতে পারে না।[৮০]

কোনও রামরাজ্যই সম্ভব নয় বর্তমান অবস্থায়, যেখানে অন্যায় অসাম্য বিদ্যমান,—কিছু লোক ঐশ্বর্যে ডুবে আছে, জনগণ যথেষ্ট খাদ্য অবধি পায় না...সমাজতন্ত্রী এবং অন্যদের প্রতি আমার বীতরাগের কারণ, তারা হিংসাত্মক আক্রমণের সহায়তায় এর স্থায়ী সমাধান করতে চায়।[৮১]

রামরাজ্য, অথবা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করতে পারি 'নির্বাণের'...ব্রিটিশ ক্ষমতার অপসরণ মানেই রামরাজ্য নয়। যখন আমরা অহিংসার আড়ালে সর্বদা অন্তরে হিংসা পুষে চলছি, তখন কেমন করে তা (রামরাজ্য) হতে পারে?[৮২]

অন্যের প্রতি সম্মান

আমার হিন্দুধর্ম আমাকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে শেখায়। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে রামরাজ্যের রহস্য।[৮৩]

রামরাজ্যের মধ্যে যদি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে চাও, প্রথমেই প্রয়োজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি। নিজের দোষগুলিকে হাজারগুণ বড় করে দেখ। তোমার প্রতিবেশীদের দোষের বেলায় চোখ বুজে থেকো। প্রকৃত অগ্রগতির একমাত্র পথ এটাই।[৮৪]

৬৮. কাশ্মীর

সমস্যা ও সমাধান

অবস্থাটা কী? বলা হচ্ছে, দক্ষ অফিসারদের নেতৃত্বে আফ্রিদী ও অন্যাদের এক বিদ্রোহী সেনাবাহিনী শ্রীনগর অভিমুখে এগোচ্ছে। পথে লুঠপাঠ করছে ও জ্বালিয়ে দিচ্ছে গ্রাম, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করছে, ফলে শ্রীনগর অন্ধকাব। পাকিস্তান সরকারের কিছু মদত ছাড়াই এ ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা বিশ্বাস করা কঠিন। এ সম্পর্কে রায় দেব এমন যথেষ্ট তথ্য আমার হাতে নেই। আমার উদ্দেশ্যের জন্য তা আবশ্যিকও নয়। আমি যা জানি, ভারত সরকার শ্রীনগরে হয়তো অল্পসংখ্যক সেনা ঢুকিয়ে সঠিক কাজ করেছে। এতে হয়তো পরিস্থিতি আয়ত্তে আসবে এবং কাশ্মীরীরা মনোবল ফিরে পাবে...ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। মানুষ কাজ করতে, মরতে পারে মাত্র। স্পার্টার সেনাদের মতো, ক্ষুদ্র ভারতীয় বাহিনীটি সাহসের সঙ্গে কাশ্মীর রক্ষা করতে গিয়ে যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আমি এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব না। কাশ্মীব প্রতিরক্ষার কাজে মুসলিম, হিন্দু ও শিখ নরনারী সে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাতে কিছু মনে কবব না। বাকি ভারতের কাছে সে হবে এক গৌরবজনক দৃষ্টান্ত। এমন বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সমগ্র ভারতকে প্রভাবিত কববে এবং আমরা ভুলে যাব, হিন্দু, মুসলিম ও শিখরা কোনওদিন শত্রু ছিল।[৮৫]

ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘে ব্যাপারটি উপস্থাপনা করার ন্যায্যতা বিষয়ে পাকিস্তান সরকার বিরোধিতা করছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে এ তথ্যের, যে হানাদার কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণে পাকিস্তানের হাত ছিল—এ দেখে আমি তাজ্জব। শুধু অস্বীকার করে গেলে তো হবে না। কাশ্মীব যখন হানাদার বিতাড়নে ভারতের সাহায্য চাইল, তখন কাশ্মীর-ত্রাণে ভারতের যাওয়া কর্তব্য ছিল। পাকিস্তানের উচিত ছিল ভারতকে সাহায্য করা। কিন্তু সহযোগিতা করার ইচ্ছা জানালেও পাকিস্তান সে জন্য কিছু কাজ করেনি...

যুদ্ধ বাধলে দুই উপমহাদেশ এক তৃতীয় শক্তির দ্বারা চালিত হবে। তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। আমি বন্ধুত্ব ও শুভাকাঙ্ক্ষার জন্য আবেদন জানাচ্ছি ...... তবে সমঝোতাটি আন্তরিক হওয়া চাই। অন্তরে ঘৃণা লালন করা যুদ্ধের চেয়েও খারাপ।[৮৬]

৬৯. ভারতে বিদেশী উপনিবেশ

ক. গোয়া

পরিবর্তনের সময়

ব্রিটিশ সরকারের দয়ায় টিকে আছে যে ছোট্ট পর্তুগীজ উপনিবেশটি, তার পক্ষে ব্রিটিশের কদাচরণের অনুকরণ ঠিক নয়। স্বাধীন ভারতে, গোয়া কখনও স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না। ভারতীয় আইন তা কখনওই সহ্য করবে না। একটি গুলিও না ছুঁড়ে গোয়ার জনগণ স্বাধীন ভারতের নাগরিক অধিকার দাবি করতে ও পেতে পারে। গোয়া অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বর্তমান পর্তুগীজ সরকার ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের ভরসায় তাদের বিচ্ছিন্ন করে দমিয়ে রাখতে পারবে না। গোয়ার পর্তুগীজ সরকারকে আমি বলব, সময়ের সংকেত বুঝুক। তাদের ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একদা যে সন্ধি হয়তো ছিল, সেই অনুসারে কাজ না করে গোয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করুক।[৮৭]

সন্ত্রাসের রাজত্ব

...... আমি মোজাম্বিক, দেলাগোয়া এবং ইন্‌হামবেনে গিয়েছি। মানবহিতৈষী কোনও সরকার চোখে পড়ল না। অবাক হয়ে দেখলাম, সেখানে সরকার, ভারতীয় ও পর্তুগীজ, আফ্রিকান ও পর্তুগীজ—এদের সকলের মধ্যে কী পার্থক্যই না করেছে। ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশের ইতিহাস অবশ্য কোনও (সদাশয় সরকারের) দাবি করতে পারে না। বস্তুত, গোয়ার ব্যাপারস্যাপার যা দেখেছি, যা জানি, তা শিক্ষণীয় কিছু নয়। গোয়াতে ভারতীয়রা যে নির্বাক, তা পর্তুগীজ সরকারের সন্ত্রাসের-রাজত্বের প্রমাণরূপে তা সে সরকারে নিষ্পাপতা বা মানবদরদের প্রমাণ নয়।[৮৮]

গোয়াবাসী ভারতীয়ের মাতৃভূমি-রূপে পর্তুগালের নাম লেখা... হাস্যকর...। আমার মতো তাদেরও মাতৃভূমি ভারত। গোয়া ব্রিটিশ-ভারতের বাইরে কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই। গোয়াবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে পুর্তুগীজের মিল যদি কিছু থাকেও, তা যৎসামান্য।[৮৯]

নাগরিক স্বাধীনতা

গোয়াবাসীদের আমি বলব, ব্রিটিশ সরকার বিষয়ে ভারতের মানুষ যেমন ভয় কাটিয়ে উঠেছে, তেমনি পর্তুগীজ সরকার বিষয়ে তারাও তাদের ভয় কাটিয়ে উঠুক এবং নাগরিক ও তা বলতে যা বোঝায় সে-সবের জন্য মৌল অধিকারের দাবি জানাক।[৯০]

এটা......আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যিক, যাতে গোমন্তকরা এ আন্দোলন পরিচালনা করে—যথাসম্ভব সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ নিয়ে, যেমন নাগরিক স্বাধীনতা

স্বরাজের বৃহত্তর প্রশ্নটি অপেক্ষা করুক সমগ্র ভারতের স্বরাজ লাভের ওপর। অবশ্য পর্তুগীজ সরকার যদি উপনিবেশের অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মতামত বিনিময় করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, তবেই। নাগরিকদের সহিংস বা অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দ্বারা স্বরাজ অর্জিত হবার নয়। যেখানে প্রত্যেকটি নাগরিকই বীর, এবং জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত সেখানে অহিংস সংগ্রামে সাফল্য সুনিশ্চিত। এমনটি ভাবা যায় ব্রিটিশ ভারত সম্পর্কে,—যেখানে মানুষ অসংখ্য,—অনেক পোড়খাওয়া, এবং সচেতন। গোয়া বিষয়ে এমনটি ভাবার অবকাশ কম। তাই নাগরিক অধিকারের মতো সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয়টিকে সামনে রেখেই এগোতে হবে।

সাফল্যের দ্বিতীয় শর্ত, সংগ্রাম অবশ্য হবে অহিংস। সম্পূর্ণ প্রকাশ্য পথে।

তৃতীয়ত, কোনও দল যেন ক্ষমতা ও আসনের জন্য লড়াই না করে। যেখানে উদ্দেশ্য সর্বজনীন সেখানে আলাদা আলাদা দলের কোনও অর্থ নেই।[১১]

আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যত খবর এসেছে, যা কাগজে বেরিয়েছে ভারতের এই অংশে—তাতে বিপরীত ধারণাটিই প্রতিপন্ন হয় (যে গোয়াতে কোনও নাগরিক স্বাধীনতা নেই)। আমার মনে হয়,....কোর্টমার্শাল দ্বারা, ডক্টর ব্র্যাগান্‌ঝার আট বছর দন্ডাদেশের খবর, কোনও সুদূর পর্তুগীজ উপনিবেশে তাঁর নির্বাসনের সম্ভাবনা,—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে গোয়াতে নাগরিক স্বাধীনতা অতি দুর্লভ বস্তু। নইলে বেছে বেছে ডক্টর ব্র্যাগানঝার মতো এক আইন-মান্যকারী নাগরিককে এত বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে বিবেচনা ক'রে নির্বাসনে পাঠানো হবে কেন?......

আয়তনে বৃহত্তর ভারত স্বাধীনতা লাভ না-করা পর্যন্ত গোয়ার অধিবাসীরা স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু আত্মসম্মান না খুইয়ে কোনও ব্যক্তি বা দল এভাবে নাগরিক স্বাধীনতা ছাড়া থাকতে পারে না।[১২]

..... নাগরিক স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষ-শিকার, মহানন্দে চলেছে গোয়াতে। একটি ক্ষুদ্রক্ষমতাশালী শক্তি, ক্ষুদ্র বলেই শাস্তির ভয় না করে কাজ করে চলতে পারে, যা এক বৃহৎ শক্তি পারে না.....কোথায়, সেই পর্তুগীজ শক্তি যে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে মৈত্রীর ও মানব-দরদের বড়াই করে? মানুষ ও ঈশ্বরের সামনে সে শক্তিকে নিজের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে হবে। নিষ্পাপের রক্ত .... কবর বা চিতাভস্ম থেকে আর্তনাদ করবে। জীবিতরা যতই ক্ষমতাশালী ও বাক্‌পটু হোক, তাদের কণ্ঠের চেয়ে ওই কান্না অনেক শক্তিশালী।[১৩]

খ. ফরাসী ভারত

..... সাম্রাজ্যবাদের হাত সদা রক্তরঞ্জিত। সাম্রাজ্যবাদীরা কল্যাণব্রতী অশোকের মতো দ্রুত সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করলেই বিশ্বের মঙ্গল। ফ্রান্সের প্রশংসা দোষের নয়, তা ন্যায্য—যেমন ফরাসী ভারতের বেলায়.....[১৪]

আমার কোনও সন্দেহ নেই, ওই-সব উপনিবেশবাসী ভারতীয়রা স্বাধীন ভারতের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে বাধ্য। শুধু, ওই সকল জায়গায় ভারতীয়রা যেন নিজের হাতে আইন তুলে না নেয়। সাংবিধানিক উপায় তারা ব্যবহার করতে পারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী (জওহরলাল নেহরু) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছেন। দুটি উপনিবেশে তাঁর আপনজনদের নিশ্চয় তিনি অবহেলা করবেন না।[৯৫]

..... শত হলেও, ফরাসীরা এক মহান জাতি। স্বাধীনতাপ্রেমী। যে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে সে অবশ্যই এদের (ফরাসীদের) কোনও চাপ দেবে না।[৯৬]

..... আমার মতামত দ্ব্যর্থহীন। যখন তাঁদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে, তখন এ-সব ছোট ছোট বিদেশী উপনিবেশের অধিবাসীরা দাসত্বের অবস্থায় থাকতে বাধ্য হবে, এটা সম্ভব নয়। ভারতের ছোট ছোট বিদেশী উপনিবেশের হীনতর অবস্থান আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। আশা করি ... মহান ফরাসী জাতি, ভারতে বা অন্যত্র কালো ও বাদামি রঙের মানুষদের দাবিয়ে রাখার ব্যাপারের সঙ্গে কখনও নিজেদের সামিল করবে না।[৯৭]

৭০. ভারত ও পাকিস্তান

দেশভাগ ইসলাম-বিরোধী

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিম লীগ উপস্থাপিত পাকিস্তানী দাবিটি অ-ইসলামিক। তাকে অন্যায় বলতে আমি ইতস্তত করব না।

মানবতার ঐক্য ও সৌভ্রাত্রকে সমর্থন করে ইসলাম। মানবপরিবারের একতাবন্ধন ভেঙে দেওয়াকে সমর্থন করে না। তাই, যারা ভারতকে সম্ভবত যুযুধান দুই দলে বিভক্ত করতে চায়, তারা ভারত ও ইসলাম উভয়েরই শত্রু।[৯৮]

দ্বিজাতি-তত্ত্ব অসত্য

ভারতের মুসলিমরা এক স্বতন্ত্র জাতি, এ ধারণা বজায় রাখার কারণ আছে, এটা বিতর্ক মূলক। তবে আমি শুনেছি, পৃথিবীতে ধর্ম যত, জাতি তত।[৯৯]

দ্বিজাতি তত্ত্ব অসত্য। ভারতের বিশাল মুসলিম জনসংখ্যার অধিকাংশ ধর্মান্তরিত, অথবা ধর্মান্তরিতদের বংশধর। ধর্মান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়নি।[১০০]

আমি বারবরই বলেছি (হিন্দু ও মুসলিম) দুইয়ের মধ্যে কোনও তফাত নেই। তাদের পর্যবেক্ষণ হয়তো পৃথক। কিন্তু তা ওদের পৃথক করে দেয় না। নিঃসন্দেহে তাদের ধর্ম ভিন্ন, কিন্তু অন্যাদের মতো তারাও একই মূল হতে জাত।[১০১]

দেশভাগের বিরুদ্ধে কোনও সবল প্রতিরোধ নয়

মুসলিমরা যদি সত্যিই জোর দেয়, তাহলে একজন অহিংস হিসাবে আমি প্রস্তাবিত দেশভাগে সবল প্রতিরোধ জানাতে পারি না। তবে এ-অঙ্গচ্ছেদে আমি কিছুতেই রাজি হতে পারি না।[১০২]

আমার জীবন নানা সমঝোতায় গঠিত। কিন্তু সে-সব সমঝোতা তো আমাকে ধ্যেয় উদ্দেশ্যের কাছে নিয়ে এসেছে ..... ঈশ্বর যদি তাই চান, আমার স্বপ্নভঙ্গের অসহায় সাক্ষী হতে হবে।[১০৩]

...... যদি আট কোটি মুসলিম তাই চায়, পৃথিবীতে কোনও শক্তি তা নিবারণ করতে পারে না। সে বিরোধিতা সহিংস বা অহিংস, যাই হোক।[১০৪]

বলপ্রয়োগে পাকিস্তানকে রদ করা মানে স্বরাজকেই পঙ্গু করা।[১০৫]

পাকিস্তান, যাকে আমি এক 'কু' বলে ঘোষণা করেছি, তাকে নিখাদ 'সু'-তে পরিবর্তন করা সম্ভব। যদি সকল বিপদাশঙ্কা দূর হয়। শত্রুতা পরিণত হয় বন্ধুত্বে এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস পরিণত হয় বিশ্বাসে।[১০৬]

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা

আমি বুঝতে পারি না সেই পাকিস্তানকে, যেখানে কোনও অ-মুসলিম সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না, অথবা এক হিন্দুস্থানকে যেখানে মুসলিমরা বিপন্ন।[১০৭]

আমি এই উদ্দেশ্যে কাজ করছি। এমনভাবে কাজ করছি যাতে প্রতিরাজ্যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এগিয়ে যায় এবং স্বাধীনতার আবশ্যিক অবস্থা তৈরি করে।[১০৮]

আমার অহিংসা সংখ্যালঘুদের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে বলেছে। সে হবে এক নবজন্মের মতো। যদি দুটি জায়গায় হিন্দু ও মুসলিম বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে পরস্পর শান্তিতে বাস করে, তা আমাকে বাড়তি শক্তি জোগাবে।[১০৯]

পাকিস্তান ও ভারতের অবশ্য কর্তব্য, যে-সংখ্যালঘুদের সম্মান, জীবন ও সম্পত্তি তাদের হাতে, এদের রক্ষা করা....

ভারত থেকে সব মুসলিম এবং পাকিস্তান থেকে সব হিন্দু ও শিখদের বিতাড়ন মানে যুদ্ধে, দেশের চিরকালীন ধ্বংস।[১১০]

বিরোধের ফয়সালা : যুদ্ধ নয়

ভারত ও পাকিস্তান তাদের বিরোধকে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করবে এবং ব্যর্থ হলে সালিস দ্বারা বিচার করাবে।[১১১]

পাকিস্তান যদি অন্যায় করেই চলে, তাহলে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ অনিবার্য।[১১২]

যদি ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের প্রতি নিঃবচ্ছিন্ন শত্রুভাবাপন্ন থাকে এবং পরস্পর যুদ্ধে নিরত হয়, তাহলে দুটো দেশই ধ্বংস হবে এবং তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা হারাবে। আমি সে-দিন দেখবার জন্য বেঁচে থাকতে চাই না।[১১৩]

এটা নিশ্চিত যে, উভয় দেশেব মধ্যে কখনও যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। তাদেব বন্ধুভাবে

থেকেই বাঁচবে এবং মরতে হবে। উভয়কে ঘনিষ্ট সহযোগিতায় কাজ করত হবে। উভয়েই স্বাধীন। আবার অনেক কিছুতে তাদের মিলও আছে। শত্রু হলে এ-সব মিল থাকবে না। যদি প্রকৃত বন্ধুত্ব থাকে উভয় দেশের জনগণই দুটি দেশের প্রতিই বিশ্বস্ত থাকতে পারে। তারা, একই জাতিসমূহের কমনওয়েল্‌থের সদস্য। কেমন করে পরস্পরের শত্রু হতে পারে?[১১৪]

৭১. ভারতের লক্ষ্যপথ

আত্মার শক্তিতে আশ্রয় গ্রহণ

আমি মনে করি ভারতের লক্ষ্য অন্যান্য দেশের চেয়ে ভিন্ন। ভারত বিশ্বের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য। সে স্বেচ্ছায় যে শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া পালন করেছে, তা অনন্য। ইস্পাতের অস্ত্রের প্রয়োজন ভারতের কম। সে দিব্য অস্ত্রে লড়েছে। এখনও তা করতে সক্ষম। অন্যান্য জাতি পশু-শক্তির প্রবক্তা। ইউরোপে চলমান এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধই এ-সত্যের নির্মম উদাহরণ। আত্মার শক্তির দ্বারা ভারত সকলকে জয় করতে পারে।

আত্মার শক্তির কাছে পশু-শক্তি যে কিছুই নয়, ইতিহাস অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে তা প্রমাণ করে। কবিরা তার বন্দনা গেয়েছেন, দ্রষ্টারা তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।[১১৫]

ভারতীয়রা যে কাপুরুষ নয়, তা প্রমাণিত হয় তার যোদ্ধ জাতিগুলির শৌর্য ও সাহস থেকে,—সে হিন্দু, মুসলিম, গোর্খা, শিখ যা-ই হোক-না-কেন। আমার কথা হল, ভারতের মাটিতে লড়াইয়ের মনোভাব বহিরাগত। সম্ভবত সেই জন্যই পৃথিবীর বিবর্তনে ভারতের ভূমিকা শ্রেষ্ঠতর। সময়ই বলে দেবে ভারতের ভাগ্যে কী আছে।[১১৬]

ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমি কাজ করি, কেন না আমার স্বদেশী আমাকে শেখায়, এ দেশে আছি এবং এর সংস্কৃতির উত্তরাধিকার পেয়েছি বলে ভারত সেবার কাজে আমি যোগ্যতম। আমার কাজে তার অগ্রাধিকার।

কিন্তু আমার দেশপ্রেম একচেটিয়া কিছু নয়। এর লক্ষ্য, শুধু অন্য কোনও জাতিকে আঘাত না-করা নয়। আক্ষরিক অর্থে সকলের উপকারে লাগা। আমার ধারণায় বিধৃত যে ভারতের স্বাধীনতা, তা কখনও পৃথিবীর পক্ষে অনিষ্টকারী হতে পারে না।[১১৭]

পশ্চিমের রক্তাক্ত পথ-অনুসরণ ভারতের নিয়তি নয়। ওই রক্তপাতে ভারত দৃশ্যতই ক্লান্ত। তার নিয়তি শান্তির রক্তপাতহীন পথে। যে শান্তি উৎসারিত হয় এক সরল, ঈশ্বরাশ্রিত জীবনধারা থেকে। ভারত তার আত্মাকে হারিয়ে ফেলবে এমন ভয় আছে। তা হারালে ভারত বাঁচতে পারবে না। তাই, গভীর আলস্যে অসহায় কণ্ঠে সে যেন না বলে, "আমি পশ্চিমের এই ধেয়ে চলা এড়াতে পারি না।" তার নিজের এবং বিশ্বের স্বার্থে একে প্রতিরোধ করার মতো শক্তিশালী তাকে হতেই হবে।[১১৮]

অহিংসা-পরম্পরা ভারতের আবহমানকালের ঐতিহ্য। কিন্তু, তার প্রাচীন ইতিহাসেও, যতদূর জানি, কার্যকরভাবে অহিংসা দেশ-পরিব্যাপী ছিল না। মানবজাতির উদ্দেশে অহিংসবাণী

প্রচারই ভারতের একমাত্র লক্ষ্য—এ আমার অনমনীয় বিশ্বাস; সফলকাম হতে হয়ত দীর্ঘসময় লাগবে। কিন্তু, আমার জ্ঞান মতে, এই লক্ষ্যপূরণে অন্যকোনও দেশই ভারতের পুরোধা হতে পারবে না।[১১৯]

পৃথিবীর সকল শোষিত জাতিকে পথ দেখাবার দায়িত্ব ভারতের কাঁধে। আজ অহিংসা তার মধ্যে যতটা সঞ্চারিত তার চেয়ে বেশি না হলে এ বোঝা ভারত টানতে পারবে না। সেই লক্ষ্যসাধনে নিজেদের যোগ্যতর করার জন্য আমি আমাদের সংগ্রামকে একটা প্রশস্ততর বাঁকে ফেরাতে চাই। ভারত শুধু যদি স্ব-ক্ষেত্রে অহিংসার নীতিকে যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করতে পারে, বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়েই যদি অহিংসাকে বর্জন না করে, তাহলে সে অত্যাচারিত ও শোষিত জাতিসমূহের মশালবাহক হবে।[১২০]

কর্তব্যের দেশ

...ভারত মূলত কর্মভূমি (কর্তব্যের দেশ), যা ভোগভূমির (ভোগবিলাসের দেশ) বিপরীত।[১২১]

...ভারতের সব কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে। উচ্চতম বাসনাপূর্ণ একটি মানুষের পক্ষে যা যা চাওয়া সম্ভব, তা সবই এখানে আছে।[১২২]

ভারত ও পৃথিবী

ইউরোপের পদতলে ভূলুণ্ঠিত ভারত মানবজাতিকে কোনও আশার বাণী দিতে পারে না। বেদানাতুর পৃথিবীকে শান্তি ও শুভেচ্ছার বার্তা দিতে পারে এক জাগ্রত, স্বাধীন ভারত।[১২৩]

মানবতার জন্য মৃত্যুবরণের উচ্চাশা যদি ভারতের থাকে, তবে তাকে অবশ্যই বাঁচতে শিখতে হবে।[১২৪]

...ভারতের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গগুলি নৈতিক ভিত্তিতে উপস্থাপিত হবে, এটা না দেখলে আমার উচ্চাশা পূর্ণ হবে না।[১২৫]

আমি চাই ভারতের উত্থান, যাতে সমগ্র পৃথিবী সুফল পায়। অন্যান্য জাতির ধ্বংসস্তূপের ওপর ভারতের উত্থান আমি চাই না। ভারত যদি শক্তিশালী ও সুযোগ্য হয়, সে পৃথিবীকে তাব শিল্পকলা এবং স্বাস্থ্যকর মশলাপাতিব ঐশ্বর্য পাঠাবে। কিন্তু আফিম বা মাদকদ্রব্য পাঠাতে নারাজ হবে। যদিও এমন ব্যবসায়ে ভারতের অনেক জাগতিক লাভ হবে।[১২৬]

ভারতকে আমি স্বাধীন ও শক্তিশালী দেখতে চাই, যাতে পৃথিবীকে আরও ভালো অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য, ইচ্ছুক ও পবিত্র বলি হিসেবে নিজেকে সে উৎসর্গ করতে পারে। এক ব্যক্তি পবিত্র হলে নিজেকে পরিবারের জন্য উৎসর্গ করে, পরিবারটি সে কাজ করে গ্রামের জন্য, গ্রাম জেলার জন্য, জেলা প্রদেশের জন্য, প্রদেশ দেশের জন্য, দেশ সকলের জন্য।[১২৭]

পশ্চিম থেকে অনেক কিছু আত্মস্থ করে আমরা লাভবান হতে পারি, একথা মানার মতো বিনয় আমার আছে। প্রজ্ঞা কোনও একটি মহাদেশ বা একটি মানবজাতির একচেটিয়া নয়। পশ্চিমী সভ্যতার বিরুদ্ধে আমার প্রতিরোধ হল, পশ্চিম থেকে যা-কিছু আসে,

এশীয়রা তা নকল করার যোগ্য-মাত্র, এই ধারণার বিরুদ্ধে। চিন্তাভাবনাহীন নির্বিচার নকল করার বিরুদ্ধে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের যদি দুঃখের আগুনের মধ্য দিয়ে চলবার ধৈর্য থাকে, তার সভ্যতার ওপর যে কোনও বেআইনী অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের ধৈর্য থাকে, তাহলে ভারত পৃথিবীর শান্তি ও সুনিশ্চিত অগ্রগতিতে এক সহায়ক অবদান রাখবে। ভারতের নিজস্ব সভ্যতা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। তবু তা এতাবৎকালের ধ্বংসলীলার মধ্যেও টিকে আছে।[১২৮]

ভারতের এক মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। তা হল পৃথিবীতে মিত্রতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। শুধু সম্মেলনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শান্তি ভেঙে যাচ্ছে। এ-তো আমরা স্বচক্ষে দেখছি।[১২৯]

সহিষ্ণুতার শিক্ষা

শোভনতা ও সহিষ্ণুতাকে মূল্যবান হয়ে উঠতে হলে, কঠোরতম চাপ সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তা যদি না পারে, সে হবে ভারতের পক্ষে এক দুর্দিন...[১৩০]

(ভারত) ইউনিয়ন কি দিব্যরাষ্ট্র হবে? অহিন্দুদের ওপর চাপোনো হবে হিন্দুত্বের মতবাদ? আশা করি তা হবে না। তা হলে, ভারত ইউনিয়ান আর আশা ও প্রতিশ্রুতির সে দেশ থাকবে না, যে দেশের দিকে এশিয় ও আফ্রিকান জাতিসমূহ, এমন কি সারা বিশ্ব চেয়ে থাকে।

পৃথিবী ভারতের কাছে ক্ষুদ্রতা ও ধর্মান্ধতা আশা করে না...মহত্ত্ব ও শুভবোধ আশা করে। যা থেকে সাবা বিশ্ব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে আলোব দিশা পায়।[১৩১]

যথার্থ স্বাধীন এবং মুক্ত ভারত তার বিপন্ন প্রতিবেশীদের সাহায্যে ছুটে যেতে বাধ্য। যেমন, আফগানিস্তান, সিলোন ও বর্মা। এই তিনটি দেশের প্রতিবেশীদের বেলায়ও এ-নিয়ম প্রযোজ্য এবং সেইভাবে, জড়িয়ে পড়ার ফলে সে-সব দেশও ভারতের প্রতিবেশী হবে। এ-ভাবে এক একক-উৎসর্গ যদি জীবন্ত-উৎসর্গে পরিণত হয়, তাহলে সমগ্র মানবজাতি সেই আলিঙ্গনে বাধা পড়ে।[১৩২]

ভারত ও এশিয়া

ভারত ব্যর্থ হলে এশিয়ার মৃত্যু হবে। ভারত বহু মিশ্রিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র, এ-কথা যথার্থ। এশিয়া, আফ্রিকা, বা পৃথিবীর যে-কোনও অংশে সকল শোষিত মানুষের আশা হয়ে উঠুক ভারত। তার এই আসনই অটুট থাকুক।[১৩৩]

শুধু এশিয়া ও আফ্রিকা কেন, ভারতের কাছে গোটা দুনিয়ার অনেক আশা। তাই সকলের দৃষ্টি ভারতের দিকে। ভারতকে যদি সে আশা চরিতার্থ করতে হয়, তাকে ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করতেই হবে। সকল ভারতীয়কে বন্ধু ও ভাইয়ের মতো থাকতে হবে। সেই সুখময় অবস্থার প্রথম শর্ত, নিষ্কলুষ হৃদয়।[১৩৪]

৭২. গণতন্ত্রের মূল উপাদান

গণতন্ত্রের মর্মবাণী কোনও যান্ত্রিক ব্যাপার নয় যে তার আকার বদলে দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়। এর জন্য চাই হৃদ্‌পরিবর্তন...প্রয়োজন ভ্রাতৃত্বের মর্ম আত্মস্থ করা...[১৩৫]

গণতন্ত্রের সার কথা...সর্বজনের হিতার্থে কাজের জন্য (সমাজের) নানা অংশের মানুষের সকল দৈহিক, আর্থিক ও আত্মিক সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করার শিল্পকলা ও বিজ্ঞান।[১৩৬]

শৃঙ্খলা

সর্বোচ্চ স্তরের স্বাধীনতা একই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি শৃঙ্খলা ও নম্রতা নিয়ে গঠিত। শৃঙ্খলা ও নম্রতা থেকে উদ্ভূত স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান কবা চলে না। লাগামছাড়া স্বেচ্ছাচার, অশ্লীলতার চিহ্ন। তা নিজের এবং প্রতিবেশীদের উভয়ক্ষেত্রেই হানিকর।[১৩৭]

শৃঙ্খলাপরায়ণ ও আলোকপ্রাপ্ত গণতন্ত্র পৃথিবীর সুন্দরতম বস্তু। পক্ষপাতপূর্ণ, অজ্ঞ ও কুসংস্কারচ্ছন্ন গণতন্ত্র নিজেই মহাবিশৃঙ্খলায় পড়বে। সে আত্মবিনাশীও হতে পারে।[১৩৮]

ব্যক্তির দায়িত্ব

প্রকৃত গণতন্ত্রে প্রত্যেক নরনারীকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখানো হয়। কেমন করে এই যথার্থ বিপ্লব আনা যাবে তা আমি জানি না। তবে এটা জানি, প্রতিটি সংস্কারসাধনের কাজ, দানধর্মের মতোই ঘরে শুরু হওয়া উচিত।[১৩৯]

গণতন্ত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত বাখা হয় সামাজিক ইচ্ছাশক্তি বা রাষ্ট্রের দ্বারা। গণতন্ত্রের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্র শাসিত হয় গণতন্ত্র দ্বারা। যদি প্রতিটি ব্যক্তি নিজ হাতে আইন তুলে নেয়, তাহলে রাষ্ট্র থাকে না। শুরু হয় নৈরাজ্য,—সমাজ আইন বা রাষ্ট্র সেখানে নেই। ওই পথেই স্বাধীনতার ধ্বংস আসে। তাই সর্বদা নিজের ক্রোধ প্রশমিত করবে এবং রাষ্ট্রকে দেবে ন্যায়ের ভার।[১৪০]

পরীক্ষা

গণতন্ত্রের সত্যতম পরীক্ষা হল যে-কোনও লোকের স্ব-মতে কাজ করবার যোগ্যতা থাকবে, যতক্ষণ না সে অন্য কারও জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি করে। গুণ্ডামির দ্বারা সাধারণ নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।[১৪১]

মানুষের মধ্যে দরিদ্রতমের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, তাদের চেয়ে ভালভাবে জীবনযাপন না-করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ওদের স্তরে পৌঁছনোর যথাসাধ্য সচেতন প্রয়াস চালানো যদি গণতান্ত্রিক হবার মাপকাঠি হয়, তাহলে আমি নিজেকে [গণতান্ত্রিক] বলে দাবি করি।[১৪২]

যে জন্মসূত্রে গণতান্ত্রিক, শৃঙ্খলাপরায়ণতা তার জন্মগত। যে স্বাভাবিকভাবেই স্বেচ্ছায়

কী মানবীয়, কী স্বর্গীয়, সকল আইনের বাধ্য হতে অভ্যস্ত, গণতন্ত্র তার কাছে আপনা হতেই আসে। যাঁরা গণতন্ত্রের সেবা করবার উচ্চাশা রাখেন তাঁরা যেন প্রথমে গণতন্ত্রের এই তিক্ত পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল দেখান। নিজেদের যোগ্য করে তোলেন। এ-ছাড়াও গণতান্ত্রিক মানুষকে একেবারে নিঃস্বার্থ হতেই হবে। সে নিজের বা দলের কথা ভাববে না, স্বপ্ন দেখবে না, শুধু গণতন্ত্রের কথা ভাববে। একমাত্র তখনই তার আইন অমান্যের অধিকার জন্মাবে। আমি চাই না কেউ তার নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করুক বা নিজেকে দমন করুক। এক সুস্থ ও সৎ মতপার্থক্য আমাদের উদ্দেশ্যের ক্ষতি করবে, একথা বিশ্বাস করি না। তবে সুবিধাবাদ, ছদ্মবেশী প্রতারণা ও জোড়াতালি দেওয়া আপস, নিশ্চয় ক্ষতি করবে। যদি তুমি সত্যই বিক্ষুব্ধ হও তাহলে দেখো, তোমার মতামতে যেন তোমার অন্তরতম বিশ্বাস ধ্বনিত হয়। সেগুলি যেন সুযোগসন্ধানী পাটির স্লোগান না হয়।[১৪৩]

গণতন্ত্রে বজ্র আঁটুনি মানে ফস্কা গেরো। সে টিকে থাকে শুধু বিশ্বাসের ওপর।[১৪৪]

পুঁজি কয়েকজনের শ্রম ব্যবহার করে নিজেকে বাড়াবার জন্য। কোটি কোটি মানুষের শ্রমকে বিচক্ষণতার সঙ্গে একত্রিত করতে পারলে আপনা থেকেই তা কোটি কোটি মানুষের সম্পদ বাড়ায়। এরই মধ্যে রয়েছে যথার্থ গণতন্ত্র। এক সত্যকার পঞ্চায়েত রাজ।[১৪৫]

গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব

প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি থাকলেই কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলে বা গণতন্ত্রেব নীতি সুবক্ষিত হয়, এটা আমার কাছে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ-ধারণা ভ্রান্ত। যদৃচ্ছ বাছাই-করা ছ'হাজার দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের চেয়ে জনস্বার্থ রক্ষায় তদ্‌গত, উদারমনা ও সত্যনিষ্ঠ পনেরো শ' মানুষের হাতে গণতন্ত্র সব সময়েই অনেক বেশি নিরাপদ। গণতন্ত্র সুরক্ষিত করতে হলে স্বাধীনতা, আত্মসম্মান ও নিজেদের একত্ব বিষয়ে তীক্ষ্ণ বোধ থাকা একান্ত আবশ্যক। মানুষ হিসেবে, যারা ভালো ও খাঁটি তাদের মধ্যে থেকেই প্রতিনিধি বাছাই করতে হবে।[১৪৬]

যাদের তারা প্রতিনিধি, তাদের মন-মেজাজ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব যদি অল্প কয়েকজনও করে, তাহলেও তা প্রকৃত গণতন্ত্রের সঙ্গে বেমানান হবে না। আমি বলি বলপ্রয়োগ করে গণতন্ত্র আনা যায় না, এর মূলনীতি কখনও বলপ্রয়োগ করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। একে অন্তর থেকেই আসতে হবে।[১৪৭]

জাতির বহু-বিচিত্র স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করাই গণতন্ত্রের সার-কথা। অবশ্য, বিশেষ স্বার্থের বিশেষ প্রতিনিধিত্বকেও সে বাদ দেয় না, দেওয়া উচিতও নয়। তবে, ওই ধরনের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের আসল পরিচয় নয়। এটা তার অসম্পূর্ণতার চিহ্ন।[১৪৮]

ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্রে গ্রাম হল প্রথম ইউনিট...কেন্দ্রে উপবিষ্ট বিশজন লোক দিয়ে সত্যকার গণতন্ত্র চালানো যায় না। এ-কাজ করতে হবে তলা থেকে, প্রতি গ্রামের অধিবাসীদের দিয়ে।[১৪৯]

যেখানে সাধারণভাবে মানুষ বিশেষ কোনও বস্তু ভালবাসে ও চায়, সে-ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে ভীরুতার স্থান নেই। (জনতার) প্রতিনিধিদের, ওদের দাবিকে বাস্তবরূপ দিতে হবে, তাকে কার্যকর করতে হবে। দেখা গেছে, জনতার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুকূল থাকলে যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে অনেকখানি সাহায্য হয়।[১৫০]

জনগণ

বলা যেতে পারে, জনগণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর—যা কি না পঞ্চায়েতের কণ্ঠস্বর। কিন্তু যেখানে মানুষ নিজেই শোষক সেখানে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর থাকে কেমন করে? যদি জনতার কণ্ঠস্বরকে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর হতে হয়, সে জনগণকে রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। ঈশ্বরের তুলাদণ্ডে সত্য ও অহিংসার মাপ চিরকাল সমান।[১৫১]

আমি বারংবার বলেছি, জাতীয় কাজ করতে গেলে জাতীয় কর্মীদের রাজনীতিক ক্ষমতা থাকা আবশ্যিক নয়। তবে, যাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে, তাদের সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রাখা জনগণের কর্তব্য। এই সংযোগ রাখা কঠিন নয়, কারণ এদের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। তবে জনগণ যদি তাদের ক্ষমতা উপলব্ধি করত, তাকে বিচক্ষণতায় ব্যবহার করত তাহলে আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যেত।[১৫২]

গণতন্ত্রে সরকারের ভুলভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই জনগণের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। চাইলে তারা সরকারকে অপসারিত করতে পারে। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সরকারের কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়। আমাদের সরকার বিশাল সেনা ও নৌবাহিনী নির্ভর কোনও বিদেশী সরকার নয়। (সরকারকে) জনগণের কাছ থেকেই শক্তি আহরণ করতে হবে।[১৫৩]

গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছাই প্রাধান্য পাবে...[১৫৪]

অধিকাংশ মানুষ যদি স্বার্থপর ও বিশ্বাসের অযোগ্য হয়, তাহলে গণতন্ত্র, পঞ্চায়েতী রাজ, কাজ করবে কি করে?[১৫৫]

সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু

বিবেকের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের আইনের কোনও স্থান নেই।[১৫৬]

অনুশাসনের তত্ত্বকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে আমরা যেন সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের দাস হয়ে না পড়ি। সে হবে আরও পাশবিক আকারে পশুশক্তির পুনরুত্থান। যদি সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারকে সম্মান করতে হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠরা অবশ্যই তাদের মতামত ও কাজকে সহ্য ও সম্মান করবে...

সংখ্যালঘুদের কথা ঠিকমত শোনা হচ্ছে কি না, তারা অপমানের সম্মুখীন হচ্ছে কি না, এটা দেখা সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তব্য।[১৫৭]

আমরা যদি মতদানের ও কাজের স্বাধীনতার অধিকার দাবি করি, তাহলে অন্যদেরও তা দিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের আইন যখন দমনমূলক হয়ে ওঠে, তখন তা সংখ্যালঘু আমলাতন্ত্রেব মতোই অসহ্য। ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে যুক্তি দিয়ে অনেক ধৈর্য সহকারে

সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিয়ে আসতে হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে।[১৫৮]

সংখ্যাগরিষ্ঠের আইনের প্রয়োগক্ষেত্র সংকীর্ণ, অর্থাৎ, খুঁটিনাটির বেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা মানতে হয়। তবে, তার যে-কোনও সিদ্ধান্ত সর্বদা মেনে নিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাসত্ব করা হবে...গণতন্ত্র মানে এই নয় যে, সেখানে মানুষ ভেড়ার মতো আচরণ করবে। গণতন্ত্রে ব্যক্তির মতামত ও কাজ করবার স্বাধীনতা কঠোরভাবে রক্ষা করা হয়। তাই আমি মনে করি, সংখ্যাগুরুর চেয়ে ভিন্নরকম কাজ করবার সম্পূর্ণ অধিকার সংখ্যালঘুর আছে।[১৫৯]

সংখ্যাগুরুর আইন দিয়ে কোনও জীবন্ত বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না।[১৬০]

যদি গণতন্ত্রের এক সত্য রূপ গড়ে তুলতে চাই, অসহিষ্ণু হলে আমাদের চলবে না। অসহিষ্ণুতার দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রমাণিত হয়।[১৬১]

আমি বারবার বলেছি, কোনও চিন্তাধারাই সঠিক বিচারের মৌরসিপাট্টা দাবি করতে পারে না। ভুল আমরা করতেই পারি। প্রায়ই নিজ সিদ্ধান্ত বদলাবার দরকার হয়। এত বড় এক দেশে, নানা সৎ-চিন্তাধারার জায়গা থাকবেই। নিজেদের বা অপরের প্রতি বড়জোর যা করতে পারি, তা হল বিরোধীর দৃষ্টিকোণ বুঝতে চেষ্টা করা। গ্রহণ করতে যদি না-ও পারি, তবু যেন তাকে শ্রদ্ধা করি। আমরা তো আশা করি, সে আমাদের দৃষ্টিকোণ শ্রদ্ধা করবে। এক সুস্থ জনজীবনের, স্বরাজ-যোগ্যতার, এ-এক অপরিহার্য পরীক্ষা।

যদি মহানুভবতা ও সহিষ্ণুতা না থাকে, কোনওদিন আমরা আপসে আমাদের বিরোধ মেটাতে পারব না। তাই, সর্বদাই এক তৃতীয় পক্ষ, কোনও বিদেশী শক্তির সালিস মেনে নেব।[১৬২]

অসহিষ্ণুতা, অসৌজন্য এবং রূঢ়তা...যে-কোনও উত্তম সমাজে নিষিদ্ধ। এগুলি গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধীও বটে।[১৬৩]

অপর পক্ষের কথা শুনতে যদি তৈরি না থাকি, গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। যখন আমরা বিরোধীদের কথা শুনতে চাই না,—শুনলেও তা নিয়ে তামাশা করি,—তখন আমরা যুক্তির দ্বার বন্ধ করে দিই। অহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, সত্য হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা থাকে। প্রকৃতির বিধানেই আমাদের বোধশক্তি সীমিত। তা মেনে নিয়েই যে দীপশিখা আমাদের কাছে গচ্ছিত আছে, তার আলোকে নির্ভয়ে কাজ করতে হবে। মনকে মুক্ত রাখতে হবে, যাকে সত্য ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত, তা অসত্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে—এটা মেনে নেবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকতে হবে। মনের এই উদারতা আমাদের আন্তর-সত্যকে শক্তিশালী করে। সত্যের পথে কোনও বাধার প্রাচীর থাকলে তা অপসারিত করে।[১৬৪]

গুণ, পরিমাণ নয়

পরিমাণ নয়, গুণের ওপর আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দিই ....সন্দেহ, অনৈক্য, প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ, কুসংস্কার, ভয়, অবিশ্বাস, ইত্যাদির মধ্যে বসে...সংখ্যার কোনও আশ্বাস তো

নেই-ই বরং বিপদ থাকলেও থাকতে পারে...সংখ্যা যখন একীভূত হয়ে কঠোর শৃঙ্খলাধীনে কাজ করে তখন সে অপ্রতিরোধ্য। যখন যে-যার পথে যায়, অথবা কোন পথে যাবে কেউ জানে না তখন সংখ্যা এক আত্মবিনাশী শক্তি হতে পারে ।[১৬৫]

যে প্রার্থী হতে চায় আমি তাকে শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই, "কত শক্তিধর পুরুষ বা নারী তুমি? সময়োপযোগী হয়ে ওঠার সামর্থ্য কী তোমার আছে?" ধরা যাক, এ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হল। তখন, সবচেয়ে সংখ্যালঘু অংশ থেকে যে এসেছে সবার আগে তাকেই বেছে নেব। এইভাবে আমি অগ্রাধিকার দেব সকল সংখ্যালঘুদের, ন্যায়সঙ্গতভাবে। ভারতের মঙ্গলের সঙ্গে যা সংগতিপূর্ণ...ভারতের কল্যাণ মানে সমগ্র ভারতের কল্যাণ, হিন্দু, বা মুসলিম, বা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণ নয়।[১৬৬]

এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন ভেবে দমে যেও না। কোনও কোনও সময়ে এটা বিশেষ সুবিধাও বটে। কতবার বলেছি, আমি সংখ্যালঘু, একা হতে চাই। আমার প্রতি জনগণের ভক্তির পরিণাম এই কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আমার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক। এ বাধা না থাকলে আমি সব উপেক্ষা করে চলে যেতাম ...[১৬৭]

অহিংসায় আমার অকাট্য বিশ্বাসের অর্থ, সংখ্যালঘুরা যখন সত্যই দুর্বল, তখন তাদের কাছে হার মানা। সম্প্রদায়গুলিকে দুর্বল করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল, তাদের কাছে হার মানা। প্রতিরোধ করলে তাদের সন্দেহ জাগবে। তাদের বিরোধিতা শক্তিশালী হবে।[১৬৮]

জনমত

কেবল জনমতই পারে কোনও সমাজকে পবিত্র ও সুস্থ রাখতে।[১৬৯]

জনমতের পরোয়া না করে কোনও জনপ্রিয় রাষ্ট্র কাজ করতে পারে না। জনমত বিরুদ্ধে গেলে রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৭০]

সুস্থ, ওয়াকিবহাল, সুসঙ্গত সমালোচনা জনজীবনে প্রাণবায়ু তুল্য।[১৭১]

গণতন্ত্র কেবল মাঝারিয়ানা বা তার চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাই কোনও গণতান্ত্রিক সংস্থাকে যদি গ্লানিমুক্ত থাকতে হয়, তাকে দীনাতিদীন ও তুচ্ছাতিতুচ্ছের সর্বাত্মক শিক্ষার দিকে মন দিতে হবে। সকল কুসংস্কার ও সমাজবিদ্বেষের ঝাপটা তাকে সইতে হবে। তেমন এক সমাজে ক্রীশ্চান ও অক্রীশ্চানে, নারী ও পুরুষে কোনও বিভেদ থাকবে না।[১৭২]

গণতন্ত্রকে কার্যকর করে তুলতে হলে তথ্যজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন যথার্থ শিক্ষার[১৭৩]

সুস্থ জনমতের প্রভাব যে কতখানি তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করিনি...জনমত অসহনীয় হয় যখন তা হিংস্র, আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।[১৭৪]

গণতন্ত্রের হাতে একটিমাত্র শক্তি আছে, তা হল জনমত। সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন ও অনশনের সঙ্গে, গোপন বা প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের কোনও মিল নেই। তবে গণতন্ত্রে এ সবের ব্যবহারও খুবই সীমিত।[১৭৫]

আইন-প্রণয়ন

জনমত গড়ে ওঠার আগেই আইন-প্রণয়ন প্রায়ই নিরর্থক বা তার চেয়েও খারাপ। জনমত তৈরি করতে অসহযোগ হল দ্রুততম উপায়।[১৭৬]

আইনটি প্রণীত হবার আগে নিষ্ঠা-সহকারে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। গণতন্ত্রে এটাই কাঙ্ক্ষিত।[১৭৭]

রাজনৈতিক কর্ম

যখন দেখলাম রাজনীতি বাদ দিয়ে সমাজসেবাও করতে পারছি না...তখন রাজনীতিতে যোগদানের তাগিদ অনুভব করেছিলাম। সামাজিক ও নৈতিক অগ্রগতির প্রেক্ষিতেই রাজনৈতিক কাজকে দেখা উচিত বলে মনে করি। গণতন্ত্রে, জীবনের কোনও কিছুই রাজনীতির স্পর্শ থেকে মুক্ত নয়।[১৭৮]

ক্ষমতার চরিত্র

ক্ষমতা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। নাকের ডগায় কি আছে, তা তারা দেখতে পায় না। কানে আছড়ে পড়ছে, সে-সব কথা শুনতে পায় না। ক্ষমতা-মদমত্ত সরকারের মনোগত অভিপ্রায়ের হদিশ পাওয়া কঠিন। তাই....দেশপ্রেমী মানুষের উচিত মৃত্যুবরণ, কারাবাস এবং অনুরূপ আকস্মিক ঘটনাবলীর জন্য তৈরি থাকা।[১৭৯]

বিশ্বস্ত সেবার মধ্য দিয়ে যে ক্ষমতা আসে তা ক্ষমতাকে মহৎ করে তোলে। সেবার নামে যে ক্ষমতা চাওয়া হয়, যা শুধু অধিকাংশ ভোট পেলেই মেলে, তা এক ভ্রান্তি, এই মোহের ফাঁদ এড়িয়ে চলা উচিত...[১৮০]

ক্ষমতা দুই জাতের। একটি পাওয়া যায় শাস্তির ভয় দেখিয়ে। অন্যটি মেলে ভালবাসায়। ভালবাসা যে ক্ষমতার ভিত্তি, তা শাস্তির ভয় দেখিয়ে আদায়-করা-ক্ষমতার চেয়ে হাজারগুণ ফলপ্রসূ ও স্থায়ী।[১৮১]

রাজনৈতিক ক্ষমতাই আমার কাছে শেষ কথা নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনগণ তাদের অবস্থার যাতে উন্নতি করতে পারে এ-জন্য তাদের যোগ্য করে তোলার একটি উপায় মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতা মানে, জাতির প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা। জাতীয় জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রিত হবার মতো ক্রটিহীন হয়ে উঠলে প্রতিনিধিত্বের দরকার হয় না। তখন যে অবস্থা দাঁড়াবে, তাকে বলা যায় এক আলোকপ্রাপ্ত নৈরাজ্যের রাজত্ব। ওই রাষ্ট্রে যে-যার নিজের শাসক। সে নিজেকে এমনভাবে শাসনে রাখবে, যে তার প্রতিবেশীর কোনও অসুবিধাই হবে না। তেমন আদর্শ-রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে না। কারণ রাষ্ট্রই থাকবে না। কিন্তু আদর্শের পূর্ণতালাভ তো জীবনে হয় না। থোরোর সেই সর্বকালীন ধ্রুপদী বিবৃতি, সেই সরকারই ভালো, যে সবচেয়ে কম শাসন করে।[১৮২]

বাইরে থেকে চাপানো ক্ষমতা সর্বদা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল। অন্তর থেকে উদ্ভূত ক্ষমতার ওসবের দরকার সামান্যই, বা কোনও দরকারই পড়ে না।[১৮৩]

যতক্ষণ না প্রত্যেকে ক্ষমতা ভাগ করে নেয় ততক্ষণ গণতন্ত্র এক অসম্ভব ব্যাপাব। কিন্তু গণতন্ত্র যেন গুণ্ডাতন্ত্রে অধঃপতিত না হয়। একজন ব্রাত্য, এক মজুর যাদের জন্য

তুমি জীবিকা অর্জন করতে পারছ, স্বায়ত্তশাসনে তাদেরও ভূমিকা থাকবে। কিন্তু তোমাকে তাদের জীবন ছুঁতে হবে, যেতে হবে তাদের কাছে। দেখতে হবে তাদের বস্তি, যেখানে তারা গাদাগাদি করে থাকে বাক্সবন্দী মরা মাছের মতো। মানবতার এই অংশের তত্ত্বাবধান করাটা তোমার কাজ। ওদের জীবন গড়ে দেওয়া বা ধ্বংস করা, দুই-ই তোমার পক্ষে সম্ভব।[১৮৪]

এমন কোনও মানবিক সংস্থা নেই, যার বিপদ নেই। সংস্থা যত বড় যেখানে তার অপব্যবহারে সম্ভাবনা ততই বেশি। গণতন্ত্র এক বিশাল সংস্থা। অতএব তার ব্যাপক অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাও খুব বেশি। গণতন্ত্রকে এড়িয়ে যাওয়া এর প্রতিকার নয়। অপব্যবহারের সম্ভাবনা কমিয়ে ন্যূনতমে এনে ফেলাই প্রতিবিধান।[১৮৫]

জন-রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন কায়েম হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতায় [রাষ্ট্রিক] হস্তক্ষেপ সে-ক্ষেত্রে ন্যূনতমে পৌঁছয়। অন্য অর্থে, প্রকৃত গণতন্ত্র রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত কোনও জাতি যেখানে যথাযোগ্য সুস্থিত। এমন অবস্থা যেখানে নেই সেক্ষেত্রে সরকারের চারিত্র্য নামেই গণতান্ত্রিক।[১৮৬]

একনায়কতন্ত্র

বহুর ওপর একের শাসন কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এর উচ্ছেদ চা-ই কিন্তু "কেমন করে" সেটাই প্রশ্ন। পথ হচ্ছে, বহুজনের জন্য বাঁচতে শুরু করা। একজন শাসকের মাথা কেটে ফেলা সহজ। রাবণের কিংবদন্তী মনে করো। তাব দশটা মাথা ছিল। একটা কেটে ফেললে সে জায়গায় আরো একটা গজাত। নীতিটা হল, প্রাণবন্ত এক গণদেবতার উপস্থিতিতে মাথা কেটে ফেলার দরকারই হয় না।[১৮৭]

জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য যে সরকার তা একটি লোকের নির্দেশে চালিত হতে পারে না। সে লোক যত বড় হোক-না-কেন।[১৮৮]

ব্যক্তিগতভাবে গণরোষ বিষয়ে আমি যতটা সজাগ ও সতর্ক থাকি, সরকারি রোষ বিষয়ে ততটা থাকি না। গণরোষ হল, জাতির বদমেজাজের নিদর্শন। আর সরকার তো আইনবলে গঠিত ছোটখাট একটি যৌথ সংস্থা। কাজেই সরকারের তুলনায়, গণরোষের মোকাবিলা করা অনেক কঠিন। উন্মত্ত অচেনা মানুষের এক জনতাকে বাগে আনার চেয়ে শাসন-কাজের অযোগ্য বলে প্রমাণিত এক সরকার উচ্ছেদ করা সহজতর।[১৮৯]

উচ্ছৃঙ্খল-জনতাতন্ত্র

...উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বাগে আনার চেয়ে সহজ কাজ আর কিছু নেই। কারণ এদের মন বলে কোনও পদার্থ নেই। আগে-থাকতে ভাবনাচিন্তা করার বালাই নেই। যা ক রে, সাময়িক উত্তেজনার বশে করে ফেলে। আবার অনুশোচনা করতেও দেরি হয় না।...গণতন্ত্রকে তার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতেই আমি অসহযোগ কাজে লাগাচ্ছি।[১৯০]

...এই বিপুল জনতার হৃদয় সোনার মতো খাঁটি। দেশের জন্য এদের অনুভূতি আছে। এরা শিখতে চায়, চায়, কেউ তাদের পথ দেখাক। এদের আলো দেখানো আমাদের অবশ্যকর্তব্য। তবে এ-জন্য স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিমান, সাচ্চা, স্থানীয় কর্মী দরকার। তাহলেই সমগ্র জাতিকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করার জন্য সংগঠিত করা যাবে। উচ্ছৃঙ্খল জনতাতন্ত্রের

মধ্য থেকেই গণতন্ত্রকে তুলে আনা যাবে।[১৯১]

গণতান্ত্রিক সংগঠনকে যে-কোনও মূল্যে ন্যায্য কাজ করার সাহস দেখাতেই হবে। যে জনগণের দুর্বলতার পক্ষে ওকালতি করে, সে নিজেকে ও জনগণকে অধঃপাতে টেনে নামায়,—তাদের নেতৃত্ব দিয়ে গণতন্ত্রের বদলে উচ্ছৃঙ্খল-জনতাতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়। গণতন্ত্র এবং উচ্ছৃঙ্খল-জনতাতন্ত্রের বিভাজনরেখা প্রায়শ সূক্ষ্ম। কিন্তু তা ইস্পাতের চেয়েও কঠিন ও শক্তিশালী।

সহজ সত্য এটাই যে, একটি নিয়ে যায় জীবনের ও অগ্রগতির পথে, অপরটি সরাসরি মৃত্যুর দিকে। মোদ্দা কথা, আমাদের অধঃপাতের কারণ ভিতরেই খুঁজতে হবে, বাইরে নয়। জাতি হিসাবে আমরা যদি সন্দেহ ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থাকি, তাহলে পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যও আমাদেব নোয়াতে পারবে না। তবে, একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। মূল সত্যগুলি যদি চিনতে পারতাম আমরা সৎ ও ধৈর্যশীল হতাম। ভিতর বা বাহির, যেখান থেকেই আসুক না কেন, সব বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করার যোগ্য হতাম।[১৯২]

সামরিকতাবাদ

...গণতন্ত্রের সঙ্গে সামরিকবাহিনী ও পুলিশ-নির্ভরতা খাপ খায় না। এটা এখানে ভালো, ওখানে খারাপ, একথা তুমি বলতে পারো না। সামরিক সাহায্য তোমাকে হেয় কববে। কোনও গণতন্ত্রে, ভোটদাতারা যদি কোনও গুণ্ডাকে সরকারের মাথায় বসায়, তাহলে হয় তারা স্বখাত সলিলে ডুববে, নয়তো দরকারে সত্যাগ্রহ ক'রে ভোটদাতাদের মত বদল ঘটাবে। এর নাম গণতন্ত্র।[১৯৩]

গণতন্ত্র এবং সামরিক নীতি, আমার কাছে দুটি বিপরীত অর্থবহ শব্দ। রাষ্ট্র দুনিয়ার সামনে সশস্ত্র শক্তি জাহির কবতে পারে কিন্তু তার ওপর কোনও গণতান্ত্রিক নির্ভর করে না। করে, বিশ্বের হিতার্থে তার রাষ্ট্র যে নৈতিক শক্তি পেশ করতে পারে, তাব ওপর।[১৯৪]

সন্ত্রাসবাদের বেদিতে গণন্ত্রের মর্মবাণী প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সে সন্ত্রাসবাদ সরকারেব বা জনগণের যারই হোক-না-কেন। কোনও কোনও দিক থেকে, সরকারি সন্ত্রাসবাদের চেয়েও জনসন্ত্রাসবাদ গণতান্ত্রিক ধারণাবৃদ্ধির প্রতি বেশি মাত্রায় বৈরভাবাপন্ন। সরকাবি সন্ত্রাসবাদ গণতান্ত্রিক ধারণাকে শক্তিশালী করে, জনসন্ত্রাসবাদ তাকে খুন করে।[১৯৫]

গণতন্ত্র ও অহিংসা

গণতন্ত্র ও হিংসা পাশাপাশি চলা দুষ্কর। যে-সব রাজ্য আজকাল নামেমাত্র গণতান্ত্রিক, তারা হয় খোলাখুলি একনায়কতান্ত্রিক হয়ে যাবে, নতুবা, যদি সত্যই গণতান্ত্রিক হতে চায়, সাহসভরে অহিংস হতে হবে। শুধুমাত্র ব্যক্তিমানুষ অহিংস আচরণ করতে পারে, ব্যক্তি নিয়ে গঠিত জাতিগুলি তা পারে না, এ-কথা বলা ঈশ্বরনিন্দার সমতুল।[১৯৬]

প্রকৃত গণতান্ত্রিক তাকেই বলে যে, নিছক অহিংস উপায়ের সাহায্যে তার নিজস্ব স্বাধীনতা, তথা তার দেশের, এবং সবশেষে সকল মানবজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করে।[১৯৭]

প্রকৃত গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ কখনও অসত্য ও সহিংস পথে আসতে পারে না। এর সহজ কারণ, এদের আচরণের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত মতে, বিরোধীদের দমন বা হত্যা করে এরা সকল বিরোধী শক্তিকে সরিয়ে দেবে। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নেই। একমাত্র নির্ভেজাল অহিংস শাসনেই ব্যক্তি স্বাধীনতার পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব।[১৯৮]

গণতন্ত্র বিষয়ে আমার ধারণা অনুযায়ী,—এর অধীনে দুর্বলতমও সর্বাধিক শক্তিমানের সমান সুযোগসুবিধা পাবে। অহিংসা ছাড়া অন্য কোনওভাবে তা ঘটতে পারে না। পৃথিবীর কোনও দেশই আজ দুর্বলের প্রতি পিঠ চাপড়ানোর অতিরিক্ত কোনও সম্মান দেখায় না। ...আজ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যে-ভাবে কাজ করে, তা হল তরলীকৃত নাৎসীবাদ বা ফ্যাসিবাদ। বড়জোর এটি এক অবগুণ্ঠন যা নাৎসী ও ফ্যাসিস্ত সাম্রাজ্যবাদকে লুকিয়ে রাখে ....[১৯৯]

আমি মনে করি যথার্থ গণতন্ত্র শুধুমাত্র অহিংসার ফলপরিণাম।[২০০]

...অহিংসার প্রেরণা ছাড়া যথার্থ গণতন্ত্র সম্ভব নয়।[২০১]

গণতন্ত্র : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যদি ইতিমধ্যে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়ে না-ও থাকে তবু তার সংকট কাল চলছে। গণতন্ত্রের প্রকৃত বিজ্ঞানটি বিবর্ধন করে, স্বীয় যোগ্যতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ দেবার ব্যাপারটি কী ভারতের জন্য সংরক্ষিত হতে পারে না? আজকের এই দুর্নীতি ও কপটতা গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল হওয়া উচিত নয়। গণতন্ত্রের এক সত্য পরীক্ষায় বাধাদানও অনুচিত।[২০২]

আমার মতে, পাশ্চাত্যে চলেছে তথাকথিত গণতন্ত্র। প্রকৃত গণতন্ত্রের বীজ তাতে অবশ্যই নিহিত আছে। তবে তা তখনই অঙ্কুরিত হবে যখন সকল হিংসা দূর হবে। অদৃশ্য হবে। এ দুটি পাশাপশি চলে। বলতে কি অসদাচবণ, হিংসারই সহোদর। ভারতকে যদি (গণতন্ত্রের) যথার্থ চেহারাটি তৈরি করতে হয় তবে হিংসা বা সত্যের সঙ্গে কোনও আপস করা চলবে না।[২০৩]

হিংসা বাদ দিয়েই ভারত যথার্থ গণতন্ত্র রূপায়িত করতে চাইছে। আমাদের হাতিয়ার সত্যাগ্রহ, যার ব্যঞ্জনা চরকা, গ্রামীণ শিল্প, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মাদক দ্রব্য বর্জন ও আমেদাবাদের অনুরূপ অহিংস শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে। এর অর্থ গণ-উদ্যোগ ও গণশিক্ষা। এ-সব কাজ চালাবার জন্য আমাদের বড় বড় কার্যালয় আছে। সেগুলি নিখাদ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের একমাত্র অন্বিষ্ট দীনাতিদীনের সেবা।[২০৪]

৭৩. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

কংগ্রেসের ক্ষয়

কংগ্রেস যখন যুক্তি ও নীতিবোধের জায়গায় গুণ্ডাতন্ত্র আমদানি করবে, তখন তার স্বাভাবিক ও সঙ্গত মৃত্যু হবে।[২০৫]

এর জন্য শুধু দরকার, কংগ্রেস থেকে (গ্রীক পুরাণোক্ত) অজিয়ান আস্তাবল হটানো, অর্থাৎ আবর্জনা সাফ করা। তবে কংগ্রেস কমিটির নেতারা উদাসীন ও অলস থেকে গেলে দুর্নীতির মোকাবিলা করা যাবে না। "লবণ যদি নিজের লোনা-স্বাদ হারায়, কী দিয়ে তাকে লবণাক্ত করা যাবে?"[২০৬]

রোমের পতনের অনেক আগেই তার অধঃপতন শুরু হয়েছিল। দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষার দ্বারা কংগ্রেস পঞ্চাশ বছর লালিত হয়েছে। ক্ষয় ধরার মুহূর্তেই তার পতন ঘটবে না। সময় থাকতে দুর্নীতি দমন করলে তার পতন আদৌ ঘটবে না।[২০৭]

কংগ্রেস ও অহিংসা

কংগ্রেস যদি অহিংসার পথে অবিচল থাকে তাহলে তার প্রভাব কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে। তার একমাত্র পুঁজি নৈতিক কর্তৃত্ব। অন্য যে-কোনও অবস্থানে গেলে অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব ও রক্তপাত অনিবার্য।[২০৮]

তোমার হৃদয়ে অসি, মুখে অহিংসা নাম, শুধু শঠতা নয়, অসততা, কাপুরুষতাও বটে। ব্রিটিশ সরকারের সামনে আমাদের অহিংসা, দুর্বলের অহিংসা। তা না হলে আমাদের নিজেদের মধ্যে এত বিবাদ কেন?

...দুর্বল ও অক্ষমের ছদ্ম অহিংসার চেয়ে বড় নীতিভ্রষ্টতা আর কিছু হয় না। আমাদের মধ্যে যদি সেই প্রয়োজনীয় অহিংসা থাকত তাহলে আমাদেব জনজীবন চূড়ান্ত সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হতো। যত মত, তত রাজনীতিক দলের জায়গা থাকত সেখানে। মতপার্থক্য হতো মনের সুস্থ স্বাধীনতার দ্যোতক,—এটাই জীবনের আইন। রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্র ও বিবাদ থাকত না, যা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতিহীন।[২০৯]

মূল উদ্দেশ্য

কংগ্রেস যদি দুঃসময়ে জনপ্রিয় হবার উপযুক্ত না হতে পারে, তাহলে সে জনপ্রিয়তা হারাবে। যদি বেকার ও ক্ষুধার্তকে কাজ দিতে না পারে, অবমাননা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে না পারে, বা মানুষকে অন্যায়ের মোকাবিলা করতে না শেখাতে পারে, বিপদকালে মানুষকে সহায়তা করতে না পারে, তাহলে কংগ্রেস সুনাম ও জনপ্রিয়তা হারাবে।[২১০]

এক পার্টি

কংগ্রেসে কেবল একটিমাত্র পার্টিই থাকতে পারে অর্থাৎ যারা কংগ্রেসী তাদের—আর কারও নয়। তার মানে এই নয়, কংগ্রেসে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জায়গা নেই। আমি নিষ্প্রাণ একরূপতায় বিশ্বাসী নই। ...সকল মানুষ জন্ম থেকেই সমান ও স্বাধীন,—এটা আক্ষরিক অর্থে প্রকৃতির আইন নয়। ধরা যাক, মেধা বিচারে সকল মানুষ সমান হয়েই জন্মায় কিন্তু সমতার নীতি তখনই যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হবে, যখন উচ্চতর মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের মেধাকে অন্যাদের দাবিয়ে রেখে আত্মোন্নতির কাজে

ব্যবহার না ক'রে, তাদের চেয়ে হৃতভাগ্যদের সেবার ব্যবহার করবে। আজ কংগ্রেসে সব রকমের লোকই আছে...[২১১]

...ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ভাবতে শুরু করেছে যে সবকিছুই তাদের। এক অর্থে এটা সত্য। তার মানে এই নয়, নিয়মশৃঙ্খলার সব বোধ বিসর্জন দিতে হবে। শৃঙ্খলা ও প্রকৃত নম্রতা, কংগ্রেসের লোকের কাছে গর্বের বস্তু হওয়া উচিত।[২১২]

কংগ্রেস দলীয় ষড়যন্ত্রের ঊর্ধ্বে থাকবে। সমগ্র ভারতের কাছে ঐক্য ও সেবাকার্যের প্রতীক হবে।[২১৩]

পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্য

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের প্রাচীনতম জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। অনেক লড়াইয়ের পর অহিংস সংগ্রামের দ্বারা সে স্বাধীনতায় পৌঁছেছে। একে মরতে দেওয়া যায় না। কংগ্রেস মরতে পারে যদি জাতির মৃত্যু ঘটে। যা প্রাণবান তা বাড়ে অথবা মরে যায়। কংগ্রেস রাজনৈতিক মুক্তি এনেছে কিন্তু আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক মুক্তি আনা এখনও বাকি। এ সকল মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। কারণ, এগুলি গঠনমূলক। উত্তেজক বা চমকপ্রদ নয়। সর্বাঙ্গীণ গঠনমূলক কাজ লক্ষ কোটি মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে কর্মশক্তি জাগিয়ে তোলে।

স্বাধীনতার প্রারম্ভিক ও আবশ্যিক অংশটুকু কংগ্রেস পেয়েছে। যা সবচেয়ে কঠিন তা এখনও আসেনি। গণতন্ত্রের সুকঠিন পথে আরোহণ করতে গিয়ে কংগ্রেস অনিবার্যভাবেই কিছু দূষিত অঞ্চল সৃষ্টি করেছে। যা দুর্নীতিতে পৌঁছেছে। এমন সংস্থা তৈরি করেছে যা নামে-মাত্র জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক। এই অবাধ্য আগাছার জঙ্গল থেকে বেরোবার উপায় কী?

গঠন

কংগ্রেসকে তার বিশেষ নামের তালিকা বাদ দিতেই হবে। কখনও যেন তা এক কোটি ছাড়িয়ে না যায়। সবাইকে সনাক্ত করার পক্ষে এক কোটিও যথেষ্ট বেশি। কংগ্রেসের একটি অজ্ঞাত তালিকায় এমন লক্ষ লক্ষ নাম আছে, কোনও দিনই যাদের প্রয়োজন হবে না। দেশের ভোটার তালিকাভুক্ত নারী পুরুষের সঙ্গে কংগ্রেসের তালিকার সঙ্গতি থাকা উচিত। একটিও জাল নাম যাতে না ঢোকে, সাচ্চা নাম একটিও যাতে বাদ না পড়ে, এটা দেখাই হবে কংগ্রেসের কাজ। কংগ্রেসের নিজস্ব তালিকায় নাম থাকবে জাতির একদল সেবকের, যারা সময়ে সময়ে তাদের উপরে ন্যস্ত কাজের দায়িত্ব পালন করবে।

দেশের দুর্ভাগ্য, আপাতত তাদের নিতে হবে শহরবাসীদের মধ্যে থেকে। এদের বেশির ভাগকেই ভারতের গ্রামে থেকে, গ্রামেব কাজ করতে হবে। বাকি কাজের লোক অবশ্যই ক্রমবর্ধমান গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে নিতে হবে।

জনগণের সেবক

আইন মতে যে ভোটদাতাদের নাম তাদের এলাকায় তালিকাভুক্ত হয়েছে, এই সেবকরা আশা করা হচ্ছে, সেখানেই ওদের জন্য কাজ করবে। বহু ব্যক্তি ও দল এদের টানতে চেষ্টা করবে। শ্রেষ্ঠ যে জিতবে সে। এ-ভাবেই কংগ্রেস তার দ্রুত-ক্ষীয়মাণ, অনন্য অবস্থানকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে। এ-ছাড়া অন্য পথ নেই। কিন্তু গতকাল কংগ্রেস তার অজ্ঞাতেই ছিল জাতির সেবক, খুদা-ই-খিদমৎগার, ঈশ্বরের সেবক। এখন কংগ্রেস নিজের ও পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করুক, সে শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেবক, তার বেশিও নয়, কমও নয়। ক্ষমতার জন্য কংগ্রেস যদি এই দৃষ্টিকটু লড়াইয়ে নিজেকে জড়ায় তাহলে একদিন জেগে উঠে দেখবে, সে আর নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কংগ্রেসের একচেটিয়া দখল আর নেই।[২১৪]

*লোকসেবক সংঘ**

দ্বিধাবিভক্ত হলেও ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহায়তা নিয়েই। তবে বর্তমানে কংগ্রেসের যে গঠন ও আকৃতি, অর্থাৎ প্রচারকার্যের মাধ্যম ও পার্লামেন্টের যন্ত্ররূপে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও সে বেঁচে আছে। ভারতের নগর ও শহরের চেয়ে একেবারে পৃথক ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম সামাজিক, নৈতিক ও আর্থনীতিক মুক্তি আজও পায়নি। গণতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে ভারতের অগ্রগতিকালে, সামরিক শক্তির চেয়ে অসামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার লড়াই ঘটতে বাধ্য। এ লড়াইকে রাজনৈতিক দল ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে অসুস্থ প্রতিযোগিতার বাইরে রাখতে হবে। এইসব, এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণে, 'অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি' সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, বর্তমান কংগ্রেস সংগঠন ভেঙে দেবে এবং নবজীবন লাভ করবে 'লোকসেবক সংঘ'রূপে। এই সংঘ গড়ে উঠবে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে,—তার ক্ষমতা থাকবে প্রয়োজনানুসারে নিয়ম পালটাবার।

পঞ্চায়েত

পাঁচ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ, যারা গ্রামবাসী বা গ্রামমনস্ক,—এদের নিয়ে প্রতিটি পঞ্চায়েত একটি ইউনিট গড়বে। সন্নিকটবর্তী অনুরূপ দুটি পঞ্চায়েত, নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এক নেতার অধীনে গড়বে এক কার্যানির্বাহী দল।

যখন এইরকম একশো পঞ্চায়েত গড়া হবে, পঞ্চাশজন প্রথম স্তরের নেতা, নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচন করবেন এক দ্বিতীয় স্তরের নেতা। এই প্রথম স্তরভুক্ত নেতারা কাজ করবেন দ্বিতীয় স্তরভুক্ত নেতার অধীনে। অনুরূপ দুই শত পঞ্চায়েত-দল গড়ার কাজ চলবে, যতক্ষণ না সমগ্র ভারত এর আওতায় আসে। প্রতি পরবর্তী পঞ্চায়েত-দল

* এক রূপান্তরিত কংগ্রেস বিষয়ে গান্ধীজির ভাবনা 'তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র'-এই শিরোনামে 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় স্তরভুক্ত নেতা নির্বাচন করে চলবে। সকল দ্বিতীয় স্তরভুক্ত নেতা যুক্তভাবে সমগ্র ভারতের জন্য এবং বিচ্ছিন্নভাবে স্ব-স্ব এলাকার জন্য কাজ করবে। দ্বিতীয় স্তরভুক্ত নেতারা দরকার বুঝলে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন,—যিনি খুশিমতো প্রতিটি দলকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, আদেশ দেবেন।

যেহেতু প্রদেশ ও জেলা গঠনের ব্যাপারটি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, তাই এই সেবকদলকে প্রদেশ বা জেলা-পরিষদে ভাগ করার চেষ্টা হয়নি। সমগ্র ভারতের উপর অধিকার ন্যস্ত করা হয়েছে সেই-সব দল বা দলসমূহের উপর—যা, যে-কোনও সময় গঠিত হবে। লক্ষণীয়, এই সেবকদল তাদের প্রভু, সমগ্র ভারতকে বিচক্ষণতায়, বিনা আপত্তিতে সেবা করার জন্য প্রভুর কাছে থেকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পাচ্ছে।

কর্মীদের গুণাবলী

১. প্রতি কর্মীকে খাদিব্যবহারকারী হতে হবে, এই খাদি তার নিজের কাটা সুতোয় তৈরি, বা এ. আই. এস. এ কর্তৃত্ব শংসাপত্র-দত্ত। সে অবশ্যই মদ্যপায়ী হবে না। হিন্দু হলে তাকে তার নিজের বা পরিবারের অস্পৃশ্যতাবোধ শপথ নিয়ে ত্যাগ করতে হবে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্য, সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা, জাতি-ধর্ম, পুরুষ বা নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকে সমান সুযোগ ও পদমর্যাদা প্রাপ্তির আদর্শে তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

২. তার অধিকাবভুক্ত এলাকার প্রতি গ্রামবাসীর সঙ্গে তাকে ব্যক্তিগত সংযোগ রাখতে হবে।

৩. গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে সে কর্মীদের নাম তালিকাভুক্ত করবে, এদেব প্রশিক্ষণ দেবে, সব কিছু লিখে রাখবে রেজিস্টারে।

৪. নিজের প্রাত্যহিক কাজের হিসেব লিখে রাখবে।

৫. গ্রামাবাসীদের সংগঠিত করবে যাতে তারা আত্মতৃপ্ত ও স্বয়ম্ভর হয় তাদের কৃষি ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে।

৬. স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সে গ্রামবাসীকে শিক্ষা দেবে। অস্বাস্থ্য ও রোগ নিবারণের সকল উদ্যোগ নেবে।

৭. হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের নীতির সংঙ্গে সংগতিপূর্ণ 'নয়ী তালিম' অনুসারে সে গ্রামবাসীদের আজীবন শিক্ষার কাজ সংগঠিত করবে।

৮. সে দেখবে, কাদের নাম সংবিধিবদ্ধ ভোটার তালিকায় নেই। এবং সে-সব নাম তালিকাভুক্ত করবে।

৯. যারা এখনও ভোটাধিকারের আইনী যোগ্যতা পায়নি, তারা যাতে তা পায়, সে জন্য সে উৎসাহ দেবে।

১০. উপরোক্ত সকল উদ্দেশ্য এবং সময়ে সময়ে তাতে যা যা যুক্ত হবে, সে-সব বিষয়ে সে নিজেকে সংঘ-নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী প্রশিক্ষিত ও যোগ্য করে তুলবে যাতে ঠিকভাবে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে।

গঠনমূলক বিভিন্ন সংগঠন

নিম্নলিখিত স্বয়ংশাসিত সংগঠনগুলি সংঘের সংবদ্ধ হবে:

১. এ. আই. এস. এ,
২. এ. আই. ভি. আই. এ,
৩. হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ,
৪. হরিজন সেবা সংঘ,
৫. গো-সেবা সংঘ।

আর্থিক সংস্থান

উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংঘ গ্রামবাসী ও অন্যাদের কাছ থেকে টাকা তুলবে। বিশেষ জোর দেবে গরিবের কাছ থেকে এক পয়সা সংগ্রহের ওপর।[২১৫]

৭৪. জনপ্রিয় বিভিন্ন মন্ত্রক

মন্ত্রক সৃজন

তুষ্টিবিধানের স্বার্থে মন্ত্রিপদ তৈবি করা একেবারে অন্যায় হবে। আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম এবং অমন দাবি নিয়ে আমাকে যদি পীড়াপীড়ি করা হতো তাহলে আমার নির্বাচকদের বলতাম, অন্য নেতা নির্বাচন করতে। এ-সব পদকে হালকাভাবে নিতে হয়, আঁকড়ে ধরতে হয় না। ওগুলি কাঁটার মুকুট, যশের নয়। অন্তত তাই হওয়া উচিত। আমাদের অভীষ্টে পৌঁছবার গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদেব যোগ্য করে তুলছে কি না, তা দেখার জন্যই এ-সব পদ গ্রহণ করতে হয়।

স্বার্থান্বেষী বা পথভ্রষ্ট ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের যদি প্রধানমন্ত্রীদের ঘাড়ে চাপতে, এবং তৎ দ্বারা অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া হয় তাহলে সে বড় মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। যারা শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীদের কর্তৃত্বভার দেবে, তাদের কাছ থেকে আশ্বাসপ্রাপ্তি যদি জরুরি হয়, তাহলে এর চেয়ে দ্বিগুণ প্রয়োজন হল বোধশক্তি, সন্দেহাতীত বিশ্বস্ততা ও স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলা মেনে নেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস পাওয়া।

এবং শেষত, চূড়ান্ত প্রকৃতি-পরীক্ষা হল, যে-দল প্রধানমন্ত্রীদের নির্বাচন করে, সেই দলীয় সদস্যাদের (মন্ত্রী) এই নির্বাচন পছন্দ হল কি না। কোনও প্রধানমন্ত্রী মুহূর্তের জন্যও তার পছন্দের কোনও নারী বা পুরুষকে দলের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। তাঁর দক্ষতা, মানুষ-চেনা ও অন্যান্য গুণাবলী বিষয়ে দলের পূর্ণ বিশ্বাস তাঁর ওপরে আছে বলেই তিনি প্রধান। এ সকল গুণই একজনকে নেতা হবার যোগ্য করে।[২১৬]

কংগ্রেসের মন্ত্রী এবং বিধায়কদের স্ব-কর্তব্য সম্পাদনে নির্ভীক হতে হবে। তাদের আসন বা পদ চলে যাবার ঝুঁকির ব্যাপারে তারা সর্বদা তৈরি থাকবে। কংগ্রেসের মর্যাদা

ও ক্ষমতা বাড়ানোর দক্ষতার বাইরে বিধানসভায় পদ ও আসনগুলির অন্য কোনও গুণ নেই। দুটোই যেহেতু প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত নৈতিকতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, তাই যে-কোনও নৈতিক বিচ্যুতি মানেই কংগ্রেসকে একটি আঘাত। অহিংসার আবশ্যিক তাৎপর্য এখানেই।[২১৭]

একজন মন্ত্রী নিঃসন্দেহে তার দলকে এগিয়ে নেয়, কিন্তু সমগ্র জাতির বিনিময়ে কখনওই তা হতে পারে না। বলতে কি, সে কংগ্রেসকে যতটা, জাতিকেও ততটুকুই এগিয়ে দেয়। কেননা সে জানে, বিদেশী শাসকের সঙ্গে লড়বার অসি যদি তার না থাকে, তাহলে জাতির মধ্যে যারা প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের সঙ্গে লড়বার কৃপাণও নেই। পরিষদেই সকল সম্প্রদায় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মিলিত হয়। এ-হল সেই জায়গা যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মন জয় করে সে এমন সব (কাজের) অনুমোদন লাভ করতে পারে যা অপ্রতিরোধ্য। যে সকল সমস্যা ব্যবস্থাবদ্ধ সমাজকে পীড়িত করে,—যেমন সাম্প্রদায়িক ঐক্য, তার মীমাংসা সম্ভব যদি পরিষদকে...প্রশ্ন সমাধানের হাতিয়ার হিসাবে দেখা হয়...[২১৮]

সারল্যের মধ্যে এক সৌন্দর্য ও শিল্প আছে, তা নির্বাচনে যে দাঁড়ায়, তার চোখে ধরা পড়ে। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও মর্যাদাবান হতে পয়সা লাগে না। আড়ম্বর ও জাঁকজমক অধিকাংশ সময়েই কুরুচির সমার্থক।[২১৯]

মন্ত্রীত্বের এই পদ, হয় বৃহত্তর সম্মান নয় তার সম্পূর্ণ বিলোপের দিকে একটি পদক্ষেপ। সম্মান যদি পুরোপুরি খোয়াতে না চায়, তাহলে মন্ত্রী ও বিধায়কদের প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত আচরণ বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। সিজারের পত্নীর মতো তাদেরও সর্বদা সর্বক্ষেত্রে সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে।

নিজেদের বা আত্মীয় বা বন্ধুদের জন্য তারা ব্যক্তিগত সুবিধালাভ করতে পারবে না। যদি আত্মীয়রা বা বন্ধুরা চাকরি পায়, তবে তা প্রার্থীদের মধ্যে সেরা বলেই তারা পাবে। সরকারি কাজে তারা যা পাবে, তা থেকে তাদের বাজারদর সব সময়েই বেশি।[২২০]

মন্ত্রীদের আচরণবিধি

কংগ্রেস সরকারে কোনও পদে আসীন থাকার পিছনে ব্যক্তিগত লাভের কোনও আশা থাকবে না, থাকবে সেবার মনোভাব।[২২১]

কংগ্রেস যদি জনগণের সংগঠন হিসেবে চলতে চায়, তাহলে মন্ত্রীদের "সাহিব লোগ"দের মতো জীবনযাপন চলতে পারে না। সরকার কর্তৃত্ব সরকারি কর্তব্য বলে প্রদত্ত কাজকে ব্যক্তিগত সুবিধার কাজে ব্যবহার করা চলবে না।[২২২]

মন্ত্রীদের (প্রকাশ্য সমালোচনা বিষয়ে) স্পর্শকাতর হলে চলবে না। তারা রূঢ় সমালোচনাও ভালোভাবে নেবে...সরলতা, সাহস, সততা ও শ্রম—এ-সব বিষয়ে অন্যদের কাছে সমালোচকদের প্রত্যাশা যতখানি, এই নির্বাচিত জনসেবকদের কাছে প্রত্যাশা তার চেয়ে অনেক বেশি।[২২৩]

আমাদের মন্ত্রীরা জনতার লোক, জনগণ থেকেই তারা এসেছে। যে-সব প্রাজ্ঞজন মন্ত্রীয় চেয়ারে বসে নেই, তাদের চেয়ে তারা বেশি জ্ঞানী, এমন অহংকার যেন তাদের না হয়।[২২৪]

সরকারের বল্গা এবং লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের দায়িত্ব নেতাদের হাতে। তাদের সজাগ থাকতে হবে। তারা অবশ্যই বিনয়ী হবে। কথা না রাখলে সাধারণ মানুষ প্রায়শ কিছু মনে করে না। নেতারা যে-কাজ করতে পারবে না, তার প্রতিশ্রুতি যেন কখনও না দেয়। একবার প্রতিশ্রুতি দিলে, যে-ভাবেই হোক সে-কথা রাখতে হবে।[২২৫]

মন্ত্রীরা (জনগণের) সেবক। মানুষের ব্যক্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে পারে না। মানুষ যতদিন চায়, তার চেয়ে বেশি একদিনও তারা আসন দখল করে থাকবে না।[২২৬]

বিধানপরিষদ

বিধানসভার উপাযোগিতা কী, দেখা যাক। বিধানসভা সরকারের মুখোশ খুলে দিতে পারে। কিন্তু এটা তার ন্যূনতম কাজ। সরকারের দোষত্রুটি জানা সত্ত্বেও কেন তারা সরকারের শিকার হয়, এ-কথা যে জনগণকে বলতে পারে, এবং সরকারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেমন করে উঠে দাঁড়াবে তা যে শিখাতে পারে, সে যথার্থই কাজের কাজ করে। সদস্যরা এই দরকারি কাজটি করতে পারেন না। কেননা, তাঁদের কাজ হল, অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য মানুষ যাতে তাদেরই দ্বারস্থ হয়, তা দেখা।

এই সভার আর এক উপযোগিতা হল, অবাঞ্ছিত আইন প্রণয়ন বন্ধ করা এবং এমন আইন আনা, যা জনগণের কাজে লাগবে। যাতে গঠনমূলক কার্যসূচীতে যতদূর সম্ভব সহায়তা করা যায়।

বিধানসভা জনতার অভিপ্রায় রূপদান করবে—এটাই বাঞ্ছিত। এ সভায় বাগ্মিতার দ্বারা সাময়িকভাবে কিছু কাজ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত, তার কোনও দরকার হবে না। বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন অভিজ্ঞরা, এবং ওই ক'জনকে যারা সমর্থন করবে, তারাই দরকারে লাগবে। যে সংগঠন টিকে আছে সেবাকার্যের জন্য, এবং যা খেতাব ও অনুরূপ তুচ্ছ সব জিনিসকে বর্জন করেছে, সেখানে, বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়া সম্মানের চিহ্ন, এ মনোভাব ক্ষতিকারক। এমন মনোভাব শিকড় গেড়ে বসলে তা কংগ্রেসের নাম নিচে টেনে নামাবে। শেষ অবধি তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

কংগ্রেসীদের যদি অমন অধঃপতন হয় তাহলে কারা ভারতের লক্ষ লক্ষ কঙ্কালে রক্ত মাংস জোগাবে? কার ওপর ভরসা রাখবে ভারত এবং বিশ্ব?[২২৭]

এক জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ। পরিষদের সম্মতি ব্যতীত সে কিছুই করতে পারে না। এক জনপ্রিয় পরিষদে নির্বাচিত প্রতিটি সদস্য ভোটদাতার কাছে দায়িত্ববদ্ধ। তাই, জনগণের প্রতিনিধি ভোটদাতার উচিত তারই সৃষ্ট সরকারের সমালোচনা করার আগে ভালো করে ভেবে দেখা।

এ ছাড়াও, মানুষের একটি বদভ্যাস মনে রাখা উচিত। মানুষ কর আদৌ পছন্দ করে না। যেখানে ভালো সরকার আছে, সেখানে করদাতা তার টাকার সম্পূর্ণ প্রতিদান পায়। যেমন, নগরে জল-কর। ওই টাকা দিয়ে কোনও করদাতা নিজে জল পেতে পারত না। তথাপি, জনতার অভিপ্রায়ে কর ধার্য করা হলেও, করদাতারা অনুরূপ কর দিতে হলে সমানে গাঁইগুঁই করে।

এটা অবশ্য সত্য যে, আমি যে করের উদাহরণ দিলাম, তার মতো অত সহজে সব রকম করের উপকারিতা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সমাজ যেমন আকারে ও জটিলতায় বড় হতে থাকে, কর্মক্ষেত্রেও তেমনি বৃদ্ধি পায়। আলাদা ক'বে একজন করদাতাকে বোঝানো মুশকিল, সে কোনও এক বিশেষ করের প্রতিদান কেমন করে পাচ্ছে। এটা অবশ্য পরিষ্কার যে গোটা কর-ব্যবস্থাই সমাজের উপকারসাধনের জন্য হওয়া উচিত। তা যদি না হতো, তবে জনতার অভিপ্রায়ে কর ধার্য হয়, এ যুক্তি টিকত না।[২২৮]

৭৫. আমার স্বপ্নের ভারত

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং অহিংস উপায় তথা নির্ভেজাল আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে ভারত যথার্থ স্বাধীনতা ও আত্মব্যঞ্জনা খুঁজে পেয়েছে, সে বর্তমান অন্ধকার থেকে বেরোবার পথনির্দেশ দিতে পারে।[২২৯]

যদি জনতার কণ্ঠস্বর, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর হয়, তবে তাকে সততা, সাহস, কোমলতা, বিনয় ও সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের কণ্ঠস্বর হতে হবে।[২৩০]

আমি বিশ্বাস করি, কিছুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। মানবপ্রকৃতি হয় ওপরে ওঠে, নয় নিচে নামে। আশা করা যাক, ভারতে তা ঊর্ধ্বগ। নইলে প্রলয় ব্যতীত ভারতের ললাটে এবং সম্ভবত গোটা পৃথিবীর ললাটে আর কিছু থাকবে না...

স্বাধীন ভারত পৃথিবীকে কি শান্তির শিক্ষা দেবে, না, বিদ্বেষ ও হিংসার, যার জন্য পৃথিবী ইতিমধ্যেই মুমূর্ষু ?[২৩১]

সমগ্র ভাবত যদি এই ভালবাসার শাশ্বত আইন মেনে নিত তাহলে সে সমগ্র পৃথিবীর অবিসংবাদী নেতা হতো... আমি শুধু বলতে চাই, যুক্তি ব্যতীত আর কারও কাছে নতিস্বীকার নয়।[২৩২]

নতুন ভারত

আমার একমাত্র আশা ও প্রার্থনা....(যে এখানে) গড়ে উঠুক এক নতুন ও তেজস্বী ভারতবর্ষ, সামরিকতায় তৎপর থেকে বা নীচভাবে পাশ্চাত্য এবং তার সমস্ত কুশ্রীতাকে অনুকরণ করে নয়, কিন্তু এক নতুন ভারত, পশ্চিমের যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করে, যা তৈরি করবে আশা-আকাঙ্ক্ষা, কেবলমাত্র এশিয়া বা অফ্রিকায় নয়, সমস্ত বেদনার্ত পৃথিবীতে।

স্বীকার করি, এ বড় বেশি আশা করা হচ্ছে। কেননা আজ আমরা সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য নগ্ন দৈহিক শক্তি দ্বারা বেষ্টিত...এই উন্মত্ততা, পশ্চিমের এই বৃথা অনুকরণ সত্ত্বেও আমার, ও বহুজনের আশা, ভারত এই মৃত্যুর উল্লাস জয় করে টিকে থাকবে। ১৯১৫ সাল থেকে লাগাতার বত্রিশ বছর সময়কাল ধরে ভারত অহিংসার যে তালিম

পেয়েছে, তা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, ভারত সেই নৈতিক উচ্চাসন অধিকার করবে, যা তারই প্রাপ্য।[২৩৩]

'পৃথিবীতে স্বর্গ'

১৮৯৬ সালে যখন দিল্লি ও আগ্রা ফোর্ট দেখতে যাই, তখন কোথায় যেন এক প্রবেশদ্বারের ওপর লিখিত একটি কবিতা পড়েছিলাম। কোথায়, তা ভুলে গেছি। কবিতাটি তর্জমা করলে এ-রকম দাঁড়ায়, "পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তা এখানে আছে, এখানে, এখানেই।" সেই দুর্গ, তার সকল চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও, আমার হিসাবে কোনও স্বর্গ নয়। তবে আমি খুশি হব, যদি দেখি ন্যায্যভাবেই কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে পাকিস্তানের সবকটি প্রবেশদ্বারে। ভারত বা পাকিস্তান যেখানেই হোক, ওই স্বর্গে কাঙাল বা ভিখারি থাকবে না, উচ্চ-নীচ থাকবে না। কোটিপতি মালিক ও অর্ধাশনরত চাকুরিয়া থাকবে না। উত্তেজক পানীয় বা মাদকদ্রব্য থাকবে না। পুরুষদের জন্য যেমন, নারীর জন্যও তেমনি সমান মর্যাদা থাকবে। নারীপুরুষের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা কঠোরভাবে রক্ষা করা হবে। সেখানে নিজের পত্নী ব্যতীত বাকি সকল নারীকে, তার বয়স অনুযায়ী সকল ধর্মের পুরুষ মা, বোন, বা মেয়ে হিসেবে দেখবে। কোনও অস্পৃশ্যতা থাকবে না সেখানে। সকল ধর্মবিশ্বাস সমান সম্মান পাবে। সেখানে সবাই সগর্বে, সানন্দে, স্বেচ্ছায়, রুটির জন্য মেহনত করবে।[২৩৪]

৭৬. গ্রামে প্রত্যাবর্তন

প্রকৃত ভারত

গুটিকয়েক শহরে নয়, ভারতকে খুঁজে নিতে হবে তার সাত লক্ষ গ্রামে। আমার এ-বিশ্বাসের কথা আমি অসংখ্যবার বলেছি। আমরা শহরবাসীরা মনে করি, ভারতের খোঁজ মিলবে শহরে। আর গ্রামের সৃষ্টি আমাদের চাহিদা মেটাবার জন্য। ওই গরিবরা প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র পায় কি না, রোদবৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ওদের মাথার ওপর ছাদ আছে কি না—আমরা এক পলকের জন্যেও তা ভাবি না।[২৩৫]

আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এযাবৎ হাজার হাজার গ্রামবাসী মারা পড়েছে। এখন ওরা যাতে বাঁচতে পারে সে জন্য আমাদের মরতে হতে পারে। এর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গ্রামবাসীরা মরেছে অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছায়। তাদের বাধ্যতামূলক আত্মবিসর্জন আমাদের হতমান করেছে। এখন আমরা যদি জেনেশুনে মরি, তাহলে এ আত্মত্যাগ আমাদের ও সমগ্র জাতিকে মহীয়ান করবে। যদি এক স্বাধীন, আত্মসম্মানী জাতি হিসেবে বাঁচতে চাই, তবে এই আবশ্যিক আত্মত্যাগে আমরা যেন পরাঙ্মুখ না হই।[২৩৬]

গ্রাম ও শহর

শহরগুলি নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম। আমাদের ফিরতে হবে গ্রামের দিকে। তাদের সংস্কার, কুসংস্কার, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির গ্লানি থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। ওদের মধ্যে থেকে, ওদের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, শিক্ষা ও সারবান তথ্য সরবরাহ করে, তবেই এ কাজ করা যাবে, অন্যভাবে নয়।[২৩৭]

দেখেছি, শহরবাসী সাধারণত গ্রামাবাসীকে শোষণ করে। সত্যি বলতে কি, গরিব গ্রামবাসীর জীবিকা নির্ভর করেই সে বাঁচে। ভারতের মানুষের অবস্থা নিয়ে অনেক ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তি লিখেছেন। আমার যতদূর জানা আছে, কেউ একথা বলেননি যে, ভারতীয় গ্রামবাসীব, কষ্টেসৃষ্টে জীবনধারণের মতো যথেষ্ট সংগতি আছে। ঠিক এর বিপরীতে তাঁবা স্বীকার করেছেন, জনগণের অধিকাংশই প্রায় অনাহারে এবং শতকরা দশজন অর্ধাহারে থাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে এক চিমটি নোংরা লবণ ও কিছু লঙ্কা, চালের খুদ ও শুকনো শস্য খেয়েই খুশি থাকতে হয়।

তুমি নিশ্চিত জেনো, আমাদের মধ্যে কাউকে ওই পরিমাণ খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে বললে, আমরা মাস খানেকের বেশি বাঁচব অমন ভবসা নেই। অথবা বাঁচলেও মানসিক ভাবসাম্য হারিয়ে ফেলব। তবু, আমাদের গ্রামবাসীরা দিনের পর দিন ওই অবস্থাতেই থাকে।[২৩৮]

কৃষিজীবী

যে মুহূর্তে ওদের (ভারতীয় কৃষকদের) সঙ্গে কথা বলবে, যেই ওরা কথা বলতে শুরু করবে, দেখবে ওরা কত জ্ঞানের কথা বলছে। ওই হতশ্রী বহিবঙ্গের পিছনে আছে আধ্যাত্মিকতার এক বিশাল সঞ্চয়। একেই আমি বলি সংস্কৃতি। পশ্চিমে তুমি এ-জিনিস খুঁজে পাবে না। কোনও ইউরোপীয় কৃষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করো,—দেখবে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই।

ভাবতীয় কৃষকের ক্ষেত্রে এক প্রাচীন সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে ওই অমার্জিত বহিরাবরণের নিচে। বহিরাবরণ খুলে ফেল, ওব লাগাতার দারিদ্র ঘুচিয়ে দাও, ওর নিরক্ষরতা দূর করো,—দেখতে পাবে এক সংস্কৃতিমান উৎকর্ষসম্পন্ন, স্বাধীন নাগরিকের সুন্দরতম নিদর্শন।[২৩৯]

জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কৃষিজীবী। ....কিন্তু আমরা যদি ওদের শ্রমের ফসলের সবটাই কেড়ে নিই বা অন্যদের নিতে দিই, তাহলে বলতে হবে আমাদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ধারণা বলতে কিছু নেই।[২৪০]

শহর যদি উপলব্ধি করে, স্বার্থপরের মতো গ্রামকে শোষণ করার বদলে, গ্রাম থেকে যে প্রাণশক্তি ও ভরণপোষণ সে আহরণ করে তার উপযুক্ত প্রতিদান গ্রামকে দেওয়া তাব কর্তব্য, তাহলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে এক সুস্থ ও নৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সমাজ পুনর্গঠনের উদার ও মহান কাজে শহরের বালকবালিকাকে যদি অংশ নিতে

হয়, তাহলে যে-সব মাধ্যম দ্বারা তারা শিক্ষা পাবে সেই মাধ্যমগুলি সরাসরি গ্রামের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া দরকার।[২৪১]

আমি মনে করি, শহরের সম্প্রসারণ অনিষ্টকর ব্যাপার। তা মানবতা ও বিশ্বের পক্ষে, ইংল্যাণ্ডের পক্ষে, অবশ্যই ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। ভারতের নগরগুলির মাধ্যমেই ব্রিটিশ ভারতকে শোষণ করেছে। শহরগুলি শোষণ করেছে গ্রামগুলিকে। গ্রামের রক্ত হল ওই সিমেন্ট, যা দিয়ে শহরে সৌধ গড়ে ওঠে। শহরের ধমনীকে যে রক্ত স্ফীত করছে, আমি চাই, সে রক্ত আবার গ্রামের রক্তবাহী শিরায় বহে চলুক।[২৪২]

....আমি জানি, নির্মল চিন্তাভিত্তিক নিষ্কলুষ কাজে ভারতকে যদি নেতৃত্ব দিতে হয়, তাহলে ঈশ্বর বিজ্ঞজনের প্রজ্ঞা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন....এবং গ্রামকে ক্ষমতা জোগাবেন যাতে তারা ঠিক মতো নিজেদের কথা বলতে পারে।[২৪৩]

ভারত গ্রাম নিয়ে গঠিত। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীরা গ্রামকে অবহেলা করেছে....গ্রামজীবন যেন কখনওই নগরজীবনের নকল বা লেজুড় না হয়ে ওঠে। নগরকেই গ্রামজীবনের আদল গ্রহণ করতে হবে, গ্রামকে বাঁচাতে হবে।[২৪৪]

আমাদের কর্তব্য

প্রখর রোদের হানায় ন্যুব্জ পৃষ্ঠে যে গ্রামবাসীরা কাজ করে তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্ম হতেই হবে। তাহলেই আমরা দেখব, ওরা যে পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, যাতে ওদের গোকমহিষ জল পান করে সে পুকুরের জল খেতে আমাদের কত না ভালো লাগবে! তখন, একমাত্র তখনই আমরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করব। আর, ওরা প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দেবে। এ-কথা আমার এই লেখার মতোই নিশ্চিত।[২৪৫]

আমাদের আদর্শ গ্রামবাসী হতে হবে। তবে, গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা নিয়ে বা কোনও ধারণা না নিয়ে, কি খাচ্ছে, কেমন করে খাচ্ছে সে বিষয়ে চিন্তা না করে এখন যে-ভাবে বেঁচে আছে সে-ভাবে থাকলে চলবে না। আমরা ওদের মতো যা-হোক একটা পাক করে, যে-ভাবে হোক গলাধঃকরণ করে, যেমন-তেমন ভাবে বেঁচে থাকব না। চলো, ওদের আমরা দেখাই আদর্শ খাদ্য কী। শুধু পছন্দ-অপছন্দ বিচার করে নয়, এ-সব পছন্দ-অপছন্দের শিকড়ে পৌঁছনো যাক.....

ওদের দেখাতে হবে, নিজেদের জন্য শাকসব্জি, আনাজপাতি ওরা কম খরচেই ফলাতে পারে, স্বাস্থ্যও ভালো রাখতে পারে। এ-ও দেখাতে হবে, শাকপাতা রাঁধার সময়েই তার খাদ্যগুণ বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে যায়....

ওদের শেখাতে হবে কেমন করে সময়, স্বাস্থ্য ও পয়সা বাঁচানো যায়..... লায়োনেল কার্টিস আমাদের গ্রামগুলিকে জঞ্জালের গাদা বলেছেন। ওগুলিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করতে হবে। ওদের চারদিকে তাজা বাতাস, তবু আমাদের গ্রামবাসীরা নির্মল বাতাস পায় না। চারদিকে টাটকা খাবার, কিন্তু ওরা তা খেতে পায় না। খাবারের প্রসঙ্গে আমি 'মিশনারীদের' মতো কথা বলছি, কেন না আমার 'মিশন' হল, গ্রামগুলিকে সুন্দর করে তোলা।[২৪৬]

একমাত্র পথ ওদের জমাদার, ওদের ধাত্রী, ওদের ভৃত্য হিসেবে ওদের মধ্যে থেকে অটলবিশ্বাসে কাজ করে চলা। ওদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকলে চলবে না। আমাদের সংস্কার ও পূর্বধারণাগুলি ভুলে যেতে হবে। নিমেষের জন্য ভুলে যেতে হবে স্বরাজকেও। অবশ্যই ভুলতে হবে যাদের "আছে" তাদের। তাদের উপস্থিতি আমাদের পদে পদে ভারাক্রান্ত করে। ওরা আছে। অনেকেই আছে যারা সব বড় বড় সমস্যার মোকাবিলা করছে। চলো, আমরা গ্রামের সামান্য কাজটা করি। এ-কাজ এখন প্রয়োজন। আর আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার পরেও সমান প্রয়োজনীয় থাকবে। সত্যি বলতে কি, গ্রামের কাজে সাফল্য, আমাদের লক্ষ্যেব আরও কাছে নিয়ে যাবে।[২৪৭]

গ্রামীণ আন্দোলন

গ্রামীণ আন্দোলন গ্রামবাসীদের কাছে যেমন একটা শিক্ষা, শহরবাসীর কাছেও তাই। শহর থেকে আনীত কর্মীদের গ্রামীণ মানসিকতা অর্জন করতে হবে, গ্রামবাসীদের অনুসরণে বাঁচার শিল্প শিখতে হবে। তার মানে এই নয়, গ্রামবাসীদের মতো তাদের উপোস করতে হবে। এর মানে, পুরনো কেতার জীবন-ধারায় এক আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।[২৪৮]

আমার (স্বাধীনতার চিত্রে) গ্রামীণ সম্প্রদায় একটি ইউনিট। গ্রাম ইউনিটে স্বাধীনতার বৃহৎ অট্টালিকা গড়তে হবে না। তাতে উপরেব চাপ পডবে নিচে। ভিত্তিভূমি, সেই চল্লিশ কোটি মানুষ পিষে যাবে...

আমার কল্পনার গ্রাম ইউনিট সবচেয়ে শক্তিশালীর মতোই বলবান। আমার কল্পিত গ্রামে ১০০০ বাসিন্দা। স্বয়ম্ভবতার ভিত্তিতে সুসংগঠিত হলে এমন এক ইউনিট ভালো কাজের পরিচয় দেবে।[২৪৯]

নিজেদের হাতকে কেমন করে কাজে লাগাতে হয়, তা আমরা ভুলে যাচ্ছি। এটা খুবই বিপজ্জনক। কেমন করে মাটি খুঁড়তে হয়, জমির যত্ন করতে হয় তা ভুলে যাওয়া মানে নিজেদের ভুলে যাওয়া। যদি ভাবো, শুধু শহরের সেবা করলেই মন্ত্রীর চেয়ারে বসা সার্থক হবে, তাহলে সে হবে, যথার্থ ভারকে ভুলে যাওয়া, যে ভারতে বাস করে তার ৭,০০,০০০ গ্রাম-ইউনিটে। কোনও মানুষ হয়তো দুনিয়া জিতে নিল। কিন্তু নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলল। তাহলে তার লাভ কী হল?[২৫০]

৭৭. সর্বতোভাবে গ্রামের সেবা

৭,০০,০০০ গ্রামের মধ্যে আছে সত্যকার ভারত। ভারতীয় সভ্যতাকে যদি এক সুস্থিত বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পূর্ণ অবদান রাখতে হয়, এই বিশাল মানবপুঞ্জকে...আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে।[২৫১]

যে তিনটি ব্যাধি আমাদের গ্রামগুলিকে তার বজ্রমুঠিতে ধরে রেখেছে তার মোকাবিলা করতে হবে। যথা; ১. যৌথ স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাব; ২. পুষ্টিহীন খাদ্য; ৩. নিশ্চেষ্টতা...। ওরা (গ্রামবাসীরা) নিজেদের কল্যাণে আগ্রহী নয়। তারা আধুনিক স্বাস্থ্যবিধির মূল্য বোঝে না। যে শ্রমে অভ্যস্ত, যথা জমি চাষ করা, তাই নিয়ে পড়ে থাকে। এর বাইরে কিছু করতে চায় না। এগুলি বাস্তব অসুবিধা এবং গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমাদের এতে দমে গেলে চলবে না।

নিজ লক্ষ্যের প্রতি অনির্বাণ বিশ্বাস রাখতে হবে। মানুষের সঙ্গে আচরণে ধৈর্যশীল হতে হবে। গ্রামের কাজে আমরা নবশিক্ষার্থী। এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির সঙ্গে যুঝতে হবে। যদি ধৈর্য ও অধ্যবসায় থাকে, আমরা পাহাড়-সমান বাধাকেও জয় করতে পারব। রোগীদের অনারোগ্য ব্যাধি থাকলেও নার্সরা রোগী ছেড়ে যেতে পারে না। ওদের মতো হতে হবে আমাদের।[২০২]

যারা শিক্ষার সুফল পেয়েছে তাদের দীর্ঘ অবহেলার ফলে গ্রামগুলির এ দুঃখভোগ—তারা শহরের জীবন বেছে নিয়েছে। যারা সেবাকার্যের প্রেরণাদীপ্ত, তাদের গ্রামে বসত করিয়ে গ্রামবাসীদের সেবার মধ্যে আত্মপ্রকাশ খুঁজে পাবার পথ করে দিয়ে গ্রামেব সঙ্গে সুস্থ যোগাযোগ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাই হল গ্রামীণ আন্দোলন...

যারা সেবার প্রেরণা থেকে গ্রামে বসবাস কবছে, সামনের বাধা তাদের নিরুদ্যম করতে পারে না। গ্রামে যাবার আগে তারা জানত যে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হবে তাদের, যার মধ্যে গ্রামবাসীদের বিরক্তিও আছে। তাই যাদের শুধু নিজের প্রতি ও লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস আছে তারাই গ্রামের কাজ করবে ও গ্রামবাসীদের প্রভাবিত করবে।

কর্মীরা

জনগণেব মধ্যে, সত্যকার জীবন-যাপন করলে সেটাই হবে দেখে-শেখার এক দৃষ্টান্ত। চারপাশের পরিবেশে তার প্রভাব না পড়ে পারে না। তরুণদের নিয়ে অসুবিধে হল, সে হয়তো নিছক রোজগার করতেই গ্রামে গেছে, সেবাকার্যের প্রেরণা তার পিছনে নেই।

যারা টাকার খোঁজে যায়, গ্রাম-জীবন তাদের আকর্ষণীয় কিছু দিতে পারে না, এ আমি মানি। কাজের উদ্দীপনা না থাকলে নতুনত্বের চমক কেটে যাবার পর গ্রাম-জীবন পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে। যে তরুণ গ্রামে গেছে, বাধাবিপত্তির সামান্য সংস্পর্শে এলেই সে যেন সব ছেড়েছুড়ে চলে না আসে। ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালালে দেখা যাবে, শহরবাসীদের থেকে গ্রামবাসীরা এমন কিছু আলাদারকম নয়। সদয় ব্যবহার ও মনোযোগে তারা সাড়া দেবে।

এটাও নিঃসন্দেহে সত্য যে, দেশেব বড় বড় মানুষদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ গ্রামে নেই। গ্রামীণ মানসিকতার প্রসার ঘটলে নেতারাও দেখবেন যে গ্রামে সফর করা এবং গ্রামবাসীদের সংস্পর্শে আসা দরকার। তা ছাড়া চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, তুলসীদাস, কবীর, নানক, দাদূ, তুকারাম, তিরুভাল্লুভার ও অন্যান্য অসংখ্য সন্তদের রচনাবলীর

মধ্যে মহান ও সাচ্চা মানুষের সাহচর্য মিলবে। সব নাম উল্লেখ করা গেল না, যদিও তাঁরাও সমান যশস্বী ও ধার্মিক।

সাহিত্য

স্থায়ী মূল্যকে গ্রহণ করার উপযোগী ক'রে মনের তার বাঁধা কঠিন। সে যদি আধুনিক চিন্তা হয়—রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক,—তাহলে তেমন সাহিত্য জোগাড় করা সম্ভব যা কৌতূহল মেটায়। আমি মানছি, ধর্মসাহিত্য যেমন সহজে মেলে, ওরকম সাহিত্য তত সহজে মেলে না। সন্তরা জনগণের জন্য বলেছিলেন ও লিখেছিলেন। আধুনিক চিন্তাকে জনগণের জন্য তাদের গ্রহণযোগ্য করে অনুবাদ করার রেওয়াজ এখনও তেমন চালু হয়নি। তবে যথাসময়ে তা আসবেই।

তাই তরুণদের বলি...হার না মানতে—বলি চেষ্টা চালাক এবং তাদের উপস্থিতির দ্বারাই গ্রামগুলিকে আরো আবাসযোগ্য ও ভালবাসার উপযোগী করে তুলুক। এ-কাজ তারা করবে, গ্রামবাসীদের কাছে গ্রহণীয় গ্রামসেবার মাধ্যমে। সকলেই প্রথমে নিজশ্রমে গ্রামটিকে আরও পরিষ্কার ক'রে, এবং তাদের সাধ্যমত নিরক্ষরতা দূর ক'রে কাজ আরম্ভ করতে পারে। যদি তাদের জীবন কলুষমুক্ত, নিয়মতান্ত্রিক ও পরিশ্রমী হয়, তাহলে যে-গ্রামে তারা কাজ করছে সেখানে তার ছোঁয়াচ লাগবেই।[২৫৩]

সমগ্র গ্রামসেবা

একজন 'সমগ্র গ্রামসেবক' অবশ্যই প্রতিটি গ্রামবাসীকে চিনবে, জানবে, সাধ্যমত কাজ করবে তাদের জন্য। তার মানে এই নয়, কর্মীটি একা-হাতে সব কাজ করতে সক্ষম হবে। সে পথ দেখাবে, কেমন করে গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারে। যে সাহায্য, যে জিনিসপত্র তাদের দরকার, তা সে জোগাড় করে এনে দেবে। সে তার নিজের সাহায্যকারীদের প্রশিক্ষণ দেবে। গ্রামবাসীদের মন এমনভাবে জয় করবে যে তারা ওপব পরামর্শ চাইবে, এবং সে পরামর্শ মেনে চলবে।

ধরা যাক একটা 'ঘানি' নিয়ে আমি কোনও গ্রামে গেলাম বাস করতে। আমি তো সাধারণ কোনও 'ঘান্‌চি' (কলু) হব না, যে মাসে ১৫—২০ টাকা রোজগার করে। আমি হব এক মহাত্মা 'ঘান্‌চি'। মজা করে 'মহাত্মা' শব্দটা ব্যবহার করলাম, তবে যা বলতে চাই তা হল, 'ঘান্‌চি' হয়েই আমি এমন একটা নমুনায় পরিণত হব, যাকে গ্রামবাসীরা অনুসরণ করবে। আমি হব সেই ঘান্‌চি, যে গীতা ও কোরান জানে। ওদের ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর মতো বিদ্যা আমাব থাকবে। সময়াভাবে এ-কাজ হয়তো আমি করতে পারব না। গ্রামবাসীরা এসে আমাকে বলবে, "দয়া করে আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করুন।" আমি ওদের বলব, "তোমাদের জন্য এক শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারি। তবে তার খরচ জোগাতে হবে।" এবং সে কাজ তারা খুশি হয়ে করতে রাজি হবে।

আমি ওদের সুতো কাটতে শেখাব। যখন ওরা এসে আমাকে বলবে কোনও তাঁতি

খুঁজে দিতে,—খুঁজে দেব। শিক্ষকের বেলায় যা বলেছি সেই একই শর্তে। তাঁতি শেখাবে কেমন করে নিজেদের কাপড় বুনতে হয়।

স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে আমি ওদের বুঝিয়ে ছাড়ব। ওরা যখন মেথরের খোঁজে আমার কাছে আসবে, আমি বলব, "আমি তোমাদের মেথর হব। সব কাজ শিখিয়ে দেব।"

এ-ই হল 'সমগ্র গ্রামসেবা' বিষয়ে আমার ধারণা। তুমি বলতে পারো, এ যুগে অমন 'ঘান্‌চি' আমি পাব না। তখন আমি বলব, এ-যুগে আমাদের গ্রামগুলিকে উন্নত কবব, এমন আশাই করতে পারি না...হাজার হলেও যে তেলকল চালায় সে-ও এক কলু। তার শক্তি আছে, কিন্তু তা অর্থে নিহিত নয়। যথার্থ শক্তির উৎস তার জ্ঞানে। প্রকৃত জ্ঞান নৈতিক অবস্থান ও শক্তি দেয়। সকলেই সেরকম এক মানুষের পরামর্শ চায়।[২৫৪]

অর্থনৈতিক সমীক্ষা

গ্রামগুলির সমীক্ষা কবা হবে। সামান্য বা বিনা সহায়তায় যে-সব জিনিস ওখানেই উৎপাদন কবা যায়, যা গ্রামেই ব্যবহৃত হবে বা বাইরে বেচা যাবে, তাব একটি তালিকা তৈরি হবে। যেমন, ঘানিপেষাই তেল ও খইল, ঘানিপেষাই জ্বালানী তেল, ঢেঁকিছাঁটা চাল, তালগুড়, মধু, খেলনাপাতি, মাদুর হাতে তৈরি কাগজ, সাবান, ইত্যাদি। গ্রামগুলি তো হয় মৃত, নয় মুমূর্ষু। (উল্লেখিত ভাবে) যদি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া যায়, তাহলে গ্রামে জেগে উঠবে প্রাণের গুঞ্জন। ভারতের নগরের ও শহবেব যা দরকার,—তার অধিকাংশ জোগান দেবার বিপুল সম্ভাবনা যে তাদেরই আছে, সেটা দেখিয়ে দেবে।[২৫৫]

শিল্প ও শিল্পদক্ষতা

গ্রামবাসীরা এমন উচ্চমানের দক্ষতা আয়ত্ত করবে, যে তাদের তৈরি জিনিস বাইরের বাজার সর্বদা কেনার জন্য প্রস্তুত থাকবে। গ্রামের পূর্ণ উন্নয়ন হলে সেখানে শিল্পগুণ ও উচ্চমানের দক্ষতা সম্বলিত মানুষের অভাব হবে না। সেখানে থাকবে গ্রামীণ কবি, গ্রামীণ শিল্পী, গ্রামীণ বাস্তুকার, ভাষাবিদ ও গবেষণা-কর্মী। সংক্ষেপে, জীবনে যা কিছু প্রাপণীয় তার সব গ্রামেই পাওয়া যাবে।

আজ গ্রামগুলি গোবরগাদা। আগামীকাল সেগুলি হবে ছোট ছোট নন্দনকানন। সেখানে থাকবে তুখোড় বুদ্ধিমান লোকেরা। কেউ তাদের ঠকাতে বা শোষণ করতে পারবে না। এখনই এই পথে গ্রাম পুনর্গঠন করার কাজ শুরু করা উচিত...অস্থায়ী নয়, স্থায়ী ভিত্তিতে গ্রাম পুনর্গঠন করতে হবে।[২৫৬]

অর্থনৈতিক পুনর্সংগঠন

শতকরা একশো ভাগ স্বদেশী বিষয়ে আমি যা লিখেছি, তাতে দেখিয়েছি, কেমন করে তার কোনও কোনও দিক নিয়ে এখনই কাজ করা যায়, যাতে নিরন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষ

আর্থনীতিক ও স্বাস্থ্যবিধিগত, দুদিক থেকেই সুফল পাবে। দেশের সব চেয়ে ধনী ব্যক্তিও এই সুফলের ভাগীদার হতে পারে। যেমন, গ্রামে যদি পুরনো প্রথায় চাল ভানা যায়, তার মজুরি ঢেঁকিপাড়ানী বোনদের হাতে আসবে। ভাত খায় এমন লক্ষ লক্ষ লোক কলেছাঁটা চিকণ চালের খাঁটি শ্বেতসারের বদলে ঢেঁকিছাঁটা চাল থেকে কিছুটা বাড়তি পুষ্টি পাবে।

চাল-উৎপাদনকারী অঞ্চলে যে কুৎসিত চালকলগুলি দেখা যায়, তার জন্য দায়ী মানুষের লোভ। এই লোভ মানুষের স্বাস্থ্য বা সমৃদ্ধির কোনও পরোয়া করে না। জনমত যদি জোরাল হতো, তাহলে ঢেঁকিছাঁটা চালের ওপর জোর দিয়ে, চালকল মালিকদের কাছে আবেদন জানানো যেত, ওই ব্যবসায় বন্ধ করার জন্য। ওই ব্যবসায় সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় এবং গরিবদের এক সৎ জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে। এমনটা ঘটলে চালকল ব্যাপারটাই আর থাকত না।[২৫৭]

...আমি বলব, গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেলে ভারতও ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারত আর ভারত থাকবে না। বিশ্বে ভারতের যে ব্রত রয়েছে, তা নিষ্ফল হবে। গ্রাম পুনরুজ্জীবন তখনই সম্ভব, যখন গ্রাম আর শোষিত হবে না। বৃহৎ শিল্পায়ন অবশ্যই গ্রামবাসীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষণ করবে। কেননা তখন প্রতিযোগিতা ও বিপণন সমস্যা এসে পড়বে।

তাই গ্রাম যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যই উৎপাদন করে, সে ব্যাপারে আমাদের মনোনিবেশ কবতে হবে। গ্রামীণ শিল্পের এই চরিত্র যদি ধরে রাখা যায়, তাহলে গ্রামবাসীরা যে-সব আধুনিক যন্ত্র ও কারিগরি যন্ত্রপাতি তৈরি করতে ও কাজে লাগাতে পারবে, তা ব্যবহারেও তাদের কোনও আপত্তি থাকবে না। অপরকে শোষণ কবার হাতিয়ার হিসেবে শুধু ওইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা চলবে না।[২৫৮]

অহিংস অর্থনীতি

কলকারখানা-নির্ভর সভ্যতার ওপরে তুমি অহিংসা গড়ে তুলতে পারো না। তা সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিতে...গ্রামীণ অর্থনীতি বিষয়ে আমি যেমন ভেবেছি, তাতে শোষণের কোনও স্থান নেই, আর হিংসার সার কথাই হল শোষণ। অহিংস হবার আগে তাই তোমাকে গ্রামমনস্ক হতে হবে। আর গ্রামমনস্ক হতে হলে তোমাকে চরকাতে বিশ্বাস রাখতে হবে।[২৫৯]

ভারতের মতোই প্রাচীন গ্রামীণ ভারত, এবং বিদেশী আধিপত্যে গড়ে ওঠা নগর-ভারত এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে। আজ নগরের আধিপত্য। তা গ্রামকে এমন শুষে নিচ্ছে যে, গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমার খাদি-মানসিকতা বলে, ওই আধিপত্য যখন চলে যাবে, নগরকেই গ্রামের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হতে হবে। গ্রামশোষণ মানে সংগঠিত হিংসা। স্বরাজকে যদি অহিংসার ওপর গড়তে চাই, গ্রামকে তার যথা-স্থান দিতে হবে।[২৬০]

খাদ্য-সংস্কার

গ্রামের আর্থিক পুনর্সংগঠন যেহেতু খাদ্য-সংস্কারের মধ্য দিয়ে শুরু হবে, তাই সহজতম ও সবচেয়ে সস্তা খাবার খুঁজে বের করা দরকার—যা গ্রামবাসীকে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। খাদ্যে শাকপাতা যোগ করলে গ্রামবাসীরা বহু রোগের আক্রমণ এড়াতে পারবে।

গ্রামবাসীর খাদ্যে ভিটামিন বা খাদ্যগুণের ঘাটতি থাকে। টাটকা শাকপাতা দিয়ে এর অনেকটা পূরণ হতে পারে। এক প্রখ্যাত ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, হিসেব করে দেখা গেছে, সবুজ শাকপাতার সঠিক ব্যবহার, খাদ্য বিষয়ে চলতি ধারণায় বিপ্লব এনে দিতে সক্ষম। দুধের খাদ্যগুণ অনেকটাই সবুজ শাকপাতা থেকে মিলবে।[২৬১]

শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র

গ্রামের প্রতিটি কুটীরে আমরা যদি বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পারতাম, তাহলে গ্রামবাসীরা বিদ্যুতের সহায়তায় তাদের কাজের হাতিয়ার চালালে আমি কিছু মনে করব না। তখন গোচারণ ভূমির মতোই মানবগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ-উৎপাদন-গৃহ থাকবে, অথবা তা হবে রাষ্ট্রের মালিকানা। যেখানে বিদ্যুৎ বা যন্ত্রপাতি নেই, কর্মহীন হাতগুলির কী করবার থাকে?[২৬২]

হাজার হাজার গ্রামে শস্য-পেষাই করার জন্য বিদ্যুৎচালিত চাকা রাখতে হলে, আমার বিবেচনায় সেটা হবে আমাদের চূড়ান্ত অসহায়তা। আমার মনে হয় ভারত সবরকম এঞ্জিন বা পেষাই-চাকা উৎপাদন করে না...ব্যাপকভাবে অমন যন্ত্রপাতি ও এঞ্জিন গ্রামে বসানো, লোভের চিহ্নও বটে। এ-ভাবে গরিবের পকেট কেটে নিজের পকেট ভরানো কি ঠিক? ওইরকম প্রতিটি যন্ত্র হাজার হাজার হাত-চাক্কিকে বেকার করে দেয়। হাজার হাজার গৃহবধূর এবং ওই চাক্কি বানাবার কারিগরদের রুজি ছিনিয়ে নেয়।

তার ওপর, এই প্রক্রিয়াটাই ছোঁয়াচে। প্রতিটি গ্রামীণ শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামীণ শ্রমশিল্পে অবক্ষয় সূচিত করবে কলা-শিল্পের অবক্ষয়। যদি এর মানে হতো, পুরনো শিল্পদক্ষতার জায়গায় নতুনের আমদানি, তাহলে এর বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলার থাকত না। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। যে হাজার হাজার গ্রামে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র বসেছে, যেখানে জাঁতাচালানিদের কাজের প্রভাতী সংগীতের মধুর ধ্বনি আর শোনা যায় না।[২৬৩]

৭৮. পঞ্চায়েত-রাজ

গ্রাম-সাধারণতন্ত্র

গ্রাম-সাধারণতন্ত্রের... অভিজ্ঞতা ভারতের ছিল। মেইন ওই নামেই তাকে অভিহিত করেছেন। ভাবতে ভালো লাগে, তাদের চালিকাশক্তি ছিল অহিংসা—হয়তো তারা তা জানত না।

...এখন সুনিশ্চিত অহিংস পরিকল্পনায় তার পুনর্জাগরণের চেষ্টা শুরু করতে হবে।[২৩৪]

একেবারে নিচু থেকে গড়তে শুরু করাই হল, শ্রেষ্ঠ, দ্রুততম, দক্ষতম পন্থা...প্রতি গ্রামকে হতে হবে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সাধারণতন্ত্র। এ-জন্য কোনও সাহসিক সিদ্ধান্তের দরকার করে না। দরকার সাহসিক, যৌথ, বিচক্ষণ কাজ...[২৩৫]

স্বাধীনতার সূত্রপাত ঘটাতে হবে একেবার তৃণমূলে। এইভাবে, প্রতিটি গ্রাম হবে এক সাধারণতন্ত্র, বা পূর্ণ-ক্ষমতা-সম্বলিত এক পঞ্চায়েত। প্রতি গ্রামকে হতে হবে স্বয়ম্ভর। নিজ কাজকর্ম পরিচালনার যোগ্যতা, এমন কি সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করবার সামর্থ্যও তার থাকবে। বাইরে থেকে আঘাত এলে, নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকার প্রশিক্ষণ দিতে হবে তাকে। তাই, শেষ পর্যন্ত একক ব্যক্তিই ইউনিট।

প্রতিবেশীরা বা বিশ্ব স্বেচ্ছায় সাহায্য দিতে চাইলে, তার ওপর নির্ভরতাকে এক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। তা হবে পারস্পরিক শক্তির স্বাধীন ও ঐচ্ছিক আচরণ। তেমন সমাজ অবশ্যই উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন হবে, যেখানে প্রতিটি নারী ও পুরুষ জানে সে কী চায়। শুধু তা-ই নয়, তারা আরো জানে যে সমান শ্রম করেও অন্যেরা যা পেতে পারে না, তা চাওয়া ঠিক নয়।

এমন সমাজ সত্য ও অহিংসার ওপর স্বতই প্রতিষ্ঠিত হবে। যা আমার মতে, ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। ঈশ্বর মানে এক স্বয়ম্ভূ, সর্বজ্ঞ, জীবন্ত শক্তি,—যা অধিষ্ঠিত আছে পৃথিবীর জ্ঞাত সকল শক্তিতে—যা অনন্যনির্ভর। যখন অন্য সকল শক্তি হয়তো লয় পাবে অথবা আর সক্রিয় থাকবে না তখনও সে বেঁচে থাকবে। এই সর্বসঞ্চারী জীবন্ত জ্যোতিতে বিশ্বাস ব্যতিরেকে আমি আমার জীবন বিষয়ে কিছু বলতে পারি না।

গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর পথে

অসংখ্য গ্রাম নিয়ে গঠিত এই কাঠামোর গণ্ডী সর্বদা বিস্তৃত হবে, কখনও ওপরে উঠবে ন। জীবন হবে না পিরামিডের মতো, যার ভিত্তি চূড়াকে ধরে রাখে। এ-হবে এক মহাসাগরীয় বৃত্ত, যার কেন্দ্রে থাকবে ব্যক্তিমানুষ। যে গ্রামের জন্য আত্মাহুতি দিতে সতত প্রস্তুত, গ্রামটি প্রস্তুত অন্যান্য গ্রামবৃত্তের জন্য আত্মদানে, যতক্ষণ না অবশেষে সমগ্রটি হয়ে ওঠে একটি জীবন, যা, একক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। তা কখনও অহঙ্কারে আক্রমণাত্মক নয় বরঞ্চ সতত বিনয়নম্র। মহাসাগরীয় যে বৃত্তের তারা অবিচ্ছেদ্য একক, তার মহিমার অংশীদার।

তাই সবচেয়ে বাইরের পরিধিরেখা কখনও ভিতরের বৃত্তকে ধ্বংস করতে বলপ্রয়ে করবে না। বরঞ্চ ভিতরে যারা আছে, প্রত্যেককে শক্তি জোগাবে। তা থেকে নিজে শক্তি পাবে। আমাকে এ কথা বলে বিদ্রূপ করা হতে পারে যে, এ সবই অলী চিন্তা, তাই এ-নিয়ে কোনও ভাবনা করার দরকার নেই। ইউক্লিডের কৌণিক বিন্দুর এক অবিনাশী মূল্য আছে, যদিও তা কোনও মানবিক মাধ্যম দ্বারা অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব। মানবজাতির বাঁচার জন্য আমার চিত্রের নিজস্ব মূল্য আছে।

আদর্শ

ভারতকে এই সত্য চিত্রের জন্যই বাঁচতে দাও, যদিও তা কোনওদিন পূর্ণতায় উপলব্ধ হবে না। আমাদের যা কাঙ্ক্ষিত তার এক সঠিক চিত্র দরকার তার কাছাকাছি কিছু একটা মেলার আগেই। ভারতে কোনওদিন যদি প্রতি গ্রামে একটি প্রজাতন্ত্র হয়, তাহলে আমি বলব আমার চিত্রটিতে যথার্থতা আছে। সেখানে শেষতম ব্যক্তি সর্বপ্রথম জনের সমান। অর্থাৎ, কেউ প্রথম বা শেষ নয়।

এ চিত্রে প্রতিটি ধর্মের পূর্ণ এবং সমান স্থান আছে। আমরা এক মহান বনস্পতির পল্লব মাত্র, যার কাণ্ডকে শিকড়-ছাড়া করা যায় না। এর শিকড় পৃথিবীর জঠরে প্রোথিত। প্রবলতম প্রভঞ্জন একে নড়াতে পারে না।

এতে এমন যন্ত্রের কোনও স্থান নেই, যা মানুষের শ্রমকে হটিয়ে দেয়, মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত করে ক্ষমতা। সংস্কৃতিসম্পন্ন মানবপরিবারে শ্রমের অনন্য এক স্থান আছে। প্রতিটি যন্ত্র, যা প্রতিটি একক ব্যক্তিকে সাহায্য করে, তারও জায়গা আছে। তবে, স্বীকার করতেই হবে আমি কখনও দু'দণ্ড থেমে ভাবিনি সে-যন্ত্র কী হতে পারে। সিংগারের সেলাইকলের কথা ভেবেছি। তবে তাও বাহুল্য। আমার ছবির শূন্যস্থান ভরাতে এর দরকার নেই।[২৬৬]

আমি জানি, এই কাজ (এক আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা) ভারতকে এক আদর্শ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজের মতোই কঠিন। কিন্তু একটিমাত্র গ্রাম সম্পর্কে একজন মানুষের উচ্চাশা পূর্ণ কবা তার পক্ষে কোনওদিন সম্ভব হলেও সমগ্র ভাবতে অনুরূপ কাজ করার পক্ষে একজন মানুষের জীবনসীমা বড়ই সংক্ষিপ্ত। তবে একজন মানুষ, একটি আদর্শ গ্রাম যদি গড়তে পারে, তাহলে সে শুধু সমগ্র ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনুকরণীয় নিদর্শন গড়বে। কোনও সন্ধানী এর চেয়ে বেশি চাইতে পারে না।[২৬৭]

গ্রামীণ সাধারণতন্ত্রের অধীনে

আমি লক্ষ লক্ষ অজ্ঞ মানুষ অধ্যুষিত এক দারিদ্রপীড়িত ভারতের ছবি আঁকিনি। আমি নিজের জন্য ভারতের যে ছবি এঁকেছি, তাতে ভারত তার প্রতিভার সঙ্গে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ পথে নিরন্তর অগ্রসরমান। পাশ্চাত্যের মরণোন্মুখ সভ্যতার তৃতীয় শ্রেণীর বা এমনকি প্রথম শ্রেণীর নকল করে এ-ছবি আমি আঁকিনি।

আমার স্বপ্ন যদি পূর্ণ হয়, সাত লক্ষ গ্রামের প্রতিটি যদি সুন্দরভাবে বাসযোগ্য এক সাধারণতন্ত্র হয়ে ওঠে,—যেখানে কেউ নিরক্ষর নয়, কেউ নয় কর্মাভাবে বেকার, সকলেই দরকারি কাজকর্মে নিযুক্ত, তাদের আছে পুষ্টিকর খাদ্য, আলো-বাতাসপূর্ণ বাসগৃহ, দেহাচ্ছাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদি। সেখানে সকল গ্রামবাসী স্বাস্থ্যবিধি ও প্রণালীর কথা জানে ও মানে। এইরকম একটি রাষ্ট্রে নানা রকম ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকবেই, আর সে চাহিদার জোগান দেবে রাষ্ট্র, নইলে তা রুদ্ধগতি অচলায়তনে পরিণত হবে।[২৬৮]

গ্রামীণ স্বরাজ

গ্রামীণ স্বরাজ সম্পর্কে আমার ধারণা,—এ হল এক পূর্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্র। তার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটাতে সে প্রতিবেশীদের উপর নির্ভরশীল না হলেও যেখানে নির্ভরতা দরকার, সেখানে নানা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তঃনির্ভরশীল। অতএব, প্রতি গ্রামের প্রথম কর্তব্য, নিজের খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের জন্য তুলা উৎপাদন। গৃহপালিত পশুর জন্য তার এক সংরক্ষিত জায়গা থাকবে। বয়স্ক ও শিশুদের জন্য থাকবে বিনোদনের ব্যবস্থা ও খেলার মাঠ। যদি বাড়তি জমি থাকে সেখানে টাকায় বিক্রয়যোগ্য দরকারি জিনিসের আবাদ হবে। এ-ভাবে গাঁজা, তামাক, আফিম ইত্যাদি (চাষ) বন্ধ হবে।

গ্রামে থাকবে এক গ্রামীণ নাট্যশালা, বিদ্যালয় ও সভাকক্ষ। পরিষ্কার জল সরবরাহের জন্য থাকবে নিজস্ব জলব্যবস্থা। কড়া পাহারায় রাখা কুয়া বা পুকুর দিয়ে এ-কাজ চলতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার শেষ ধাপ পর্যন্ত শিক্ষা হবে আবশ্যিক। যতদূর সম্ভব, সব কাজকর্ম হবে সমবায় ভিত্তিতে। স্তরে স্তরে অস্পৃশ্যতা নিয়ে আজ আমাদের যেমন জাত-পাত রয়েছে সেখানে তা থাকবে না।

গ্রাম-কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সেখানে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগিতার কলাকৌশলসহ অহিংসা থাকবে। গ্রাম যে নামের তালিকা রাখবে, তা থেকে পর্যায়ক্রমে বাছাই করা গ্রামরক্ষীদের আবশ্যিক-বাহিনী থাকবে।

গ্রামের সরকার

গ্রামীণ সরকার চালাবে পাঁচজন লোকের পঞ্চায়েত। ন্যূনতম নির্ধারিত গুণমানের ভিত্তিতে এরা গ্রামের সাবালক নারী ও পুরুষ দ্বারা বছর বছর নির্বাচিত হবে। এদের সকল কর্তৃত্ব ও প্রয়োজনীয় শাসনাধিকার থাকবে। প্রচলিত অর্থে শাস্তি দেবার কোনও নিয়ম যেহেতু থাকবে না, তাই এই পঞ্চায়েতই একাধারে বিধায়ক, বিচারক ও প্রশাসকরূপে কাজ করবে তার এক বছর মেয়াদি কার্যকালে...

প্রতিবেশী গ্রামগুলির সঙ্গে এবং যদি কোনও কেন্দ্র থাকে তবে তার সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটি আমি এখানে খতিয়ে দেখিনি। আমার উদ্দেশ্য, গ্রামীণ সরকারের এক রূপরেখা দাখিল করা। সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা-ভিত্তিক পূর্ণ গণতন্ত্র বিদ্যমান। ব্যক্তিই নিজ সরকারের স্থপতি। তাকে ও তার সরকারকে শাসন করে অহিংসার আইন। সে এবং তার গ্রাম পৃথিবীর সমবেত শক্তি উপেক্ষা করতে সক্ষম। কেননা, যে আইন প্রতিটি গ্রামবাসীকে পরিচালিত করছে তা হল নিজের ও তার গ্রামের মর্যাদা রক্ষার্থে প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ.......

যে ছবি এখানে আঁকা হল, তাতে অসম্ভব কিছু নেই। এমন এক গ্রামকে ছাঁদ হিসেবে গড়ে তোলা হয়তো সারা জীবনের কাজ। প্রকৃত গণতন্ত্র ও গ্রামজীবনকে যে ভালবাসে সে যদি কোনও একটি গ্রাম বেছে নিতে পারে, তাকেই তার পৃথিবী, তার একমাত্র কর্মক্ষেত্রে বলে গণ্য করতে পারে, তাহলে সে সুফল পাবে।[২৬৯]

জনমত

পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে, হিংসা যে-কাজ কখনওই করতে পারে না, জনমত তা করবে। বর্তমানে জমিদার, পুঁজিপতি ও রাজারা ততদিনই ক্ষমতা জাহির করতে পারবে যতদিন না সাধারণ মানুষ নিজেদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে। জনগণ যদি জমিদারি ও পুঁজিবাদের পাপাচারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে, তাহলে তা রিক্ততায় নিঃশেষ হয়ে যাবে। পঞ্চায়েত রাজে শুধু পঞ্চায়েতকে মানা হবে, আর পঞ্চায়েত-কাজ করবে শুধু তার নিজের তৈরি বিধানের মাধ্যমে।[২৭০]

মেহনতী লক্ষ লক্ষ মানুষই প্রকৃত শাসক।[২৭১]

কৃষকই মেরুদণ্ড

পঞ্চায়েত রাজে, ভারতে স্বভাবতই যে সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে সে হল কৃষক। কেমন করে তার অগ্রগতি ঘটানো যাবে সেটাই প্রশ্ন।[২৭২]

পঞ্চায়েতের ক্ষমতা যত বাড়বে, মানুষের মঙ্গলও তত বেশি হবে। তা ছাড়া, পঞ্চায়েতকে কার্যকর ও কর্মদক্ষ করতে গেলে জনশিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নীত করতে হবে। আমি জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা ভাবি নৈতিক অর্থে, সামরিক অর্থে নয়। স্বাভাবিকভাবেই এ-ব্যাপারে আমি 'নয়ী তালিম' ছুঁয়ে শপথ করি।[২৭৩]

পঞ্চায়েতের কাজ

সততা ও শ্রমক্ষমতার পুনঃপ্রর্বতন পঞ্চায়েতের কাজ...বিবাদের ফয়সালা যদি গ্রামবাসীদেরই করতে হয় তাহলে পঞ্চায়েতের কাজ হবে তাদের বিবাদ এড়াতে শেখানো। এর ফলে নিখরচায় দ্রুত ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত। তোমার পুলিশ বা সামরিক বাহিনী দরকার হবে না....

এ-ছাড়া, গবাদি পশুর উন্নতিসাধন পঞ্চয়েতের এক্তিয়ারভুক্ত। তাহলে দখা যাবে দুধের জোগান সমানে বাড়ছে...গ্রামে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ বাড়ছে কি না সেটা দেখাও পঞ্চায়েতের কাজ। জমিতে ঠিক মতো সার দিলে ফলন বাড়াবার এ-কাজটি হবে।

তোমার নিজস্ব আমোদপ্রমোদ (খেলাধূলা) আছে। সেগুলো থাকবে। মাদক পানীয় এবং ঔষধ তোমাদের বর্জন করতে হবে। গ্রামে যদি এখনও অঁস্পৃশ্যতার লেশ মাত্র থেকে থাকে—আশা করব, তোমরা তা দূর করবে। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, পারসিক ও খ্রীশ্চানদের উচিত একসঙ্গে ভাইবোনের মতো থাকা। যা বললাম, সব যদি আয়ত্ত করতে পারো, তাহলে তোমরা প্রকৃত স্বাধীনতার নিদর্শন দেখাবে। ভারতের সব জায়গা থেকে মানুষ তোমাদের আদর্শ গ্রাম দেখতে আসবে এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।[২৭৪]

পঞ্চায়েত রাষ্ট্র

যদি দেখি পঞ্চায়েত-রাজ, তথা যথার্থ গণতন্ত্রের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, তাহলে, দীনতম, সমাজে নিম্নতম যে, দেশের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয়ের সঙ্গেই সমানভাবে সে ভারতের শাসক হবে। এটা আগেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সকলেই নির্মল হৃদয়। যারা নয়, তারাও পবিত্র হয়ে উঠবে। পবিত্রতার সঙ্গে চাই প্রজ্ঞা। তখন কেউ সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাত-বেজাতে কোনও পার্থক্য করবে না। সবাই সবাইকে নিজের সমান ভাববে। আর ভালবাসার রেশমী ডোরে সকলকে ধরে রাখবে। কেউ অপরকে অস্পৃশ্য ভাববে না। মেহনতী মজুর ও ধনী পুঁজিপতিকে আমরা সমান চোখে দেখব। সবাই জানবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কি ক'রে সৎ পথে জীবিকার্জন করা যায়। বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমে কোনও পার্থক্য করবে না। এই পরমোৎকর্ষ অবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে আমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের মেথরে পরিণত করব। যার প্রজ্ঞা আছে, সে কখনও অফিম, মদ বা অন্য মাদকদ্রব্য ছোঁবে না। সবাই স্বদেশীকে মানবে জীবননীতি হিসেবে। পুরুষ, নিজের স্ত্রী ব্যতীত সকল রমণীকে, তাদের বয়স অনুসারে নিজের মা, বোন, বা মেয়ের মতো দেখবে। কখনও মনে মনে তার প্রতি লালায়িত হবে না। দরকারে সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবে। কখনও অপরের প্রাণনাশ করতে চাইবে না....[২৭৫]

৭৯. শিক্ষা

'যা মুক্তি দেয়, তা-ই শিক্ষা'—এই প্রাচীন উক্তি সেকালের মতো একালেও সমান সত্য। এখানে শিক্ষার অর্থ শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়। যেমন মুক্তি বলতে শুধুমাত্র মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক মুক্তি বোঝায় না। মানব সেবার জন্য যা দরকার তার সব কিছুর প্রশিক্ষণই জ্ঞানের মধ্যে পড়ে। আর ইহজীবনে সকল প্রকারের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ হল মুক্তির প্রকৃত অর্থ। দাসত্ব দুই রকম: বাইরের আধিপত্যের দাসত্ব, এবং নিজের কৃত্রিম চাহিদার দাসত্ব। এই আদর্শের অন্বেষণে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা-ই প্রকৃত অনুশীলন।[২৭৬]

বেঁচে থাকার জ্ঞান

আজ বিশুদ্ধ জল, সরস মাটি, নির্মল বাতাস আমাদের অজ্ঞাত। ইথার ও সূর্যের অপরিমেয় মূল্য আমরা জানি না। এই পাঁচটি শক্তিকে আমরা যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করি, যদি সঠিক ও সুসমঞ্জ খাদ্য খাই, তাহলে আমরা অনেকদিনের মুলতবি কাজ করে ফেলব। এ-জ্ঞান আহরণের জন্য আমাদের ডিগ্রি বা কোটি কোটি টাকার দরকার নেই। যা দরকার তা হল ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস, কাজের উদ্দীপনা, প্রকৃতির ওই পাঁচটি শক্তির [পঞ্চভূত : ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম] সঙ্গে পরিচয়, এবং খাদ্যনির্বাচনবিদ্যা। স্কুল ও কলেজে সময় নষ্ট না করেই এগুলো শেখা যায়।[২৭৭]

যে কোনওরকম শিক্ষা অর্জন করতে গেলে সবার আগে চাই নিরন্তর জিজ্ঞাসা এবং সুস্থ কৌতূহল। কৌতূহলকে বিনয়ের দ্বারা বশে রাখতে হয়, আর শিক্ষকের জন্য চাই সশ্রদ্ধ মনোভাব। কৌতূহল যেন ধৃষ্টতায় পর্যবসিত না হয়। ধৃষ্টতা, মনের গ্রহণক্ষমতার শত্রু। বিনয় এবং জিজ্ঞাসা ব্যতীত কোনও জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।[২৭৮]

নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্য এক নতুন ধরনের শিক্ষা আবশ্যক।[২৭৯]

নিছক সাক্ষরতাও বিদ্যার্জন নয়, বাস্তব জীবনের জন্য শিক্ষাই একজনকে মানুষ করে তোলে।[২৮০]

প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের বা তার আগেই, পাশাপাশি আমি সুপারিশ করব সর্বজনীন শিক্ষার, পুঁথিগত শিক্ষা নয়। তা হয়তো সহায়ক হতে পারে মাত্র। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মন উপবাসী রেখেছে, দুর্বল করেছে, কখনওই নির্ভীক নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য মনকে তৈরি করেনি। আমি সকলকে পর্যাপ্ত শিক্ষাদান করব এমন সমৃদ্ধ ভাষায়, যে-কোনও দেশই তা নিয়ে গর্ব করতে পারে। নাগরিকত্ব বোঝার জন্য যে শিক্ষা, তা স্বল্প সময়ে শেখা যায় যদি আমরা সৎ ও আগ্রহী হই।[২৮১]

শ্রমের মর্যাদা

যেহেতু আমাদের সময়ের সিংহভাগ ব্যয়িত হয় রুজি রোজগারের মেহনতে, আমি বলি, শৈশব থেকেই আমাদের শিশুদেব সে-মেহনতের মর্যাদা শেখানো হোক। শিশুদের শ্রম ঘৃণা করতে শেখানো উচিত নয়। কৃষকের ছেলে স্কুলে যাবার পর ক্ষেতমজুর হিসেবে অকেজো হয়ে পড়বে কেন, তার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তাই সে হয়ে পড়ে।[২৮২]

পুঁথিগত শিক্ষার উচিত হাতের কাজের শিক্ষাকে অনুসরণ করা,—এই একটি গুণ, যা দৃশ্যতই মানুষকে পশুব থেকে বিশিষ্ট করেছে। লেখার ও পড়ার জ্ঞান আয়ত্ত না করলে মানুষের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব নয়,—এ একটা কুসংস্কার। জ্ঞান অবশ্যই জীবনে মহিমা দান করে। কিন্তু মানুষের নৈতিক, দৈহিক ও বস্তুবাদী উন্নয়নে ওটি কোনওমতেই অপরিহার্য নয়।[২৮৩]

আমি মনে করি, বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত শিক্ষার একমাত্র উপায় দেহের অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের সঠিক ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ; যথা হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায়, শিশুর ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তার ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য অঙ্গাদির ব্যবহার, তার বুদ্ধিবৃত্তি গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ ও দ্রুততম উপায়। তবে, মন ও দেহের বিকাশ যদি আত্মার জাগরণের সঙ্গে একত্রে তাল মিলিয়ে না চলে, তাহলে, পূর্বোক্তটি একপেশে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ বলতে আমি বুঝি অন্তরের শিক্ষাদান। মনের যথার্থ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, অতএব, তখনই হতে পারে যখন তা শিশুর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক গুণের শিক্ষার সঙ্গে সমানে পা-ফেলে চলে। দুইয়ে মিলে এক অবিভাজ্য সমগ্র। অতএব, এই তত্ত্ব অনুযায়ী এটা মনে করলে খুব ভুল হবে যে, দুটির উন্নয়ন ভাগে ভাগে, বা একটি অপরটিকে বাদ দিয়ে সম্ভব।

সঙ্গতিপূর্ণ ঐকতান

দেহ, মন, ও আত্মার বিভিন্ন শক্তির যথার্থ সমন্বয় ও সঙ্গতির অভাবের সর্বনাশা পরিণাম খুবই স্পষ্ট। তারা আমাদের ঘিরে রয়েছে। আমাদের বর্তমান বিকৃত অনুষঙ্গের জন্য আমরা তাদের অনুভব করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি....।[২৮৪]

বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের সব নয়, সে শুধুমাত্র প্রাণীদেহধারীও নয়, নিছক হৃদয় বা নিছক আত্মাও নয়। পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে গেলে তিনটির যথার্থ ও সুসমঞ্জস ঐকতান প্রয়োজন। এতেই আছে শিক্ষার সত্য অর্থনীতি।[২৮৫]

শিশুর ও মানবের দেহ, মন ও আত্মার শ্রেষ্ঠ যে-টুকু, তাকে সম্পূর্ণ টেনে বের করাকে আমি শিক্ষা বলি। সাক্ষরতা শিক্ষার শেষ নয়, শুরুও নয়। এ-শুধু একটি মাধ্যম যা-দিয়ে নারী ও পুরুষকে শিক্ষাদান করা যায়। সাক্ষরতা নিজে, শিক্ষা নয়। তাই আমি শিশুর শিক্ষার শুরুতে শেখাব কোনও দরকারি হস্তশিল্প। যাতে প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সে উৎপাদনও করতে পারে.....আমি বিশ্বাস করি, ওই শিক্ষানীতিতে মন ও আত্মার সর্বোচ্চ উন্নয়ন সম্ভব। তবে আজকের মতো নিছক যান্ত্রিকতায় নয়, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শেখাতে হবে হস্তশিল্প। শিশু যাতে প্রতিটি প্রক্রিয়ার কী ও কেন জানতে পারে।[২৮৬]

পুঁথিগত দিকটির চেয়ে শিক্ষার সংস্কৃতিগত দিকটির ওপর আমি বেশি গুরুত্ব দিই।[২৮৭]

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দরকারি কায়িক শ্রম কবলে, তা বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে অতি চমৎকার কাজ দেয়.... ভারসাম্যসম্বলিত মেধা মানে দেহ, মন, ও আত্মার সুসমঞ্জস বৃদ্ধি....সামাজিকভাবে যা দরকাবি, তেমন মেহনতের মাধ্যমে যে মেধার বিকাশ হয়, তা সেবাকার্যের এক হাতিয়াব। সহজে তা পথভ্রষ্ট হবে না বা ভ্রান্ত পথে চলে যাবে না।[২৮৮]

'নয়ী তালিম'

যে কোনও বুনিয়াদী কারিগবি শিল্পশিক্ষাকে, শিক্ষাব মাধ্যমেব কাজে লাগাতে হলে তাকে বিশ্বজনীনতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।[২৮৯]

একটি প্রকল্পে একত্রিত কবতে হবে কারিগরি কাজ, শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে। 'নয়ী তালিম' এই চারটির সুন্দর মিশ্রণ। ভ্রূণাবস্থা থেকে মৃত্যু অবধি ব্যক্তির সমগ্র শিক্ষা এব পরিধির মধ্যে পড়ে...কারিগরি ও শিল্পকে শিক্ষার থেকে পৃথক করে দেখার চেয়ে ওগুলিকেই আমি পরোক্ষের মাধ্যমে মনে করব।[২৯০]

আমার 'নয়ী তালিম' টাকার ওপর নির্ভরশীল নয়। চালাবার খরচ শিক্ষাপদ্ধতি থেকেই উঠে আসা উচিত। যে সমালোচনাই হোক, আমি জানি, যা 'স্বয়ম্ভর', একমাত্র তা-ই হল শিক্ষা।[২৯১]

একে বলা হচ্ছে শিক্ষার নতুন পদ্ধতি। কেননা এটা বিদেশ থেকে আমদানি করা বা চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা নয়। যে ভারত প্রধানত গ্রাম নিয়ে গঠিত এই শিক্ষা সেই ভাবতের পরিবেশের সঙ্গে মানানসই। মানুষ যার দ্বারা গঠিত, সেই শরীর, মন ও

আত্মার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনায় এ-শিক্ষা বিশ্বাসী। এটা পাশ্চাত্য ধরনের নয়, যা প্রধানত সামরিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন। সে শিক্ষায় আত্মাকে দাবিয়ে রেখে দেহ ও মনকে প্রথম লালন করা হয়। এ-শিক্ষা সবচেয়ে ভালো হয়, যখন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। আর এক বৈশিষ্ট্য হল, এটি সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হবে। এই শিক্ষা সে-ভাবেই পরিকল্পিত। ফলে এই শিক্ষার জন্য শিক্ষাখাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের প্রয়োজন হয় না।[২৯২]

শিক্ষকরা যেটা নিচ্ছেন সেটা তাদের উপার্জিত। এই শিক্ষা ও বাঁচবার শিল্প সমার্থক। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনকেই, শেখাবার ও শিখবার কাজের সময় উৎপাদন করতে হয়। শুরু থেকেই এ-শিক্ষা জীবনকে সমৃদ্ধ করে। এই শিক্ষায়, জাতিকে কাজ খুঁজে বেড়াতে হয় না।[২৯৩]

আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি দেহ, মন ও আত্মার বিকাশ ঘটায়। সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি শুধুই মনের কথা ভাবে।[২৯৪]

এই শিক্ষা সকলের কাছে, সঠিকভাবেই হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা বলে পরিচিত। এটা আংশিক সত্য। এই নতুন শিক্ষার শিকড় আরো গভীরে। এটি নিহিত আছে, ব্যক্তিজীবন বা যৌথজীবনের সবরকম মানবিক কাজকর্মে সত্য ও প্রেম প্রয়োগ করার মধ্যে। জীবনের কর্মকাণ্ডে সত্য ও প্রেমের পরিব্যাপ্তির চিন্তা থেকেই হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ধারণা উদ্ভূত।

প্রেম চায় যথার্থ শিক্ষা সকলের কাছে সহজলভ্য হোক,—যেন তা প্রতিটি গ্রামবাসীর দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে। তেমন শিক্ষা কেতাবের ওপর নির্ভর করে না, কেতাবে এ-শিক্ষা মেলেও না। শাখাবিভক্ত ধর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। একে যদি ধর্মীয় বলা যায়, তবে তা বিশ্বজনীন ধর্ম। যা থেকে ধর্মের সকল শাখা উদ্ভূত। তাই এ-শিক্ষার পাঠ নিতে হবে জীবন-গ্রন্থ থেকে। যাতে কোনও খরচা লাগে না। পৃথিবীব কোনও শক্তি যাকে ছিনিয়ে নিতে পারে না কারও কাছ থেকে।[২৯৫]

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত, জনগণের প্রকৃত সেবক তৈরি করা, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণধারণ বা প্রাণবিসর্জন করবে। তাই আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত....[২৯৬]

নারী শিক্ষা পুরুষদের শিক্ষা থেকে পৃথক হওয়া উচিত কি না আর কখন তা শুরু করা উচিত সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে আমার দৃঢ় অভিমত, পুরুষের সমান সুযোগ মেয়েদের পাওয়া উচিত। এমন কি প্রয়োজনে বিশেষ সুযোগও।[২৯৭]

আমাদের ছাত্রদের বিদেশগমনের প্রবক্তা আমি কোনওদিন নই। আমার অভিজ্ঞতা বলে, ওই ছাত্ররা দেশে ফিরে দেখে তারা গোল ছিদ্রে চৌকা পেরেকের মতো বেখাপ্পা। জন্মভূমি থেকে যে অভিজ্ঞতার উৎসার সেই অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ, দেশেব অগ্রগমনে তার দানই সবচেয়ে বেশি।[২৯৮]

শিক্ষার্থীদের জন্য আচরণবিধি

যারা পাঠ সমাপ্ত করেছে, শুধু তারাই বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ নিতে পারবে। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষার্থীর একমাত্র কাজ হওয়া উচিত, তাদের জ্ঞান বাড়ানো....যে-কোনও দেশেই সকল শিক্ষার সুস্পষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত সে-দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।[২৯৯]

সর্বোপরি ছাত্রদের বিনয়ী ও দোষমুক্ত হতে হবে।

.....মহত্তমকে মহৎ হবার জন্য স্বেচ্ছায় দীনতম হতে হয়। হিন্দু-বিশ্বাসে আমার যে জ্ঞান, তা থেকে বলতে পারি, শিক্ষাক্রম শেষ হওয়া অবধি শিক্ষার্থীর জীবন এক সন্ন্যাসীর মতো হওয়া উচিত। তাকে কঠোরতম শৃঙ্খলায় থাকতে হবে। সে বিয়ে করতে পারবে না, ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হতে পারবে না। মদ্যপান ও অনুরূপ কিছু প্রশ্রয় দিতে পারবে না। তার আচার-আচরণ হবে আদর্শ আত্মসংযমের এক দৃষ্টান্ত।[৩০০]

শিক্ষার মাধ্যম

আমাদের এই মিথ্যা, অ-ভাবতীয় করে ফেলার শিক্ষার দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি হয়ে চলছে। তা ক্রমাগত বাড়ছে, এর প্রমাণ আমি প্রত্যহ পাই......

আমরা যেন ভাবতে শুরু করেছি, ইংরেজি না জানলে কেউ 'বোস'-এর মতো হবার আশা করতে পারে না। এর চেয়ে বড় কুসংস্কার আমি ভাবতে পারি না। আমরা যেমন অসহায় বোধ করি, কোনও জাপানী তা করে না....

এখনই শিক্ষার মাধ্যম বদলানো উচিত এবং যে কোনও মূল্যে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে তাদের ন্যায্য স্থান দেওয়া উচিত। যে অন্যায় অপচয় প্রত্যহ জমছে তার তুলনায়, উচ্চশিক্ষার সাময়িক বিশৃঙ্খলা আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য।

প্রাদেশিক ভাষাব মর্যাদা ও বাজারদর বাড়াতে আমি চাইব, যে প্রদেশে আদালতটি অবস্থিত সেই প্রদেশের ভাষায় আদালতের কাজ চলুক। প্রাদেশিক বিধানসভার কাজকর্মও সেই প্রদেশের ভাষায় বা যে সীমারেখার মধ্যে একাধিক ভাষা প্রচলিত, সেই সব ভাষায় পরিচালিত হওয়া উচিত। কেন্দ্রে হিন্দুস্থানীর স্থানই থাকবে সবার উপরে।

আমার মতে, এই প্রশ্নের মীমাংসা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের করার কথা নয়।...দেশ যখন যথার্থ স্বাধীন হবে তখন শিক্ষামাধ্যমের প্রশ্নের একটাই সমাধান হবে। বিশেষজ্ঞরা পাঠক্রম বানাবেন, সেই অনুযায়ী পাঠ্যবই লিখবেন। এবং স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট মানুষ দেশের চাহিদা মেটাবে।

....যতদিন আমরা, শিক্ষিত শ্রেণীরা, এ-প্রশ্ন নিয়ে খেলা করব, আমার আশঙ্কা ততদিন আমরা আমাদের স্বপ্নের স্বাধীন ও সুস্থ সবল ভারতের দেখা পাব না। প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁধন কাটিয়ে আমাদের উঠতে হবে, সে বাঁধন শিক্ষাগত, আর্থনীতিক, সামাজিক বা রাজনীতিক যা-ই হোক-না-কেন। প্রচেষ্টাই লড়াইয়ে তিন-চতুর্থাংশ।[৩০১]

আমার কোনও সন্দেহ নেই,—তরুণদের শিক্ষার ভার যাঁদের হাতে, তাঁরা যদি মনস্থির করে ভেবে দেখেন, তবে আবিষ্কার করবেন যে, মাতৃদুগ্ধ যেমন স্বাভাবিকভাবে শিশুর

দেহের উন্নতিসাধনে সহায়তা করে, ঠিক তেমনি মাতৃভাষা কাজ করে মানুষের মানসিকতা গঠনে। অন্যথা হবে কী করে? শিশু প্রথম শিক্ষা নেয় মায়ের কাছে। অতএব, আমার মতে, সন্তানদের মানসিকতা বিকাশের জন্য, তাদের উপর মাতৃভাষার বদলে অন্য ভাষা চাপিয়ে দেওয়া, মাতৃভূমির প্রতি পাপ।[৩০২]

জাতীয় ভাষা

নাগরী বা উর্দু লিপিতে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষাই একমাত্র আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হতে পারে...

আমি চাই ইংরেজ জবরদখলকারীর রাজনৈতিক শাসনকে আমরা যেমন নির্বাসনে পাঠিয়েছি, তেমনই সাংস্কৃতিক অনধিকার-প্রবেশকারী হিসেবে ইংরেজিভাষার নির্বাসন। বাণিজ্য ও কূটনীতি ক্ষেত্রে এক আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে সমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষা চিরকাল তার স্বাভাবিক স্থান বজায় রাখবে।[৩০৩]

যদি প্রাদেশিক ভাষা তার যোগ্য উচ্চস্থান পেতে চায় তাহলে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। হিন্দুস্থানী হবে লিংগুয়া ফ্রাংকা,—ভারতের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু তা প্রাদেশিক ভাষার জায়গা নিতে পারে না। এ-ভাষা বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার মাধ্যমও হতে পারে না,—ইংরেজি তো নয়ই। এর কাজ, ভারতের সঙ্গে (প্রদেশগুলিব) অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ উপলব্ধ করানো।[৩০৪]

ইংরেজি ভাষা

ইংরেজি জ্ঞান বাদ দিয়েই ভারতীয় মানসের সর্বোত্তম বিকাশ সম্ভব করতে হবে।[৩০৫]

আমি ভালো করে ভেবেচিন্তেই বলছি, যে-ভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দেব হীনবল করেছে, ভারতীয় ছাত্রদেব স্নায়বিক উদ্যমের ওপর নিদারুণ চাপ সৃষ্টি করেছে, আমাদের করেছে অনুকরণপ্রবণ...কোনও দেশ, অনুবাদকদের এক গোষ্ঠী তৈরি করে জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।[৩০৬]

ইংরেজি আজ বিশ্বভাষা এ-কথা অনস্বীকার্য। আমি একে তাই, দ্বিতীয় ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে রাখতে চাই। তবে, বিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। সে-ও বাছাই করা কয়েকজনের জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য নয়...মানসিক দাসত্বের জন্যই আমরা ভাবি, ইংরেজি ছাড়া আমাদের চলবে না, তেমন পরাজয়বাদী মতবাদ আমি মেনে নিতে পারি না।[৩০৭]

সাহিত্য

কেউ যেন মনে না করে, আমি ইংরেজি ভাষা বা তার মহান সাহিত্যের নিন্দা করছি। হরিজন পত্রিকায় আমার লেখা প্রতিবেদনে, ইংরেজি ভাষাপ্রীতির পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বা প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন ভারতকে সাহায্য করতে পারে না, তেমনই ইংরেজি সাহিত্যের মহত্ত্ব ভারতীয় জাতিকে সাহায্য করতে অপারগ।

ভারতকে তার নিজ জলবায়ু, নিসর্গ দৃশ্য ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হতে হবে। এই তিনটি-ই যদি ইংরেজি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সাহিত্য থেকে নিম্নমানের হয়, তবুও আমরা ও আমাদের সন্তানরা তো আমাদের উত্তরাধিকারের ওপরেই সৌধ গড়ব। অন্যেরটা ধার করলে, আমাদেরটা নিঃস্ব হয়ে পড়বে। বিদেশী রসদে কখনওই আমরা বেড়ে উঠতে পারব না। ইংরেজি ভাষায়, তথা বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় যে-সব অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত আছে, আমি চাই, জাতি সেগুলি ভারতীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মস্থ করুক। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় রচনাবলীর সৌন্দর্য জানার জন্য আমার বাংলা শেখার দরকার নেই। ভালো অনুবাদের মাধ্যমেই আমি তা পাই। তলস্তয়ের ছোট গল্প পড়ার জন্য গুজরাটী ছেলেমেয়েদের রাশিয়ান শেখার দরকার নেই। ভালো অনুবাদ থেকেই তারা তা পড়ে। ইংরেজরা বড়াই করে যে, বিশ্বের সেরাসাহিত্য প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই সহজ ইংরিজিতে ওদের হাতে পৌঁছে যায়। শেক্সপীয়ার ও মিলটনের চিন্তা ও রচনার মধ্যে যা সর্বোত্তম তা জানার জন্য আমাকে ইংরেজি শিখতে হবে কেন?[৩০৮]

৮০. ভাষাভিত্তিক প্রদেশ

কংগ্রেসের স্বার্থে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্বিন্যাসের স্বীকৃতি কংগ্রেসের কাছ থেকে আদায় করার কাজে আমি প্রধান সহায়ক ছিলাম। অনুরূপ পুনর্বিন্যাস সরকার যাতে মেনে নেয়, সে জন্য আমি সবসময়ে দাবি জানিয়েছি।[৩০৯]

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগকেই আমি সঙ্গত বলে মনে করি। দুটি প্রদেশ পাশাপাশি সংলগ্ন নয়, অথচ একই ভাষায় কথা বলে, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কেরল ও কর্ণাটক যদি একই ভাষায় কথা বলত তাহলে আমি দুটিকে দুই ভিন্ন প্রদেশ বলে গণ্য করতাম।[৩১০]

প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়

যে-ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং সেই ভাষাভাষী মানুষরা পূর্ণ বিকশিত হতে চায়, সে-ক্ষেত্রে তদনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয় থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করি...। একই সঙ্গে আশঙ্কা হয়, অযথা তাড়াহুড়ো করে এ-লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে নিজেদের স্বরূপ না প্রকাশ করে ফেলি। প্রদেশগুলির ভাষাভিত্তিক রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস হল প্রথম পদক্ষেপ।[৩১১]

সকলেই বড় বেশি আত্মপরায়ণ। সবাই নিজের ও নিজ পরিবারের কথা ভাবছে। কেউ সমগ্র ভারতের কথা ভাবছে না। কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি অবশ্যই আছে। তবে তা সোচ্চার বা প্রাণবন্ত নয়। বহির্মুখী শক্তিটি আছে উপরের স্তরে। স্বভাবের বশেই সে সবচেয়ে জোরে চেঁচায়। সকলের মনোযোগ পেতে চায়। সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে সে নিজেকে

প্রকাশ করে। ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা ভীতির সঞ্চার করেছে।....

অত্যুৎসাহী সংস্কারকরাও বিতর্কমূলক প্রসঙ্গগুলি মুলতবি রাখেন সেই অপেক্ষাকৃত সুসময়ের জন্য, যখন দেশের স্বার্থে "দাও আর নাও"-এর মহিমা প্রকাশ্যে স্বীকার করা হবে, সকল সংকীর্ণ স্বার্থ হার মানবে ভারতকল্যাণরূপ সর্বমঙ্গলময় একমাত্র স্বার্থের কাছে।

তাই, আমি মনে করি যারা চায় এ মুহূর্তে গঠনমূলক প্রস্তাব সক্রিয় হোক—তাদেরকে কাজ করতে হবে এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য। বিরোধের পরিবর্তে তুলে ধরতে হবে সমন্বয়, লড়াইয়ের জায়াগায় শান্তি, পশ্চাৎগতির জায়গায় অগ্রগতি, মৃত্যুর জায়গায় জীবন।[৩১২]

কোনও স্বতন্ত্র প্রাদেশিকতা নয়

আমি মনে করি, সকল প্রদেশের মানুষই ভারতের, এবং ভারত সকলের। একমাত্র শর্ত হল, কোনও প্রদেশকে শোষণ বা শাসনের জন্য, বা তার স্বার্থ-হানিকর কিছু করার জন্য কেউ অন্য প্রদেশে গিয়ে বসবাস করতে পারবে না। সকলেই ভারতের সেবক, এবং তারা সেবাকার্যের প্রেরণাতেই বেঁচে থাকে।[৩১৩]

এই একমুখী প্রাদেশিকতা আমাদের জীবনে এক অভিশাপ। আমার প্রদেশ ভারতের সীমানার সঙ্গেই সমব্যাপ্ত, যাতে শেষ পর্যন্ত তা পৃথিবীর সীমানায় গিয়ে পৌঁছয়। নইলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।[৩১৪]

ভারতের ঐক্য

কংগ্রেস ইতিমধ্যেই [ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্বিন্যাস]-এর নীতি মেনে নিয়েছে এবং ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে একে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। তা হলে সেটা দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল হবে। কিন্তু ওই পুনর্বিন্যাস যেন ভারতের অঙ্গাঙ্গী ঐক্যের প্রতিকূল হয়ে না ওঠে। স্বায়ত্তশাসন মানে সংহতিবিনাশ নয়, বা এ-ও নয় যে কেন্দ্র বা অন্যান্য প্রদেশের পরোয়া না করে প্রদেশগুলি যে-যার পথে চলতে পারে। প্রতিটি প্রদেশ যদি নিজেকে স্বতন্ত্র, সার্বভৌম এক ইউনিট বলে ভাবতে শুরু করে, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে। আর সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হবে বিভিন্ন ইউনিটের স্বাধীনতাও...।

বাইরের দুনিয়া আমাদের শুধু ভারতীয় বলে জানে,—গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় বা তামিল বলে নয়।

তাই, দৃঢ়চিত্তে আমাদের সকল ঐক্যবিনাশী প্রবণতাকে পরাস্ত করতে হবে। চিন্তায় ও আচরণে ভারতীয় হতে হবে। এই সর্বোচ্চ বিবেচনা সাপেক্ষে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের পুনর্বিন্যাস করলে শিক্ষা ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে উৎসাহ সঞ্চারিত হবে।[৩১৫]

৮১. গো-রক্ষা

গোরুর স্থান

গাভী হচ্ছে করুণার কবিতা। এই শান্ত প্রাণীটিতে কেবলমাত্র করুণাই দেখতে পাই। সে লক্ষ কোটি ভারতবাসীর মাতা। গো-রক্ষার অর্থ, ঈশ্বর সৃষ্ট সকল অবোলা প্রাণীর রক্ষা। প্রাচীর ঋষিরা সকলেই (গো-সেবা) দিয়ে দিন শুরু করতেন। এই নিম্নতর সৃষ্টির আবেদন অবোলা বলেই এত শক্তিশালী।[৩১৬]

...গোরু মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র। সমস্ত মনুষ্যেতর প্রাণীর হয়ে সে আমাদের কাছে আবেদন জানায়: প্রাণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের হাতে যেন এরা সুবিচার পায়। মনে হয়, চোখের ভাষায় সে বলছে, "হত্যা করার জন্য, মাংস খাবার জন্য বা নিষ্ঠুরতা করার জন্য তোমাকে আমাদের ওপরে রাখা হয়নি। রাখা হয়েছে আমাদের বন্ধু ও অভিভাবক হবার জন্য।"[৩১৭]

আমি একে পূজা করি এবং সমস্ত জগতেব বিরুদ্ধে গিয়েও এই পূজা আমি রক্ষা করব।[৩১৮]

গো-মাতা বহু অর্থে আমাদের জন্মদাত্রী মায়ের চেয়ে শ্রেয়। মা আমাদের দুধ দেন মাত্র দু'বছর, এবং আশা করেন বড় হয়ে আমরা তাঁর সেবা করব। গো-মাতা ঘাস ও দানা ছাড়া আমাদের কাছে কিছুই প্রত্যাশা করেন না। আমাদের মা প্রায়ই অসুস্থ হন, এবং আমাদের কাছে সেবা আশা করেন। গো-মাতা ক্বচিৎ-কদাচিৎ অসুস্থ হন।

গো-মাতার সেবাকার্য চলতে থাকে একনাগাড়ে। মৃত্যুতেও তা শেষ হয় না। আমাদের মায়ের মৃত্যু হলে দাহ বা সমাধির খরচ আছে। জীবনে যেমন, মরণেও তেমনই কাজে লাগেন গো-মাতা। তাঁর শরীরের প্রতি অংশ আমরা কাজে লাগাতে পারি,—তাঁর মাংস, হাড়, অন্ত্র, শিং ও চামড়া। যে মা জন্ম দেন তাঁকে তুচ্ছ করছি না। কিন্তু আমি কেন গোরুর পূজা করি তার পর্যাপ্ত কারণ দেখাচ্ছি।[৩১৯]

হিন্দু ধর্মে গাভী

হিন্দু ধর্মের মূল সত্য হল গো-রক্ষা। মানুষের বিবর্তনে গো-রক্ষা আমার কাছে এক আশ্চর্য ঘটনা। গো-সেবা মানুষকে তার প্রজাতির ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। গোরু আমার কাছে সকল মনুষ্যেতর প্রাণী জগতের প্রতীক। মানুষ গোরুর মাধ্যমে সকল জীবের সঙ্গে ঐক্য বোধ করে। কেন গোরুতে দেবত্বারোপ করা হয়, তা আমার কাছে স্পষ্ট। ভারতে গোরুই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী। তার দানের অন্ত ছিল ন্যা। শুধু দুধ নয়, সে কৃষিকার্যেও সাহায্য করত...গো-রক্ষা, পৃথিবীর প্রতি হিন্দুধর্মের উপহার। যতিদিন হিন্দুরা গো-রক্ষা করবে হিন্দুধর্ম বাঁচবে...

গো-রক্ষার ক্ষমতা দিয়েই বিচার করা হবে হিন্দুদের। তাদের ফোঁটা তিলক দিয়ে নয়, শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে নয়, তীর্থযাত্রা বা জাত-পাতের গোঁড়ামি দিয়ে নয়।[৩২০]

গো-হত্যা

গো-রক্ষা করছে বলে কোনও মানুষকে যেমন আমি হত্যা করব না, তেমনই কোনও মানুষের জীবন রক্ষা করেছে বলে কোনও গোরুকে মারব না, সে যত দামীই হোক।[৩২১]

আমার ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা আমি অন্য মতাবলম্বীদের মনে এই বিশ্বাস মুদ্রিত করব যে, গো-হত্যা পাপ। এ কাজ ত্যাগ করা উচিত।[৩২২]

আইন করে গো-হত্যা নিবারণ করা যাবে না। জ্ঞান, শিক্ষা, গোরুর প্রতি মমতাই শুধু এ-কাজ বন্ধ করতে পারে। যে-সব প্রাণী দেশেব পক্ষে বোঝা তাদের বাঁচানো যাবে না। হয়তো মানুষ বোঝা হয়ে উঠলে তাকেও বাঁচানো যাবে না।[৩২৩]

আমি দেখতে চাই, গো-রক্ষা নীতি সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ আমার অভিলাষ। তবে, তাব জন্য সবার আগে আমাকে নিজের ঘর গুছিয়ে তুলতে হবে।[৩২৪]

গো-রক্ষা আমার কাছে শুধু গোরুকে রক্ষা কবা নয়। পৃথিবীর সকল জীবিত, অসহায়, দুর্বলকে রক্ষা করা।[৩২৫]

কিন্তু আবারও বলি,...গো-রক্ষা ব্যাপারে যে-কোনও কার্যসূচীর ন্যূনতম অংশ হল আইনী নিষেধ...মানুষ মনে কবে, কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইন হলে অন্যায়টি তিরোহিত হবে। সে জন্য আর চেষ্টা করতে হবে না। এর চেয়ে বড আত্মপ্রবঞ্চনা আব হয় না। আইন প্রণয়নের লক্ষ্য যেখানে এক অজ্ঞ বা ক্ষুদ্র অন্যায়কাবী গোষ্ঠী, সেখানে তার বিরুদ্ধে আইন কার্যকর হতে পারে। কিন্তু এক বুদ্ধিমান ও সংগঠিত জনমত, অথবা ধর্মের আবরণেব আড়ালে কোনও ধর্মান্ধ ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যে আইনের বিরোধিতা করে, তখন তা কখনও সফল হতে পারে না।

গো-রক্ষার প্রশ্নটি নিয়ে যতই ভাবছি, ততই মনে এ ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে, গোরু ও গো-কুল রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমার প্রস্তাবিত পথে অবিরাম গঠনমূলক কর্মোদ্যোগ চালানো যাবে।[৩২৬]

গো-সেবা

গৃহপালিত পশুর সুরক্ষা গো-সেবার এক আবশ্যিক অঙ্গ। ভারতেব পক্ষে এ প্রশ্ন খুব জরুরি...এই মুহূর্তে দরকার গভীর অনুশীলন এবং ত্যাগের প্রেরণা। টাকা জমিয়ে পাহাড় করে কিছু দান-খয়রাত করার মধ্যে সত্যকার কাজের ক্ষমতার পরিচয় নেই। আসল কাজের কাজ হল, কেমন করে পশু-সংরক্ষণ করতে হবে তা জানা। লক্ষ লক্ষ মানুষকে তা জানানো। নিজে সেই আদর্শের যোগ্য হয়ে ওঠা। এই প্রচেষ্টায় অর্থব্যয় করা।[৩২৭]

গো-রক্ষার আর্থনীতিক প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবলে, সে প্রয়োজন সহজেই মেটানো যায় যদি প্রশ্নটি ওরই ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। তেমন হলে, দুধ দিতে অক্ষম গৃহপালিত পশু, খরচের তুলনায় অল্প দুধ দেয় এমন গাভী এবং বুড়ো ও অক্ষম গৃহপালিত

পশুদের হত্যা করা হবে দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই। ভারতে এই হৃদয়হীন অর্থনীতির কোনও স্থান নেই। যদিও স্ববিরোধিতার এই দেশের অধিবাসীরা হয়তোবা, বাস্তবিকই, বহু হৃদয়হীন কাজের অপরাধে অপরাধী।

ইতিবাচক উদ্যোগ

প্রতিপালনের খরচের চেয়ে গোরু যখন কম দুধ দেয় বা কোনওভাবে লোকসানের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে হত্যা না করে বাঁচানো যাবে কী করে? এই প্রশ্নের জবাব এ-ভাবে দেওয়া যায়:

১. গোরু এবং গো-কুলের প্রতি হিন্দুরা তাদেব যথাকর্তব্য করলে। তারা তা করলে, আমাদের গৃহপালিত পশু ভাবত ও পৃথিবীর গর্ব হতো। আজ ঘটনা তার সম্পূর্ণ বিপবীত।

২. পশুপ্রজনন-বিজ্ঞান শিক্ষা ক'রে। আজ এ-কাজে সম্পূর্ণ নৈরাজ্য চলছে।

৩. পশুকে খাসি কবার যে নিষ্ঠুর প্রথা বর্তমান, তার বদলে পাশ্চাত্যের অধিকতর মানবিক প্রথা গ্রহণ ক'রে।

৪. ভারতের পিঁজরাপোলগুলির আমূল সংস্কারসাধন ক'রে। কিছু না-জেনে, নিয়মকানুনের বালাই না রেখে আজ ওগুলো পরিচালিত হচ্ছে। যারা চালায়, তারা তাদের কাজ বিষয়ে অজ্ঞ।

৫. এই প্রাথমিক কাজগুলি হয়ে গেলে দেখা যাবে, মুসলিমরা নিজে থেকেই বুঝবে, গোমাংস বা অন্য কাবণে গোরু জবাই করার দরকার নেই। হতে পারে মনের এই পরিবর্তন হিন্দু ভাইদের জন্যই।

পাঠক দেখবেন ওই কথাগুলির পিছনে আছে একটাই ব্যাপার, তার নাম অহিংসা বা নামান্তরে বিশ্বজনীন করুণা। চূড়ান্ত বস্তুটি উপলব্ধ হলে বাকি সবকিছুই সহজ হয়ে যাবে। যেখানে অহিংসা, সেখানেই অসীম ধৈর্য, আন্তর শান্তি, সুবিবেচনা, আত্মত্যাগ ও সত্য জ্ঞান।[৩২৮]

৮২. গবাদি-পশু সমবায়

নিজ বাড়িতে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিজের গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা কোনও চাষীর পক্ষে একা সম্ভব নয়। অন্যান্য কাবণের মধ্যে, যৌথপ্রচেষ্টার অভাবই গোরু এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর অবনতির এক প্রধান কারণ। আজকের দুনিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে যৌথ বা সমবায় আদর্শেব দিকে এগিয়ে চলেছে। এ-পথে বহু কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। আমাদের দেশেও এর ঢেউ এসে লেগেছে। তবে খুবই বিকৃতভাবে। ফলে আমাদের গরিবরা এ-থেকে কোনও সুফল আদায় করতে পারেনি। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে গড়-পড়তা চাষীব জমি রোজ কমে যাচ্ছে। তা ছাড়া, ব্যক্তিবিশেষের হাতে যে জমি থাকে, তা প্রায়ই টুকরো টুকরো।

এই রকম একজন চাষীর পক্ষে বাড়িতে গবাদি পশু রাখা আত্মঘাতী নীতি। তবু, এটাই তাদের আজকের হাল। যারা অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেয়, এবং ধর্মীয়, নৈতিক বা মানবিক ধ্যানধারণার প্রতি মনোযোগ প্রায় দেয়ই না, তারাই মিনারের মাথায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যে, চাষীকে গিলে ফেলছে তার গৃহপালিত পশু। কেননা পশু-খাদ্যের দাম, পশু যা দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি। তারা বলে, সব অকেজো পশুকে পাইকারি হারে কেটে না-ফেলা বোকামি।

মানবতাবাদীদের কী করা উচিত, সেটাই প্রশ্ন। সাফ জবাব হল, এমন একটা পথ বের করতে হবে, যাতে আমরা শুধু যে গৃহপালিত পশুদের প্রাণ বাঁচাব তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও দেখব, তারা যেন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। আমি নিশ্চিত, সমবায়প্রথা আমাদের অনেকখানি সাহায্য করবে। নিচের তুলনাগুলি সহায়ক হতে পারে:

১. যৌথপ্রথায় কোনও কৃষক এখনকার মতো বাড়িতে পশু রাখতে পাববে না। পশু বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়। চরপাশ নোংরা করে। পশুর সঙ্গে বাস কবার মধ্যে সুবুদ্ধি ও মানবিকতার কোনও পরিচয় নেই। এটা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যৌথপ্রথা গ্রহণ করলে, পশু আজ কৃষকের বাড়িতে যে জায়গা জুড়ে আছে তা কৃষক ও তার পরিবার পাবে।

২. পশুর সংখ্যা যত বাড়ে বাড়িতে কৃষকের জীবন তত দুবিষহ হয়ে ওঠে। তাই সে বাধ্য হয়ে বাছুর বেচে দেয়, মদ্দা মোষ মেরে ফেলে নয়তো তাড়িয়ে দেয়। তখন বিতাড়িত পশু না খেয়ে মরে যায়। সমবায় ভিত্তিতে পশুর যত্ন নিলে এই অমানবিকতা এড়ানো যায়।

৩. যৌথ গৃহপালিত পশু খামাব গড়ে উঠলে, অসুখ হলে পশুরা পশুচিকিৎসার সুযোগ পাবে। কোনও সাধারণ কৃষক নিজে এ-ব্যবস্থা করতে পারে না।

৪. এ-ভাবেই যৌথপ্রথায় একটি বাছাই করা ষাঁড়কে অনেকগুলি গাইয়ের দরকারের জন্য রাখা যায়। দয়াধর্ম ব্যতীত এ কাজ অসম্ভব।

৫. সমবায় প্রথায় সাধারণ গো-চারণ ভূমি, বা পশুদের চলাফেরার জায়গা সহজেই মিলবে। আজ, সাধারণত, একজন চাষীর কাছে এরকম কিছু নেই।

৬. যৌথপ্রথায় পশু-খাদ্যের খরচ তুলনায় কম হবে।

৭. ভালো দামে দুধ বেচার অনেক সুবিধা হবে। আজ একজন গোয়ালা যা করে, সেই দুধে জল মেশাবার দরকার বা প্রলোভন থাকবে না।

৮. আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি পশুর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা একজন ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু এ-কাজ সহজেই করা যায় পুরো গ্রামের পশুর ক্ষেত্রে। পশুর জাত যাতে ভালো হয়, সে কাজ করাও সহজ হবে।

৯. সমবায় ভিত্তিক পশু-খামারের সপক্ষে উপরে বর্ণিত সুবিধাগুলি অকাট্য যুক্তি বলে বিবেচিত হবে। জোরাল যুক্তি হল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রথার ফলে আমাদের ও আমাদের গৃহপালিত পশুদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই আবশ্যিক পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা নিজেদের ও পশুদের বাঁচাতে পারি।

আমি এ-ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সমবায়-খামার ছাড়া আমরা কৃষিকাজের পুরো

সুফল পাব না। একটি গ্রামের একশোটি পরিবার যৌথপ্রথায় জমি চাষ করল, রোজগার ভাগ করে নিল, জমিকে একশো ভাগে ভাগ করল না—এটাই কি অনেক ভালো ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়? জমির ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও তাই।

রাতারাতি মানুষকে এ-রকম জীবনধারায় নিয়ে আসা কঠিন হবে,—সে তো অন্য কথা। ঋজু ও সংকীর্ণ পথে চলা সব সময়েই কঠিন। গো-সেবা কর্মসূচীর প্রতিটি পদক্ষেপ সমস্যাকণ্টকিত। বড় বড় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই এ-পথকে সহজ করার আশা করতে পারি। আপাতত আমার উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তিগত উদ্যোগের চেয়ে যৌথ পশু-খামারের উপযোগিতা যে কত বেশি তা দেখানো। আরও একটু এগিয়ে বলি, আগেরটি ভুল, একমাত্র পরোক্তটি সঠিক। বাস্তবক্ষেত্রেও একমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমেই ব্যক্তি তার স্বাধীতাকে রক্ষা করতে পারে। পশু খামারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-প্রচেষ্টা স্বার্থপরতা ও অমানবিকতায় পৌঁছেছে। যৌথ প্রচেষ্টা দুটিকে পুরোপুরি দূর করতে না পারলেও প্রশমিত কবতে পারবে।[৩২৯]

৮৩. প্রকৃতি-চিকিৎসায় আরোগ্য

আমাব বিশ্বাস, মানুষের ওষুধেব দরকার খুব সামান্য। ১০০০-এর মধ্যে ৯৯৯টি রোগ সুষম আহার, জল-চিকিৎসা, মাটি-চিকিৎসা এবং অনুরূপ গৃহ-চিকিৎসাব দ্বারা সারানো সম্ভব।[৩৩০]

আমি মন করি, যেখানে ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার নিয়ম কঠোবভাবে মানা হয়, আহার ও ব্যায়াম বিষয়ে যত্ন নেওয়া হয়, সেখানে কোনও অসুস্থতা ও বোগেব অবকাশ নেই। যেখানে ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ শুচিতা বিদ্যমান, সেখানে রোগ অসম্ভব। গ্রামের মানুষ এটা বুঝলে তাদের আব ডাক্তার বা হাকিম বা বৈদ্য দবকাব হতো না...[৩৩১]

উন্নততর জীবন

প্রকৃতি-চিকিৎসা মানে এক আদর্শ জীবনধারণ। যার জন্য বসবাসেব আদর্শ পরিবেশ চাই শহরে ও গ্রামে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে অবশ্যই রয়েছে ঈশ্বরের নাম, যাকে ঘিরে প্রকৃতি-চিকিৎসার আরোগ্য-ব্যবস্থা আবর্তিত হচ্ছে।[৩৩২]

প্রকৃতি-চিকিৎসা মানে যথাসম্ভব শস্তা ও সহজ চিকিৎসা। গ্রামের পক্ষে এই চিকিৎসাই আদর্শ। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ গ্রামবাসীরাই দিতে পারবে। যেটা পারবে না তা জোগাড় করতে হবে।

প্রকৃতি-চিকিৎসা জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে শুভপরিবর্তন এনে দেয়। এর অর্থ, স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন-নিয়ন্ত্রণ। হাসপাতাল থেকে বিনা পয়সায় বা পয়সা দিয়ে ওষুধ নেওয়ার ব্যাপার এটা নয়। যে হাসপাতালে বিনা পয়সার চিকিৎসা করায়, সে দয়ার দান নিচ্ছে। যে প্রকৃতি-চিকিৎসা করায়, সে কখনো ভিক্ষা করে না। নিজেকে

নিজে সাহায্য করলে আত্মসম্মান বাড়ে। সে শরীর থেকে বিষ বের করে দিয়ে আরোগ্য হবার ব্যবস্থা করে। ভবিষ্যতে অসুস্থ হবার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে...[৩৩৩]

সঠিক আহার

সঠিক ও সুষম আহার আবশ্যিক। আজ আমরা যেমন, আমাদের গ্রামবাসীরাও তেমনই দেউলিয়া। প্রকৃতি-চিকিৎসা-পরিকল্পনার এক আবশ্যিক অঙ্গ হল, গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে সবজি, ফল ও দুধ উৎপাদন করা। এতে যে সময় যাবে, তাকে অপচয় মনে করা উচিত নয়। এর ফলে সকল গ্রামবাসীর উপকার হতে বাধ্য। উপকৃত হবে সমগ্র ভারত।[৩৩৪]

প্রকৃতি-চিকিৎসার সার হল,—আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও প্রণালীর নিয়ম শিখি, ও সে নিয়ম মেনে চলি,—সেই সঙ্গে সঠিক পুষ্টির নিয়মও। এ-ভাবে প্রত্যেকে নিজের চিকিৎসক হয়ে ওঠে।

যে ব্যক্তি বাঁচার জন্য খায়, ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোম—এই পঞ্চভূত যার বন্ধু, সে এইসব কিছুর স্রষ্টা ঈশ্বরের সেবক। তার অসুস্থ হওয়া উচিত নয়। যদি হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস বেখে সে শান্ত থাকবে। দরকার হলে শান্তিতে মরবে। তাব গ্রামের মাঠে যদি বনৌষধি থাকে, সে তা কাজে লাগাতে পারে। কোটি কোটি মানুষ এভাবেই বাঁচছে, টুঁ-শব্দটি না করে এ-ভাবেই মরছে। তাবা ডাক্তারের নামও শোনেনি, মুখোমুখি তো দেখেইনি।[৩৩৫]

ব্যাধি

ইচ্ছায় বা অজ্ঞতায় প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কবলে তা থেকে ব্যাধির উৎপত্তি হয়। অতএব, সময় থাকতে ওই সব নিয়মে ফিবে এলে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হবে। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে সহনাতীত পীড়া দিয়েছে, প্রকৃতিপ্রদত্ত শাস্তি তাকে সইতে হবে। অথবা তা এড়াতে হলে, অসুখ বুঝে ডাক্তাব বা শল্য-চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। যোগ্য শাস্তির কাছে পরাজয় স্বীকার মানুষেব মনে শক্তি জোগায়, শাস্তি এড়িয়ে গেলে মন দুর্বল হয়।[৩৩৬]

প্রকৃতি-চিকিৎসা এবং দেশজ প্রথার প্রতি আমার ভালবাসা আছে বলেই যে আমি পাশ্চাত্য চিকিৎসার অগ্রগতি বিষয়ে অন্ধ, তা নয়। যদিও তাকে আমি কলঙ্কের টীকা দিয়েছি 'শয়তানী জাদু' বলে। কথাটা রূঢ় হয়ে গেল, কিন্তু তা প্রত্যাহারও করছি না, কেননা, প্রথমত তা জীবন্তপ্রাণী ব্যবচ্ছেদ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ভয়ঙ্করতার সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয়ত, যত মন্দ উপায়েই হোক, সে আয়ু দীর্ঘতর করার কাজে বিরত হবে না, এবং তৃতীয়ত, দেহস্থ অমর আত্মাকে সে উপেক্ষা করে। প্রকৃতি-চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা, প্রকৃতি-চিকিৎসকদেব অলস ভণ্ডামি সত্ত্বেও আমি এটা আঁকড়ে পড়ে থাকি।[৩৩৭]

গ্রামের জন্য

আমার প্রাকৃতিক-চিকিৎসা একান্তভাবে গ্রাম ও গ্রামবাসীর জন্য। এতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র,

এক্স-রে বা অনুরূপ উপকরণের কোনও জায়গা নেই। এ চিকিৎসায় কুইনিন, এমেটিন বা পেনিসিলিনেরও দরকার নেই। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থ জীবনযাপন প্রাথমিক আবশ্যকতা। এটা করলেই যথেষ্ট হবে।

সবাই এটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারলেই অসুখ বিসুখের বালাই থাকবে না। রোগ সারাবার সকল প্রাকৃতিক বিধান মানার পরেও যদি অসুখ হয়, তাহলে চিরন্তন সার্বভৌম চিকিৎসা আছে রামনামে। কিন্তু রামনামের মাধ্যমে রোগমুক্তি একদিনে বিশ্বজনীন হয়ে উঠবে না। রোগীর মনে বিশ্বাস জাগাতে হলে, চিকিৎসককে রামনামের মাহাত্ম্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হতে হবে।[৩৩৮]

গ্রামই হোক আমাদের ধ্যানজ্ঞান। গ্রামের শিশু ও বয়স্করা আমাদের কাছে আসে। তাদের শেখাই কেমন করে বাঁচার মতো বাঁচতে হয়। ডাক্তাররা বলেন, নিরানব্বই শতাংশ রোগের জন্ম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অখাদ্য খাবার এবং অপুষ্টি থেকে। আমরা যদি এই ৯৯% কে বাঁচতে শেখাই তবে ১% কে ভুলে যেতে পারি...ওরা কোনও মানবদরদী ডাক্তার পেয়ে যেতে পারে। ওদের দেখ-ভাল করার জন্য ওদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই।[৩৩৯]

জানতে ইচ্ছে করে, দেশের জন্য ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা কী করছেন। দেখা যায়, তাঁরা চটপট চলে যান বিদেশে। বিশেষ অসুখের বিশেষ চিকিৎসার নতুন ধারা শিখতে। আমার প্রস্তাব, তাঁবা ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের দিকে মনোযোগ দিন। তাহলে তাঁরা দেখবেন, গ্রামসেবার কাজে যে-সব যোগ্যতাসম্পন্ন নারীপুরুষ প্রয়োজন, তাদের পাশ্চাত্য ধাবায় শিক্ষিত না হয়ে প্রাচ্য প্রথায় শিক্ষিত হওয়া দরকার। তখন তাঁরা নানা দেশজ প্রথার সঙ্গে খাপ রেখে যাবেন।

ভারতের গ্রামেই যখন পর্যাপ্ত ওষধি-ভেষজ জন্মায় তখন পশ্চিম থেকে আমদানি করা ওষুধের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ওষুধের চেয়েও বেশি দরকার, মানুষকে ঠিকভাবে বাঁচাব প্রণালী শেখানো।[৩৪০]

৮৪. যৌথ শৌচালয়

জন -বিবেক

সর্বসাধারণের ব্যবহার্য শৌচালয়গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সকলে যদি তাগিদ অনুভব করে এবং আন্তরিকভাবে যত্নবান হয়, কেবল তাহলেই যৌথ-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে। পথের এবং ব্যক্তিগত বা সাধারণ শৌচালয়ের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য অস্পৃশ্যতাও অনেক দায়ী।

গোড়ায়, স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রথম কথাই ছিল অস্পৃশ্যতা। ভারতের বাইবে সর্বত্র আজও তা-ই আছে। অর্থাৎ অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি বা বস্তু অস্পৃশ্য। কিন্তু যেই মুহূর্তে সেই অপরিচ্ছন্নতা দূর হবে মানুষ বা বস্তুটি আর অপরিচ্ছন্ন রইল না। তাই, যে জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ

করে, সে বেতনভোগী ভাঙ্গী হোক বা অবৈতনিক মা—যতক্ষণ না তারা নোংরা কাজ করার ফলে যে অপরিচ্ছন্নতা, তা ধুয়ে ফেলে ততক্ষণ তারা অপরিচ্ছন্ন।[৩৪১]

পৌরসভা

শুধুমাত্র কর বসিয়ে এবং মাইনে-করা লোক দিয়ে কোনও পুরসভা-ই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং জঞ্জালের স্তূপ দূর করতে পারবে না। ধনী ও দরিদ্রের ঐক্যবদ্ধ স্বেচ্ছা-সহযোগিতার দ্বারাই একমাত্র এই জরুরি সংস্কার সম্ভব।[৩৪২]

আমি যদি কোনও স্থানীয় বোর্ড বা পৌরসভা এলাকার করদাতা হতাম, তাহলে, যতক্ষণ না প্রদত্ত করের চার গুণ উশুল হয়, ততক্ষণ এক পাই-ও বাড়তি কর দিতাম না এবং অন্যদেরও দিতে নিষধ করতাম। প্রতিনিধি হিসেবে যারা স্থানীয় বোর্ড বা পৌরসভায় যায়,—তারা নাম কিনতে বা পারস্পরিক শত্রুতা করতে যায় না, যায় ভালবাসা-শিঞ্চিত এক সেবাকার্য করতে, যা পয়সার ওপর নির্ভর করে না।

আমাদের দেশ নিঃস্ব। পৌর সদস্যদের মধ্যে যদি প্রকৃত সেবাকার্যের প্রেরণা থাকে, তাহলে তারা নিজেরাই হয়ে যাবে অবৈতনিক জমাদার, ভাঙ্গী, পথ-নির্মাতা। সে কাজ ক'রে তারা গর্ববোধ করবে। যারা কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়নি, সে-সব সহ-সদস্যদেরও আমন্ত্রণ জানাবে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য। যদি কাজের উদ্দেশ্যটিতে এবং নিজেদের উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে তাদের আদর্শ সাড়া জাগাবেই।

তার মানে, পৌরপিতা হবেন সর্বক্ষণের কর্মী। তার কোনও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। এর পরের কাজ হল, স্থানীয় বোর্ড বা পৌরসভার এলাকাভুক্ত সমগ্র প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা তালিকাভুক্ত করা। এদের সকলকেই পুরসভার কাজে হাত লাগাতে ডাকা হবে। হাজিরা-খাতা রাখতে হবে। যারা খুব গরিব, চাঁদা দেবার ক্ষমতা নেই, অথচ সুস্থ ও কর্মক্ষম, তাদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম-দানের কথা বলা যেতে পারে।[৩৪৩]

প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ

যেখানে সেখানে থুথু ফেলে, জঞ্জাল ফেলে যারা বাতাস দূষিত করে বা অন্যভাবে চারপাশ নোংরা করে তারা মানুষ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপ করে। মানব দেহ ঈশ্বরের মন্দির। সে মন্দিরে যে বাতাস ঢুকবে, তাকে যে দূষিত করে, সে সেই মন্দিরকে কলুষিত করে। রামের নাম সে বৃথাই নেয়।[৩৪৪]

জাতীয় বা সামাজিক স্বাস্থ্যবোধ আমাদের মধ্যে নেই। যেখানে, যে-ভাবেই স্নান করি না কেন, আমরা পাতকুয়ো বা পুকুরের জল নোংরা করি। এমনকি, যে-নদীর ধারে বা যে নদীতে স্নান-আহ্নিক করি, সে নদীর জল নোংরা করতেও আমাদের বাধে না। এ-এক অতি বিশ্রী বদভ্যাস। এই বদভ্যাসের জন্যই আমাদের গ্রামের, এবং আমাদের পবিত্র নদী ও তার পবিত্র তীরভূমির এই দূরবস্থা। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যই নানা রোগের উৎপত্তি।[৩৪৫]

৮৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য আমি যে সবসময়ে ব্যাকুল থেকেছি, সে কথা আমার জীবৎকালে না হোক মৃত্যুর পরে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই স্বীকার করবে।[৩৪৬]

আমি কায়মনোবাক্যে [হিন্দু ও মুসলিম]-এই দুটিকে মৈত্রীবন্ধনে বেঁধে দিতে চেয়েছি—প্রয়োজন হলে, আমার রক্ত দিয়েও।[৩৪৭]

মুসলমান ও হিন্দুর প্রতি আমার সমান ভালবাসা। আমার হৃদয় মুসলমানেব জন্য যেমন, হিন্দুর জন্য তেমনই কাতর হয়। যদি খুলে দেখাতে পারতাম, দেখতে, সেখানে কোনও আলাদা আলাদা কক্ষ নেই,—যার একটি হিন্দুর জন্য, একটি মুসলমানেব জন্য এবং অন্যগুলি অন্যান্যদের জন্য সংরক্ষিত।[৩৪৮]

ঐক্যের অর্থ

নিতান্ত তরুণ বয়স থেকেই আমি মনেপ্রাণে (হিন্দু-মুসলিম ঐক্য) চেয়েছি। কয়েকজন মহত্তম মুসলিমকে আমি আমার বন্ধু মনে করি। আমার এক ইসলাম ধর্মনিষ্ঠ মেয়ে আছে, যে মেয়ের চেয়েও বেশি। সে ওই ঐক্যের জন্য বাঁচছে। সানন্দে সেজন্য মরতেও রাজি আছে। বম্বের জুমা মসজিদের প্রযাত মুয়েজ্জিনেব ছেলে আমাব আশ্রমেব এক একনিষ্ঠ সদস্য ছিল।[৩৪৯]

[হিন্দু-মুসলিম ঐক্য]-র ভিত্তি হচ্ছে, আমাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য, অভিন্ন অভীষ্ট ও অভিন্ন দুঃখবেদনা। পরস্পরের দুঃখ বেঁটে নেওয়ার পারস্পবিক সহিষ্ণুতায় ওই এক লক্ষ্যে পৌঁছবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল সহযোগিতা।[৩৫০]

হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য মানে শুধু হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য নয়, পরন্তু যারা মনে করে ভারত তাদের দেশ, তাদের সকলের ঐক্য। তাব ধর্মবিশ্বাস যা-ই হোক না-কেন।[৩৫১]

ধর্মের মতো, বন্ধুত্বের ভিত্তিও ভালবাসা। ভালবাসাব অধিকারে আমি মুসলমানের বন্ধুত্ব লাভ করতে চাই। একটি সম্প্রদায়ের মনেও যদি ভালবাসা জেগে থাকে, আমাদের জাতীয় জীবনে ঐক্য প্রাতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হবে।[৩৫২]

এক পরিবার

সর্বোত্তম পথ হল, বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো এবং সমগ্র মানব পরিবারকে এক পরিবারের সদস্য বলে গণ্য করা। যে নিজের ও অপরের পরিবারের মধ্যে পার্থক্য করে, স্ব-পরিবারের সদস্যদের সে ভুল শিক্ষা দেয়। বিরোধ ও অধর্মের পথ খুলে দেয়।[৩৫৩]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

(সাম্প্রদায়িকতার) উচ্ছৃঙ্খলতা এক দানব, যার অনেকগুলি মুখ। শেষ পর্যন্ত সে সকলকেই আঘাত করে। যারা মুখ্যত এর জন্য দায়ী, তাদেরও রেয়াৎ করে না।[৩৫৪]

যদি এক পক্ষ প্রত্যাঘাত করা বন্ধ করে, তাহলে দাঙ্গাও বন্ধ হবে।[৩৫৫]

অন্যায়কারীর ধর্মাবলম্বী-আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেওয়া কাপুরুষের কাজ।[৩৫৬]

তুলনামূলকভাবে পবিত্র চরিত্রের মানুষ ইসলাম ও হিন্দুধর্মে অবশ্যই মিলবে যারা ওইসব [গুণ্ডাদের] মধ্যে কাজ করবে।[৩৫৭]

আমরা গুণ্ডাবাজদের রাশ টেনে ধরব, তাদের মন বদলাব।[৩৫৮]

ইসলাম বা হিন্দুধর্ম, বা উল্লেখযোগ্য কোনও ধর্মেই গুণ্ডামির কোনও স্থান নেই।[৩৫৯]

ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রত্যেকে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে। মনের গোপনেও অপরের অনিষ্টচিন্তা থেকে বিরত থাকবে।[৩৬০]

অন্য ধর্মকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কোনও প্ররোচনা বরদাস্ত করা হবে না।[৩৬১]

একে অপরেব ধর্মকে নিন্দা করা, দায়িত্বহীন বিবৃতি দেওয়া, অসত্য বলা, নিরীহ মানুষের মাথা ফাটানো, মন্দির বা মসজিদ অপবিত্র করা—ঈশ্বরকে অস্বীকার করার সামিল।[৩৬২]

(সাম্প্রদায়িক) জট ছাড়াবার চাবি প্রত্যেকের কাছে আছে। তা হল স্বধর্মেব সাব অনুসরণ করা, অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ কবা।[৩৬৩]

প্রাচীন সংস্কৃতির গোপন ঐশ্বর্য খুঁজতে গিয়ে আমি এই অপরিমেয় আশীর্বাদ পেলাম যে, প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতিতে যা চিরস্থায়ী তা যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ ও জরাথুস্ত্রেব শিক্ষাতেও পাওয়া যায়।[৩৬৪]

হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মবিশ্বাসের সারাৎসার আত্মস্থ করেছে। সেই অর্থে এ কোনও অনন্য ধর্ম নয়। তাই ইসলাম বা তার অনুসারীদের সঙ্গে এর কোনও বিবাদ থাকতে পারে না।[৩৬৫]

তরবারি ইসলামের প্রতীক নয়। তবে ইসলাম জন্ম নিয়েছিল এমন এক পরিবেশে, যেখানে তরবারি সর্বোচ্চ আইন, তখনো ছিল, আজও আছে,....মুসলমানদেব মধ্যে আজও তরবারি খুব বেশি দেখা যায়। ইসলাম অর্থ 'শান্তি'। তাই ইসলামকে সার্থক হয়ে উঠতে হলে ওই তরবারি খাপে ভরতে হবে।[৩৬৬]

ইসলামের বিশিষ্ট অবদান...ঈশ্বরের একত্বে নিখাদ বিশ্বাস, এবং যারা নামে ইসলামভুক্ত তাদের মধ্যে মানবসৌভ্রাত্রের সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করা।[৩৬৭]

ইসলাম মানে শান্তি। এই শান্তি শুধু মুসলিমদের মধ্যে বন্দী থাকতে পারে না। সমগ্র দুনিয়ার জন্য এই শান্তি প্রসারিত করতে হবে।[৩৬৭]

ধর্মান্তরণ

জোর করে ধর্মান্তরিত করার দিন চলে গেছে।[৩৬৯]

এ হল এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে আনুগত্য বদল করা, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মবিশ্বাসকে পারস্পরিক প্রত্যাখ্যান, যা পারস্পরিক বিদ্বেষের জন্ম দেয়।[৩৭০]

ধর্মান্তরিত করার জন্য বলপ্রয়োগের কোনও অনুমোদন কোরানে নেই।[৩৭১]

নাগরিক জীবনে যেমন আমরা একে-অপরের মাথা ফাটাই না, তেমনি ধর্মীয় ব্যাপারেও তা করতে পারি না।[৩৭২]

আমার বিশ্বাস, নেতারা না চাইলে জনগণ লড়াই করতে চায় না। তাই নেতারা যদি সহমত হন যে, প্রতিটি উন্নত দেশের মতো পারস্পরিক বিবাদ জনজীবন থেকে মুছে ফেলা দরকার, কেননা তা অধর্মীয়, বর্বরোচিত, তাহলে আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, জনগণ তাঁদের অনুসরণ করবে।[৩৭৩]

সালিস

সালিসি এক প্রাচীন ও সভ্য পন্থা।[৩৭৪]

সকল যুগে এবং সকল জাতির পক্ষে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা অত্যাবশ্যক।[৩৭৫]

ক্ষুব্ধ দলগুলি যাতে স্বহস্তে আইন তুলে নিতে না-পারে নিরপেক্ষ জনমত সেটা নিশ্চিত করবে। প্রতিটি মামলা [বিরোধ] নিষ্পত্তির জন্য সালিস বা আদালতে পাঠাতে হবে।[৩৭৬]

মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো

যেহেতু হিন্দুরা দীর্ঘকাল মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করে দেবার প্রথা কঠোরভাবে মেনে আসছে, তাদের এ-প্রথা ভাঙা অনুচিত। যেখানে তারা বাজনা বাজালে বাধা আসছে না, সেখানে তা চলতে পারে। সেখানে ঝামেলার আশঙ্কা, ঘটনা বির্তকিত, সেখানে দুই সম্প্রদায়েরই প্রসঙ্গটি সালিসিব জন্য পাঠানো উচিত।[৩৭৭]

গাভী

গাভীকে বাঁচানো হিন্দুর ধর্ম। কিন্তু অহিন্দুর ক্ষেত্রে, গোরু বাঁচাবার জন্য বলপ্রয়োগ কখনও তার ধর্ম হতে পাবে না।[৩৭৮]

.....সংখ্যালঘু মুসলিমকে, আইন প্রণয়ন দ্বারা গোহত্যার সংবিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা মানতে বাধ্য করা হিন্দু সংখ্যাগুরুর পক্ষে অবিজ্ঞোচিত ও অনুচিত কাজ।[৩৭৯]

লিপি

হিন্দু ও মুসলিম কর্তৃক (হিন্দী ও উর্দু) লিপি ব্যবহারের ব্যাপারটি আমার মতে ঐকিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।[৩৮০]

চাকরি

[সরকারি দপ্তরে] যদি আমরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রশ্রয় দেই, তাহলে তা ভালো সরকারের পক্ষে মরণান্তিক হবে।[৩৮১]

সংখ্যালঘুরা পূর্ণ সুবিচার পাবার অধিকারী। একমাত্র বিবেচ্য হওয়া উচিত দক্ষতা ও যোগ্যতা....[৩৮২]

সহিষ্ণুতা

পরস্পরের প্রতি যদি নম্র ও সদয় মনোভাব গড়ে তুলি, একমাত্র তাহলেই আমাদের বাঞ্ছিত ঐক্য স্থায়ী হবে।[৩৮৩]

একমাত্র সহিষ্ণুতাই বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সু-প্রতিবেশী ও বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে বসবাস করার কাজে মানুষকে যোগ্য করে তোলে।[৩৮৪]

ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মীয় সংকীর্ণতার চেয়ে জাতীয়তা অনেক বড়। সে অর্থে আমবা প্রথমে ভারতীয়, পবে হিন্দু, মুসলমান, পার্সী ও খ্রীশ্চান।[৩৮৫]

রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হতে বাধ্য।.....তাই আইনেব চোখে সবাই সমান থাকবে। তবে, সকলেরই যে-কোনও ধর্ম অনুসরণের অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে, যতক্ষণ না তা দেশের অইনভঙ্গ কবে।[৩৮৬]

সমান নাগরিকত্ব

সংখ্যালঘুদের উপলব্ধি করাতে হবে, যে-রাষ্ট্রে বাস কবছে, সেখানকাব সংখ্যাগুরুদেব মতোই তাবা সম্মানিত নাগরিক।[৩৮৭]

যদি সংখ্যাগুরু হিন্দু স্ব-ধর্ম ও কর্তব্যকে মূল্যবান মনে কবে, তবে যে-কোনও মূল্যে তাদের ন্যায়ের পথে থাকতে হবে। সংখ্যাগুরু ছাড়া ন্যায়বিচাবেব জন্য সংখ্যালঘুদেব আর কারও ওপর ভরসা করাব নেই। তাই তারা সংখ্যালঘুদের সীমাবদ্ধতা বা ভ্রান্তি গায়ে মাখবে না।[৩৮৮]

মুসলিমদের প্রতি সমান নাগরিকসুলভ আচরণ করা উচিত। আচবণেব সাম্য, উর্দু লিপির প্রতি শ্রদ্ধা দাবি করে।[৩৮৯]

সংখ্যালঘুদের ওপর সামান্যতম উৎপীড়নও যেন না হয়। (ভাষা, লিপি) ইত্যাদি সব প্রশ্ন সন্তর্পণে পরিচালনা করার প্রয়োজন আছে।[৩৯০]

হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন নিয়ে আমার একটাই কথা : এই সমস্যাব সম্পূর্ণ সমাধান তখনই হবে, সে ভারতে হোক বা পাকিস্তানে,—যখন সংখ্যালঘু নিজেকে সম্পূর্ণ নিবাপদ মনে করবে। যদি একজন মাত্র সংখ্যালঘু থাকে, তবুও।[৩৯১]

হিন্দু ও শিখ মেয়েদের উচিত মুসলিম বোনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। তারা ওদেব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবে, নিজেরাও আমন্ত্রণ পাবে। মুসলিম ছেলেমেয়েদের সাম্প্রদায়িক স্কুলে না গিয়ে সাধারণ স্কুলে পড়তে চাওয়া উচিত। তারা মিলেমিশে খেলাধূলা করবে।[৩৯২]

১৩. স্বদেশী

৮৬. চরকা সুসমাচার

গরিবের কাছে

চরকায় যখনই একটি সুতো কাটি, ভারতের গরিবের কথা ভাবি। ভারতের দরিদ্র আজ ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছে মধ্যবিত্ত বা ধনীদের চেয়েও বেশি। যে লোক ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত, উদরপূর্তি ছাড়া আর কিছু যে চায় না, তার কাছে পেটই ঈশ্বর। যে তাকে অন্ন দেবে সে-ই তার ঈশ্বর। তার মধ্যে সে ভগবানকেও দেখতে পারে। যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ সবল তেমন লোককে ভিক্ষা দেওয়া মানে নিজেকে ও তাকে হেয় করা। ওদের একমাত্র দরকার, কাজ। আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে যা কাজ দিতে পারে, তা হল হাতে সুতো কাটা।

...আমি বলেছি, আমার চরকাকাটা এক তপস্যা বা ধর্মানুষ্ঠান। যেহেতু বিশ্বাস করি, দরিদ্রের জন্য নিখাদ ও সক্রিয় ভালবাসার মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাই আমি চরকায় কাটা প্রতিটি সুতোয় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি।[১]

....চরকা, কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে আমাদের একাত্ম করে দেয়। কোটিপতিরা ভাবে, টাকা আছে বলেই দুনিয়ার সব কিছু তার। কিন্তু তা তো নয়। যে-কোনও মুহূর্তে মৃত্যু এসে তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে....জীবন হারানো, আর "আত্ম" বর্জন করা এক নয়। ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য উৎসর্গ হিসেবে, কেমন করে আত্ম বা অহংকে স্বেচ্ছায় মুছে ফেলা যাবে, তা শিখতে হয়। চরকায় কারও একাধিপত্যের কোনও স্থান নেই। চরকা সবচেয়ে গরিব সহ সকলের প্রতীক। চরকা চায় আমরা বিনম্র হব, অহংকার নিঃশেষে বর্জন করব।[২]

সবগুলি নয়, একটি কুটীরশিল্প পুনরুদ্ধার করলে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র দূর হবে। একটি শিল্প পুনরুদ্ধার করা হলে, অন্য শিল্পগুলি তা অনুসরণ করবে....চরকাই হবে আমার সেই বনিয়াদ, যার উপর গড়া হবে এক শক্তসমর্থ গ্রামজীবন। চরকাকে করব সেই কেন্দ্র, যা ঘিরে বাকি সব কাজ আবর্তিত হবে।[৩]

চরকার বাণী

চরকা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, সরল পথে, কম খরচে ও ব্যবসায়িক প্রণালীতে আর্থনীতিক সংকট সমাধানের যোগ্য। তাই, আমি তার সমাদর দাবি করি। ....চরকা দেশের সমৃদ্ধির, তথা মুক্তির প্রতীক। বাণিজ্যিক যুদ্ধ নয়, বাণিজ্যিক শান্তির প্রতীক।[৪]

চরকার চাকার পরিধির চেয়ে তার বাণী অনেক ব্যাপক। এ বাণী হল সরলতার, মানবজাতির সেবার, অপরকে আঘাত না করেই বাঁচার, ধনী ও গরিব, পুঁজি ও শ্রম, রাজপুত্র ও চাষী, এদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন সৃজনের। এই ব্যাপকতর বাণী স্বভাবতই সকলের জন্য।[৫]

চরকার প্রকৃত বাণী হল, শোষণের চিন্তার বদলে সেবার ধারণা নিয়ে আসা। পাশ্চাত্যে, শোষণের কণ্ঠের আধিপত্য। আমি চাই না, আমাদের দেশ ওই প্রবণতা বা কণ্ঠকে নকল করুক।[৬]

আমি সত্যই অনুভব করি, আমেরিকা ও সমগ্র বিশ্বের জন্য চরকার এক বার্তা আছে। কিন্তু যতক্ষণ না ভারত বিশ্বকে দেখিয়ে দেয় যে চরকাকে সে আপন ক'রে নিয়েছে ততক্ষণ তা সত্য হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ভারত আজ তা করছে না। দোষ চরকার নয়। আমার তিলমাত্র সংশয় নেই যে, ভারত ও বিশ্বের ত্রাণ নিহিত আছে চরকায়। ভারত যদি যন্ত্রের দাস হয়, সে-ক্ষেত্রে আমি বলব ঈশ্বর পৃথিবীকে রক্ষা করুন।[৭]

অনাড়ম্বর জীবনে প্রত্যাবর্তন

আমি যখন ইন্দ্রিয় ভোগবাসনাপূর্ণ আধুনিক কৃত্রিম জীবনধারার বিরুদ্ধে বলি,—নারী ও পুরুষকে বলি চরকায় বিধৃত সরল জীবনে ফিরে যেতে, তখন তা এজন্য বলি যে, অনাড়ম্বর জীবনে প্রত্যাবর্তনের সুমতি যদি আমাদের না হয় তাহলে পাশবিকতার চেয়েও নিম্নস্তরের এক জীবনে আমাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।[৮]

আমার বিশ্বাস, অহিংসা ব্যতীত আর কোনও পথই ভারতে চলবে না। ভারতের ক্ষেত্রে সেই ধর্মের প্রতীক হল চরকা। কেননা সে একাই দুর্গতের বন্ধু, গরিবের প্রাচুর্যদাতা। ভালবাসার আইন স্থান বা কালের সীমা জানে না। আমার স্বরাজে তাই ভাঙ্গী, ধেড়, দুবলা এবং দুর্বলের মধ্যেও দুর্বলতম—সকলেরই স্থান আছে। চরকা ব্যতীত আমি আর কাউকে জানি না যা এদের সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারে।[৯]

জীবনচক্র

(মনে শান্তি পেতে হলে) চরকা কাটো। চরকার গুঞ্জন তোমার আত্মায় শান্তির প্রলেপ মাখাবে। আমি বিশ্বাস করি, যে সুতো বুনি তা জীবনের ভাঙাচোরা টানাপোড়েন মেরামত করার ক্ষমতা রাখে। চরকা অহিংসার প্রতীক, যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে সারাটা জীবন— যদি তা এক যথার্থ জীবন হয়।[১০]

চরকার চাকার মধ্য দিয়ে কারও কারও মনে পড়বে, শান্তির রাজপুত্র অশোকের নাম। তিনি এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু শেষপর্যন্ত ক্ষমতার আড়ম্বর-আতিশয্য ত্যাগ ক'রে মানুষের হৃদয়ে এক অবিসংবাদী সম্রাট হয়ে ওঠেন। সে-সময়ে প্রচলিত সকল ধর্মবিশ্বাসের প্রতিভূ হন। করুণা ও প্রেমের সেই জীবন্ত আধার সম্পর্কে যে-ধর্মচক্রের কথা শোনা যায়, চরকার চাকার মধ্যে আমরা তারই এক সঙ্গত প্রকাশ দেখতে পাই।

চরকাকে এ-ভাবে ব্যাখ্যা করলে, কোটি কোটি মানুষের জীবনে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। অশোকের ধর্মচক্রের সঙ্গে এর তুলনা, তা থেকে এর উৎপত্তির সূত্র টানা মানে, এই সাদামাটা চরকার মধ্যে, সদাচংক্রমণশীল ঐশ্বরিক প্রেমের আইনের চক্রকে মান্য করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা।[১১]

...চরকা-কাটা আশ্রমের উপাসনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উৎসর্গ হিসেবে চরকা কাটার ধারণাটি ঈশ্বর কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা আমরা বিশ্বাস করি, চরকা, এবং তা যা কিছুর প্রতীক, তার মধ্যেই নিহিত আছে দরিদ্রত্রাণের একমাত্র আশা।[১২]

আমার দাবি, ভারতের মতো এক বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উপমহাদেশে (নিরুদ্যম জয় করার জন্য), চরকাকে সর্বজনীন করাই একমাত্র উপায়। সেই সঙ্গে চরকা কিসের প্রতীক, সে বিষয়েও পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। আমি চরকাকে তুলনা করি কেন্দ্রীয় সূর্যের সঙ্গে এবং অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পকে সৌরজগতের নানা তারামণ্ডলের সঙ্গে। পূর্বোক্তটি পরোক্তদের আলো তাপ দেয়, তাদের ধাবণ করে রাখে। সূর্য না থাকলে তাদের অস্তিত্ব থাকত না।[১৩]

চরকা কাটার কর্তব্য

আমাদের প্রত্যেককে যেমন খেতে পরতে হয়,—ঠিক তেমনি প্রত্যেককে চরকা কাটতে হবে।[১৪]

জানি না, আমি কর্মযোগী বা অন্য কোনওরকম যোগী কিনা। জানি, কাজ ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। চরকায় হাত রেখে আমি মরতে চাই। যদি কাউকে কোনও মাধ্যমের সাহায্যেই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হয়, তবে চরকার মাধ্যমে নয় কেন? 'গীতা'য় ঈশ্বর বলেছেন, যে আমাকে পূজা করে, তাকে আমি সঠিক পথে নিয়ে চলি, তার প্রার্থনা পূর্ণ করি।[১৫]

ভারতের প্রতিটি নারী যদি চরকা কাটে, তাহলে নিশ্চিত এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যাবে, যা জওহরলাল (নেহরু) কাজে লাগাতে পারেন। উৎপাদিত বাষ্পকে যতক্ষণ-না সঠিক ব্যবহার করা হচ্ছে, ইঞ্জিন চলবে না বরং যে বাষ্প উৎপাদন করছে সে ঝলসে যেতে পারে, মৃত্যুও হতে পারে তার।[১৬]

চরকার বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা সমাজতন্ত্রে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ না আমরা চরকার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিজ্ঞান নিয়ে গভীর অনুশীলন করি, ততক্ষণ আমাদের হাতে চরকা ভারতকে মুক্ত করার শক্তিতে পরিণত হবে না। এ-কাজ শুধু যে ভারতকে স্বাধীন

করবে তা নয়— সমগ্র বিশ্বকে পথনির্দেশ দেবে।[১৭]

'স্বাধীনতার পোষাক'

...গরিবের পক্ষে খাদি যেমন রুজি-রোজগারের এক সম্মানজনক কাজ তেমনি অহিংস উপায়ে স্বরাজ লাভের এক মাধ্যম হিসেবেও এর অতিরিক্ত ও অনেক বেশি মূল্য আছে।[১৮]

১৯০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার মাথায় এই ভাবনাটা আসে যে, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত ভারতকে যদি বিদেশী শাসনের জোয়ালমুক্ত হতে হয়, তাহলে ভারতকে চরকা ও হাতে-কাটা-সুতোকে, দাসত্বের বদলে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে দেখতে হবে। চরকার আর একটি অর্থ হওয়া উচিত, "রুজি রোজগার"।[১৯]

খাদি আমার কাছে ভারতীয় মানবতা, তার অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাম্যের প্রতীক। অতএব শেষ অবধি তা হল জওহরলাল নেহরুর কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, "ভারতের মুক্তির পোশাক।"

এ ছাড়াও, খাদি-মানসিকতা মানে জীবনের আবশ্যিক জিনিসগুলির উৎপাদন ও বন্টনের বিকেন্দ্রীকরণ। তাই এযাবৎ অনুসৃত নীতি হল, প্রতিটি গ্রাম তার প্রয়োজনীয় সব কিছু উৎপাদন করবে, এবং সেই সঙ্গে বাড়তি একটা অংশ উৎপাদন করবে শহরের চাহিদা মেটাতে।

ভারি শিল্পের কেন্দ্রীকবণ ও জাতীয়করণ আবশ্যাক হবে, কিন্তু মুখ্যত গ্রামকেন্দ্রিক বিপুল জাতীয় কর্মকাণ্ডে তার অংশ থাকবে যৎসামান্য...

গ্রামের এই কেন্দ্রীয় শিল্প এবং এর সঙ্গে যুক্ত হস্তশিল্পগুলির নির্বিচার ধ্বংসের ফলে বুদ্ধির দীপ্তি ও জীবনের উজ্জ্বলতা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। গ্রামকে রেখে গেছে, রিক্ত ও নিষ্প্রভ ক'রে। গ্রামের হাল এখন প্রায় গ্রামবাসীদের অযত্নে পালিত গবাদি পশুর মতো।[২০]

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, হাতে-কাটা-সুতো ও হস্তচালিত তাঁতের পুনঃপ্রবর্তন, ভারতের নৈতিক ও আর্থনীতিক পুনরুজ্জীবনে সবচেয়ে বড় দান রাখবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের একটা সাদামাটা শিল্প চাই কৃষির সম্পূরক হিসেবে। দীর্ঘকাল আগে চরকা-কাটা ছিল কুটীর শিল্প। লক্ষ লক্ষ মানুষকে উপবাস থেকে বাঁচাতে হলে, ঘরে চরকা-কাটায় সাহায্য করতে হবে তাদের। সেই সঙ্গে প্রতি গ্রামে থাকবে তার নিজস্ব তাঁতি।[২১]

পৃথিবীর জাতিগুলির প্রতি এ কোনও বিদ্বেষের বার্তা বহন করে না, বরঞ্চ শুভেচ্ছা ও স্বয়ম্ভরতার বার্তা নিয়ে আসে। পৃথিবীর শান্তিবিঘ্নকারী ও সম্পদশোষণকারী এক নৌবাহিনীর সুরক্ষা তার দরকার নেই। তার দরকার লক্ষ লক্ষ মানুষের সুদৃঢ় প্রত্যয় যাতে তারা বাড়িতে বসে নিজেরা সুতো কাটতে পারে, ঠিক যেভাবে ঘরে রান্না করে। কাজ করতে গিয়ে ও না-করে যত ভুল করেছি তার জন্য উত্তরপুরুষের অভিশাপ হয়তো আমার প্রাপ্য, তবে আমি নিশ্চিত, চরকা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ওদের

আশীর্বাদও আমি লাভ করব। এর পেছনে আমি আমার সর্বস্ব বাজি রাখতে পারি। চাকার প্রতিটি আবর্তনে বোনা হচ্ছে শান্তি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। একে হারিয়ে ভারতের দাসত্ব এসেছিল। এর স্বেচ্ছা-পুনঃপ্রবর্তন, তার সকল ফলাফলসহ, নিশ্চিতভাবে ভারতের স্বাধীনতা আনবে।[২২]

গ্রামীণ জনগণের আশা

আমি অনেকবার বলেছি, যদি ভারতের সাত লক্ষ গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, সকল সভ্যতার মূলে যে শান্তি, যদি তা অর্জন করতে হয়, তাহলে চরকাকে সকল হস্তশিল্পের মধ্যমণি করে তুলতে হবে।[২৩]

চরকা আমার কাছে জনগণের আশার প্রতিভূ। চরকা যাবার সঙ্গে সঙ্গে জনগণ স্বাধীনতাও হারাল। চরকা ছিল গ্রামবাসীদের কৃষিকাজের সম্পূরক, কৃষিকাজকে সে মর্যাদা দিয়েছিল। বিধবার সহায় ও সান্ত্বনা ছিল চরকা। আলস্য থেকে গ্রামবাসীদের দূরে রাখত। চরকার মধ্যে পূর্ব ও পরবর্তী সব শিল্পই ছিল,—তুলো পেঁজা, তুলো থেকে আঁশ ছাড়ানো, টানা দেওয়া, মাপে ফেলা, রং করা ও বোনা। এসব কাজ আবার গ্রামের ছুতোর কামারকে ব্যস্ত রাখত।

চরকা সাত লক্ষ গ্রামকে স্বয়ম্ভর করেছিল। চরকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পও বিদায় নিল, যেমন তেলের ঘানি। শূন্যস্থান পূরণ করতে এল না কিছুই। সব হারিয়ে গ্রাম নিঃস্ব হয়ে গেল। নানা জীবিকা, সৃজনী শক্তি, সঞ্চিত সামান্য সম্পদ, সব চলে গেল...তাই গ্রামকে যদি স্বনির্ভর হতে হয়, সবচেয়ে স্বাভাবিক হবে চরকা এবং সংশ্লিষ্ট সবকিছুর পুনঃপ্রবর্তন।[২৪]

চরকা একজনের জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার তো বটেই, সেই সঙ্গে তাকে তার প্রতিবেশীর কাজেও সাহায্য করতে শেখায়—এতে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। ঠিকমতো চরকা চালাতে গেলে সুতোকাটার পূর্বাপর সব প্রক্রিয়া তার জানা থাকা উচিত।[২৫]

শুধু চরকাই যে ভারতকে তার প্রাচীন গরিমা ফিরিয়ে দিতে পারে ভারতে আসার আগেই এ-বিশ্বাস আমার মনে জন্মায়। তাই চরকাকে তুলনা করেছি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সূর্যের অঙ্গে, যাকে ঘিরে আবর্তিত হয় আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির সৌরজগৎ। ধনী ও গরিবের মধ্যে এ এক সোনালি সেতু।[২৬]

চরকা পাশ্চাত্যের ছোট বা বড় যন্ত্রের মতো নয়। সেখানে কোটি কোটি ঘড়ি কয়েকটি বিশেষ জায়গায় তৈরি হয়। তা দুনিয়ার সর্বত্র বিক্রি হয়। সেলাই-কল সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যায়। এসব জিনিস একটিমাত্র সভ্যতার প্রতীক। চরকা এর ঠিক বিপরীত।

এক জায়গায় বিপুল উৎপাদন করে চরকাকে আমরা সর্বজনীন করতে চাই না। আমাদের আদর্শ, যেখানে সুতোকাটুনিরা থাকে, সেই এলাকাতেই চরকা ও তার আনুষঙ্গিক সব তৈরি করব। সেখানেই চরকার মূল্য। কিছু ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দিলে ওখানেই

তা মেরামত করতে হবে। চরকাকাটুনিদের শেখানো হবে, কেমন করে সে মেরামতের কাজ করবে।[২৭]

'মিল'-এর শিল্প

আমাদের চাহিদা মেটাবার মতো পর্যাপ্ত কাপড় মিলগুলি আজ তৈরি করতে পারে না। যদি করতও বাধ্য না করলে ওরা দাম কমাবে না। সোজা কথা, ওরা টাকা কামাতে এসেছে। কাজেই জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী দাম নিয়ন্ত্রণ করবে না। গরিব গ্রামবাসীর হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যেই হাতচরকা পরিকল্পিত। প্রতিটি কৃষিভিত্তিক দেশের, একটি সম্পূরক শিল্পের দরকার হয়, যা দিয়ে চাষীরা বাড়তি সময়টা কাজে লাগাতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে তেমন শিল্প বলতে সর্বদা চরকাকেই বোঝায়। এটা কি এক অবাস্তব কল্পনাসম্ভূত আদর্শ? না, এক প্রাচীন পেশাকে পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা,—যার ধ্বংস এনেছে দাসত্ব, দেউলেপনা, অতুলনীয় সেইসব শিল্পসৌকর্যের বিলুপ্তি, যা একদা ভারতের অসামান্য বস্ত্রশিল্পের ব্যঞ্জনা পেয়েছিল, বিশ্বে ঈর্ষার কারণ হয়েছিল।[২৮]

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়, আমি কি কাপড়কল-শিল্প ধ্বংস করতে চাই? তা চাইলে আমি অন্তঃশুল্ক নিষেধের জন্য চাপাচাপি করতাম না। আমি চাই কাপড়কল শিল্প উন্নতি করুক, তবে, দেশের বিনিময়ে সে সমৃদ্ধ হোক, তা চাই না। অন্যদিকে, দেশের স্বার্থ যদি দাবি করে যে এ-শিল্প চলে যাওয়া উচিত— বিনা বিবেকদংশনে আমি একে চলে যেতে দেব।[২৯]

আমার মতে, মিল-মজদুররা অংশীদারদের মতোই মিলের মালিক। যখন মিল-মালিকরা বুঝবে মজদুররা তাদের মতো মিলমালিক তখন দুপক্ষের মধ্যে কোনও বিবাদ থাকবে না।[৩০]

৮৭. স্বদেশীর অর্থ

স্বদেশীর প্রেরণা

স্বদেশী আমাদের মধ্যে সেই প্রেরণা যা আমাদের সামূহিক পারিপার্শ্বিক কাজ ও সেবার মধ্যে আটকে রাখে। দূরবর্তী যা, তা থাকে বাইরে। যেমন, ধর্ম। এর সংজ্ঞার প্রয়োজন চরিতার্থ করতে নিজেকে আমি আমার পূর্বপুরুষদের ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব—এটাই হল আমার সামূহিক ধর্মীয় পারিপার্শ্বিক কাজে লাগানো। যদি দেখি তা ত্রুটিপূর্ণ, তাহলে ত্রুটি দূর ক'রে তাকে সংশোধন ক'রে নেব। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি দেশজ সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করব। তাদের যেসব ত্রুটি প্রমাণিত, সেগুলি সংশোধন করে, তাদের সেবা করব। অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমার নিকটতম প্রতিবেশীরা যা উৎপাদন করে শুধু তাই কাজে লাগাব। যেখানে খামতি আছে তা দূর ক'রে এসব শিল্পকে কর্মদক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ ক'রে

তার সেবা করব। বলা হয়েছে, এই স্বদেশীকে যদি কার্যকর করা যায়, তা আগামী স্বর্ণযুগের দিকে নিয়ে যাবে।...

ধর্ম

...হিন্দুধর্ম এক রক্ষণশীল ধর্ম হয়ে উঠেছে। ফলে তা এক প্রবল শক্তি, যেহেতু স্বদেশী প্রেরণা এতে অন্তর্লীন হয়ে আছে। এ-ধর্ম সহিষ্ণুতম, কেননা এ ধর্মান্তরিত করে না। এবং অতীতে যেমন দেখা গেছে এখনও তেমনই ব্যাপ্তিযোগ্য। বৌদ্ধধর্মকে সে বহিষ্কার করেছে—এ-ধারণা আমি ভুল বলে মনে করি। বহিষ্কার করেনি, বরং আত্মস্থ করেছে। স্বদেশী প্রেরণার যুক্তিতে একজন হিন্দু ধর্মান্তরকে অস্বীকার করে। তা এজন্য নয় যে উক্ত ধর্মকে সে শ্রেষ্ঠ মনে করে,—করে এ জন্য, সে জানে সংস্কারসাধন ক'রে সে এর অসম্পূর্ণতা পূরণ করতে পারবে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যা বললাম, মনে করি, তা পৃথিবীর অন্যান্য মহান ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্য। তবে বিশেষভাবে সত্য হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে।

শিক্ষা

স্বদেশী ধারণা থেকে সরে যাওয়া আমাদের কাছে প্রায় মরণতুল্য হয়েছিল। ফলে আমাদের প্রচণ্ড অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে। আমরা, শিক্ষিতশ্রেণী, এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেয়েছি। তাই, জনগণ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি আমাদের। জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই, ব্যর্থ হই। তারা ইংরেজ অফিসারদের যতটা চেনে আমাদের তার চেয়ে বেশি চেনে না। ওদের মন আমাদের বা অফিসারদের কাছে খোলা খাতা নয়। ওদের উচ্চাশা আমাদের উচ্চাশা নয়। এখানে একটা ছেদ আছেই। প্রতিনিধিরা ও যাদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যর্থতা তোমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ।

বিগত পঞ্চাশ বছরে মাতৃভাষায় শিক্ষা পেলে আমাদের পূর্বজরা, ভৃত্যরা, প্রতিবেশীরা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের ভাগ নিতে পারত। এক 'রায়', বা 'বোস'-এর আবিষ্কার রামায়ণ ও মহাভারতের মতো ঘরে ঘরে সম্পদ বল গণ্য হতো। জনগণের কথা ধরলে, এখন যা দাঁড়িয়েছে, এসব মহান আবিষ্কার বিদেশীরা করলেও চলত। বিদ্যার প্রতিটি শাখা যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখানো হতো, তাহলে, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সেগুলি চমৎকারভাবে সমৃদ্ধ করত...

অর্থনৈতিক জীবন

জনগণের গভীর দারিদ্র্যের অধিকাংশ ঘটেছে, আর্থনীতিক ও শিল্প ক্ষেত্রে স্বদেশী থেকে সরে যাওয়ার ধ্বংসাত্মক কাজের ফলে। ভারতের বাইরে থেকে যদি একটি বাণিজ্যিক পণ্যও না আনা হতো, তাহলে আজ ভারত ভোগবিলাসের প্রাচুর্যে ভেসে যেত। কিন্তু তা আর হল কই। আমরা লোভী হলাম, ইংল্যাণ্ডও তাই। ভারত ও ইংল্যাণ্ডের যোগাযোগ

এক সুস্পষ্ট ভ্রান্তির ভিত্তিতে স্থাপিত হয়...

যদি স্বদেশী-নীতি মানি তাহলে তোমার-আমার কর্তব্য হবে, যারা আমাদের চাহিদার জোগান দেবে তাদের খুঁজে বের করা এবং যেখানে-যেখানে জোগান দেবার কাজটা তারা জানে না বলে করতে পারছে না, সেখানে তাদের ওই কাজটা করতে শেখানো—এটা ধরে নিয়ে যে প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেরই সুস্থবৃত্তির অভাব রয়েছে।

তখন ভারতে প্রতিটি গ্রাম স্বাবলম্বী ও স্বয়ম্ভর এক ইউনিট হবে। যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় না তেমন আবশ্যিক পণ্য অন্যগ্রামের সঙ্গে বদলাবদলি করবে।

এটা অর্থহীন প্রলাপ মনে হতে পারে। ভারত তো অর্থহীনতারই দেশ। তৃষ্ণায় গলা শুকালেও অর্থহীন যখন এক দয়ালু মুসলিম পানীয় জল দিতে চাইছে। তথাপি, হাজার হাজার হিন্দু তৃষ্ণায় ছাতি-ফেটে মরে গেলেও মুসলমানের হাতে জল খাবে না। এই অবুঝ মানুষকে যদি একবার বোঝানো যায় যে, তাদের ধর্ম চাইছে তারা শুধু ভারতে তৈরি পোশাক পরবে, ভারতে উৎপন্ন খাবারই শুধু খাবে,—তাহলে তারা অন্য কোনও পোশাক পরতে, অন্য খাবার খেতে অস্বীকার করবে।

ধর্মীয় শৃঙ্খলাবোধ

প্রায়ই জোর দিয়ে এ-কথা বলা হয়, ভারত স্বদেশী গ্রহণ করতে পারে না, বিশেষত, আর্থনীতিক জীবনে। যারা এ-আপত্তি তোলে তারা স্বদেশীকে জীবনের নীতি হিসেবে দেখে না। তাদের কাছে এশুধু এক দেশপ্রেমী প্রচেষ্টা, যদি তাতে আত্মত্যাগের কিছু থাকে, তবে চেষ্টা করবার দরকার নেই। এখানে যে স্বদেশীর কথা বলা হচ্ছে, তা হল, এ-এক ধর্মীয় শৃঙ্খলানিষ্ঠা, ব্যক্তির শারীরিক অসুবিধা তুচ্ছ ক'রে তা পালন করতে হবে। স্বদেশীর যান্ত্রমন্ত্রে ভারতে তৈরি হয় না-বলে সূচ বা পিন না-পেলে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আজ যা সে দরকারি মনে করে তেমন শতশত জিনিস ছাড়াই একজন স্বদেশীকে চলতে শিখতে হবে....

আমি বলব, বিনয় ও প্রেমের আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একমাত্র নীতি হল স্বদেশীর নীতি। যেখানে আমি নিজের পরিবারের সেবাও সামান্যই করতে পারি, সেখানে সমগ্র ভারতকে সেবা করতে বেরোবার চিন্তা করা দম্ভমাত্র। আমার প্রচেষ্টা পরিবারেই কেন্দ্রিত রেখে তার মাধ্যমে আমি সমগ্র দেশের তথা সকল মানবতার সেবা করছি, এটা ভাবাই ভালো। একেই বলে বিনয়। এরই নাম প্রেম।

উদ্দেশ্যই কাজের উৎকর্ষ নির্ধারণ করবে। আমি অন্যদের কী কষ্ট দিচ্ছি তার পরোয়া না করেই নিজ পরিবারের সেবা করতে পারি, যেমন, আমি এমন এক কাজের ভার নিতে পারি, যার ফলে মানুষের কাছে জুলুম করে টাকা আদায় করা যায়। ফলে আমার পয়সা হয়। পরিবারের অনেক অন্যায় আবদার রাখতে পারি। এক্ষেত্রে আমি পরিবার বা রাষ্ট্র কারোরই সেবা করছি না।

অথবা, মেনে নিতে পারি, ঈশ্বর আমাকে হাত ও পা দিয়েছেন নিজেকে এবং

আমার ওপর যারা নির্ভরশীল তাদের ভরণপোষণের জন্য। তখন কালবিলম্ব না ক'রে আমার এবং আমার আত্মীয়স্বজনের জীবন সাদাসিধে ক'রে নেব। এই ক্ষেত্রে, কারও ক্ষতি না ক'রে আমি আমার পরিবারের সেবা করলাম। ধরা যাক, সকলেই এইরকম জীবনযাত্রা অনুসরণ করল, আমরা তৎক্ষণাৎ এক আদর্শ অবস্থা পেয়ে যাব। সকলে একই সময়ে সে অবস্থায় পৌঁছবে তা না। কিন্তু আমরা যারা এর যাথার্থ্য বুঝে এটা কার্যকর করব, তারা নিশ্চয় সেই সুখের দিনটির প্রত্যাশা করব, তার আগমন ত্বরান্বিত করব।[৩১]

প্রতিবেশীদের সেবাকার্য

স্বদেশী বলতে আমি কী বুঝি, তা সুবিদিত। নিকটতম প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে আমি দূরতম প্রতিবেশীর সেবা করব না। এটা কখনওই প্রতিহিংসামূলক বা শাস্তিমূলক নয়। কোনও অর্থেই এ সংকীর্ণ নয়, কেননা আমার বৃদ্ধির জন্য যা দরকার তা পৃথিবীর সর্বত্র থেকে কিনি। যদি আমার বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে, অথবা প্রকৃতি আমার ওপর যাদের দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের ক্ষতি করে,—তখন সে জিনিস যত ভালো বা সুন্দর হোক আমি কারো কাছে কিছু কিনব না।

পৃথিবীর সব জায়গা থেকে আমি দরকারি, সুস্থ সাহিত্য কিনি। ইংল্যাণ্ড থেকে শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি, অস্ট্রিয়া থেকে পিন ও পেনসিল, সুইজারল্যাণ্ড থেকে ঘড়ি। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, জাপান, বা পৃথিবীর কোনও জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও মিহি সুতোর কাপড় কিনব না,—কেননা তা ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর ক্ষতি করেছে, এবং সে ক্ষতি বেড়েই চলেছে।

আমি মনে করি, ভারতের লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব লোকের হাতে-কাটা-সুতোয় বোনা কাপড় কিনতে নারাজ হওয়া আমার পক্ষে পাপ। তেমনই পাপ বিদেশী কাপড় কেনা, যদিও তা গুণগত উৎকর্ষে ভারতের হাতে-বোনা কাপড়ের চেয়ে উন্নতমানের। আমার স্বদেশী তাই প্রধানত হাতে-বোনা-খদ্দর কেন্দ্র করে আবর্তিত। এবং তা প্রসারিত হয় ভারতে যা কিছু উৎপাদিত হতে পারে ও হয় তার দিকে।[৩২]

[স্বদেশীর উপাসক] তার প্রথম কর্তব্য হিসেবে নিজেকে প্রতিবেশীদের জন্য উৎসর্গ করবে। এর সঙ্গে, বাকি অন্যদের স্বার্থ বিসর্জন ও বাদ দেওয়া জড়িত, যদিও সেই বাদ বা বিসর্জন হবে লোকদেখানো মাত্র। প্রতিবেশীদের অনাবিল সেবা কখনোই চরিত্রগতভাবে দূরবর্তীদের সেবার বাইরে নিজেকে রাখতে পারে না। বরঞ্চ তার উল্টোটাই হয়।

"ব্যক্তির বেলায় যেমন, বিশ্বের বেলাতেও তেমনই"—এ-এক অব্যর্থ নীতি যা আমরা হৃদয়ঙ্গম করলে ভালো করব। অন্যদিকে, যে নিজেকে "দূরের দৃশ্যের" টানে প্রলোভিত হতে দেয়, এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে যায় সেবাকার্য করতে, তার আকাঙ্ক্ষা শুধু বিফলেই যায় না, প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্যসাধনেও সে ব্যর্থ হয়....

আমি এ-সত্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে, একজন মানুষ তার প্রতিবেশীদের ও মানবতাকে একই সঙ্গে সেবা করতে পারে। এর শর্ত হল, প্রতিবেশীদের সেবাকার্য স্বার্থপর বা

পক্ষপাতদুষ্ট হবে না, অর্থাৎ কোনওভাবেই আর একজনের শোষণকারী হবে না। প্রতিবেশীরাও বুঝবে কী মনোভাব থেকে এই সেবাকার্য করা হচ্ছে। এ-ও জানবে যে, তারাও যে তাদের প্রতিবেশীদের সেবা করবে এটা প্রত্যাশিত। এভাবে বিবেচিত হলে এটা ছড়িয়ে পড়বে প্রবাদের সেই তুষার গোলকের মতো, যা গতিপথে জ্যামিতিক নিয়মে শক্তি সঞ্চয় করে ও পৃথিবীকে ঘিরে ফেলে। এর মানে দাঁড়ায়, স্বদেশী হল সেই প্রেরণা যা আর সকলকে বাদ দিয়ে মানুষকে ঘরের পাশের পড়শীকে সেবা করার নির্দেশ দেয়। যে-শর্ত আমি আগেই উল্লেখ করেছি তা হল, যে-প্রতিবেশী সেবা পাবে, সে-ও তার প্রতিবেশীকে সময়ে সেবা করবে। এই অর্থে স্বদেশী একদেশদর্শী নয়। মানুষের কর্মক্ষমতার বিজ্ঞানসম্মত সীমাবদ্ধতা স্বদেশী স্বীকার করে।[৩৪]

উৎকট স্বাদেশিকতা নয়

এই জীবন-পরিকল্পনা অনুযায়ী, আমি আর সব দেশ বাদ দিয়ে দৃশ্যত ভারতকে সেবা করার মাধ্যমে অন্য কোনও দেশের ক্ষতি করছি না। আমার দেশপ্রেম একই সঙ্গে পক্ষপাতী ও নিরপেক্ষ। আমি আমার জন্মভূমির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছি এই অর্থে তা পক্ষপাতদুষ্ট। আবার তা নিরপেক্ষ এইজন্য যে, আমার কাজ প্রতিযোগিতা বা বিদ্বেষমূলক নয়। "কাজেই, তুমি তোমার নিজের সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারো, তবে অন্যেরটা ক্ষতি করে নয়"। এ শুধুমাত্র আইনী প্রবচন নয়, এটি জীবনের এক মহান নীতি। এটি অহিংসা বা প্রেমের যথার্থ অনুশীলনের চাবি বিশেষ।[৩৫]

সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতিতে বিদেশের সবকিছু বর্জন করা যে স্বদেশীর এক অঙ্গ, এ আমি কখনও মনে করিনি। স্বদেশীর ব্যাপক সংজ্ঞা হল, বিদেশী জিনিস বাদ দিয়ে, গৃহশিল্পের সুরক্ষার জন্য যতটা দরকার,—বিশেষ করে সে-সব শিল্প যা বাদ দিলে ভারত নিঃস্ব হয়ে যাবে, সেই সব ঘরে-তৈরি-জিনিস ব্যবহার করা। তাই, আমার মতে বিদেশী জিনিস কতটা হিতকর তা না ভেবে এবং তা কাউকে নিঃস্ব করছে না, জেনেও যে স্বদেশী নির্বিচারে সবরকম বিদেশী জিনিস বর্জন করে, সে খুব সংকীর্ণ অর্থে স্বদেশী।[৩৬]

স্বদেশীকে যদি অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসে পরিণত করা হয়, তবে যে-কোনও, ভালো জিনিসের মতোই তাকেও মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হবে। এই বিপদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে। বিদেশী বলেই বিদেশী উৎপাদকদের বাতিল করা এবং এ-দেশ যা উৎপাদনের যোগ্য নয়, তা উৎপাদনের কাজে জাতীয় সময় ও অর্থ অপচয় করা হলে, তা মারাত্মক ভুল হবে। স্বদেশী প্রেরণাকে নসাৎ করা হবে। স্বদেশীর সত্য উপাসক কদাচ বিদেশীর অনিষ্টচিন্তা মনে পোষণ করবে না। দুনিয়ার কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ ক'রে সে প্রণোদিত হবে না। স্বদেশী অর্থে ঘৃণার চর্চা নয়। এ হল পরিশুদ্ধ অহিংসা, তথা প্রেমময় এক নিঃস্বার্থ সেবাকার্যের নীতি।[৩৭]

১৪. সৌভ্রাত্র

৮৮. প্রেমের সুসমাচার

সমন্বয়কারী শক্তি

আত্মা বা সত্যের শক্তি এবং প্রেমের শক্তি সমান। প্রতিপদে এর সক্রিয়তার প্রমাণ পাই। সেই শক্তি না থাকলে বিশ্ব লয় পাবে।...হাজার কেন, হাজার হাজার মানুষ টিকে থাকার জন্য এ-শক্তির সক্রিয় কর্মের ওপর নির্ভর করে। লক্ষ লক্ষ পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কলহ, এ-শক্তি প্রয়োগ করলে মিটে যায়। শত শত জাতি শান্তিতে বাস করে—ইতিহাস এ ঘটনা দেখে না, দেখতে পায় না। ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে প্রেম বা আত্মার সমতাপূর্ণ কাজে প্রতিটি অন্তরায় সৃষ্টির নথি। দুই ভাই ঝগড়া করল, একজনের হল অনুশোচনা, তার মধ্যে যে ভালবাসা সুপ্ত ছিল, তা জাগিয়ে তুলল, দুইজন আবার শান্তিতে বসবাস করতে থাকল। এ-কেউ মনে রাখবে না। যদি দুই ভাই উকিলের হস্তক্ষেপে বা অন্য কোনও কারণে হাতিয়ার তুলে নেয়, বা আদালতে যায়, যা পশুশক্তির আর এক প্রদর্শনী,—তখনই ব্যাপারটি সংবাদপত্রে প্রকাশ পাবে, পাড়াপড়শির আলোচনার বিষয় হবে। হয়তো ইতিহাসেও ঠাঁই পাবে। পরিবার, বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যা সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও তা সমভাবে সত্য। পরিবারের জন্য এক আইন ও জাতির জন্য অন্য, এমন বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। অতএব, প্রকৃতির কার্যক্রমে অন্তরায় সৃষ্টির নথির নাম ইতিহাস। আত্মার শক্তি প্রকৃতিজ, তাই ইতিহাসে উপেক্ষিত।[১]

বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন, যে-সকল অণু দ্বারা পৃথিবী গঠিত তাদের আসঞ্জক শক্তি ব্যতিরেকে পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যেত। আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেত। জড়বস্তুতেই যদি আসঞ্জক শক্তি থাকে, তাহলে প্রাণবন্ত সবকিছুতেও থাকবে, এবং প্রাণময় সত্তার মধ্যে সমন্বয়কারী শক্তির নাম হল প্রেম। এ আমরা দেখি পিতা ও পুত্র, ভাই ও বোন, বন্ধু ও বন্ধুর মধ্যে। কিন্তু যা কিছু প্রাণবন্ত তার মধ্যে এ-শক্তিকে ব্যবহার করতে শিখতে হবে। সেই ব্যবহারের মধ্যে আছে আমাদের ঈশ্বরজ্ঞান। যেখানে প্রেম, সেখানে জীবন। ঘৃণার পথ নিয়ে যায় ধ্বংসে।[২]

আমার বিশ্বাস, মানবজাতির উদ্যমের যোগফল, আমাদের নীচে নামাবার জন্য নয়,

উঁচুতে তুলে ধরার জন্য, এবং অজ্ঞাতসারে হলেও তা সুনিশ্চিতভাবেই প্রেমের আইনের কাজ। মানবজাতি যে টিকে আছে, চলছে, এ-ঘটনাই প্রমাণ করে যে আসঞ্জক শক্তি ধ্বংসাত্মক শক্তির চেয়ে—কেন্দ্রাভিগ শক্তি, কেন্দ্রাতিগ শক্তির চেয়ে বড়।[৩]

আমাদের সত্তার আইন

হাজার হাজার বছর ধরে পশুশক্তি পৃথিবীকে শাসন করছে। মানবজাতি বরাবর তার কুপরিণাম ভোগ করছে, এই কথা অনায়াসে বলা যায়। ভবিষ্যতে এ-থেকে ভালো কিছু উৎসারিত হবে, সে আশা বিশেষ নেই। অন্ধকার থেকে যদি আলোর প্রকাশ হতে পারে, তাহলেই একমাত্র ঘৃণা থেকে প্রেম উৎসারিত হতে পারে।[৪]

ধ্বংসের মধ্যেও জীবন বহমান থাকে, এ আমি দেখেছি। তাহলে ধ্বংসের আইনের চেয়ে উচ্চতর আইন কিছু নিশ্চয় আছে। একমাত্র সেই আইনাধীনেই এক সুবিন্যস্ত সমাজ সুস্পষ্ট রূপ পাবে, জীবন হবে বাঁচার যোগ্য। জীবনের আইন যদি তা-ই হয়, তাকে দৈনন্দিন জীবনে কার্যকর করতে হবে। যেখানেই ছন্দপতন ঘটবে, যখনই বিরোধীর সম্মুখীন হবে, প্রেমের দ্বারা তাকে জয় করো। এই রকম সিধে পথেই আজীবন এ-কাজ করে এসেছি। শুধু দেখেছি, প্রেমের আইন যেভাবে সাড়া দেয়, ধ্বংসের আইন তা কখনও দেয়নি।[৫]

প্রেম বা অহিংসা যদি আমাদের সত্তার আইন না হয়...তা হলে মাঝে মাঝেই যুদ্ধের আবির্ভাব থেকে কোনও মুক্তি নেই। একটির পর একটি,—প্রত্যেকটি ভয়ালতায় আগেরটির চেয়ে ভয়ংকর...

যত আচার্য পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা সকলে এই আইনই প্রচার করেছেন। কেউ জোর দিয়েছেন বেশি, কেউ-বা একটু কম। প্রেম যদি জীবনের আইন না হতো, তাহলে মৃত্যুর মধ্যে জীবন টিকে থাকত না। মৃত্যুকে অবিরাম জয় করার নামই তো জীবন। মানুষ ও পশুর মধ্যে মৌল পার্থক্য যদি কিছু থেকে থাকে, তা হল, মানুষ প্রেমের আইনকে স্বীকার করতে করতে এগিয়ে যায় এবং ব্যক্তিজীবনে তা বাস্তবায়িত করে। প্রাচীন ও অর্বাচীন, পৃথিবীর সকল সন্তরাই স্ব-স্ব মত ও ক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের সত্তার সর্বোচ্চ আইনের জীবন্ত নিদর্শন। এ অবশ্যই সত্য যে, আমাদের মধ্যেকার পশুটি যেন মনে হয়, সহজে জিতে যাচ্ছে। তাতে অবশ্য আইনটি মিথ্যে হয়ে যায় না। ব্যবহারিক প্রয়োগ যে কত কঠিন, এটা তারই প্রমাণ। স্বয়ং সত্যের মতো সমুচ্চ যে আইন, তার ক্ষেত্রে অন্যথা হবেই-বা কী করে? এই আইনের অনুশীলন যখন বিশ্বজনীন হবে, স্বর্গের মতো পৃথিবীতে রাজ্যশাসন করবেন ঈশ্বর। আমাদের মধ্যেই আছে স্বর্গ ও মর্ত্য, এ-কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। আমরা মর্ত্যকে জানি, আমাদের ভিতরের স্বর্গে আমরা বহিরাগত। যদি এটা বলা চলে যে কারও কারও পক্ষে প্রেমের অনুশীলন সম্ভব, তাহলে, অন্যদের এটা অনুশীলনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা দম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা নরমাংস ভক্ষণ ও অন্যান্য অনুরূপ আচরণ করতেন এবং এ-ও খুব সুদূর অতীতের ব্যাপার নয়,—যা আজ আমাদের কাছে ঘৃণাজনক।

সন্দেহ নেই, সেকালে গ্রিক শেপার্ডরাও ছিল। নরভক্ষকদের বিরুদ্ধে বিচিত্র নীতি প্রচার করার ফলে তাদের মানুষ উপহাস করত। হয়তো, শেপার্ডদের কাঠের শাস্তিদণ্ডে মাথা ও হাত পা ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো।[৬]

বিরামহীন যুদ্ধের দলিল ইতিহাস। কিন্তু আমরা নতুন ইতিহাস তৈরি করতে চেষ্টা করছি। আমি এ-কথা বলছি কারণ, অহিংসার প্রশ্নে আমি জাতীয় মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করি। যুক্তির দ্বারা আমি তরবারির নীতিকে খণ্ডন করেছি। এর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, জঙ্গলের আইনের জায়গায় আসবে সচেতন প্রেমের আইন—এটাই মানুষের নিয়তি।[৭]

যেখানে প্রেম সেখানে ঈশ্বরও আছেন।[৮]

ভালবাসা কখনও দাবি করে না, সে চিরদাতা। ভালবাসা কষ্ট সহ্য করে, কখনও নালিশ জানায় না, প্রতিশোধ নেয় না।[৯]

সেবাকার্যের নিয়ম

সবচেয়ে নিরাপদ আচরণবিধি হল : সেবার কাজ করতে চাইলে জ্ঞাতিত্ব দাবি করা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে এই জ্ঞাতিত্ব নিয়ে পীড়াপীড়ি না-করা। বাস্তবিক, আমি জীবনের এই নিয়মই প্রয়োগ করেছি ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও, একে আমি বলি আচরণের সুবর্ণনীতি। ... এছাড়া মানুষে মানুষে মধুর সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখার অন্য কোনও উপায় আমার জানা নেই। বহু বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই অটল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, সুবর্ণনীতি পালনে যেখানেই কোনও ব্যাঘাত ঘটেছে, সেখানেই খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, এমনকি মাথা ফাটানোর ঘটনাও ঘটেছে...[১০]

ব্যবহারে সাম্য

[আমার মূল উদ্দেশ্য] সমগ্র মানবজাতির প্রতি সমব্যবহার। আর সেই সমব্যবহারের অর্থ সমানভাবে সকলের সেবা।[১১]

কারণ, [মানুষের] বয়স, উচ্চতা, গায়ের রঙ ও বুদ্ধিবৃত্তি যদিও সকলের সমান নয়, তবু এই ভিন্নতা সাময়িক ও বহিরঙ্গগত। এই পার্থিব শরীরের অন্তরালে যে আত্মার অধিষ্ঠান, তা সকল দেশের; সকল নরনারীর ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। ...চারপাশে যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি তার মধ্যে এক যথার্থ বাস্তব ঐক্য বিদ্যমান। বৈষম্য শব্দটি পূতিগন্ধময়, দাম্ভিকতা, অমানবিকতা এরই পরিণাম। যেমন প্রাচ্যে, তেমনি প্রতীচ্যে। মানুষের ক্ষেত্রে যা সত্য, তা জাতির ক্ষেত্রেও সত্য। কারণ, মানবগোষ্ঠী নিয়েই জাতি গঠিত। বৈষম্যের মিথ্যা ও অনমনীয় নীতির ফলেই এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলি উদ্ধত শোষণের শিকার। বর্তমানে প্রাচ্যকে লুটেপুটে খাবার পাশ্চাত্যের এই ক্ষমতা পশ্চিমের শ্রেষ্ঠতা ও পুবের হীনতার লক্ষণ কিনা, কে বলবে?[১২]

আকার বহু, কিন্তু প্রেরণাদাতা আত্মা একই। যেখানে বাইরের বৈচিত্র্যের আড়ালে এক সর্বব্যাপী মৌলিক ঐক্য বিরাজমান, সেখানে উচ্চনীচ ভেদাভেদের অবকাশ কোথায়।

জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপেই তো তুমি এই ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছ। এই অপরিহার্য একত্ব উপলব্ধি করাই সকল ধর্মের পরম লক্ষ্য।[১৩]

আমি প্রেমের সার্বভৌম আইনের শাসনে বিশ্বাস করি, যেখানে বিভেদ নেই।।[১৪]

আমার কাছে সবাই সমান: আত্মীয় অনাত্মীয়, দেশবাসী বিদেশী, শ্বেতকায় অশ্বেতকায়, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী ভারতীয় তা সে মুসলিম, পারসী, খ্রিশ্চান বা ইহুদী যে-ই হোক-না-কেন। এদের মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য করি না। ওরকম ভেদাভেদ করতে আমার মন সায় দেয় না। এটাকে বিশেষ গুণ বলেও দাবি করতে পারি না। কেননা, আমার স্বভাবই এইরকম। চেষ্টা ক'রে আমাকে এটা আয়ত্ত করতে হয়নি। অন্যদিকে, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এবং অন্যান্য অপরিহার্য গুণের ক্ষেত্রে, এগুলির উৎকর্ষ সাধনের জন্য আমাকে যে নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হয়েছে, সে-বিষয়ে আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন।[১৫]

আমাদের ভালবাসার বৃত্ত প্রসারিত করে সমগ্র গ্রাম্যজীবনকে তার আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, গ্রাম তার আওতার মধ্যে আনবে জেলাকে, জেলা প্রদেশকে: এইভাবেই পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমাদের ভালবাসার পরিধি পৃথিবীর বৃত্তে গিয়ে শেষ হয়।[১৬]

আমাদের এই যুগে মূল্যবোধ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমরা মন্থর ফললাভে তৃপ্ত নই। শুধুমাত্র স্বজাতির, এমনকি আমাদের স্বদেশের কল্যাণেও তৃপ্ত নই। সমগ্র মানবতার জন্য আমরা অনুভব করি, বা করতে চাই। নিজের উদ্দেশ্যের দিকে মানবতার পথসন্ধানে এ-এক মস্ত লাভ।[১৭]

তোমাদের কাছে আমার আবেদন...হৃদয় গ্লানিমুক্ত করো, দয়াবান হও। তোমাদের হৃদয় যেন মহাসাগরের মতো ব্যাপ্ত হতে পারে...পাছে তুমি দোষী সাব্যস্ত হও এই ভয়ে অন্যদের দোষী সাব্যস্ত কোরো না। এক সর্বোচ্চ বিচারক আছেন, যিনি তোমাকে ফাঁসি দিতে পারেন। তবু তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। তোমার অন্তরে ও চারপাশে অনেক শত্রু, কিন্তু তিনি তোমায় রক্ষা করেন। তোমাকে দয়ার চোখে দেখেন।[১৮]

পারস্পরিক সহিষ্ণুতা

সুবর্ণনীতির সারকথা হল...পারস্পরিক সহিষ্ণুতা। যদিও আমরা জানি, সবাই কখনও একইভাবে চিন্তা করব না, সত্যকে দেখব যে-যার মত ভগ্নাংশে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বিবেক, সকলের ক্ষেত্রে এক জিনিস নয়। ব্যক্তিআচরণের ক্ষেত্রে বিবেক উত্তম পথনির্দেশক। তবে সে আচরণ সবার ওপরে চাপালে সকলের বিবেকের স্বাধীনতা ক্ষেত্রে তা এক দুঃসহ ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে...অত্যন্ত বিবেকবান মানুষদের মধ্যেও মতপার্থক্যের অবকাশ থাকবে। যে-কোনও সভ্যসমাজে একমাত্র যে আচরণবিধি সম্ভব, তা হল পারস্পরিক সহিষ্ণুতা।[১৯]

ক্ষমাশীলতা আত্মার এক গুণ। অতএব তা ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়। প্রভু বুদ্ধ বলেছেন: "অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করো"। কিন্তু ওই 'অক্রোধ' কী? এ-এক

ইতিবাচক গুণ। এর অর্থ প্রেম বা দয়ার পরম গুণ। এই পরম গুণে উদ্দীপিত হতে হবে তোমাকে যা ব্যক্ত হবে তোমার আচরণে। যখন তুমি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে তার ক্রোধের কারণ জেনে নেবে। যদি আঘাত দেবার কোনও কারণ ঘটিয়ে থাকো, তাহলে সংশোধন করবে। তারপর তার ভ্রান্তি তাকে বোঝাবে, বিশ্বাস করাবে যে প্ররোচিত হওয়া অন্যায়। আত্মার এই গুণের বিষয় সচেতনতা এবং এর সুচিন্তিত ব্যবহার, শুধু মানুষটিকে নয়, তার পরিবেশকেও উন্নীত করে। অবশ্য এমন ভালবাসা যার মধ্যে আছে কেবল সে-ই তা কাজে লাগাবে। অক্লান্ত প্রয়াসে এ-ভালবাসা নিশ্চয়ই জাগানো যায়।[২০]

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও তা সমান সত্য। তবে ক্ষমা করারও একটা সীমা আছে, দুর্বল কখনও যা করতে পারে না। ক্ষমা শক্তিমানের গুণ।[২১]

বিশ্বাস

মানবস্বভাবকে আমি সন্দেহ করতে পারি না। যে কোনও মহৎ ও মিত্রতাপূর্ণ কাজে তা সাড়া দেবে, দিতে বাধ্য।[২২]

আমার মধ্যে মানুষ বা মানবজাতি সম্পর্কে কোনও অবিশ্বাস নেই। ঈশ্বরের কাছে তাদের তো জবাবদিহি করতেই হবে। তবে আমি কেন উদ্বিগ্ন হব? অবশ্য যেখানে আমার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রশ্ন, সেখানে চিন্তা সক্রিয় আমার। সন্দেহ ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও আমি প্রত্যেকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হতে চেষ্টা করি। সন্তাপ যদি আমার ললাটলিখন হয় তাহলে তা আমাকে সইতে হবে। তবে যতক্ষণ আমি পাপের বিরুদ্ধে লড়ছি, নিজেকে আমি নির্বল হতে দিতে পারব না।[২৩]

পারস্পরিক আস্থা ও ভালবাসা কোনও বিশ্বাস, কোনও ভালবাসা নয়। তোমাকে যারা ঘৃণা করে তাদের যদি ভালবাসতে পারো, যে-প্রতিবেশীকে তুমি অবিশ্বাস করো তাকে যদি ভালবাস—তাহলে সেটাই হবে আসল ভালবাসা। ইংরেজের সরকারি আমলাদের অবিশ্বাস করবার ন্যায্য কারণ আছে আমার। আমার ভালবাসা যদি আন্তরিক হয়, আমার অবিশ্বাস সত্ত্বেও আমি অনুরূপ ইংরেজদের ভালবাসব। যদি বন্ধুকেই শুধুমাত্র বিশ্বাস করলাম, তাহলে আমার ভালবাসা দিয়ে কী হবে? সে তো চোরেও করে। বিশ্বাস চলে গেলেই তারা শত্রু হয়ে ওঠে।[২৪]

শিশুর মুখ থেকে

বিশ্বাস করো, আমার শত শত, বা হাজার হাজার শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আমি জানি আমার বা তোমার চেয়ে সূক্ষ্ম সম্মানবোধ শিশুদের বোধহয় বেশি। আমরা যদি নতজানু ও বিনম্র হতে পারতাম, দেখতে পেতাম, জীবনের বড় বড় শিক্ষাগুলি বয়স্ক শিক্ষিত মানুষদের বদলে ওই তথাকথিত অজ্ঞশিশুদের কাছ থেকেই শিখে নিতে পারতাম। যীশু বলেছিলেন, শিশুদের মুখ থেকেই জ্ঞান নিঃসৃত। এর চেয়ে উচ্চমার্গের মহত্তর

সত্য তিনি আর উচ্চারণ করেননি। এটা আমি বিশ্বাস করি। আপন অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমরা যদি নিষ্পাপ, নিরহঙ্কার হয়ে শিশুদের কাছে যাই তাহলে তাদের কাছে জ্ঞানলাভ করতে পারব।

বিশ্বশান্তি

আমার শিক্ষা বলতে এই একটি: মানুষের যা অসাধ্য ঈশ্বরের কাছে তা ছেলেখেলা। যিনি তাঁর নগণ্যতম সৃষ্টির নিয়তির ওপরেও কর্তৃত্ব করেন: সেই ঈশ্বরের ওপর যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই অন্তিম আশা নিয়ে আমি বাঁচি, সময় কাটাই ও তাঁর ইচ্ছা মেনে নেবার প্রয়াস করি।

...বিশ্বে যদি প্রকৃত শান্তি আনতে চাই, যুদ্ধের বিরুদ্ধে চালাতে চাই প্রকৃত যুদ্ধ, তাহলে শিশুদের দিয়েই শুরু করতে হবে। সহজাত নিষ্পাপতায় তারা যদি বেড়ে ওঠে, আমাদের সংগ্রাম করতে হবে না। নিষ্ফলা, অলস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে না। ভালবাসা থেকে ভালবাসায়, শান্তি থেকে শান্তিতে উত্তরণ করে চলব আমরা—যতদিন না পৃথিবীর প্রতিটি কোণ আবৃত হয় শান্তি ও প্রেমে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে সারা পৃথিবী যাব জন্য বুভুক্ষু।[২৫]

আত্মার শক্তি

জীবনের প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করি ঈশ্বর আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন।[২৬]

প্রেমের শক্তিরই আর এক নাম আত্মার শক্তি। পশুশক্তির জায়গায় আমি যদি সেই আত্মার শক্তিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে পারতাম, তাহলে, আমি নিশ্চিত জানি, এমন এক ভারত তোমাদের উপহার দিতে পারতাম যে-ভারত সারা দুনিয়াকে উপেক্ষা করতে পারত—তা সেই দুনিয়া যতই সর্বনাশা হোক-না-কেন। তাই, অষ্টপ্রহর আমি নিজেকে কষ্ট সহ্যের এই চিরন্তন আইন শিখিয়ে যাব। হাজির করব তাদের কাছে, যারা একে গ্রহণ করতে চায়। যদি অন্য কোনও কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করি, তবে তারও উদ্দেশ্য হবে ওই আইনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো।[২৭]

তরবারি ছুঁড়ে ফেলে প্রেমের পাত্র ছাড়া বিরুদ্ধবাদীদের আর কিছু দেবার নেই আমার। এই পাত্র তুলে ধরে ওদের আমার কাছে টানবার আশা রাখি। মানুষে মানুষে স্থায়ী শত্রুতার কথা আমি ভাবতে পারি না। যেহেতু পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি, তাই এই আশা নিয়ে বাঁচি, এ জন্মে না-হোক, অন্য কোনও জন্মে আমি বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে বাঁধতে পারব সকল মানবআকে।[২৮]

প্রেমের ব্রত

সবিনয়ে স্বীকার করি, যত ঔদাসীন্যেই হোক, আমার অস্তিত্বের প্রতিটি তন্তু আমি ভালবাসায় অনুরণিত করতে চেষ্টা করি। এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমার সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি

উপলব্ধি করতে আমি অধীর। তিনি আমার কাছে মূর্ত সত্য। কর্মজীবনের প্রথমভাগে হৃদয়ঙ্গম করি, যদি সত্য উপলব্ধি করতে হয়, প্রয়োজনে জীবনের মূল্যেও আমাকে সত্যের আইন মানতে হবে। সন্তানের আশীর্বাদ পেয়ে আবিষ্কার করলাম, ছোট শিশুদের মধ্য দিয়েই ভালবাসার আইন সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়, শেখা যায়। আমরা, সেই অজ্ঞ হতভাগ্য পিতামাতরা যদি এমন না হতাম—তাহলে আমাদের সন্তান যথার্থ নিষ্পাপ হতো। আমি বিশ্বাস করি, দুষ্ট হয়ে কোনও শিশুই জন্মায় না। শিশু জন্মাবার আগে ও পরে, সে বড় হবার সময়ে বাপ-মা যদি সমঝে চলত, তাহলে শিশু আপনা থেকেই সত্য ও প্রেমের আইন মানত, এ এক সুবিদিত সত্য। জীবনের প্রথম দিকেই এ শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। কিন্তু, ধীরে ধীরে, উল্লেখ্য এক পরিবর্তন শুরু করি।

আমার এই উত্তাল জীবন যে কত দুস্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেছে তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করতে চাই না। আমি শুধু সত্যতার সঙ্গে ও সবিনয়ে এইটুকু বলতে পারি—আমার জীবনে, চিন্তায়, কথায় ও কাজে, প্রেমের যতখানি প্রকাশ ঘটাতে পেরেছি, তাতে আমি উপলব্ধি করেছি "সেই শান্তি যা বোধগম্যতার অতীত"। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই শান্তি আমার মধ্যে দেখতে পেয়ে হতবুদ্ধি হয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছে, এ অমূল্য সম্পদ আমি কোথা থেকে পেলাম। আমি তা ব্যাখ্যা করতে পারিনি। শুধু বলেছি, বন্ধুরা যদি আমার মধ্যে সে শান্তি দেখে থাকে, তবে সেটি পেয়েছি আমাদের সত্তার মহত্তম আইনটি মেনে চলার জন্য।[২৯]

জীবনের প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করছি অহিংসা, ভালবাসার দ্বারা পরিচালিত হতে। আমি মূলত শান্তিপ্রেমী। বিরোধ সৃষ্টি করতে চাই না। যারা আমার বিরোধিতা করে, তাদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এমন একটি কাজও করব না যা আমি সত্য ও প্রেমের বিপরীত বলে জানি।[৩০]

ভালবাসা ছাড়া অন্যের উপর কর্তৃত্ব ফলাবার অন্য কোনও হাতিয়ার আমার নেই।[৩১]

আমার লক্ষ্য বিশ্বের বন্ধুত্ব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবলতম বিরোধিতা এবং মহত্তর প্রেম—দুটোকে আমি মেলাতে পারি।[৩২]

কর্মব্রতর ওপর আমার দ্ব্যর্থহীন বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাস হল, এই ব্রত যদি সফল হয়—সফল হবে, হতে বাধ্য—তাহলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার স্থান হবে এমন এক আন্দোলন হিসেবে, যার অভীষ্ট ছিল সমগ্র মানবজাতিকে একসূত্রে বন্ধন করা: পরস্পরের বৈরী হিসেবে নয়, এক অখণ্ড সমগ্রের অংশরূপে।[৩৩]

৮৯. সকল জীবনই এক

'বসুধৈব কুটুম্বকম'

আমার নীতিবোধ আমাকে, শুধু বানর নয়, ঘোড়া, ভেড়া, সিংহ, চিতাবাঘ, সাপ ও বিছার সঙ্গে কেবল আত্মীয়তা পাতাবার অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। বলে,

এই কুটুম্বিতা পাতানো দরকার। তবে ওরা আমাকে তাদের আত্মীয় না-ভাবলেও চলবে।

আমি যে কঠোর নীতি বিশ্বাস করি, যা আমার জীবন শাসন করে, তার এ শাসন জারি করা উচিত যে প্রতিটি নরনারী এই একপেশে বাধ্যতা আমাদের উপর চাপাক। তা যে চাপানো হয়েছে তার কারণ একা মানুষ ঈশ্বরের আদলে সৃষ্ট। আমরা যে অনেকে আত্মবিস্মৃত, তাতে এসে যায় না কিছু। ভেড়ার পালের মধ্যে প্রতিপালিত হলে সিংহ নিজের সঠিক জায়গাটি জানতে পারে না। তাই তার সুফলও পায় না। কিন্তু জায়গাটা তো তারই থেকে যায়, আর যেই সে সেটা বোঝে, ভেড়ার ওপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করে। কিন্তু কোনও ভেড়া সিংহ সেজে থাকলেও কখনও সিংহের মর্যাদা পাবে না।

আর মানুষ যে ঈশ্বরের আদলে তৈরি সে-কথা প্রমাণ করার জন্য নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষকে তার মধ্যে ঈশ্বরের আদলটি কতখানি ফুটে বেরোল, তা দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। এটা দেখানোই যথেষ্ট যে অন্তত একজন মানুষ তা দেখিয়েছে। আর মানবজাতির মহান ধর্মাচার্যরা যে নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের আদর্শ দেখিয়েছেন, এ-কি অস্বীকার করা যাবে?[৩৪]

আমার বিশ্বাস, আমি অহিংসা দ্বারা সম্পৃক্ত। অহিংসা ও সত্য আমার দুই ফুসফুস। তাদের বাদ দিয়ে আমি বাঁচতে পারি না। প্রতি মুহূর্তে, অহিংসার অসীম ক্ষমতা ও মানুষের ক্ষুদ্রতা, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে আমার চোখে ধরা পড়ছে।

অসম্পূর্ণ অহিংসা

এক অরণ্যবাসী তার অপরিমেয় করুণা সত্ত্বেও হিংসা সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে না। প্রতি নিশ্বাসে সে কিছুটা হিংসার কাজ করে। দেহটাই তো এক কসাইখানা। তাই মোক্ষ ও স্বর্গসুখ কেবল সম্পূর্ণ দেহমোচনে। সেই কারণে মোক্ষের আনন্দ ব্যতীত সকল সুখই ক্ষণস্থায়ী, অসম্পূর্ণ। এক্ষেত্রে, প্রাত্যহিক জীবনে অনেক তিক্ত হিংসার গরল আমাদের পান করতে হয়।[৩৫]

কোনও-না-কোনও হিংসা দ্বারাই দেহে জীবন বিদ্যমান থাকে। তাই নেতিবাচক এক শব্দে উচ্চতম ধর্মের সংজ্ঞা বলা হয়েছে অহিংসা। পৃথিবী ধ্বংসের নিগড়ে বাঁধা। অন্য কথায় দেহকে জীবন্ত থাকার জন্য হিংসার আবশ্যকতা সহজাত। তাই অহিংসার উপাসক সর্বদা দেহের বন্ধন থেকে পরম মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে।[৩৬]

ভেবে কষ্ট পাই, কিন্তু জানি এ দেহে বাঁচবার বাসনা আমাকে নিরন্তর হিংসায় জড়াচ্ছে। তাই এই মর্ত্যকায়ার প্রতি আমি ক্রমেই উদাসীন হয়ে পড়ছি। যেমন, আমি জানি যে নিশ্বাস নেবার সময় বাতাসে ভাসমান অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু আমি ধ্বংস করি। কিন্তু আমি তো শ্বাস-প্রশ্বাস থামাই না। তরিতরকারি খাওয়াও হিংসা—কিন্তু দেখছি যে তা ছাড়তে পারছি না।

আবার কীট ও জীবাণুনাশক ব্যবহার হিংসা। কিন্তু কেরোসিনের মতো সংক্রমণনাশক তো বর্জন করতে পারছি না, যা মশা ইত্যাদি তাড়াতে ব্যবহার করি। যখন ধরাও

যায় না, আবার নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন তো আশ্রমে সাপ মারাও মেনে নিই। বলদ চরাতে পাচনের ব্যবহারও সহ্য করি আশ্রমে।

কাজেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষেভাবে কত যে হিংসার কাজ আমি করি, তার শেষ নেই...এই বিনম্র স্বীকারোক্তির পর বন্ধুরা যদি আমার ওপর আশাভরসা ত্যাগ ক'রে আমাকে ছেড়ে যান, তাহলে দুঃখিত হব। কিন্তু অহিংসা অনুশীলনে আমার ত্রুটি লুকোবার চেষ্টা আমাকে দিয়ে কিছুতেই করানো যাবে না। এটুকুই বলতে পারি, অহিংসার মতো মহান আদর্শের সংশ্লিষ্ট সবকিছু বোঝার অবিরত চেষ্টা চালাচ্ছি। চিন্তায়, কথায় ও কাজে তা অনুশীলন করছি—কিছুটা সাফল্য যে পাইনি, তাও নয়। তবে জানি সামনে এখনও পাড়ি দেবার দীর্ঘপথ পড়ে আছে।।[৩৭]

জীবন্ত প্রাণীব্যবচ্ছেদ

আমাকে ঠিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরোধী বলা যাবে না। বরঞ্চ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক প্রেরণার আমি প্রশংসা করি। যদি সে প্রশংসায় কিছু খামতি থাকে তার কারণ, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী ঈশ্বরের নিম্নস্তরের সৃষ্টিগুলির কোনও দাম দেন না। জীবন্ত পশুব্যবচ্ছেদ আমি সমস্ত আত্মা দিয়ে ঘৃণা করি। বিজ্ঞান ও তথাকথিত মানবতার নামে নিষ্পাপ প্রাণের ওই অমার্জনীয় হত্যা আমি ঘৃণা করি। নিষ্পাপের রক্তে কলঙ্কিত সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না।

জীবন্ত পশুব্যবচ্ছেদ ছাড়া যদি রক্তসঞ্চালন তত্ত্ব আবিষ্কার করা না যেত তা বাদ দিয়েই মানবজাতির দিব্যি চলে যেত। আমি দেখতে পাচ্ছি তেমন দিন আসছে যখন পশ্চিমের সৎ বিজ্ঞানী জ্ঞানান্বেষণের বর্তমান পদ্ধতির ওপর সীমারেখা আরোপ করবেন।

মনুষ্যেতর

ভাবীকালের পঞ্জিতে শুধু মানব-পরিবার নয়, যা-কিছু জীবিত, সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা যেমন ধীরগতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করছি যে হিন্দুরা তাদের এক-পঞ্চমাংশকে অবনমিত ক'রে সমৃদ্ধ হবে অথবা পাশ্চাত্যের মানুষ, প্রাচ্য ও আফ্রিকান জাতিগুলিকে শোষণ ক'রে উন্নতি করবে, বেঁচে থাকবে—এ-চিন্তা ভ্রান্ত। তেমনই আমরা সময়ে উপলব্ধি করব মনুষ্যেতর সৃষ্টির ওপর আমাদের আধিপত্য নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করার জন্য নয়, আমাদের সঙ্গে সমানভাবে তাদের উপকার সাধনের জন্য। কেননা আমি নিশ্চিত আমার যেমন আত্মা আছে, তাদেরও তা আছে।[৩৮]

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন পশুর ওপর মানুষের আধিপত্য আরও জোরে চেপে বসছে বলে মনে হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি মানবিকভাবেই পশুদের ব্যবহার করার প্রবণতাও বাড়ছে। তিন ধরনের মানবতাবাদী আছে। একদল পশুশক্তির বদলে অন্য যে-কোনও শক্তি ব্যবহারের পক্ষপাতী। আর এক দল মনে করে, মনুষ্যেতর প্রাণীকে স্বজাতীয় প্রাণীরূপে গণ্য ক'রে তাদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব ভ্রাতৃপ্রতিম আচরণ করা শ্রেয়। তৃতীয় দল, মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে। উপরন্তু,

তারা নিজেদের ও স্বজাতীয় প্রাণীদের শক্তি ততটুকুই ব্যবহার করতে চায় যতটুকু করলে মনুষ্যেতর প্রাণী নিজের বুদ্ধিবিবেচনা ও ইচ্ছার অনুরূপ কাজ দেয়। আমি তৃতীয় দলে।[৩৯]

'যন্ত্রণা উপশমে মৃত্যু ঘটানো'

একটি কুকুর বা অন্য যে-কোনও জীবিত প্রাণী অসহায়ভাবে মন্থর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করছে—এ দৃশ্য আমি এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারি না। কোনও মানুষ ওই অবস্থায় পড়লে তাকে আমি মেরে ফেলব না, কারণ আমার কাছে অধিকতর আশাপ্রদ আরোগ্যব্যবস্থা রয়েছে। কোনও কুকুর যদি ওই অবস্থায় পড়ে, তাহলে তাকে আমি মেরে ফেলব। কারণ সেক্ষেত্রে আমার কাছে কোনও নিরাময় ব্যবস্থা নেই। আমার ছেলের জলাতঙ্ক রোগ হলে তার যন্ত্রণা উপশমের কোনও চিকিৎসা না থাকলে, তাকে মেরে ফেলাই আমি উচিত বলে মনে করব।

অদৃষ্টবাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। নিরাময়ের সকল চেষ্টা শেষ হলে আমরা অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিই। এক যন্ত্রণার্ত শিশুর কষ্টলাঘবের অন্যতম এবং শেষ আরোগ্য-ব্যবস্থা হল তাকে মেরে ফেলা।[৪০]

একটি গোরুকে বাঁচাতে আমি কোনও মানুষকে যেমন মারব না, তেমনই এক মানুষের প্রাণরক্ষার্থে, একটি গোরুকে মারব না তা সে-প্রাণ যত দুর্মূল্য হোক-না-কেন।[৪১]

আমার ধারণা অনুযায়ী, একজন মানুষের চেয়ে একটি মেষের জীবন কম দুর্মূল্য নয়। মানব শরীরের জন্য এক মেষের প্রাণনাশ করতে আমি রাজি হব না। আমার মতে, একটি প্রাণী যত অসহায়, মানুষের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মানুষের দ্বারাই তার রক্ষা পাবার অধিকার তত বেশি।[৪২]

বিষাক্ত প্রাণীদের সমস্যা

কোনও প্রাণের, এমনকি একটি সাপের প্রাণের বিনিময়েও আমি বাঁচতে চাই না। সাপের দংশনে আমি বরং মরে যাব, তবু তাকে আমি মারব না। তবে এমনও হতে পারে, ঈশ্বর যদি আমাকে তেমন নিষ্ঠুর পরীক্ষায় ফেলেন ও তাঁরই ইচ্ছায় একটি সাপ আমাকে দংশন করতে উদ্যত হয়, তখন হয়তো মরার সাহস আমার হবে না। কিন্তু আমার ভেতরের পশুটা মাথা চাড়া দিতে পারে, এই নশ্বর দেহকে বাঁচাবার জন্য আমি সাপটাকে মারবার চেষ্টা করতে পারি।

আমি মানছি, আমার মধ্যে বিশ্বাস ততটা মূর্ত হয়ে ওঠেনি যাতে জোর দিয়ে বলতে পারি সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য সর্পভীতি যতখানি জয় করা দরকার ততটা আমি পেরেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যেসব বিষাক্ত নিষ্ঠুর দুষ্ট চিন্তা লালন করি, সাপ বাঘ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর তারই পাল্টা জবাব দেন...

আমার বিশ্বাস সব প্রাণই এক। চিন্তার রূপই কেবল পৃথক। আমাদের সঙ্গে বাঘ ও সাপের আত্মীয়তা আছে। দুষ্ট, নিষ্ঠুর, লালসাপূর্ণ চিন্তা এড়িয়ে চলতে ওরা আমাদের সতর্ক করে। যদি পৃথিবীকে বিষাক্ত পশু ও সরীসৃপ-মুক্ত করতে চাই, তাহলে আমাকে

নিজের সব বিষাক্ত চিন্তা ত্যাগ করতে হবে। আমার অসহিষ্ণু অজ্ঞতায়, এ-দেহের অস্তিত্ব আরও দীর্ঘায়িত করার বাসনায়, আমি যদি তথাকথিত বিষাক্ত পশু ও সরীসৃপ হত্যা করি, তাহলে ধরে নেব আমি বিষাক্ত চিন্তা ত্যাগ করছি না। ওইরকম বিপজ্জনক প্রাণীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার বদলে আমি যদি মরে যাই তাহলে আরও ভালো। পূর্ণতর মানুষ হয়ে আমি পুনরুত্থান করব। এ-বিশ্বাস অন্তরে রেখে, সাপের মধ্যে বাসকারী এক সমসত্তাকে কেমন করে আমি মারতে পারি?[৪৩]

...শিয়রে শমন নিয়ে আমরা সত্যে পৌঁছবার পথ হাতড়ে চলেছি। এটা বোধহয় ভালোই যে, জীবনের প্রতিপদে আমরা বিপদের মুখোমুখি হই। কেননা বিপদ ও আমাদের অস্তিত্বের অনিশ্চয়তার কথা জেনেও সকল প্রাণের উৎসের প্রতি আমাদের উপেক্ষা আর তার চেয়েও বেশি আমাদের বিস্ময়কর ঔদ্ধত্য। যে কোনও আকারের, যে কোনও প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করে। তবে যেসব প্রাণীকে বিনাশক বলে অভিজ্ঞতায় জেনেছি, তাদের সঙ্গে মিতালি পাতাবার মতো অত সবল নয় আমার অন্তর। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রামাণিক বিশ্বাস লাভ করেও আমি তার ওপর ভরসা রাখতে পারি না। যতদিন সাপ, বাঘ ইত্যাদিকে ভয় পাবার মতো কাপুরুষতা আমার মধ্যে থাকবে, ততদিন এই ভরসাহীনতাও থাকবে।[৪৪]

আমার অভ্রান্ত বিশ্বাস, সামান্যতম অজুহাতে নরহত্যা করার প্রবণতা মানুষের যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে। সে অপরের জীবন নিয়ে যথেচ্ছাচার করতে দেয় নিজেকে। যদি সে সত্যই বিশ্বাস করত, ঈশ্বর হলেন প্রেম ও করুণার ঈশ্বর, তাহলে কারও প্রাণ নিতে সে শিউরে উঠত। যাই হোক, মৃত্যুভয়ে বাঘ, সাপ, পক্ষহীন মাছি, মশা, ইত্যাদিকে, যদি আমি মারিও তবু সতত সেই উদ্ভাসন প্রার্থনা করি, যা সকল মৃত্যুভয় হরণ করবে, জিঘাংসা প্রবৃত্তি দূর করে আমার মনকে শ্রেয়তর পথ চিনিয়ে দেবে। কেননা:

> যে শক্তি আমাকে করুণা করে,
> তার কাছে শিখেই
> আমি ওদের করুণা করতে শিখেছি।[৪৫]

সর্বোচ্চ আদর্শ

আমার অহিংসা শুধুমাত্র সর্বজীবের প্রতি দয়া নয়। জৈনধর্মে মনুষ্যেতর জীবনের পবিত্রতার ওপর গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি বোঝা যায়। কিন্তু মানবজীবনের তুলনায় কাউকে ওই জীবনের প্রতি বেশি সদয় হতে হবে, এ তো কখনওই হতে পারে না। অনুরূপ জীবনের পবিত্রতা বিষয়ে লেখার সময়ে ধরে নিচ্ছি, মানবজীবনের পবিত্রতা সর্বজনস্বীকৃত। মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর, বাস্তবায়নের সময় আদর্শটি বিকৃত হয়ে পড়েছে। যেমন, অনেকে পিপীলিকাদের খাইয়ে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। মনে হয়, তত্ত্বটি এক জড়, নিষ্প্রাণ গোঁড়া বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ধর্মের নামে কপটতা ও বিকৃতি লোকসমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে।

অহিংসা পরম আদর্শ। এটি সাহসীর জন্য, কাপুরুষের জন্য কখনওই নয়। অন্যদের

হত্যা ক'রে সুবিধা লাভ করা এবং এটা খুব ধার্মিক ও অহিংসের কাজ বলে নিজেকে ধোঁকা দেওয়া নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা।[৪৬]

হত্যা না করার উপদেশ

আমার অহিংসা আমারই। পশু হত্যা না-করবার উপদেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। যেসব পশু মানুষ খায়, জখম করে, তাদের প্রাণ বাঁচাবার কোনও তাগিদ আমার নেই। তাদের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করা, আমার মতে, অন্যায়। তাই আমি পিপীলিকা, বানর, বা কুকুরদের খাওয়াব না। তাদের প্রাণ বাঁচাতে একটি মানুষেরও প্রাণ বিসর্জন দেব না।

এভাবে ভাবতে ভাবতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, বানরের উৎপাতে যেখানে মানুষের জীবন বিপন্ন, সেখানে তাদের মেরে ফেলা ক্ষমার্হ। এই হত্যা কর্তব্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ আইন কেন মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে না। তা করা যায় না, কেননা যত মন্দই হোক, মানুষ তো আমাদেরই মতো। ঈশ্বর মানুষকে বিচারশক্তি দিয়েছেন, যা পশুর নেই।[৪৭]

বানর এবং অনুরূপ প্রাণীদের অনিষ্ট থেকে যদি সমাজ ও নিজেদের বাঁচাতে চাই, তাহলে ওদের মেরে ফেলতে হবে। যথার্থ অহিংসার এটাই দাবি। সাধারণ নিয়ম হল যতদূর সম্ভব হিংসা এড়িয়ে চলব। সমাজের জন্য অহিংসা, ব্যক্তির ক্ষেত্রে অহিংসার থেকে অবশ্যই পৃথক। সমাজের বাইরে যে বাস করে, সে সকল সতর্কতা উপেক্ষা করতে পারে। সমাজ তা পারে না।[৪৮]

৯০. আমার জন্য কোনও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা নয়

আমি চাই না আমার বাড়ির চারদিকে পাঁচিল তোলা হোক। আমার বাতায়ন বন্ধ থাকুক। আমি চাই, সকল দেশের সংস্কৃতির খোলা হাওয়া আমার বাড়ি দিয়ে বহে যাক। তবে, কাউকেই আমি আমার ভারসাম্য নষ্ট করতে দেব না। পরের বাড়িতে এক অনধিকার প্রবেশকারী, এক ভিখারি বা দাস হয়ে থাকতে আমি নারাজ।[৪৯]

আমরা চারদিকে পাঁচিল তুলে সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকব, এ আমি ভাবতেই পারি না। তবে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা বজায় রেখে এ-কথাও বলব, অপরাপর সংস্কৃতির গুণগ্রাহিতা, আমাদের সংস্কৃতির গুণগ্রাহিতা ও আত্মীকরণের অনুগমন করবে, পুরোগামী হবে না।

কোনও সংস্কৃতিই আমাদের মতো এতো সমৃদ্ধ নয়—এ আমার দৃঢ় অভিমত। কিন্তু আমরা তার খোঁজ রাখি না। এমনকি আমাদের বাধ্য করা হয়েছে সংস্কৃতিচর্চা থেকে বিরত থাকতে এবং তার মূল্যের কদর না করতে। জীবন থেকে ওই সংস্কৃতি আমরা প্রায় বাদ দিয়েছি। অনুশীলনবর্জিত পণ্ডিতিয়ানা সুগন্ধি-মাখা-শবের মতো; দেখতে হয়তো মনোরম, কিন্তু মনকে অনুপ্রাণিত বা উন্নীত করে না।

আমার ধর্ম অন্য সংস্কৃতিকে হেয় বা অশ্রদ্ধা করতে যেমন নিষেধ করে তেমনই নিজের সংস্কৃতি আত্মস্থ ক'রে তাই নিয়ে বাঁচতেও বলে। নইলে তা হবে সামাজিক আত্মবিনাশ।[৫০]

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমন্বয়

বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় ভারতে স্থায়ী হয়েছে। তা ভারতীয় জীবনকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি আবার প্রভাবিত হয়েছে ভারতের মাটি দিয়েই। এ সমন্বয় অবশ্যই স্বদেশী গোত্রের হবে, যেখানে প্রতি সংস্কৃতির নিশ্চিত, বৈধ জায়গা থাকবে...[৫১]

[ভারতীয় সভ্যতা] ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস-আশ্রিত সভ্যতার সংমিশ্রণ। যে ভৌগোলিক ও অন্যান্য পরিবেশে এইসব সংস্কৃতি মিলিত হয় তাদের দ্বারা প্রভাবিত। তাই ইসলামীয় সংস্কৃতি আরব, তুর্কী, মিশর ও ভারতে এক রকম নয়। তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের অবস্থাগত প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি তাই একান্তভাবে ভারতীয়ই। সামগ্রিকভাবে এই সংস্কৃতি হিন্দু বা ইসলামীয় বা অন্যকিছু নয়। এ-সবকিছুর মিলনেই সে গড়ে উঠেছে, এবং একান্তভাবে প্রাচ্যভাবাপন্ন। যে নারী বা পুরুষ নিজেকে ভারতীয় বলে সে, এই সংস্কৃতির অছিদারী হিসেবে, বাইরের সমস্ত আক্রমণ থেকে একে সযত্নে আগলে রাখতে বাধ্য।[৫২]

আমাদের কালের ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। আজ যেসব সংস্কৃতি পরস্পরের প্রতি বৈরভাবাপন্ন, আমাদের মধ্যে অনেকে চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে। একলা চলার নীতি আঁকড়ে থেকে কোনও সংস্কৃতিই বাঁচতে পারে না।

ভারতে আজ খাঁটি আর্য সংস্কৃতি বলে কোনওকিছুর অস্তিত্ব নেই। আর্যরা ভারতের দেশজ, না অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী, তা আমাকে তেমন টানে না। যা আকর্ষণ করে তা হল আমার প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা অবাধ স্বাধীনতায় পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। আমরা, বর্তমান প্রজন্ম, সেই মিশ্রণের পরিণাম।

আমরা আমাদের জন্মভূমি ও আমাদের ধারয়িত্রী এই ক্ষুদ্র ভূ-মণ্ডলের শুভার্থী, না গলগ্রহ—একমাত্র ভবিষ্যতই সে-কথা প্রমাণ করবে।[৫৩]

হয় আমরা ধরে নেব, বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষেরা বন্ধুভাবে একত্রে বসবাস ক'রে নানা সংস্কৃতির এক মনোরম ঐকতান সৃষ্টি করে গেছেন, যার রূপ চিরস্থায়ী ও ক্রমশ শক্তিশালী করার জন্য আমরা প্রয়াস চালাব। নতুবা, যেদিন একটিমাত্র ধর্মই হিন্দুস্থানে বিরাজ করত সেই কালকে খুঁজে বেড়াব এবং ফেলে আসা পদচিহ্ন ধরে পেছিয়ে যাব সেই বিচ্ছিন্ন একক সংস্কৃতির দিকে।

তেমন কোনও ঐতিহাসিক সাল তারিখ খুঁজে পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি পাই, যদি পিছন পানে হাঁটি, তাহলে আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেব সেই কুৎসিত কালপর্বে এবং সঙ্গতভাবেই অভিসম্পাত কুড়ব সমগ্র বিশ্বের।[৫৪]

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

নিজের বিষয়ে বলতে গেলে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছে আমার ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেও বলছি, জাতির যতটুকু সেবাকার্য করতে পেরেছি, তার *একমাত্র* কারণ, যতদূর সম্ভব প্রাচ্য সংস্কৃতিকে আমি ধরে রেখেছি। জনগণের কাছে আমি সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় হয়ে যেতাম যদি এক ফিরিঙ্গিমার্কা, বিজাতীয় মানুষ হতাম। যে জনগণের সামান্যই জানে, তাদের জন্য সামান্যই ভাবে—সম্ভবত জনসাধারণের ধরন-ধারণ, অভ্যাস-আচরণ, চিন্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তাচ্ছিল্যই করে।[৫৫]

ইউরোপীয় সভ্যতা নিঃসন্দেহে তাদেরই উপযুক্ত। কিন্তু আমরা যদি তা নকলের চেষ্টা করি, ভারতের সর্বনাশ হবে। তার মানে এই নয়, যা ভালো, আমাদের দ্বারা আত্মীকরণ সম্ভব, তা আমরা গ্রহণ ও আত্মস্থ করব না। বা ইউরোপীয়দের মধ্যে যেসব দোষ ঢুকে পড়েছে সেগুলো তাদের বর্জন করতে হবে না।

বৈষয়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে অবিরাম ছুটে চলা এবং ক্রমাগত তা বাড়িয়ে যাওয়া এক বিরাট অভিশাপ। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এই মনোভাব ইউরোপীয়দের ঢেলে সাজাতে হবে। নইলে, আজ তারা যে আরামপ্রদ জীবনের দাসত্ব করছে, সেই জীবনই তাদের পিষে মেরে ফেলবে। হতে পারে, আমার বুঝতে ভুল হচ্ছে। কিন্তু জানি, ভারত যদি সোনার হরিণের পেছনে ছোটে তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

এসো, আমাদের হৃদয়ে এক পাশ্চাত্য দার্শনিকের নীতিবাক্য মুদ্রিত করে রাখি— "সহজসরল জীবন ও উন্নত মনন"।

আজ এটা নিশ্চিত যে, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনযাত্রা উচ্চমানের হতে পারে না। আমরা অল্প ক'জন—যারা বলি যে আমরা জনগণের হয়ে ভাবি—উচ্চমানের জীবনযাত্রার বিফল সন্ধান করতে গিয়ে হয়তো উচ্চমার্গের চিন্তা করতে ভুলে যাব। এ বিপদের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[৫৬]

পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্য

আমি মনে করি, আমাদের হয়ে অন্য কেউ আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারে না। আমরাই একে বাঁচাতে পারি, আবার ভুল করলে আমরাই তাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারি।[৫৭]

যদিও রাজনীতিগতভাবে আমরা স্বাধীন কিন্তু পশ্চিমের সুচতুর সূক্ষ্ম আধিপত্য থেকে সামান্যই মুক্ত হতে পেরেছি। রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বাস করেন, জ্ঞান একমাত্র পশ্চিম থেকেই আসতে পারে তাঁদের সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। আবার এ-বিশ্বাসেও আমার সমর্থন নেই যে, পশ্চিম থেকে ভালো কিছুই আসতে পারে না। তবুও আমার আশঙ্কা, এ প্রসঙ্গে এখনও আমরা কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি।

আশা করা যায়, কেউই এই বিশ্বাস আঁকড়ে বসে নেই যে রাজনৈতিক দিক থেকে বিদেশী আধিপত্য কাটিয়ে উঠেছি বলেই আমরা বিদেশী ভাষা ও বিদেশী চিন্তাধারার নাগপাশ থেকেও পুরোপুরি মুক্ত হয়েছি।[৫৮]

এশীয়দের জন্য এশিয়া

"এশীয়দের জন্য এশিয়া"—বলতে যদি ইউরোপীয়ান-বিরোধী জোট বোঝায়, তাহলে এই মতবাদে আমার সমর্থন নেই। এশিয়াকে যদি আমরা কুয়োর ব্যাঙ করে রাখতে না চাই, তবে এশীয়দের জন্য এশিয়াকে কেমন করে রাখতে পারি? কিন্তু সে তো কূপমণ্ডুক হয়ে থাকতে পারে না। সমগ্র বিশ্বকে তার তো এক বার্তা দেবার আছে, শুধু তাকে এর যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। বৌদ্ধ প্রভাবের ছাপ রয়ে গেছে সমগ্র এশিয়াতে। যার মধ্যে আছে ভারত, চীন, জাপান, বর্মা, সিংহল, মালয় রাজ্যমালা। আমি বর্মী ও সিংহলীদের বলেছিলাম, তারা নামেই বৌদ্ধ, প্রকৃত বৌদ্ধ হল ভারত। একথা আমি চীন ও জাপানকেও বলতে পারি। এশিয়াকে শুধু এশিয়ার নয়, সমগ্র বিশ্বের হয়ে উঠতে গেলে বুদ্ধের বার্তা আমার শিখতে হবে। দুনিয়াকে তা শেখাতে হবে। আজ কোথাও তার ঠাঁই নেই। তোমরা তোমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকারের প্রতি বিশ্বস্ত হও—এই একটি ছাড়া তোমাদের দেবার মতো আমার অন্য কোনও বার্তা নেই। এ-বার্তা ২,৫০০ বছরের প্রাচীন। কিন্তু আজও তা জীবনের সঙ্গে অম্বিত করা যায়নি। তবে ২,৫০০ বছর কী আর এমন বেশি! কালচক্রে একটি বিন্দুমাত্র। আমরা ভাবছি, অহিংসার ফুলটি বুঝি শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে ফুল তো এখনও ভালো করে ফোটেইনি।[৫৯]

আশা করি, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষ...ঐক্যবদ্ধ একটি দুনিয়া গড়ে তোলার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রয়াস চালাবে। এই অভীষ্ট অর্জনের পথ ও পন্থার কথা তাদেরই ভাবতে হবে। স্থির সংকল্প নিয়ে যদি কাজ করো, তাহলে আমাদের প্রজন্মেই এই স্বপ্ন সার্থক হবে তাতে কোনও সংশয় নেই...। এই দুনিয়া যদি এক না হয়, তাহলে সে দুনিয়াতে আমি বাঁচতে চাই না। তাই, আমার জীবৎকালেই এই স্বপ্নের সার্থকতা আমি দেখে যেতে চাই বইকি।[৬০]

সকলের চোখ ভারতের দিকে। বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকার পানে...ব্রিটেনের ওপর ভারত এক নৈতিক জয় অর্জন করেছে। কেননা ভারত লড়াই করেছে অহিংসার পথে, আর তাই এশিয় দেশগুলি ভারতের কাছে সঠিক পথনির্দেশ পাবার আশা করে। সেই আশা যাতে বিফল না হয় তা দেখা প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য। ভারত যদি এশিয়া ও আফ্রিকাকে সঠিক পথনির্দেশ দেয়, দুনিয়ার চেহারা পালটে যাবে।[৬১]

এক বিশ্ব

এ-বিশ্বকে ঈশ্বর এমন নিয়মে বেঁধে রেখেছেন যে, কেউ তার ভালোত্ব ও মন্দত্ব কেবল নিজের জন্য আঁকড়ে রাখতে পারে না। এই সমগ্র দুনিয়া বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ সম্বলিত মানবদেহের মতো। এক অঙ্গে ব্যথা হলে, সারা শরীর সেটা টের পায়। এক অঙ্গে পচন ধরলে তা নিশ্চিতভাবে পুরো দেহব্যবস্থাকে বিষাক্ত করবে।[৬২]

ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির মঙ্গলকামনা মানুষের আকুল অভিপ্রায় হওয়া উচিত। আর একমাত্র প্রার্থনা হবে, আমরা যেন সেই কর্তব্যসাধনের শক্তি পাই। সকলের শুভকামনায় জড়িয়ে আছে তারও মঙ্গল। যে শুধু নিজের, বা নিজ-সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করে, সে

স্বার্থপর, এবং তার কখনও ভালো হয় না।[৬৩]

দুটি নতুন রাষ্ট্রের (ভারত ও পাকিস্তানের) সামনেই পথ খোলা আছে, লক্ষ্য অবারিত...পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির এক পরিবার গঠন, যা স্বতই অভ্যন্তরীণ সামরিক শক্তিকে বাদ দেবে। 'নিজেও ভোগ করব না, অপরকেও ভোগ করতে দেব না'—ভারতের ক্ষেত্রে এমন এক জঘন্য নীতির কথা আমি ভাবতেও পারি না। তা যদি ঘটে তাহলে ভারত বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে...

যদি ভারতের প্রচেষ্টায় স্বাধীন ও মুক্ত রাষ্ট্রসমূহের এক ফেডারেশন গঠন সম্ভব হয় তবে ঈশ্বরের সাম্রাজ্য বা রামরাজ্যের আশা করা অন্যায় হবে না।[৬৪]

ইউনেস্কো

শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মাধ্যমে 'জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন' শান্তি সুনিশ্চিত করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে আমি গভীর আগ্রহী। যতক্ষণ পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বৈষম্য বিরাজমান, ততক্ষণ প্রকৃত নিরাপত্তা ও স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত হতে পারে না, এ-আমি খুবই বুঝি। অপেক্ষাকৃত দুর্ভাগা দেশগুলির সুদূরতম আঁধার ঘরে আলো নিয়ে যেতে হবে। আমি মনে করি এ কাজে অর্থনীতি ও শিক্ষায় অগ্রসর জাতিগুলির বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।[৬৫]

৯১. জাতীয়তা বনাম আন্তর্জাতিকতা

ভারতীয় জাতীয়তা

আমি স্বদেশের স্বাধীনতা চাই, যাতে অন্যান্য দেশ আমার স্বাধীন দেশ থেকে কিছু শিখতে পারে, মানবজাতির উপকারে আমার দেশের সম্পদ ব্যবহৃত হতে পারে। আজ যেমন দেশভক্তি আমাদের শেখায়, ব্যক্তিকে মরতে হবে পরিবারের জন্য, পরিবারকে গ্রামের জন্য, গ্রাম জেলার জন্য, জেলা প্রদেশের জন্য, প্রদেশ দেশের জন্য, ঠিক তেমনই একটি দেশেরও স্বাধীনতা দরকার, যাতে সে বিশ্বের হিতার্থে প্রয়োজনে মরতে পারে। তাই জাতীয়তাবাদের প্রতি বা আমার জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি আমার ভালবাসার অর্থ হল, আমার দেশ স্বাধীন হোক, যাতে মানবজাতির প্রাণরক্ষার জন্য প্রয়োজনে সমগ্র দেশ প্রাণবিসর্জন দিতে পারে। জাতিবিদ্বেষের কোনও স্থান সেখানে নেই। সেটাই হোক আমাদের জাতীয়তাবাদ।[৬৬]

আমাদের জাতীয়তাবাদ অন্য জাতিগুলির পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে না, কেননা আমরা কাউকে শোষণ করব না—ঠিক তেমনি আমাদেরও শোষণ করতে দেব না কাউকে। স্বরাজের মধ্য দিয়ে আমরা সমগ্র পৃথিবীর সেবা করব।[৬৭]

আমার কাছে দেশপ্রেম ও মানবিকতা সমার্থক। আমি দেশপ্রেমিক, কেননা আমি মানুষ এবং মানবিক। এ কোনও একচেটিয়া ব্যাপার নয়। ভারতের সেবা করতে গিয়ে আমি ইংল্যাণ্ড বা জার্মানীর ক্ষতি করব না। আমার জীবন-পরিকল্পনায় সাম্রাজ্যবাদের কোনও জায়গা নেই। এক দেশপ্রেমিকের আইন, এক পিতৃতান্ত্রিকের আইন থেকে পৃথক নয়। এবং এক দেশপ্রেমিক যদি ঐকান্তিকতাহীন মানবিকতাবাদী হয়, সে আর তেমন দেশপ্রেমিক থাকে না। ব্যক্তিগত ও রাজনীতিক আইনে কোনও সংঘাত নেই।[৬৮]

কারও পক্ষে জাতীয়তাবাদী না হয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া অসম্ভব। আন্তর্জাতিকতাবাদ তখনই সম্ভব, যখন জাতীয়তাবাদ হয়ে ওঠে একটি বাস্তব ঘটনা। অর্থাৎ যখন বিভিন্ন দেশের মানুষ নিজেদের সংগঠিত ক'রে একটি মানুষ হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয়। জাতীয়তাবাদ তো পাপ নয়। আধুনিক জাতিসমূহের যা অভিশাপ—সেই সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নিজেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবা—এগুলিই পাপ। সবাই চায় পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে। অপরের ধ্বংসস্তূপের ওপর ইমারত গড়তে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক ভিন্নপথের পথিক। সে চায়, নিজেকে সংগঠিত করতে, অথবা সমগ্র মানবতার কল্যাণ ও সেবার জন্য পূর্ণ আত্মপ্রকাশ খুঁজে পেতে...ঈশ্বর আমার ভাগ্য ভারতের মানুষদের মধ্যে অর্পণ করেছেন, যদি তাদের সেবায় ব্যর্থ হই, আমার স্রষ্টার কাছে আমি অসৎ প্রতিপন্ন হব। তাদের কেমন করে সেবা করব, তা-ই যদি না জানি, তাহলে মানবতাকে কেমন ক'রে সেবা করতে হয় তা-ও আমি কোনওদিন জানতে পারব না। স্বদেশসেবার কাজ করতে গিয়ে যতক্ষণ না আমি অন্যান্য জাতির ক্ষতি করছি ততক্ষণ কোনওক্রমেই আমি ভুলপথে যেতে পারি না।[৬৯]

মানব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভারত

সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষিতে ভাবতে চাই না আমি। সাধারণভাবে মানবজাতির মঙ্গল আমার দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমার ভারত-সেবাকার্যের অন্তর্ভুক্ত মানবতার সেবা কার্য...ভারতকে স্বাধীন করার সমগ্র পরিকল্পনাটি, আন্তর শক্তির উন্নয়নের ভিত্তিতে রচিত। এ হল আত্মশুদ্ধির পরিকল্পনা। তাই পশ্চিমের মানুষ ভারতের আন্দোলনকে সবচেয়ে ভালো সাহায্য করতে পারে বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়ে, ভারতের অন্তর্মুখীনতা অনুশীলনের জন্য। বিশেষজ্ঞরা ভারতে আসুন যথার্থ সত্যসন্ধানীর উপযুক্ত খোলা মন নিয়ে, সকল অহংকর ত্যাগ করে...

লিখিত বা উচ্চারিত শব্দের শক্তির চেয়ে চিন্তাশক্তিতে আমি বেশি বিশ্বাস করি। যে-আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই, তার যদি জীবনীশক্তি থাকে এবং যদি স্বর্গের আশীর্বাদধন্য হয় তাহলে তা সঞ্চারিত হবে সমগ্র বিশ্বে, সর্বত্র, আমি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও...

অহংকার করছি না, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমার বাণী ও পদ্ধতি মূলত সমগ্র বিশ্বের জন্য এবং গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছি, পশ্চিমের বহুসংখ্যক নরনারীর হৃদয়ে তা চমৎকার সাড়া জাগিয়েছে এবং অনুরাগীর সংখ্যা প্রত্যহ বেড়ে চলেছে।[৭০]

মনে হয়, আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটি ছোট পরিধির মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে। এর কারণ আমার সীমাবদ্ধতা। তা আমি জানি, জেনে বেদনাবোধ করি। কিন্তু আশা রাখি, সেই ক্ষুদ্রপরিধি বিষয়ে যা সত্য তা সম্পূর্ণ সমগ্রের বেলায়ও সত্য হওয়া সম্ভব...সমগ্র পৃথিবীর সহায়তার জন্য আমি আকুল। আমি তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি... কিন্তু আমি জানি, দুকূলপ্লাবী বন্যার মতো, আমাদের ওপর আছড়ে পড়ার আগে আমাদের তার যোগ্য হতে হবে।[৭১]

ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্য

শুধু ভারতীয় মানবতার সৌভ্রাত্র আমার অন্বিষ্ট নয়। শুধু ভারতের মুক্তি আমার লক্ষ্য নয়। যদিও নিঃসন্দেহে আজ তা বলতে গেলে আমার সমগ্র জীবন ও সময় জুড়ে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে আমি মানব-সৌভ্রাতৃত্বের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যেতে ও তা উপলব্ধি করতে চাই। আমার দেশপ্রেম আর সবকিছুকে বাদ দিয়ে নয়। তা সমগ্র বসুধাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। যে-দেশপ্রেম অন্যসব জাতির দুঃখ দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তাকে শোষণ ক'রে বড় হতে চায়, আমার কাছে তা অবশ্য বর্জনীয়। আমার ধারণাপ্রসূত-দেশপ্রেম যদি সর্বদা ও সর্বথা ব্যাপকতম মানবতার মঙ্গলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হয় তাহলে তার কোনও মূল্যই নেই। শুধু তাই নয়, আমার ধর্ম হতে নিঃসৃত আমার দেশপ্রেম ও ধর্ম, সকল প্রাণকে আপন করে নেয়। সৌভ্রাত্র ও একাত্মতা উপলব্ধি করতে চাই শুধু মানুষ নামে পরিচিত সত্তার সঙ্গে নয়, সকল প্রাণের সঙ্গে, এমনকি যারা সরীসৃপ তাদের সঙ্গেও। এ-কথা শুনে চমকে যেও না। আমি সরীসৃপের সঙ্গেও আত্মীকরণ উপলব্ধি করতে চাই এই জন্য যে, আমরা একই ঈশ্বর হতে উদ্ভূত—যদি তা হয়, তাহলে যে রূপেই দেখা দিক, সকল প্রাণই মূলত এক।[৭২]

আমি ভারতের এক দীনসেবক। ভারতকে সেবা করার মাধ্যমে আমি বিস্তৃত মানবজাতিরই সেবা করি। অল্পবয়সেই আবিষ্কার করেছিলাম, ভারতসেবার সঙ্গে মানবতার সেবার কোনও বিরোধ নেই। বয়স, এবং আশা করি প্রজ্ঞাও যত বাড়ল, দেখলাম সে কথা সত্য। প্রায় পঞ্চাশ বছর জনজীবনের একজন হয়ে কাটাবার পর আজ বলতে পারি, জাতির সেবার সঙ্গে পৃথিবীর সেবার কোনও বিরোধ নেই—এ নীতিতে আমার বিশ্বাস বেড়েছে। এ এক উৎকৃষ্ট নীতি। একমাত্র একে মেনে নিলে পৃথিবীর অবস্থা সহজ হবে। আমাদের পৃথিবীতে বসবাসকারী জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা বন্ধ হবে।[৭৩]

স্বাধীনতা বনাম পারস্পরিক নির্ভরতা

বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য, ঐচ্ছিক পরস্পর নির্ভরতা।[৭৪]

পৃথিবীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা আজ যুযুধান পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র চায় না। চায়, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বন্ধুত্বপূর্ণ স্বাধীন বহু রাষ্ট্রের ফেডারেশন। এমন সম্ভাবনা হয়তো সুদূর পরাহত। স্বদেশের ক্ষেত্রে বড় কিছু দাবি করতে চাই না। কিন্তু স্বাধীনতা নয়, বিশ্বজনীন

পরস্পর নির্ভরতার জন্য আমাদের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করার মধ্যে বিরাট বা অসম্ভব কিছু আমি দেখি না... আমি চাই স্বাধীনতা জাহির না করেই সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার সামর্থ্য। ব্রিটেন যখন তার সাম্রাজ্যের মধ্যেই ভারতের সম্পূর্ণ সাম্যলাভের ঘোষণা করবে, তখন, যে-পরিকল্পনাই আমি করি-না-কেন, তা হবে মিত্রতার, মিত্রতাহীন স্বাধীনতার নয়।[৭৫]

সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক

স্বয়ম্ভরতার মতোই পরস্পর-নির্ভরতা মানুষের আদর্শ এবং তাই হওয়া উচিত। মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক না থাকলে মানুষ বুঝতে পারে না সে বিশ্বের সঙ্গে একীভূত। দমন করতে পারে না তার অহংবাদ। সামাজিক আন্তর্নির্ভরতাই মানুষকে তার নিজের বিশ্বাস বাজিয়ে দেখার, বাস্তবতার কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই ক'রে নেবার ক্ষমতা দেয়। মানুষের অবস্থা যদি এমন হতো বা নিজেকে সে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারত যে, অন্যের ওপর নির্ভর করার কোনও দরকারই তার নেই, তাহলে সে সত্যি সত্যি বিশ্বের পক্ষে এক অহংকারী ও উদ্ধত-আপদের-বোঝা হয়ে দাঁড়াত। সমাজের ওপর নির্ভরতা তাকে মানবতার শিক্ষা দেয়। এ-কথা ঠিক-প্রত্যেকেরই উচিত তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন নিজেই সব মিটিয়ে ফেলা। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমার কাছে পরিষ্কার, স্বয়ম্ভরতার দৌলতে কেউ যদি সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে তাহলে সেটা পাপের সমতুল। তুলো চাষ থেকে সুতো কাটা অবধি যেসব কাজ করতে হয়, তাতেও কোনও ব্যক্তি স্বয়ম্ভর হতে পারে না। কোনও-না-কোনও সময় তাকে পরিবারের লোকজনের সাহায্য নিতেই হয়। আর, পরিবারের কাছ থেকেই যদি সে সাহায্য নিল, তবে প্রতিবেশীদেব কাছে নেবে না কেন? অথবা "বিশ্ব আমার পরিবার"—এই মহান উক্তির তাৎপর্যই বা থাকবে কোথায়?[৭৬]

আমরা যেন...ভুলে না যাই, সামাজিক স্বভাবই মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করেছে। স্বাধীন হবার বিশেষ অধিকার যদি তার থেকে থাকে, তবে আন্তনির্ভরশীল হওয়ার কর্তব্যও তার ওপর সমানভাবে বর্তায়। একমাত্র উদ্ধত ব্যক্তিই দাবি করবে, কাউকে সে চায় না, সে একাই একশো।[৭৭]

ব্যক্তি

সমাজজীবনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আন্তর্নির্ভরতা দুটোই আবশ্যক। শুধু এক রবিনসন ক্রুসোই নির্ভেজাল স্বয়ম্ভর হতে পারে। অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মেটাতে কোনও ব্যক্তি যখন তার যথাসাধ্য ক'রে ফেলে, বাকিটার জন্য সে তার প্রতিবেশীদের সহায়তা চাইবে। সেটাই হবে যথার্থ সহযোগিতা।[৭৮]

আত্মানুসন্ধান মানে নিজেকে উন্নীত করা, পরানুসন্ধান নিজেকে হেয় করা। যৌথ জীবনের শিল্প ও গুণাগুণ (আমাদের) শেখা উচিত। যার মধ্যে সহযোগিতার সীমাবৃত্তরেখা বেড়েই চলেছে, যতক্ষণ না অবশেষে তা সমগ্র মানবজাতিকে আবেষ্টন করে।[৭৯]

এমন একটি সদ্‌গুণও নেই, যার লক্ষ্য শুধু একক ব্যক্তির মঙ্গল ও তার দ্বারা তৃপ্তিলাভ। এর বিপরীতে, এমন একটি অপরাধও নেই যা প্রকৃত অপরাধী ছাড়াও প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অন্যদের বিপদে ফেলে না। তাই, এক একক ব্যক্তি ভালো না মন্দ সেটা শুধু তার নিজের ব্যাপারে নয়, সমগ্র সম্প্রদায়, সমগ্র বিশ্বের ভাবনার ব্যাপার।[৮০]

মানবজাতি এক। সকলেই সমানভাবে নৈতিক আইনের শাসনাধীন। ঈশ্বরের চোখে সকল মানুষ সমান। জাতি, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির তফাৎ অবশ্যই আছে। তবে যার সামাজিক অবস্থান যত উঁচু, দায়িত্বও তার তত বেশি।[৮১]

আমি বিশ্বাস করি না...এক ব্যক্তি আত্মিকভাবে লাভবান হয় এবং তার চারপাশের লোক কষ্ট পায়। আমি অদ্বৈতে বিশ্বাসী, মানুষের এবং সকল প্রাণীর মৌল একত্বে বিশ্বাসী। তাই আমি বিশ্বাস করি, এক ব্যক্তি আত্মিকভাবে লাভবান হলে সারা দুনিয়া সে লাভের অংশীদার হয়। এবং এক ব্যক্তির পতন হলে গোটা বিশ্বেরই পতন ঘটে।[৮২]

আত্মোৎসর্গের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হল, ব্যক্তি নিজেকে উৎসর্গ করবে গোষ্ঠীর জন্য, গোষ্ঠী জেলার জন্য, জেলা প্রদেশের জন্য, প্রদেশ জাতির জন্য, জাতি বিশ্বের জন্য। মহাসাগর থেকে এক বিন্দু জল তুলে নিলে কোনও কাজ দেয় না তাতে, তা উবে যায়। কিন্তু যখন মহাসাগরের মধ্যে থেকে যায়, তখন বড় বড় জাহাজ বক্ষে বহন করার গৌরব অর্জন করে।[৮৩]

৯২. জাতিবর্ণ বিদ্বেষ

জীবন এক অবিভাজ্য সমগ্র। তাই-মানুষ জীবনের একভাগে ন্যায় করছে এবং অন্য কোনও ভাগে অন্যায়, এ হতে পারে না।[৮৪]

আমার জীবনপরিকল্পনায় যেমন ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পার্থক্য করে না, তেমনি বিভিন্ন জাতির মধ্যেও তফাৎ করে না। আমার কাছে "মানুষ, সবকিছু নিয়ে মানুষই থেকে যায়"।[৮৫]

শ্বেতাঙ্গদের নীতি

('দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা মানুষদের নীতি') চোখে দেখা-না-গেলেও তা এক বিশ্বযুদ্ধের বীজ বহন করে।[৮৬]

শ্বেতাঙ্গরা যদি সত্যিই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাইরের সাহায্য কী দরকার তাদের?[৮৭]

টিকে থাকার জন্য যে সভ্যতাকে জাতিবিদ্বেষী আইন প্রণয়ন ও বিনাবিচারে মৃত্যুদণ্ড দেবার আইন ও বাইরের সাহায্য দরকার হয়, তাকে কি সভ্যতা বলা যায়?[৮৮]

প্রতিশোধ

যদি-না-কেউ একজন কৃষ্ণাঙ্গদের সত্যাগ্রহ অস্ত্র উপহার দেয়, তাহলে একদিন তারা তাদের শ্বেতাঙ্গ নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংস্র অ্যাটিলার মতো অভ্যুত্থান করবে।[৮৯]

...যদি বিনাবিচারে মৃত্যুদণ্ড দেবার আইন দক্ষিণ আফ্রিকায় চলতে দেওয়া হয়, তাহলে শ্বেত-সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কতিলক অঙ্কিত হবে। আশা করি, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ও মানবজাতির সুসভ্য বিবেক তা চলতে দেবে না।[৯০]

এই নতুন জাতিভেদপ্রথা, ভারতের প্রাচীন কিন্তু মুমূর্ষু প্রথার চেয়েও খারাপ। মুমূর্ষু হলেও ভারতের প্রথার মধ্যে কিছু ভালো দিকও আছে। নয়া সুসভ্য সংস্করণে সে-সবের বালাই নেই। সে বেহায়ার মতো ঘোষণা করে, এশীয় ও আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য শ্বেত-সভ্যতার চারপাশে আইনের পাঁচিল তোলা প্রয়োজন।[৯১]

'শ্বেতাঙ্গের বোঝা'

'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' মানে কি রক্ষা করার অজুহাতে কালোমানুষের ওপর আধিপত্য চালাবার ঔদ্ধত্য? কখনওই নয়। যে কপটতা ওদের কুরে খাচ্ছে, তা থেকে ওদের বিরত হওয়া উচিত। আর দেরি নয়, শ্বেতাঙ্গরা সকল মানুষকে নিজেদের সমান মনে করতে শিখুক। সাদাচামড়ার মধ্যে তো কোনও রহস্য লুকিয়ে নেই। এটা বারবার প্রমাণ হয়েছে, সমান সুযোগসুবিধা দিলে যে কোনও বর্ণের বা দেশের মানুষ যে-কোনও মানুষের সমান।

"তোমরা যাহা ইচ্ছা করো যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও"। যিনি এ-কথা বলেছিলেন, (শ্বেতাঙ্গরা) কি তাঁর নাম মিছেই নেয়? তারা কি হৃদয় থেকে সেই মহান অশ্বেতকায় এশীয়কে নির্বাসিত করেছে, যিনি বিশ্বকে ওই বার্তা দিয়ে গেছেন?

ওরা কি ভুলে যায় যে মানবজাতির মহত্তম আচার্যরা সকলেই এশীয়? একজনের মুখও সাদা নয়? এঁরা যদি মর্ত্যে এসে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, তাহলে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক এলাকায় থাকতে হবে। এবং এশীয় ও অশ্বেতকায় বলে আইন মতে, শ্বেতাঙ্গদের সমান হবার অযোগ্য বলে চিহ্নিত হবেন।[৯২]

জাতিবর্ণ বিদ্বেষ অপসারণ

যারা জাতিবৈষম্য অবসানের কথা বলেও এ-পাপের বিরুদ্ধে কাজের কাজ কিছুই করে না, তারা নপুংসক। তাদের আর আমি কী বলব! শেষ পর্যন্ত নিপীড়িতদের নিজের মুক্তি নিজেদেরই অর্জন করতে হবে...সমাধান অনেকটাই ভারতের হাতে। ভারতের নিজের ঘর যদি ঠিকঠাক থাকে, সমস্যা সমাধানে সে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে...

ইউ. এন. ও. যদি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বিবাদের ব্যাপারটি ন্যায়সঙ্গতভাবে না দেখে তাহলে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। ন্যায়নিষ্ঠ হলে তবেই ইউ. এন. ও-র সমৃদ্ধি ঘটবে, এ-নিয়ে আমার কোনও সংশয় নেই।[৯৩]

৯৩. যুদ্ধ ও শান্তি

যুদ্ধে আমার অংশগ্রহণ

এতবছর ধরে আত্মসমীক্ষা চালাবার পরেও মন করি, যে-পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম, তাতে বুয়র যুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, এবং বলা যেতে পারে, ১৯০৬ সালে নেটালে তথাকথিত জুলু 'বিদ্রোহে'র সময় আমি যে-পথ নিয়েছিলাম, তা না নিয়ে উপায় ছিল না।

অসংখ্য শক্তি জীবন শাসন করে। যদি কেউ একটি সাধারণ নীতি মেনে নিজ কর্মের ধারা স্থির করে ফেলতে পারত—যে-নীতি ওই বিশেষ মুহূর্তে নিমেষমাত্র চিন্তা না করেই প্রয়োগ করা যায়, তাহলে তো জীবনতরী তরতর করে বয়ে যেত। কিন্তু অত সহজে স্থির করতে পেরেছি, এমন একটি কাজও মনে পড়ে না।

মনেপ্রাণে আমি যুদ্ধবিরোধী। তাই সুযোগ পেয়েও মারণাস্ত্রের প্রশিক্ষণ কখনও নেইনি। সম্ভবত, এই জন্যই আমি সরাসরি মানুষের জীবনহানির দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাই। কিন্তু বলপ্রয়োগ-নির্ভর একটি সরকারের অধীনে যখন বাস করেছি, তার দেওয়া সুযোগসুবিধা যখন স্বেচ্ছায় নিয়েছি, তখন সেই সরকার যুদ্ধ জড়িয়ে পড়লে, আমার সাধ্যমত তাকে সাহায্য করতেই হতো। নইলে, সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা ক'রে, যেসব বিশেষ সুবিধা পেয়েছি, তা যথাসাধ্য প্রত্যাখ্যান করতে হতো।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি এক সংস্থার সদস্য। তার হাতে কয়েক বিঘা জমি আছে, বানরের উৎপাতে সে জমির ফসল নয়ছয় হতে বসেছে। আমি সকল প্রাণের পবিত্রতায় বিশ্বাসী। বানরদের আঘাত করা মানে অহিংসায় ফাটল ধরানো। কিন্তু ফসল বাঁচানোর তাগিদে বানরদের উপর আক্রমণে উসকানি ও নেতৃত্ব দিতে ইতস্তত করি না। এ-অন্যায় এড়াতে পারলে ভালো হতো। এড়ানো যায়, সংস্থাটি ত্যাগ ক'রে, বা ওটি ভেঙে দিয়ে। তা আমি করি না। কেননা, এমন কোনও সংস্থা পাবার আশাই করতে পারি না, যেখানে চাষবাস নেই, ফলত, কোনওরকম প্রাণনাশও নেই। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, সবিনয়ে ও মনস্তাপে আমি তাই বানরদের আঘাত হানায় অংশ নিই। আশা, কোনওদিন বেরোবার পথ খুঁজে পাব...

তবুও, আমি তিনবার যুদ্ধের কাজে অংশ নিয়েছি। যে সমাজে আছি, তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারি না। সেটা আমার পক্ষে পাগলামি। ওই তিনবার ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার কোনও চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। ওই সরকার বিষয়ে আমার অবস্থান আজ সম্পূর্ণ আলাদা। তাই তার যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ আমার উচিত নয়। তার সামরিক কার্যকলাপে অংশ নিতে বাধ্য হলে আমাকে কারাবাসের, এমনকি ফাঁসিতে যাবার ঝুঁকি নিতে হবে।[১৪]

জাতীয় সেনাবাহিনী

...যদি জাতীয় সরকার থাকে, তাহলে আমি সরাসরি কোনও যুদ্ধে অংশ না নিলেও তেমন পরিস্থিতির কথা ভাবতেই পারি, যখন সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুকদের সপক্ষে ভোট দেওয়া আমার কর্তব্য হবে। কেননা আমি জানি, সকলেই আমার মতো অতখানি অহিংসায় বিশ্বাসী নয়। জোর ক'রে কোনও ব্যক্তি বা সমাজকে অহিংস করা যায় না।[১৫]

পরিস্থিতির চাপে আমি অহিংসার শিক্ষক হয়েছি। আমার জীবনে সাধ্যমত আমারই শিক্ষাকে বলবৎ করব। মনে হয়, নিজেকে যুদ্ধবিরোধী রাখার শক্তিও আমার আছে। আর মনে হয়, নিজে যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারব।

স্বরাজের অধীনে এক জাতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা আমি সমর্থন করব। হয়তো এজন্যই যে আমি বুঝি, মানুষকে জোর করে অহিংস করা যায় না। আজ মানুষকে শেখাচ্ছি, অহিংস উপায়ে কী করে এক জাতীয় সংকটের মুখোমুখি হওয়া যায়।

তবে এক সংকট মুহূর্তে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে অহিংসা মানা এক কথা, আর জীবনের এক দর্শন হিসেবে প্রত্যেককে চিরকাল তা মেনে চলার কথা বলা আর এক কথা। আমি তা অসম্ভব বলে মনে করি না। কিন্তু তেমন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার শক্তি আমার নেই। তাই আমি হয়তো জাতীয় সামরিকবাহিনী প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করব না। শুধু আমি তাতে যোগ দিতে পারি না। অন্তরে স্পষ্ট অনুভব করি, ওই রকম একটি বাহিনী নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, অন্যদের মনে এ-বিশ্বাস জন্মাতে পারি, তেমন ভাষা তো আমার জানা নেই।[১৬]

অহিংসা কী ভাবে কাজ করে

অহিংসা কাজ করে এক রহস্যময় উপায়ে। অহিংসার প্রেক্ষিতে কোনও মানুষের কাজ প্রায়ই বিশ্লেষণ করা যায় না। তেমনই প্রায়শ দেখা যায়, শব্দার্থের বিচারে মানুষটি হয়তো অহিংসার প্রতিমূর্তি, অথচ তার কাজকর্মের ওপর হিংসার আবরণ। এবং পরে দেখা যায়, অনুমান সঠিক। আমার আচরণ বিষয়ে এটুকুই বলতে পারি, যেসব উদাহরণ দিলাম, সেসব কাজ অহিংসার স্বার্থেই করা হয়েছিল। অন্যকোনও স্বার্থের বলিদান দিয়ে হীন জাতীয় বা অন্য কোনও স্বার্থসিদ্ধি করার কোনও চিন্তাই ছিল না...

আমার কাছে অহিংসা শুধুমাত্র এক দার্শনিক নীতি নয়। এ আমার জীবনের নিয়মনীতি ও প্রাণবায়ু। জানি, আমি প্রায়শ বিফল হই। কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতে। এ তো বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপার নয়। হৃদয়ের ব্যাপার। নিরন্তর ঈশ্বরের সেবা ক'রে, চূড়ান্ত বিনয়দীনতায়, আত্মত্যাগে, সর্বদা নিজেকে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত রেখে, তবে প্রকৃত পথনির্দেশ মেলে। এর অনুশীলন সর্বোচ্চ নির্ভীকতা ও সাহস দাবি করে। আমার ব্যর্থতা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি সচেতন।

কিন্তু আমার অন্তরের বর্তিকা অকম্প্র ও উজ্জ্বল। সত্য ও অহিংসা ব্যতীত আমাদের বাঁচার উপায় নেই। যুদ্ধ অন্যায় আমি জানি, এ-এক চরম পাপ। এ-ও জানি যুদ্ধকে বিদায় নিতে হবে। দৃঢ় বিশ্বাস করি রক্তপাত ও প্রবঞ্চনার দ্বারা স্বাধীনতা কোনও স্বাধীনতা

নয়...হিংসা বা অসত্য নয়, অহিংসা ও সত্যই আমাদের সত্তার আইন।[৯৭]

একজন অহিংস ব্যক্তি সহজাতভাবেই হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এক ব্যবস্থায় পরোক্ষের চেয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে। তার সামনে অন্যকোনও পথ খোলা নেই। সে এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। আমি যে পৃথিবীতে থাকি তা অংশত হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রতিবেশীদের মারার জন্য সেনাবাহিনীকে পয়সা দেওয়া, অথবা নিজেই এক সৈন্য বনে যাওয়া: এই দুইয়ের মধ্যে কোনও পথ যদি বেছে নেবার স্বাধীনতা থাকে, তাহলে বিশ্বাসের সঙ্গে সংগতি রেখে ফৌজে নাম লেখাব এই আশায়, হিংসার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করব, এমনকি আমার সহযোদ্ধাদের হৃদ্‌পরিবর্তন ঘটাব।[৯৮]

সামরিক চাকরি

শুধু সামরিক চাকরি প্রত্যাখ্যান করলেই যথেষ্ট হবে না। যখন সেই বিশেষ সময় আসে, তখন সামরিক কাজ করতে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ—পাপের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়টা পার হয়ে যাবার পর সে কাজটা করা। রোগটি গভীরে, সামরিক চাকরি বহির্লক্ষণ মাত্র। আমি বলছি তোমাদের—যাদের নাম সামরিক চাকরির খাতায় নেই তারাও এ-পাপে সমান অংশগ্রহণ করে, যদি এ কাজে রাষ্ট্রকে সমর্থন করে। যে নারী বা পুরুষ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এক সামরিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রকে সমর্থন করে—সে পাপের অংশীদার। যে বৃদ্ধ বা তরুণ কর দিয়ে ওই রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করে, সে-ও পাপের ভাগী। তাই যুদ্ধকালে নিজেকে বলেছিলাম, সেনাবাহিনীর দাক্ষিণ্যে যখন গম খাচ্ছি, সৈন্য না হয়েও বাকি সবই তার মতো করছি, তখন সেনাদলে নাম লিখিয়ে গুলি খেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। অন্যথায় আমার হিমালয়ে গিয়ে প্রকৃতিজাত খাদ্য খাওয়া উচিত। তাই, যারাই সামরিক চাকরি বন্ধ করতে চায়, তারা সহযোগিতা বন্ধ করেই সেটা করতে পারে। যে সমগ্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সমর্থক, তার সঙ্গে অসহযোগিতার চেয়ে—সামরিক কাজ করতে অস্বীকার করা অনেক ছোট ব্যাপার। তবে বিরোধীরা এমন দ্রুত কাজ করে, যে তোমাকে ধরে জেলে নিয়ে যাবার বা রাস্তায় বের ক'রে দেবার ঝুঁকি থেকেই যায়।[৯৯]

যুদ্ধ-প্রতিরোধ

যখন দুটো জাত লড়ছে—অহিংসার উপাসকের কর্তব্য তখন সে যুদ্ধ বন্ধ করা। যে এ কর্তব্যের যোগ্য নয়, যার যুদ্ধ প্রতিরোধের কোনও শক্তি নেই, এ-কাজ করার যোগ্যতা নেই, সে যুদ্ধে অংশ নিয়েও মনেপ্রাণে নিজেকে, জাতিকে ও বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করার চেষ্টা করতে পারে।[১০০]

(আমার ক্ষেত্রে) এটি গভীর বিশ্বাসের (এক ব্যাপার)। যুদ্ধকে ঘৃণা করার ব্যাপারে আমি কারও কাছে নতিস্বীকার করব না। তবে বিশ্বাস এক কথা, সঠিক অনুশীলন আর এক। স্বীয় উদ্দেশ্যের স্বার্থে এক যুদ্ধবিরোধী যা করতে পারে তা হল আর এক যুদ্ধবিরোধীকে নিবৃত্ত করা, যে হয়তো ঠিক উলটো কাজটা করছে। তত্রাচ, যুদ্ধ বিষয়ে

দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিই হয়তো এক। এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তির কারণ, মানবচরিত্রের দুর্বোধ্য জটিলতা। তাই আমি একই বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের মধ্যেও পারস্পরিক সহিষ্ণুতার আবেদন জানাই।[১০১]

যুদ্ধ বন্ধ করার সবকাজই বিফল হবে যতদিন না যুদ্ধের কারণগুলি বোঝা যায়। এবং তার মূল নিয়ে মোকাবিলা করা যায়। আধুনিক যুদ্ধের মুখ্য কারণ পৃথিবীর তথাকথিত দুর্বল জাতিগুলিকে অমানবিক শোষণ করা নয় কি?[১০২]

যুদ্ধের পেছনে কোনও সাহস, কোনও বীরত্ব না থাকলে যুদ্ধ অতি ঘৃণ্য এক ব্যাপার হতো। যুদ্ধ উৎসাদনের জন্য ভাষণের প্রয়োজন হতো না। তবে, আমি তোমাদের যা বলব, রেডক্রস সহ যুদ্ধের সকল শাখার চেয়ে তা অনেক মহান। বিশ্বাস করো আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে—যারা নিজ আবেগ ও জীবন পরিবেশের হাতে বন্দী। বিশ্বাস করো লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের ভুলে ক্ষতবিক্ষত, লক্ষ লক্ষ ভেঙে যাওয়া পরিবার আছে পৃথিবীতে। আগামীকালের শান্তি সংগঠনগুলি যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করবে, তাদের হাতে অনেক কাজ থাকবে...[১০৩]

আজ যা হচ্ছে তা হল, অহিংসা নীতিকে অশ্রদ্ধা, হিংসার অভিষেক, যেন তা এক চিরকালের আইন...আজ আমরা দেখছি, যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ে এ-ওকে হারাবার এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতা। একদিন সংঘাত বাধবে। যেদিন তা আসবে সেদিন গণতন্ত্রগুলির জয় হবে। কারণ তারাই পাবে জনগণের সমর্থন, যে জনগণ মনে করে সরকারে তাদেরও ভূমিকা আছে....[১০৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এই মহাযুদ্ধের পরিণতি হবে মহাভারতে বর্ণিত সেই যুদ্ধের মতো। ত্রিবাঙ্কুরবাসী একজন, মহাভারতকে মানুষের চিরস্থায়ী ইতিহাস বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা সঠিক। সেই মহাকাব্যে যা বর্ণিত আছে, তা ঘটছে আজ আমাদের চোখের সামনে। যুযুধান দেশগুলি এমন ক্রোধে ও ভয়ংকরতায় নিজেদের ধ্বংস করছে যে শেষে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বিজেতাদের নিয়তি হবে পাণ্ডবদের মতো। মহান যোদ্ধা অর্জুন প্রকাশ্য দিবালোকে এক সামান্য দস্যুর দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিলেন। আর, এই ভয়ংকর হত্যালীলা থেকে জন্ম নেবে এক নতুন ব্যবস্থা। লক্ষ লক্ষ শোষিত মেহনতী মানুষ এতকাল যার জন্য তৃষিত হয়ে আছে। শান্তিপ্রেমীদের প্রার্থনা বিফল হতে পারে না। সত্যাগ্রহ এক বেদানার্ত আত্মার অভ্রান্ত, মূক প্রার্থনা।[১০৫]

(কোনও কোনও লোক তর্ক করে যে) ঘৃণা কখনও প্রেমে রূপান্তরিত হতে পারে না। যারা হিংসায় বিশ্বাসী তারা একে কাজে লাগিয়ে বলবে, "মারো তোমার শত্রুকে, আঘাত হানো তার ও তার সম্পত্তির ওপর। যেখানেই পারো প্রকাশ্যে, বা গোপনে—যখন যেমন দরকার"! এর পরিণাম, হবে, গভীরতর ঘৃণা, প্রতিবিদ্বেষ, প্রতিশোধ। দু'পক্ষের ক্ষেত্রেই। আধুনিক কালের এই যুদ্ধের হোতারা মরতে-না-মরতেই ঘোষণা করেছে এই

বিদ্বিষ্ট আচরণের অন্তঃসারশূন্যতা। তথাকথিত বিজেতারা জিতল, না শত্রুকে খুঁজে বের ক'রে দমন করতে গিয়ে নিজেরাই হেরে গেল—তা দেখতে এখনও বাকি আছে।[১০৬]

৯৪. পারমাণবিক যুদ্ধ

আণবিক বোমা

বিশ্বে মহাপ্রলয়-পরবর্তী এক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমি কি এখনও সত্য ও অহিংসায় আমার বিশ্বাসে অনুরক্ত? আণবিক বোমা কি সে বিশ্বাসে বিস্ফোরণ ঘটায়নি? না, তা ঘটায়নি। শুধু তাই নয়, আমাকে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে যে ওই দুটিই বিশ্বে মহত্তম শক্তি। এর সামনে আণবিক বোমা অসহায়। দুটি বিরোধী শক্তি এ-ওর বিপরীত। একটি নৈতিক ও আত্মিক, অপরটি বাস্তব ও বস্তুবাদী। একটি অপরটির চেয়ে অনন্তগুণে শ্রেয়। এই অপরটির স্বভাবধর্মেই অন্ত ঘটবে। আত্মার শক্তি চিরকালই অগ্রগতিশীল ও সীমাহীন। এর পূর্ণ প্রকাশ, একে বিশ্বে অজেয় করেছে। এ-কথা বলে আমি নতুন কিছু বলছি না। শুধু ঘটনা বিবৃত করছি। তদুপরি এই শক্তি সবার মধ্যে নিহিত। গাত্রবর্ণ নির্বিশেষে প্রতি নরনারীশিশু কেউ বাদ নয়। শুধু, অনেকের মধ্যে তা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু ঠিক মতো প্রশিক্ষণ দ্বারা একে জাগানো সম্ভব।

এটাও বুঝতে হবে, এই সত্য না চিনলে, একে উপলব্ধি করতে যথাযোগ্য চেষ্টা না করলে আত্মবিনাশের হাত থেকে বাঁচা যাবে না। প্রতিবেশীরা সাড়া দিল-কি-দিল-না, তা না ভেবে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে চললে প্রত্যেকের মধ্যেই এর প্রতিবিধান আছে।[১০৭]

আণবিক বোমা কি সবরকম হিংসার ব্যর্থতাই প্রমাণ করেনি?[১০৮]

উত্তর : অহিংসা

মার্কিনী বন্ধুরা বলেছেন, আণবিক বোমা যেভাবে অহিংসা আনবে, অন্যকিছু তা পারবে না। তা পারবে, যদি আণবিক বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা পৃথিবীতে এমন ঘৃণা আনে, যে এখনকার মতো পৃথিবী হিংসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এ হল ঠিক সেই পেটুকের মতো, যে আকণ্ঠ ভোজন করার পর বমি-বমি-ভাব হলে তখনকার মতো খাওয়া বন্ধ করে। কিন্তু বমিভাব কেটে গেলে দ্বিগুণ উদ্যমে আবার গিলতে থাকে। বর্তমান বিতৃষ্ণার ভাব কেটে গেলে পৃথিবী ওইভাবেই নবোদ্যমে হিংসায় প্রত্যাবর্তন করবে।

অনেক সময়ে 'কু' থেকে 'সু' উৎপন্ন হয়। কিন্তু তা ঈশ্বরের অভিপ্রায়, মানুষের নয়। মানুষ জানে, পাপ থেকে শুধু পাপ, ভালো থেকে শুধুই ভালোর জন্ম।

আণবিক শক্তিকে আমেরিকান বিজ্ঞানী ও সামরিক বাহিনীর লোকেরা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাল বটে, কিন্তু অন্য বিজ্ঞানীরা তাকে নিঃসন্দেহে মানবিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার

করবেন। এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু আমার আমেরিকান বন্ধুরা তা বলেননি। তাঁরা অমন নিপাট ভালোমানুষ নন, যে এমন এক প্রশ্ন তুলবেন যার জবাব একেবারে জলবৎ তরলং। যে ঘর পোড়াতে চায় সে আগুন কাজে লাগায় ধ্বংসসাধন ও হীনউদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। এক গৃহিণী, মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করতে আগুন রোজ ব্যবহার করে।

যতদূর দেখতে পাচ্ছি, যে সূক্ষ্ম অনুভূতি মানুষকে যুগে যুগে ধারণ করে রেখেছিল, আণবিক বোমা তাকে ভোঁতা করে দিয়েছে। আগে ছিল তথাকথিত যুদ্ধনীতি, যা যুদ্ধকে সহনীয় করত। এখন আমরা নগ্নসত্য জানি। যুদ্ধ, ক্ষমতা ছাড়া আর কোনও নীতি জানে না। আণবিক বোমা এক শূন্যগর্ভ জয় এনে দিল সশস্ত্র মিত্রশক্তিকে। কিন্তু কিছুকালের জন্য জাপানের আত্মার বিনাশ ঘটাল। ধ্বংসকারী জাতির আত্মার কী হল তা দেখার পক্ষে খুব কমসময় পাওয়া গেছে। প্রকৃতির শক্তি রহস্যময় উপায়ে কাজ করে। অনুরূপ ঘটনার জ্ঞাত ফলাফল থেকে অজ্ঞাত ফলাফল নিরূপণ ক'রে আমরা ওই রহস্যের সমাধান হয়তো করতে পারি। এক দাসমালিক, নিজেকে বা তার সহকারীকে খাঁচায় না ঢুকিয়ে তার দাসকে 'খাঁচাবন্দী' করতে পারে না। কেউ যেন মনে না করে, অযোগ্য উচ্চাশার তাড়নায় জাপান যেসব অন্যায় করেছে আমি তার সপক্ষে সওয়াল করছি। পার্থক্যটা মাত্রাগত। ধরে নিচ্ছি জাপানের লোভ খুবই অশোভন ছিল। কিন্তু বৃহত্তর অশোভনতা ক্ষুদ্রতর অশোভনতাকে কোনও অধিকার দেয়নি জাপানের এক বিশেষ অঞ্চলে নরনারীশিশুদের নির্দয়ভাবে ধ্বংস করবার।

আণবিক বোমার চরম ট্রাজিডি থেকে ন্যায্যত এই নীতিই প্রতিপন্ন হয় যে, এ-বোমা অন্যান্য বোমার দ্বারা ধ্বংস করা যাবে না। হিংসাকে যেমন ধ্বংস করা যাবে না প্রতিহিংসা দিয়ে। একমাত্র অহিংসার দ্বারা মানুষ হিংসা বর্জন করতে পারে। ঘৃণা জয় করার একমাত্র পথ প্রেম। প্রতিঘৃণা, ঘৃণার ভিতরের ও বাইরের, সবকিছুই বাড়িয়ে দেয়। আমি জানি, যা বহুবার বলেছি, আমার সাধ্য ও ক্ষমতা মতো যার অনুশীলন করেছি তারই পুনরাবৃত্তি করছি। যা আগে বললাম তা নতুন কিছুই নয়। পর্বতের মতোই প্রাচীন। শুধু, আমি কোনও আদর্শলিপির কথা আওড়াচ্ছি না। যা সত্তার প্রতিটি তন্তুতে বিশ্বাস করি, তাই ঘোষণা করছি। জীবনের নানাক্ষেত্রে ষাট বছরের অনুশীলন এ-বিশ্বাসকে সমৃদ্ধ করেছে, বন্ধুদের অভিজ্ঞতা তা দৃঢ় করেছে। এটাই কিন্তু মূল সত্য, যার শক্তিতে মানুষ একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে অবিচল। ম্যাক্সমূলার বহুকাল আগে যা বলেছিলেন, আমি তা বিশ্বাস করি। তিনি বলেছিলেন, মানুষ যতদিন সত্যে অবিশ্বাস করবে, ততদিন তা আউড়ে চলতে হবে।[১০৯]

"আণবিক বোমার ভয়ঙ্করতা কি জোর ক'রে পৃথিবীতে অহিংসা আনবে না? প্রতিটি জাতির যদি আণবিক বোমা থাকে,—তারা তা ব্যবহারে বিরত থাকবে। কেননা তাহলে সকলেই সমূলে বিনষ্ট হবে"। আমার অভিমত, তা হবে না। এখন অনেক বেশি ধ্বংস ও মৃত্যু ঘটাতে পারবে, এই সম্ভাবনায় হিংসাশ্রয়ী মানুষের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠবে।[১১০]

বোমার প্রতিষেধক

নরনারী শিশুর সার্বিক বিনাশের জন্য আণবিক বোমা ব্যবহার আমি বিজ্ঞানের পৈশাচিক অপপ্রয়োগ বলে মনে করি।

"প্রতিষেধক কী? এতে করে কি অহিংসা সেকেলে বলে বাতিল হয়ে গেল?" না। বরঞ্চ অহিংসাই শেষ শরণ। সে-ই একমাত্র, যাকে আণবিক বোমা ধ্বংস করতে পারে না। আমার একটি পেশীও প্রকম্পিত হয়নি যখন প্রথম শুনলাম, আণবিক বোমা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে হিরোশিমা। বরঞ্চ নিজেকেই বললাম, "এখন পৃথিবী অহিংসা বরণ না করলে মানবজাতির আত্মবিনাশ অনিবার্য"।[১১১]

আমার সন্দেহ নেই, পৃথিবীতে ততদিন শান্তির আশা ক'রে লাভ নেই যতদিন না বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের শোষণের ইচ্ছা ও হিংসাপ্রবণতা ত্যাগ করে। যুদ্ধ তো এগুলিরই স্বাভাবিক প্রকাশ এবং আণবিক বোমা তার অনিবার্য পরিণতি। বিশ্বযুদ্ধকালে আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম, খোলা চিঠি লিখেছিলাম ব্রিটেনবাসীকে, হিটলারকে, জাপানীদের, এবং এজন্য "পঞ্চম বাহিনী" বলে আখ্যাত হয়েছিলাম।[১১২]

প্রাচ্যের মনীষীরা

প্রথম জ্ঞানী ব্যক্তি জরাথুস্ত্র। তিনি প্রাচ্যবাসী। তাঁর পরে এলেন বুদ্ধ। তিনিও প্রাচ্যের, ভারতের। বুদ্ধের পরে কে এলেন? যীশু খ্রীস্ট এলেন প্রাচ্য থেকে। যীশুর আগে এলেন মোজেস। তিনি মিশরে জন্মালেও প্যালেস্টাইনের লোক। যীশুর পরে এলেন মহম্মদ। কৃষ্ণ বা রাম বা অন্য জ্যোতিষ্কদের প্রসঙ্গ আমি বাদ দিয়ে গেলাম। তাঁদের আমি কম জ্যোতির্ময় মনে করি না। তবে সাহিত্যজগতে তাঁরা কম পরিচিত। যা হোক, এশিয়ার এই সব মানুষের সঙ্গে তুলনীয় একটি মানুষকেও জানি না বিশ্বে। তারপর কী হল? প্রতীচ্যে যাবার পর খ্রীস্টধর্ম বিকৃত হয়ে পড়ল। এ-কথা বলতে হল বলে আমি দুঃখিত। আর বলব না কিছু...

এশিয়ার বার্তা

আমি চাই তোমরা এশিয়ার বার্তা বোঝ। পশ্চিমের চশমা পরে, বা আণবিক বোমা অনুকরণ ক'রে এ বোঝার নয়। যদি পশ্চিমকে কোনও বার্তা জানাতে চাও, তা সত্য ও প্রেমের বার্তা হতে হবে....এই গণতন্ত্রের যুগে, দীনতম দরিদ্রের জাগরণের যুগে, তুমি এ-বার্তা পুনঃপ্রচার করতে পারো গুরুত্ব দিয়ে। তুমি প্রতীচ্যবিজয় সম্পূর্ণ করবে, তবে নিজে শোষিত হয়েছে বলে প্রতিশোধের মধ্যে দিয়ে নয়, সত্যিকারের সমঝোতা দিয়ে। আমি নিশ্চিত, যদি তোমরা সবাই, মস্তিষ্কের বদলে হৃদয়কে একীভূত করো, প্রাচ্যের এই জ্ঞানীরা যে বার্তা রেখে গেছেন তার রহস্য বোঝার জন্য, যদি আমরা সত্যই সে কালোত্তীর্ণ বার্তার যোগ্য হয়ে উঠি, তাহলে পশ্চিমবিজয় সম্পূর্ণ হবে। এইরকম বিজয় পশ্চিমই ভালবাসবে।

আজ পশ্চিম জ্ঞানের জন্য তৃষিত। আণবিক বোমার সংখ্যাবৃদ্ধিতে পশ্চিম মরিয়া

হয়ে উঠেছে। কেননা আণবিক বোমার অর্থ চূড়ান্ত ধ্বংস—শুধু পশ্চিমের নয়, সারা বিশ্বের। এ যেন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হতে চলেছে। এক বিধ্বংসী মহাপ্লাবন অবশ্যম্ভাবী। এখন এ তোমার দায়িত্ব বিশ্বকে তার নিষ্ঠুরতা ও পাপের কথা বলা—তোমাদের ও আমার আচার্যরা এই উত্তরাধিকারই শিখিয়েছেন এশিয়াকে।[১১৩]

যথার্থ অহিংসার বিরুদ্ধে, হিংসার অস্ত্র, এমনকি আণবিক বোমাও অকেজো হয়ে পড়ে।[১১৪]

৯৫. শান্তির পথ

ক. নিরস্ত্রীকরণ

আমি বলি (অহিংসার) নীতি রাজ্যসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভালো। জানি, বিগত মহাযুদ্ধের কথা বলা মানে চোরাবালি দিয়ে হাঁটা। তবু, অবস্থা বোঝাবার জন্য তা করতেই হবে। গত যুদ্ধ ছিল সম্পত্তি ও ক্ষমতা বাড়াবার যুদ্ধ। আমি যেমন বুঝেছি। দুই পক্ষেই। দুর্বল জাতিগুলিকে শোষণলব্ধ অর্থ নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারার যুদ্ধ ছিল এটা। মিষ্টি কথায় যাকে বলা যায়, বিশ্ববাণিজ্য...দেখা যাবে, ইউরোপ নিরস্ত্রীকরণ শুরু করার আগে—যা তাকে করতেই হবে যদি না সে আত্মহত্যা করতে চায়—কোনও দেশকে নিজেকে নিরস্ত্র করতে হবে বিশাল ঝুঁকি নিয়ে। যদি এই সুখের ব্যাপার কোনওদিন ঘটে, সে দেশে অহিংসার স্তর স্বভাবতই এত উপরে উঠে থাকবে যা পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। তার বিচার হবে অভ্রান্ত, সিদ্ধান্ত দৃঢ়, বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গে তার ক্ষমতা মহান—সে দেশ নিজের জন্য এবং অন্য সকল দেশ ও জাতির জন্য বাঁচতে চাইবে।[১১৫]

আফিম উৎপাদনের মতোই, বিশ্বে অসি তৈরিও নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের জন্য আফিমের চেয়ে তরবারি হয়তো অনেক বেশি দায়ী।[১১৬]

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কর্তব্য

"যেহেতু নিরস্ত্রীকরণ প্রধানত নির্ভর করে বৃহৎ শক্তিগুলির ওপর, তবে সুইজারল্যাণ্ডের মতো এক ছোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে নিরস্ত্র হতে বলা হচ্ছে কেন"? (*জনৈক সুইস ব্যক্তির প্রশ্ন*)

তোমার দেশের নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে আমি শুধু সুইজারল্যাণ্ড নয়, সকল শক্তিকেই এ-কথা বলছি। এই বার্তা যদি ইউরোপে অন্যত্র বহে নিয়ে না যাও, তাহলে আমার দোষক্ষালন হয়ে যাবে। সুইজারল্যাণ্ড এক নিরপেক্ষ দেশ ও অনাগ্রাসী জাতি, তাই সুইজারল্যাণ্ডের তো কোনও সামরিক বাহিনী থাকার দরকারই নেই। দ্বিতীয়ত, তোমাদের অতিথিপরায়ণতা, তোমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার জন্যই তো বিভিন্ন

জাতির মানুষেরা তোমার কাছে যাচ্ছে। পৃথিবীকে নিরস্ত্রীকরণের শিক্ষা তোমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব। দেখানো সম্ভব, সেনাবাহিনী বাদ দিয়ে চলবার মতো যথেষ্ট সাহস আছে তোমাদের।[১১৭]

"এক নিরস্ত্র নিরপেক্ষ দেশ কেমন করে অন্যান্য দেশকে ধ্বংস হতে দিতে পারে? বিগত যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনী, সীমান্তে প্রস্তুত না থাকলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।" (*এক সুইস ব্যক্তির প্রশ্ন*)

আমাকে হয়তো স্বপ্নচারী বা বুদ্ধিহীন বলে গণ্য করা হবে। তবু, সে ঝুঁকি নিয়েই আমার মতো করে এ-প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। কোনও নিরপেক্ষ দেশ যদি একটি আগ্রাসী সেনাবাহিনীকে তার প্রতিবেশী দেশকে ছারখার করতে দেয়, তাহলে তা হবে কাপুরুষতা। সামরিক সৈন্য ও অহিংসার সৈন্যদের মধ্যে দুই বিষয়ে মিল আছে। আমি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক ও ফেডারেল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলে খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুর জোগান দিতে অস্বীকার করে হানাদার বাহিনীকে ঢুকতে দিতাম না। দ্বিতীয়ত, থার্মোপলির মতো, সুইজারল্যাণ্ডে নরনারীশিশুর এক জীবন্ত প্রাকার তৈরি করে, তোমরা তোমাদের আক্রমণকারীদের বলতে পারতে: যেতে হলে আমাদের মৃতদেহ মাড়িয়ে যাও। বলতে পারো, এ-ঘটনা মানুষের অভিজ্ঞতা ও সহ্যশক্তির বাইরে। আমি বলি, তা নয়। এ তো খুবই সম্ভব। গতবছর গুজরাটে মেয়েরা টুঁ-শব্দটি না করে লাঠিচার্জ সয়েছে। পেশোয়ারে হাজার হাজার মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি খেয়েছে, কিন্তু হিংসার আশ্রয় নেয়নি। কল্পনা করো, এক সেনাবাহিনী অন্য এক দেশে ঢোকার জন্য নিরাপদ পথ খুঁজছে, আর, তাদের সামনে এই সব নারী ও পুরুষ। বলতে পারো, সে সেনাবাহিনী এমনই বর্বর যে ওদের মাড়িয়ে চলে যাবে। তবু বলব, নিজেদের মরতে দিলে তোমরা তোমাদের কর্তব্য করতে। যে-বাহিনী নিরপরাধ নরনারীর মৃতদেহ মাড়িয়ে যায়, তারা দ্বিতীয়বার সে কাজ করতে পারবে না। লক্ষ লক্ষ নরনারী অনুরূপ সাহস দেখাবে—এ যদি বিশ্বাস করতে না-চাও, তবুও তোমাকে মানতেই হবে অহিংসা অনেক দৃঢ় উপাদানে তৈরি। দুর্বলের হাতিয়ার হিসাবে একে ভাবাই হয়নি, ভাবা হয়েছিল সর্বোত্তম সাহসীর জন্য।[১১৮]

বৃহৎ শক্তি ও নিরস্ত্রীকরণ

বৃহৎ শক্তিগুলির যে-কোনওদিন (অহিংসা) গ্রহণ করবার, নিজেদের মহিমান্বিত করবার উত্তরপুরুষের অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হবার পথ খোলাই আছে। তারা, অথবা তাদের যে-কেউ যদি বিনাশের ভয় ত্যাগ করতে পারে, নিজেরা নিরস্ত্র হতে পারে, তাহলে অনায়াসে তারা অন্যদের মানসিক সুস্থতা ফিরে পেতে সাহায্য করবে। তবে তখন ওই বৃহৎ শক্তিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পৃথিবীর তথাকথিত অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতিদের শোষণ করা ছাড়তে হবে। জীবনপ্রণালী পালটাতে হবে। এর মানে এক সম্পূর্ণ বিপ্লব। সাধারণভাবে আশাই করা যায় না যে, বৃহৎ শক্তিগুলি যে-পথে চলে এসেছে, নিজেদের মূল্যবোধ অনুযায়ী একের এক এক যুদ্ধ জয় ক'রে গেছে, সে পথ আপনা হতে ত্যাগ ক'রে তারা এর বিপরীত পথে চলবে। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা তো আগেও ঘটেছে,

এই গদ্যময় যুগে তা আবারও ঘটতে পারে। অন্যায়ের প্রতিকার করার যে শক্তি ঈশ্বরের আছে তাকে খর্ব করার সাহস আছে কার? একটি ব্যাপার সুনিশ্চিত। এই উন্মত্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতা যদি চলতে থাকে, তাহলে ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক হত্যাকাণ্ড ঘটতে বাধ্য। যদি কোনও বিজেতা বেঁচে যায়, তাহলে সেই বিজয়ী জাতির পক্ষে ওই বিজয়ই হবে এক জীবন্ত মৃত্যু। সাহসের সঙ্গে, নিঃশর্তে অহিংসনীতি ও এ-নীতির মহৎ সম্ভাবনাকে গ্রহণ করা ব্যতীত এ আসন্ন অভিসম্পাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই।[১১৯]

খ. গুণ্ডামি বনাম অহিংসা

যা প্রায়ই সবাই বলে তা আমিও বলছি, 'গুণ্ডা' জাতগুলিকে নিয়ে কী করা যাবে? আমেরিকায় ব্যক্তিগত গুণ্ডাবাজি ছিল। স্থানীয় এবং জাতীয় পুলিশী কড়া ব্যবস্থায় তা দমন করা গেছে। আমরা কি দেশগুলির ক্ষেত্রে গুণ্ডাবাজি বিষয়ে কিছু করতে পারি না? যেমন, আফিমের জঘন্য বিষ চলেছে মাঞ্চুরিয়াতে। আবিসিনিয়া ও স্পেনে—অস্ট্রিয়া হঠাৎ দখল করে নেওয়ায়, চেক্রোস্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে?

পৃথিবীর সেরা চিন্তাশীলরা যদি অহিংসার পথে দীক্ষিত না হন, তাহলে তাদের সাবেকিপ্রথায় গুণ্ডাবাজির মোকাবিলা করতে হবে। তাতে এটাই প্রমাণ হবে যে, আমরা জঙ্গলের আইন ছেড়ে বেশিদূর এগোইনি। ঈশ্বর প্রদত্ত উত্তরাধিকারের কদর করতে শিখিনি এখনও। ১৯০০ বছর বয়সী খ্রীস্টধর্মের, তার চেয়েও প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের, এমনকি (সঠিক বুঝে থাকলে) ইসলামের শিক্ষা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে আমরা বড় একটা এগোইনি। যারা অহিংসায় দীক্ষিত নয় তাদের শক্তি ব্যবহার আমি বুঝি। যারা অহিংসাব্রতী তারা সর্বশক্তি দিয়ে দেখাক যে অহিংসা, গুণ্ডাবাজিরও প্রতিরোধ করতে পারে। এটা আমি চাই। কেননা, যত নায্য কারণেই ব্যবহার করা হোক-না-কেন শক্তি ব্যবহার শেষ পর্যন্ত আমাদের, হিটলার ও মুসোলিনীর শক্তির মতোই, কাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মাত্রায় সামান্য তফাৎ থাকবে। তুমি ও আমি, যারা অহিংসায় বিশ্বাসী, তারা নিশ্চয় একে সঙ্কট মুহূর্তে ব্যবহার করব। এমন কি যদি মুহূর্তের তরে মনেও হয় এক কানাগলির পাঁচিলে মাথা ঠুকছি, তবুও গুণ্ডাদের মর্ম স্পর্শ করার আশা ছাড়ব না।[১২০]

অহিংস বিকল্প

অহিংসার শর্তাধীনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে, এ-কথা আমি বলবই যে, জাপানেরই পদ্ধতিতে জাপানের আগ্রাসন প্রতিরোধ করে ৪০ কোটি জনসংখ্যার এক মহান জাতি, মহান সংস্কৃতিসম্পন্ন চীন তার মর্যাদার প্রতি সুবিচার করেনি। আমি যে অহিংসার কথা বলছি তা যদি চীনের থাকত, তাহলে জাপানের অস্ত্রাগারের সেই নবতম মারণাস্ত্র ব্যবহারের দরকার পড়ত না। চীনারা জাপানকে বলত, "তোমাদের সব মারণাস্ত্র নিয়ে এসো। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক তোমাদের উপহার দিচ্ছি। কিন্তু বাকি ২০ কোটি তোমাদের সামনে নতজানু হবে না"। চীনারা এ-কাজ করলে, জাপান চীনের গোলাম হতো।[১২১]

...জার্মান সৈন্যরা সংখ্যায়, শক্তিতে, সামরিক সাজসরঞ্জামে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। পোল্যাণ্ডবাসীরা শৌর্যের সঙ্গে তাদের সামনে দাঁড়াল, এ প্রায় অহিংসা। এ-কথা বারবার বলতে পারি আমি। "প্রায়" শব্দটি অবহেলা করো না। আমরা এ-দেশে ৪০ কোটি। আমরা যদি এক বিশাল বাহিনী গঠন ক'রে বিদেশী আগ্রাসন রোধ করার প্রস্তুতি নিই, তাহলে নিজেদের অহিংস দূরে থাক, "প্রায়" অহিংস বলাও কল্পনাতীত। শত্রু যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল, পোল্যাণ্ডবাসীরা আদৌ তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। যখন সশস্ত্র প্রস্তুতির কথা বলি, তখন উন্নততর হিংসার দ্বারা অন্য যে-কোনও হিংসার প্রতিরোধে প্রস্তুতির কথা ভাবি। ভারত যদি কখনও নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করে, তাহলে সে বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে বৃহত্তম বিঘ্ন হবে। আমরা যদি সে পথ নিই, তাহলে ইউরোপীয় জাতিগুলির মতো আমাদেরও শোষণের পথ ধরতে হবে।[১২২]

গ. প্রেমের পথে শান্তি

আন্তর্জাতিক ঘটনাধারায় প্রেমের আইন স্বীকৃতি পেতে এখনও অনেক দেরি। সরকারি প্রশাসনযন্ত্র এক জাতি থেকে অন্য জাতির হৃদয়কে লুকিয়ে রাখে। তাদের মধ্যে আড়াল করে দাঁড়ায়। তবু...আমরা দেখছি পৃথিবী কেমন ক'রে অবিচলভাবে এগিয়ে চলেছে এই উপলব্ধির দিকে: যেমন মানুষে মানুষে তেমনি জাতিতে জাতিতে সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে বলপ্রয়োগ, আর অসহযোগিতার আর্থনীতিক নিষেধাজ্ঞা সেনা ও নৌবাহিনীর চেয়ে অনেক শক্তিশালী ও নিয়ামক।[১২৩]

যতক্ষণ না এক নতুন শক্তিকে লাগাম পরিয়ে চাকার ওপর চড়ানো হচ্ছে, ততক্ষণ পুরনো শক্তির চালকরা এই নবপ্রবর্তিত বস্তুকে তত্ত্বসর্বস্ব, অসাধ্য ভাববাদী বলে ভাববেন। আন্তর্জাতিক প্রেমের জন্য তার-সংযোগ করতে হয়তো দীর্ঘকাল লেগে যাবে, কিন্তু চলমান শরীরী বলপ্রয়োগের বদলে আন্তর্জাতিক অসহযোগিতার নিষেধাজ্ঞা বেছে নেওয়া...চূড়ান্ত ও সত্য সমাধানের দিকে এক লক্ষণীয় অগ্রগতি।[১২৪]

স্থায়ী শান্তি

স্থায়ী শান্তির সম্ভাব্যতায় অবিশ্বাস মানে, মানবচরিত্রের দেবত্ব বিষয়ে অবিশ্বাস। এতাবৎ অনুসৃত পদ্ধতিগুলি যে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ, যারা চেষ্টা করেছে তাদের গভীরতম আন্তরিকতার অভাব ছিল। এমন নয় যে, সে অভাব তারা টের পেয়েছে। এক রাসায়নিক সংযোগ যেমন প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ না হলে ব্যর্থ হয়, তেমনই শান্তি অনারব্ধ থেকে গেছে শর্তগুলি আংশিক কাজ করেছে বলে। মানবতার স্বীকৃত নেতারা, যাঁদের ধ্বংসের মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে, তাঁরা যদি সেগুলির সম্ভাব্যতা বিষয়ে পূর্ণ অবহিত হয়ে সেগুলিকে একেবারে নিঃশেষে বর্জন করতে পারেন, তাহলে স্থায়ী শান্তি আয়ত্ত হতে পারে। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ত্যাগ না করলে এটা স্পষ্টতই অসম্ভব। বৃহৎ শক্তিগুলি, আত্মবিনাশী প্রতিযোগিতা, চাহিদা তথা বৈষয়িক সম্পত্তি বাড়ানোর বাসনা বন্ধ না করলে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবন্ত ঈশ্বরে

জীবন্ত বিশ্বাসের অভাবই সব পাপের মূল। এ-এক অতি উত্তম মানবিক ট্র্যাজিডি, এই পৃথিবীতে যারা যীশুর বার্তায় বিশ্বাসী বলে দাবি করে, তাঁকে যারা শান্তির রাজপুত্র বলে অভিহিত করে, বাস্তবক্ষেত্রে তারাই সে-বিশ্বাসের অতি সামান্যই পরিচয় দেয়। আন্তরিকভাবেই যাঁরা ক্রিশ্চান ধর্মযাজক, তাঁরা কতিপয় মানুষের মধ্যে যীশুর বার্তা সীমাবদ্ধ রেখেছেন এটাও যথেষ্ট বেদনাদায়ক ঘটনা। আমাকে শৈশব থেকে শেখানো হয়েছে, এবং নিজেও যাচাই করে দেখেছি, মানবসত্তার মধ্যে যারা নীচতম তারাও মানবজাতির প্রাথমিক গুণগুলি আয়ত্ত ও অনুশীলন করতে পারে এ-কথা সত্য। ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষকে যা তফাৎ করেছে তা হল এই সন্দেহাতীত বিশ্বজনীন সম্ভাব্যতা। যদি একটি দেশও নিঃশর্তে ত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখত, আমাদের অনেকেই, জীবৎকালেই দেখতাম পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করছে।[১২৫]

বৃহৎ শক্তিবর্গ সাহসিকতার সঙ্গে নিজেদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত না নিলে শান্তি কখনও আসবে না। আমার মনে হয়, ইদানীংকার ঘটনাবলীর চাপে বৃহৎশক্তিবর্গ এ-কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। অর্ধশতাব্দীব্যাপী অবিরাম অহিংসা অনুশীলনের অভিজ্ঞতার পর আমার অটুট বিশ্বাস, একমাত্র অহিংসার পথেই বাঁচানো যাবে মানবজাতিকে। এটাই হল বাইবেলের মূল শিক্ষা। আমি এভাবেই বাইবেল বুঝেছি। আমার মধ্যে এ-বিশ্বাস আজ আরও জ্যোতির্ময়।[১২৬]

কোন তোষণ নয়

"অ্যাপিজমেন্ট" বা তোষণ করা শব্দটি ইংরিজি ভাষায় তিরস্কারের অর্থ বহন করে। শব্দটির প্রতি আমার কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি চাই। কিন্তু যে-কোনও মূল্যে নয়। মর্যাদার বিনিময়ে বা আগ্রাসকের কাছে মিনতি ক'রে তো নয়ই। তাই যারা ভাবে আমি এ-দুটির দোষে-দুষ্ট তাঁরা আশু উদ্দেশ্যের ক্ষতি করবে।[১২৭]

মানুষের শেষ সাধ্যসীমা অবধি সত্য ও অহিংসা অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তি বা জাতির জীবনে শান্তি আসবে না। প্রতিহিংসার নীতি কখনও সফল হয়নি—আমার এ-অভিজ্ঞতা প্রতিদিন শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হচ্ছে।[১২৮]

অহিংস সমাজ

অহিংস পথে সমাজকে সংগঠিত বা পরিচালিত করা যায় না, এ-কথা বলা আজ এক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বিষয়ে আমি আপত্তি জানাব। এক পরিবারে, বাপ যখন তার বেয়াড়া সন্তানকে চড় মারে—সন্তান পাল্টা চড় মারার কথা ভাবে না। সে বাবাকে মেনে নেয় চড়ের ভয়ে নয়, তবে চড় মারার পিছনে যে আহত ভালবাসা আছে তা সে টের পায়। আমার মতে এটাই সার সত্যকথা। এই পথেই সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত। পরিবারের বেলায় যা সত্য, সমাজের বেলায়ও তা সত্য। সমাজ এক বৃহৎ পরিবার ছাড়া আর কিছু নয়।[১২৯]

যুদ্ধের সমাপ্তি

যতদিন না মিত্রশক্তি বা বিশ্ব, যুদ্ধের কার্যকরতায়, তার আনুষঙ্গিক ভয়ঙ্কর শঠতা ও জালিয়াতিতে বিশ্বাস ত্যাগ করছে, এবং সকল জাতি ও দেশের স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়সংকল্প হচ্ছে, ততদিন তারা শান্তির আশা করতেই পারে না। আমার এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা আমি আবার জানাচ্ছি। যে-পৃথিবী সকল যুদ্ধের অবসান চাইছে সেখানে এক জাতির দ্বারা অপর জাতির ওপর শোষণ ও আধিপত্য চালাবার কোনও জায়গা নেই। একমাত্র সেই পৃথিবীতেই সামরিকভাবে দুর্বলতর জাতিগুলি সন্ত্রাস বা শোষণের ভয় থেকে অব্যাহতি পাবে।[১৩০]

হিংসা দ্বারা হিংসার জবাব নয়, হাত সংযত রেখে হিংসাকে ব্যর্থ করা, একইসঙ্গে (শক্তির বলে বলীয়ান্ আগ্রাসনকারীর) দাবির কাছে নতিস্বীকার না করাই হল, দুনিয়াতে সভ্যভাবে চলবার একমাত্র উপায়। যে-কোনও অন্যপন্থাই নিয়ে যাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতার দিকে, যার মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তাগিদেই থাকবে কিছুকালের শান্তি। কেননা অবসন্নও হবে সবাই, ওদিকে চলবে আরও বড়সড় হিংসার প্রস্তুতি। উচ্চতর মাত্রার হিংসার মাধ্যমে শান্তি, অবশ্যম্ভাবীরূপে নিয়ে যায় আণবিক বোমা ও তার আনুষঙ্গিক সবকিছুর দিকে। এর অর্থ অহিংসা ও গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ বানচাল করা। অহিংসা বাদ দিয়ে গণতন্ত্র সম্ভব নয়।[১৩১]

আমি জোরগলায় বলতে পারি, পৃথিবী যদি শান্তি পেতে চায় তাহলে অহিংসা ছাড়া অন্য পন্থা নেই।[১৩২]

শান্তিবাদ ও শান্তিবাদী

যথার্থ শান্তিবাদী যথার্থ সত্যাগ্রহী। সত্যাগ্রহী বিশ্বাসভরে কাজ ক'রে চলে, তাই ফলাফলের কথা ভাবে না। কেননা সে জানে কাজটি যদি খাঁটি হয়, ফল মিলবেই।

...দৃঢ়চিত্তে, আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক, যে-কোনও যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্রব না রেখে শান্তিবাদীদের নিজ বিশ্বাস প্রমাণ করতে হয়।[১৩৩]

...পর্বতে প্রদত্ত উপদেশের সঙ্গে কঠোর সঙ্গতি রেখে শান্তিবাদীদের জীবনযাপন করতে হয়। তারা অচিরে দেখবে, অনেককিছু ছাড়বার আছে তাদের, অনেক কিছু ঢেলে সাজাতে হবে। সবচেয়ে বড় যা তাদের উপেক্ষা করতে হবে, তা হল সাম্রাজ্যবাদের ফল...[১৩৪]

৯৬. আগামীদিনের বিশ্ব

ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ যেমন জল্পনা কল্পনা হচ্ছে, এমন বোধহয় আগে হয়নি। আমাদের পৃথিবী কি হিংসার দুনিয়া হয়েই থেকে যাবে চিরকাল? সেখানে কি সর্বদা থাকবে দারিদ্র, উপবাস, ক্লেশ? ধর্মে আমাদের বিশ্বাস কি ব্যাপক ও দৃঢ়তর হবে, না দুনিয়া ঈশ্বরহীন হয়ে যাবে? সমাজে যদি বড় রকম পরিবর্তন আনতে হয়, কেমন ক'রে তা আনা যাবে? যুদ্ধ দিয়ে, না বিপ্লবে? না তা আসবে শান্তিপূর্ণভাবে?

এসব প্রশ্নে নানামুনির নানা মত। প্রত্যেকে আগামীদিনের পৃথিবীর নকশা আঁকে, নিজের পছন্দ মতো, যা সে আশা করে। আমি উত্তর দিচ্ছি শুধু বিশ্বাস নয়, দৃঢ়প্রত্যয় থেকে। আগামীদিনের পৃথিবী হবে, হতেই হবে, অহিংসাভিত্তিক এক সমাজ। এটা প্রথম আইন। এ থেকে অন্যান্য সুফল নিঃসৃত হবে। মনে হতে পারে এ-বড় দূরের লক্ষ্য এক আকাশকুসুম। কিন্তু এ-কোনও মতেই অসাধ্য নয়। কেননা, এজন্য এখানে এখনই কাজ করা যেতে পারে। এক ব্যক্তি ভবিষ্যতের জীবনধারা, অহিংস জীবনধারা গ্রহণ করতে পারে। অন্যদের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। যদি এক ব্যক্তি তা করতে পারে, ব্যক্তির সমন্বয়, গোষ্ঠীগুলি কি তা পারে না? সকল জাতি? মানুষ শুরু করতেই ইতস্তত করে অনেকসময়ে, কেন-না তারা মনে করে তাদের যা খোয়, তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অগ্রগতির পথে এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা। চাইলে এই বাধা প্রতিটি ব্যক্তি দূর করতে পারে।

সমবণ্টন

আমার দৃষ্টিতে আগামীদিনের পৃথিবীর দ্বিতীয় আইন, সমবণ্টন, যা অহিংসজাত। তার মানে এই নয়, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ জোর ক'রে ভাগ করা হবে। এর মানে, প্রতিটি মানুষের নিজের স্বাভাবিক চাহিদাগুলি মেটাবার সম্বল থাকবে, তার বেশি নয়। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একজন লোকের হয়তো সপ্তাহে সিকি পাউণ্ড ময়দা দরকার, আর একজনের দরকার পাঁচ পাউণ্ড। দু'জনকেই জোর ক'রে সিকি পাউণ্ড বা পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া অন্যায়। দু'জনেই যেন স্ব-স্ব চাহিদা মেটাতে পারে।

এখানে আমরা আগামীদিনের পৃথিবী গড়বার সঙ্গে জড়িত, সম্ভবত সবচেয়ে জটিল প্রশ্নে আসছি। এই সমবণ্টন কার্যকর করা যাবে কী ক'রে? ধনীদের কি তাদের সকল সম্পত্তি খোয়াতে হবে?

অহিংসা বলে, "না"। যা হিংস্র, তা কখনওই মানবজাতির স্থায়ী উপকার করতে পারে না। জোর করে সম্পত্তি কেড়ে নিলে সমাজকে অনেক মহান দান থেকে বঞ্চিত করা হবে। ধনী জানে কিভাবে সৃষ্টি ও নির্মাণ করতে হয়। তার ক্ষমতাকে নষ্ট করলে চলবে না। তার বদলে, তাকে তার সম্পদের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। যাতে সে যুক্তিসংগতভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেই সম্পদ কাজে লাগাতে পারে। তার বাকি সম্পত্তির সে হবে অছি। তা সমাজের উপকরার্থে ব্যয় হবে। এইরকম মানুষ আগেও ছিল। এখনও আছে। আমার মতে, একজন লোক যেই মুহূর্তে নিজেকে সমাজের সেবক মনে করবে, সমাজের জন্য রোজগার করবে, ব্যয় করবে, সেই মুহূর্তে তার রোজগারকে ভালো বলে মেনে নিতে হবে, তার ব্যবসায়িক উদ্যোগকে বলতে হবে গঠনমূলক।

মানবস্বভাবে: পরিবর্তন

অহিংসার এই গোটা ধারণাটির সঙ্গে কি মানবস্বভাবে এক পরিবর্তন জড়িত নয়? ইতিহাসে কি এমন পরিবর্তনের কোনও নজির আছে? জোর দিয়ে বলব, আছে। নীচ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, লোভী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুখ ফিরিয়ে অনেকেই এমন এক মানুষ হয়ে উঠেছে, যে সমাজকে দেখে এক সমগ্র হিসেবে, তার হিতার্থে কাজ করে। যদি একজনের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটতে পারে, তবে অসংখ্যের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে।

ভবিষ্যৎ

আগামীদিনের পৃথিবীতে আমি কোনও দারিদ্র, যুদ্ধ, বিপ্লব, রক্তপাত দেখি না। অতীতের চেয়ে সে পৃথিবীতে ঈশ্বরে বিশ্বাস আরও ব্যাপক, আরও গভীরতর হবে। বৃহদর্থে পৃথিবীর সত্তা নির্ভর করে ধর্মের ওপর। ধর্মকে উপড়ে ফেলার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।[১৩৫]

একমাত্র অহিংসার ভিত্তিতেই এক বিশ্বসঙ্ঘ নির্মাণ করা যেতে পারে। পৃথিবীর কর্মকাণ্ডে হিংসাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।[১৩৬]

১৫. প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

॥ মৃত্যু ॥

বহুবছর ধরে আমি ভেবেচিন্তে এ কথায় সায় দিয়ে আসছি, মৃত্যু, জীবনে এক পরিবর্তন মাত্র, আর কিছুই নয়। যখনই তা আসে, তাকে স্বাগত জানানো উচিত। মৃত্যুভয় সহ সকল ভয় অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য আমি ইচ্ছা করেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

তবু মনে পড়ে, আমার জীবনে অমন দিনও এসেছে যখন বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে দেখতে পাবার সম্ভাবনায় মনে যেমন আনন্দ জাগে তেমনই আসন্ন মৃত্যুর চিন্তাতেও আনন্দিত হয়েছি। এ-ভাবেই শক্তিশালী হবার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ অনেকসময়ে তবু দুর্বল থেকে যায়। যে জ্ঞান মস্তিষ্কে থমকে যায়, হৃদয়ে প্রবেশ করে না,—তা জীবনের সংকটময় অভিজ্ঞতার মুহূর্তে ক্বচিৎ কাজে আসে।

আবার যখন কোনও ব্যক্তি বাহিরের সহায়তা পায় ও নেয়, তখন অন্তরাত্মার শক্তি প্রায়শ উবে যায়। এক সত্যাগ্রহীর উচিত সতত অনুরূপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা।[১]

জীবন ও মৃত্যু, একই ব্যাপারের বিভিন্ন পর্যায়। একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ। এ-সত্য আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সত্যি বলতে কি, নির্মম যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে আমার সুখ বা জীবনের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ এক অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা দুঃখযন্ত্রণা। তা না থাকলে জীবনের মূল্য কী?[২]

মৃত্যু-ভয়

কেউ যদি বলে, মৃত্যু এড়াতে হলে আমাকে এ-বছরের শেষে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকতে হবে, আমি তা করব না। আমি জানি, যতরকম সাবধানতা অবলম্বন করে মানুষ নিজেকে ভোলাক না কেন, মৃত্যু অমোঘ। আমি চাই যে তোমরা এটা বোঝো, ভারতে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সামান্য ক'জনের মধ্যে আমি একজন, যারা জানে কেমন ক'রে স্বাস্থ্য ধরে রাখতে হয়। ঈশ্বর জানেন আমাকে দিয়ে কী কাজ করাবেন। তাঁর কাজের জন্য আমাকে যতক্ষণ দরকার, তার চেয়ে বেশি এক মুহূর্ত তিনি আমাকে বাঁচতে দেবেন না।[৩]

মৃত্যু সহচর ও সখা। যারা সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে তারা ভাগ্যবান।[৪]

মৃত্যুভয় কারও থাকা উচিত নয়। সকল মানুষের জীবনেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি হাসতে হাসতে মরি, আমরা এক নতুন জীবনে প্রবেশ করব।[৫]

যে-মানুষ বাঁচার বদলে কেবল মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে ব্যস্ত, তার ওই পথ ত্যাগ করাই শ্রেয়।

তার প্রতি উপদেশ: জীবনের মতো মৃত্যুকে ভালবাস, পারলে তার চেয়েও বেশি। কেউ হয়তো বলবে, বড় কঠোর উক্তি। তার চেয়েও কঠিন তা পালন করা। যে-কোনও যোগ্য কাজই তো কঠিন। আরোহণ কঠিন। অবরোহণ সহজ, তবে পথ প্রায়শ পিছল। শত্রু নয়, বন্ধু হিসেবে মৃত্যুকে দেখলে জীবন বাঁচার যোগ্য হয়ে ওঠে।

জীবনের প্রলোভন যদি জয় করতে চাও মৃত্যুকে ডেকে পাঠাও সাহায্যের জন্য। মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে গিয়ে কাপুরুষ তার মানসম্মান, স্ত্রী, কন্যা, সকলই হারায়। সাহসী আত্মসম্মান বিসর্জন দেবার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে।

যখন সময় আসবে, যা আসতেই পারে, আমার উপদেশ স্পষ্ট কথায় জানিয়ে যাব। অনুমান করে নেবার মতো কিছু রেখে যাব না।[৬]

সকলের জীবনেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কেউ মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। তাহলে মৃত্যুকে ভয় কিসের? মৃত্যু পরম সুহৃদ। সে দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়।[৭]

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় কর

এই কর কেন থাকবে না? ওই কোটিপতিদের ছেলেরা, যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়, তারা তো ওই সম্পত্তির জন্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতির তো ক্ষতি হয় দ্বিগুণ। ওই উত্তরাধিকার ন্যায্যত দেশের। আর, উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির পাহাড়ে চাপা পড়ে ব'লে দেশের ক্ষতি হয়। তাদের গুণপনা কোনও কাজেই লাগে না।[৮]

ব্যক্তিগতভাবে আমি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে বিশ্বাস করি না। সচ্ছল লোকদের উচিত সন্তানদের শিক্ষাদান করা। এমনভাবে তাদের মানুষ করা, যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে শেখে। তারা তা করে না। এটাই আসল ট্রাজিডি। তাদের সন্তানরা কিন্তু লেখাপড়া শেখে, দারিদ্র-প্রশংসাকারী কিছু পদ্য আবৃত্তিও করে, কিন্তু বাপের সম্পত্তি বাগাবার বেলায় তাদের কোনও মনোবিকার হয় না।[৯]

।। বাসনা ।।

মানুষের যথার্থ সুখ তৃপ্তির মধ্যে। যে অতৃপ্ত তার যত সম্পত্তিই থাকুক, নিজের বাসনার দাস হয়ে পড়ে। আর সত্যিসত্যিই, বাসনার দাসত্বের তুল্য আর কোনও দাসত্ব হয় না। ঋষিরা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, মানুষ নিজেই তার সবচেয়ে বড় শত্রু, আবার সর্বোত্তম বন্ধু। মুক্ত থাকবে, না দাস হবে, এ-তার নিজের হাতে। যা ব্যক্তির বেলায় সত্য, সমাজের বেলায়ও তাই।[১০]

।। নিয়তি ।।

আমি জানি না, কখন, কোথায়, কীভাবে মৃত্যু আসবে তা নিয়তি-নির্ধারিত কি না। শুধু জানি, "তাঁর ইচ্ছা বিনা একটি ঘাসের ডগাও নড়ে না।" তবে এ-ও জানি আবছা। যা আজ আবছা, কাল তা স্পষ্ট হবে, অথবা পরশু,—প্রার্থনাময় প্রতীক্ষার পর।[১১]

বলা হয়, মানুষ নিজ-নিয়তির নির্মাতা। এটা অংশত সত্য। যে মহান শক্তি আমাদের সব সংকল্প ও পরিকল্পনা পিছনে ছুঁড়ে ফেলে চলে যান ও তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় কাজ করেন, তিনি যতটুকু করতে দেন, মানুষ স্ব-নিয়তির ততটুকুই তৈরি করতে পারে।[১২]

।। নির্লিপ্তি ।।

বাইরে থেকে দেখলে, আমার দৈহিক সুস্থতার কারণ, পান, আহার ও নিদ্রার ব্যাপারে নিয়মিত আচরণ এবং ১৯০১ সাল থেকে জীবনে যা অনুসরণ করছি সেই প্রকৃতি-চিকিৎসার পদ্ধতি, যার ওপর আমার পক্ষপাতিত্ব আছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশি করে আছে, মানসিক নির্লিপ্তির অনুশীলন।

নির্লিপ্তি বলতে আমি বুঝি, যতক্ষণ তোমার কাজের উদ্দেশ্য নিষ্কলুষ, তোমার কাজের উপায়গুলিও সঠিক, ততক্ষণ প্রার্থিত ফল পেলে-কি-পেলে-না, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে না। তার মানে, শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে, যদি তুমি উপায়গুলি সম্বন্ধে যত্নবান থেকে বাকিটা তাঁর ওপর ছেড়ে দাও।[১৩]

আমার বর্তমান জীবন যত সঠিক হোক-না-কেন, আমার অতীত আচরণ দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয় না। তবু, মন থেকে শরীরকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে আমি অতীতের ভুলভ্রান্তির পরিণামকে জুঝতে পারি। নির্লিপ্তি, মানুষকে অতীতের ভ্রান্ত আচরণের পরিণাম কাটিয়ে ওঠার, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ও পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা জয় করার ক্ষমতা দেয়।

সাদা কথায় বলতে গেলে, প্রকৃতির নিয়ম থেকে জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, যে কোনও বিচ্যুতিই তার শোধ তুলে নেয়। যেমন, ক্রোধ, বদমেজাজ, অধীরতা, দাম্পত্যজীবনে ভুল, ইত্যাদি। কিন্তু এই আশ্বাস আছে, যদি সম্পূর্ণ নির্লিপ্তি অর্জন করতে পারো এ-সবই মুছে ফেলতে পারবে। "অনন্তকালস্থায়ী জীবন পাবে না, যদি না আবার জন্মাও।"

এর বিপরীতে, চিরস্থায়ী জীবন পেতে পারো যদি "আবার জন্মাও"। মৃত্যুর সামনে কোনও বাধা নেই। তুমি নবজীবন শুরু করতে পারো। নতুন করে এখনই বাঁচতে আরম্ভ করতে পারো। যদি অতীত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে পারো, এবং নির্লিপ্তির কুঠার দিয়ে অতীতের উত্তরাধিকার কেটে ফেলতে পারো, তাহলে অতীত তোমার জীবনছন্দে ব্যাঘাত ঘটাবে না।[১৪]

এক অন্তর্দর্শনের মুহূর্তে কবি নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন: "ওহে মানব! তুমি ঈশ্বরের নাম করা ছেড়ে দিলে কেন? ক্রোধ, লালসা বা লোভ তো ত্যাগ করোনি, কিন্তু

ভুলে গেছ সত্য। ঈশ্বরের ভালবাসার অমূল্য রত্ন ফেলে দিয়ে মূল্যহীন পয়সা জমাচ্ছ। এর চেয়ে শোকাবহ আর কী আছে! ওহে মূর্খ! তুমি কেন সকল অহংকার ত্যাগ করে ঈশ্বরের করুণার ওপর শুধু নিজেকে ছেড়ে দিচ্ছ না?" তার মানে এই নয়, কারও ঐশ্বর্য থাকলে তা ফেলে দিতে হবে। স্ত্রী ও সন্তানদের তাড়িয়ে দিতে হবে। এর সরল অর্থ, এ-সব বস্তুতে আসক্তি ছাড়তে হবে। তাঁর আশীর্বাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে শুধু তাঁকে সেবা করার জন্য। আরো আছে, সর্ব সত্তা নিয়োগ করে যদি তাঁর নাম নিই—আমরা স্বাভাবিকভাবেই লালসা, অসত্য ও নীচ কামনাবাসনা থেকে মুক্ত হব।[১৫]

সকল সাফল্যের চাবিকাঠি হল প্রজ্বলন্ত আবেগ ও নিশ্ছিদ্র নির্লিপ্তির সমাহার।[১৬]

।। আহার ।।

চরিত্রগঠন ও দেহকে বশীভূত করার কাজে খাদ্যের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখা ভুল। সুষম আহার এক শক্তিশালী উপাদান, তাকে অবহেলা করা চলে না। তবে খাদ্যের প্রেক্ষিতে সকল ধর্মের হিসাব করা,—যা ভারতে প্রায়ই হয়ে থাকে, নিতান্ত ভুল। যেমন ভুল খাদ্য বিষয়ে সকল সংযমকে উপেক্ষা করা এবং জিহ্বার স্বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। হিন্দুধর্মের অন্যতম অমূল্য অবদান হল নিরামিষ ভোজন। এটা লঘুভাবে ছেড়ে দেওয়া চলে না। তাই, নিরামিষ আহার আমাদের মন ও দেহকে দুর্বল করেছে, বা তার কার্যকারতা পরোক্ষ বা নিঃসাড়—এই ভুল শোধরানো দরকার। মহত্তম হিন্দু সংস্কারকরা তাঁদের প্রজন্মে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন। তাঁরা সকলে ছিলেন নিরামিষাশী। শঙ্কর বা দয়ানন্দের আমলে তাঁদের চেয়ে আর কে বেশি কর্মোদ্যম দেখাতে পেরেছেন?

...কারও খাদ্য-নির্বাচন তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়। এটা প্রত্যেকের নিজের জন্য যুক্তি দিয়ে বোঝার বিষয়। এখন নিরামিষ আহার বিষয়ে প্রচুর বই বেরিয়েছে, বিশেষত পশ্চিমে। যে-কোনও সত্যসন্ধানী এগুলি পড়লে লাভবান হবেন। অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানীও এ-বিষয়ে লিখেছেন। ভারতে নিরামিষ ভোজনের জন্য কোনও উৎসাহ প্রদানের দরকার নেই। কেননা এযাবৎ তা সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ও সম্মানজনক আহার হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যারা এ বিষয়ে... তেমন নিশ্চিত নয়, তারা পশ্চিমে নিরামিষ আহারের সপক্ষে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে, তা চর্চা করতে পারে।[১৭]

বাঁচার জন্য খাওয়া

শুধু রসনা তৃপ্তির জন্য নয়, দেহযন্ত্র সচল রাখবার জন্য খাওয়া উচিত। যখন ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি অঙ্গ দেহের সেবক, দেহের মাধ্যমে আত্মার, তখন জিভের স্বাদ চলে যায়। একমাত্র তখনই প্রকৃতির অভিপ্রেত পথে দেহ কাজ শুরু করে।

প্রকৃতির সঙ্গে এই ঐকতান আয়ত্ত করতে হলে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করা হোক, তা পর্যাপ্ত নয়, এবং কোনও ত্যাগই যথেষ্ট নয়। দুর্ভাগ্যবশত, আজকাল স্রোত প্রবল

বেগে উলটো দিকে বইছে। এই নশ্বর দেহকে সাজাবার জন্য, কয়েকটি ক্ষণমুহূর্ত দেহকে বেশি টিকিয়ে রাখার জন্য, অসংখ্য প্রাণী বিনাশ করতে আমরা লজ্জা পাই না। ফলে আমরা নিজেদের দেহ ও আত্মাকে হত্যা করি। একটা পুরনো রোগ, সারাতে গিয়ে একশোটা নতুন রোগ ডেকে আনি। ইন্দ্রিয়ের আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হই। এমন কি উপভোগ করার ক্ষমতাও হারাই। এ-সব আমাদের চোখের সামনেই ঘটে। কিন্তু যারা জেগে ঘুমোয় তাদের চেয়ে অন্ধ আর কে আছে।[১৮]

এই যে বলা হয়, মানুষ যা খায়, তা-ই হয়ে যায়, এর মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। খাদ্য যত স্থূলরুচির হবে, দেহও তেমনই বিদঘুটে হবে।[১৯]

মাংস আহার

উত্তেজক পানীয় ও ঔষধ, সবরকম খাদ্য, বিশেষত, মাংস গ্রহণে বিরত থাকা নিঃসন্দেহে আত্মার বিকাশের সহায়ক। তবে এতেই এর সমাপ্তি নয়। অনেকেই আছে যারা সকলের সঙ্গে বসে মাংস খায়, অথচ জীবনযাপন করে ঈশ্বর সম্পর্কে ভীত থেকে। কেউ হয়তো আবার, ধর্ম মেনে মাংস ও অনেক কিছু বর্জন করে চলে অথচ তার প্রতিটি কাজই ঈশ্বরনিন্দা তুল্য। এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমোক্তরা স্বীয় মুক্তির অনেক কাছাকাছি।[২০]

মানুষ মাংস, ডিম, ইত্যাদি খেতে পারবে না। ঠিক বা ভুল যা-ই হোক, আমার ধর্মীয় প্রত্যয়েরই এক অংশ এটা। নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার উপায়ের একটা মাত্রা থাকা উচিত। এমন কিছু কাজ আছে যা আমরা বাঁচার জন্যও করতে পারি না।[২১]

কোনও দেশে, কোনও পর্যায়েই, মানুষের যেখানে সাধারণভাবে বাঁচা সম্ভব সেখানে আমি মাংসাহার প্রয়োজন মনে করি না। মনে করি না মাংসাহার আমাদের প্রজাতির উপযোগী। আমরা যদি ইতর প্রাণীদের চেয়ে শ্রেয় হয়ে থাকি, তবে তাদের অনুকরণ করে ভুল করছি। যারা আবেগ সংযত করতে চায়, মাংসাহার তাদের পক্ষে অনুপযোগী—অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয়।[২২]

দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য আমরা যেন আমাদেরই সগোত্র প্রাণীদের হত্যা না-করি—আত্মিক অগ্রগতি একটা স্তরে উপনীত হয়ে এই দাবিই করে বলে আমার বিশ্বাস।[২৩]

নিরামিষ আহার

আমি চিরকাল খাঁটি নিরামিষ আহারের পক্ষে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, চাঙ্গা থাকার জন্য নিরামিষ খাদ্য তালিকায় দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য—যেমন, দই, মাখন, ঘি, ইত্যাদি থাকা উচিত...

তবে আমার বিশ্বাস, বিশাল তরিতরকারির সাম্রাজ্যে নিশ্চয় তেমন কিছু আছে যেগুলি দুধ ও মাংসের খাদ্যগুণ জোগাতে সমর্থ। অথচ এগুলি নৈতিক ও অন্য অপূর্ণতা থেকে মুক্ত।

আমার মতে, দুধ ও মাংস ভোজনে নিশ্চয় কিছু অপূর্ণতা আছে। মাংস পেতে গেলে হত্যা করতে হয়। শৈশবে মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য কোনও দুধে আমাদের অধিকার নেই। সর্বোপরি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নৈতিক অপূর্ণতার বাইরেও আরও কিছু আছে। যে প্রাণী থেকে দুধ ও মাংস আহরিত হয় সেগুলির দোষও সঙ্গে সঙ্গে আসে...

ক্ষুধা খাদ্যকে যে পরিতৃপ্তি দেয়, পৃথিবীর সকল সুখাদ্যও তা দিতে পারে না।[২৪]

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ শৈশবে যে মাতৃদুগ্ধ পান করে, তার বাইরে অন্য দুধের তার দরকার নেই। তার খাদ্যতালিকায় রৌদ্রপক্ব ফল ও বাদাম ছাড়া আর কিছু থাকা অনাবশ্যক। দেহকোষ ও শিরার জন্য সে যথেষ্ট পুষ্টি পেতে পারে আঙুর জাতীয় ফল, ও আখরোট জাতীয় বাদাম থেকে। যে ওইসব খাদ্য খায়, তার পক্ষে যৌন ও অন্যান্য আবেগ সংবরণ সহজ হয়।[২৫]

খাদ্য-গবেষণা

মানুষকে পুরোপুরি সুস্থ শরীরে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্ভিদের অসীম ক্ষমতার কথা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আজও সমীক্ষা করেনি। এই বিজ্ঞান অভ্যাসের বশে কসাইখানা বা অন্তত দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ওপর বিশ্বাস রাখে। যাদের নিরামিষাহারের ঐতিহ্য আছে সেই ভারতীয় চিকিৎসকদেরই এই কর্তব্য পালন করতে হবে। ভিটামিন বিষয়ে গবেষণা দ্রুত বাড়ছে,—সবচেয়ে দরকারি ভিটামিন সরাসরি সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া গেলে, চিকিৎসাবিজ্ঞান খাদ্য বিষয়ে এযাবৎ যা বুঝিয়ে এসেছে তার বহু স্বীকৃত তত্ত্ব ও বিশ্বাসে বিপ্লব এনে দেবে।[২৬]

আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলে জেনেছি, সব মানুষের জন্য কোনও ছকে-বাঁধা আহারের নিয়ম নেই। বিজ্ঞতম চিকিৎসকরা বড়জোর বলতে পারেন, এই খাদ্যতালিকা হয়তো এর ক্ষেত্রে ভালো কাজ করবে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে এটাকে ভালো কাজ করতে দেখেছেন। চিকিৎসার মতো অন্য কোনও বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীর এমন হাত-পা বাঁধা নয়। কোনও ওষুধ বা খাদ্য বা মানবশরীরে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে সে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে ভয় পায়। এটা এখনও এবং পরেও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিকই থাকবে। এই যে প্রচলিত প্রবাদ, 'একজনের খাদ্য অন্যের পক্ষে বিষ হতে পারে', এর ভিত্তি বিপুল অভিজ্ঞতা, যার সত্যতা নিয়ত নিরূপিত হচ্ছে। এই যখন ব্যাপার, তখন বুদ্ধিমান নারীপুরুষের পক্ষে পরীক্ষার ক্ষেত্র অন্তহীন। অন্তরে বিরাজিত আত্মার বিবর্তনে যে-দেহ এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সাধারণ লোকের সে-দেহ সম্পর্কে কাজ চালাবার মতো জ্ঞান অর্জন করা উচিত। তথাপি, নিজেদের দেহ বিষয়ে আমরা যেমন উদাসীন ও অজ্ঞ, তেমন আর কোনও বিষয়ে নই।[২৭]

অগণিত বীজ, পাতা ও ফলের মধ্যে, মানবজাতিকে পূর্ণতম পুষ্টি জোগাবার যে-সব সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, বিজ্ঞানীরা এখনও তা খতিয়ে দেখেননি বলে মনে করি। মাংসাহারে বিশ্বাস কেন্দ্র করে যে বিশাল কায়েমি স্বার্থ গড়ে উঠেছে, তা চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে এ-প্রশ্ন নিয়ে কাজ করতে বাধা দেয়।[২৮]

নৈতিক ভিত্তি

নিরামিষ আহারের দৃঢ় সমর্থক থাকতে হলে মানুষের একটা নৈতিক ভিত্তি দরকার...কেন না তা দেহ নয়, আত্মা নির্মাণের জন্য দরকার। মানুষ, মাংসের চেয়ে আরও বেশি। মানুষের আত্মার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। তাই নিরামিষাশীদের এই নৈতিক ভিত্তি থাকা উচিত যে, মানুষ মাংসাশী প্রাণী হয়ে জন্মায়নি। মাটিতে যা জন্মায় সেই ফল ও শাকপাতা খেয়ে বাঁচার জন্যে জন্মেছিল।[২৯]

অহিংসা খাদ্যনির্বাচনবিদ্যার ব্যাপার নয়, এ তাকে ছাপিয়ে যায়। মানুষ কী খায় বা পান করে, তাতে সামান্যই এসে যায়। এর পিছনে যে কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মসংযম আছে, সেটাই আসল কথা। তোমার আহার্য নির্বাচনকালে যত পারো সংযত হবার অভ্যাস করো। এ-সংযম প্রশংসাযোগ্য, দরকারিও। তবে তা অহিংসার প্রান্ত মাত্র স্পর্শ করে। যদি কারও হৃদয় পরের দুঃখে করুণায় পূর্ণ হয়, বিগলিত হয়, যদি সে সকল কামনাবাসনা বর্জিত হয়ে ওঠে, সে আহার বিষয়ে নিজেকে অনেক প্রশ্রয় দিলেও মূর্ত অহিংসা এবং আমাদের শ্রদ্ধেয়। অপরপক্ষে, যদি কেউ স্বার্থপরতা ও কামনাবাসনার দাস হয়, পাষাণ হৃদয় হয়, সে আহার বিষয়ে যতই নীতিবাগিশ হোক, অহিংস সে নয়, এক হতভাগ্য দুর্জন।[৩০]

মনে রাখতে হবে, নিছক জীবে-দয়া আমাদের অন্তঃস্থিত ষড়রিপু,—যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ও মিথ্যাচারকে জয় করার ক্ষমতা দেয় না...যে প্রত্যহ পিপীলিকা ও কীটপতঙ্গকে খাওয়ায়, জীবহত্যা করে না, সে যদি ক্রোধ ও কামে নিমজ্জিত থাকে, তার জীবে-দয়া প্রশংসনীয় কিছু নয়। এ-কাজ সে যান্ত্রিকভাবে করে। এর কোনও আধ্যাত্মিক মূল্য নেই। হয়তো তার চেয়েও খারাপ। ভিতরের পাপ ঢাকবার জন্য এক ভণ্ডামির আবরণ।[৩১]

।। নিয়মানুবর্তিতা ।।

নিয়মানুবর্তিতা কোনও পদমর্যাদার ধার-ধারে-না। যে-রাজা শৃঙ্খলার মূল্য জানেন, তিনি তাঁর খাস ভৃত্যের কাছেও নতি স্বীকার করেন, যখন তিনি তাকে তাঁর একমাত্র বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন।[৩২]

সর্বোচ্চ স্বাধীনতার সঙ্গে সর্বাধিক নিয়মানুবর্তিতা ও বিনয় জড়িত। শৃঙ্খলা ও বিনয় সঞ্জাত স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করা যায় না। বল্‌গাহীন স্বেচ্ছাচারিতা নিজের ও প্রতিবেশীর কাছে অসভ্যতার চিহ্ন।[৩৩]

ভাবতে পারি তেমন সময়ের কথা, যখন উদ্দেশ্যের পিছনে যুক্তির জন্য অপেক্ষা না করে সম্পূর্ণ বাধ্যতা প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এ-এক সৈনিকের আবশ্যিক চরিত্রগুণ। অসংখ্য লোকের ওই গুণ না থাকলে জাতি তেমন এগোতে পারে না। কিন্তু তেমন বাধ্যতার দরকার কমই হয়। যে-কোনও সুশৃঙ্খল সমাজে তা কম হওয়াই উচিত।[৩৪]

বড় ও স্থায়ী কিছু অর্জন করার আগে আমাদের কঠোর, লৌহকঠিন শৃঙ্খলা আবশ্যিক। শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি এবং যুক্তিবুদ্ধির কাছে আবেদন রাখলে এ-শৃঙ্খলা আসবে না। শৃঙ্খলার শিক্ষা হয় প্রতিকূল পরিবেশে। যখন উৎসাহে উদ্দীপ্ত তরুণরা আত্মরক্ষার কোনও বর্ম ছাড়াই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে শিখবে, তারা জানবে দায়িত্বজ্ঞান ও শৃঙ্খলা কী।[৩৫]

যৌথ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবার আগে দরকার স্বেচ্ছা-শৃঙ্খলা।...যে-জাতি স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছে তার নিয়মানুবর্তিতার আবশ্যকতা অনেক বেশি (সেনাদলের চেয়ে)। এ না থাকলে রামরাজ্য, বা পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য এক অচরিতার্থ স্বপ্নই থেকে যাবে।[৩৬]

যে-জাতি মহান জাতি হবার উচ্চাশা রাখে, গণ-শৃঙ্খলা তার আবশ্যিক শর্ত।[৩৭]

।। শ্রম-বিভাজন ।।

শ্রম-বিভাজন আবশ্যিক। শুধু একজন একাই সব করবে, এটা অনভিপ্রেত। সংগঠন-ব্যবস্থার পক্ষে এটা অবশ্যই এক বাধা। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মতো, সংগঠন ব্যক্তিগত নয়। "রাজা মৃত। রাজা দীর্ঘজীবী হোক।" তাই এই প্রবাদ, "রাজা কোনও অন্যায় করতে পারে না।" রাজা ব্যক্তিমানুষ হিসেবে বজ্জাত হতে পারেন, কিন্তু যখন তার মধ্যে একটি ব্যবস্থা মূর্ত, তিনি সেই অর্থে "ত্রুটিমুক্ত", যে-অর্থে কোনও একটি সমাজে "ত্রুটি হীনতা" শব্দটিকে বোঝা হয়।

নীতি বাক্যটি এই,—ভারপ্রাপ্ত লোকরা প্রথম পর্যায়ে যত অপদার্থই হোক, এক অগ্রসরমান সংগঠনে যারা ভার নেবে, তারা সবসময়ে সর্বসমক্ষে থাকবে। সংগঠনকে রাখবে সবার আগে, নিজে থাকবে সবার শেষে। বজ্জাতদের মাধ্যমে কোনও কাজ সংগঠিত করার চেষ্টা করলে, সে সংগঠনের মাথায় চিরকাল বজ্জাতরাই থাকবে।[৩৮]

।। চিকিৎসক ।।

এটা ঘটনা, চিকিৎসকরা আমাদের আত্মপ্রশ্রয় উস্কে দেয়। পরিণতি: আমাদের আত্মসংযম চলে গেছে, আমরা পৌরুষহীন হয়ে পড়েছি।[৩৯]

চিকিৎসা-জীবিকা আত্মাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অথচ দেহের মতো এক ভঙ্গুর যন্ত্রকে মেরামত করতে চেষ্টার কোনও কসুর করে না—সাধারণভাবে এই জীবিকার সঙ্গে আমার কলহ মূলত এ-ই নিয়ে। এই জীবিকা মানুষকে এর দয়ানির্ভর করে ফেলে। মানুষের মর্যাদা ও আত্মসংযম খর্ব করে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে লক্ষ্য করছি, পশ্চিমে ধীরে, অথচ নিশ্চিতভাবে উদিত হচ্ছে এক চিন্তাধারা, রুগ্ন দেহকে আরোগ্য করতে আত্মার কথা ভাবছে, তাই এক শক্তিশালী আরোগ্যমাধ্যম হিসেবে ওষুধের চেয়ে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করছে বেশি।[৪০]

আত্মার আরোগ্যকারী

দেহের নয়, আমরা চাই আত্মার আরোগ্যকারী। হাসপাতাল ও চিকিৎসকের সংখ্যা-বৃদ্ধি

প্রকৃত সভ্যতার চিহ্ন নয়। আমরা ও অন্যরা দেহকে যত কম প্রশ্রয় দেব, আমাদের ও পৃথিবীর পক্ষে তা ততই মঙ্গলজনক।[৪১]

দেহকে ঈশ্বরের মন্দির হিসেবে ব্যবহার না করে আমরা একে ইন্দ্রিয়সেবার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি। আর তা বাড়াতে, এই মর্ত্যকায়াকে পীড়ন করতে সচেষ্ট হই। সে জন্য চিকিৎসকের সহায়তার জন্য দৌড়তে লজ্জা পাই না।[৪২]

এক ডাক্তারের উপাধি শেষ কথা নয়। প্রকৃত ডাক্তার সে, যে যথার্থ সেবক।[৪৩]

ডাক্তার বৈদ্য ও হাকিম, সবাই খাটে টাকার জন্য। সেবার মনোভাব থেকে তারা এ কাজে ব্রতী হয় না। কারও কারও সেই মনোভাব আছে। কিন্তু তাতে আমার বক্তব্যের কিছু অন্যথা হয় না।[৪৪]

।। পোশাক ।।

আমার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ 'হ্যাট'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর, আমার গোপন আন্তর্জাতীয়তাবাদ সোলার টুপি-কে ইউরোপ থেকে পাওয়া সামান্য গুটিকয়েক ভালো জিনিসের একটি বলে মনে করে। সোলার টুপিকে জনপ্রিয় করার জন্য কোনও দল গড়লে আমি তার সভাপতি হতাম। কিন্তু 'হ্যাট'-এর বিরুদ্ধে উত্তাল জাতীয় প্রতিরোধের জন্য তা পারি না।

ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় (এ-দেশের জলবায়ুতে) অপ্রয়োজনীয়, অস্বাস্থ্যকর, অশোভন-দর্শন ট্রাউজার্স মেনে নিয়ে, আর সোলার টুপি মেনে নিতে ইতস্তত ক'রে ভুল করেছে। তবে আমি জানি, জাতীয় পছন্দ বা অপছন্দ যুক্তি মেনে চলে না।[৪৫]

আমি জাতীয় পোশাক পরি। কারণ এটি ভারতীয়ের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও মানানসই। আমি মনে করি, ইউরোপীয় পোশাক অনুকরণ আমাদের অধোগতির, লজ্জার ও দুর্বলতার চিহ্ন। যে-পোশাক ভারতের জলবায়ুতে সব চেয়ে উপযোগী, যা তার সাদাসিধাভাব, শিল্পগুণ ও সস্তা দামের জন্য দুনিয়াতে কারও থেকে নিচে নয়, যা স্বাস্থ্যের প্রয়োজন মেটায়, সেই পোশাক বর্জন করে আমরা জাতীয় পাপ করছি। মিথ্যা অহংকার ও সমান মিথ্যা মর্যাদাবোধ ঝেড়ে ফেলতে পারলে, ভারতে ইংরেজ বহু আগেই ভারতীয় পোশাক পরত।

আমি ধর্মের কারণে জুতো পরি না। তবে এ-ও দেখেছি সম্ভবমতো জুতো না পরাটা স্বাভাবিক ও অনেক স্বাস্থ্যসম্মত।[৪৬]

।। সুরাপান ।।

ভারতবর্ষকে জোর করে সুরামুক্ত করা চলবে না,—যারা মদ খেতে চায়, তাদের তার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে,—এই আপাতরম্য যুক্তিতে বিভ্রান্ত হয়ো না। রাষ্ট্র, তার মানুষের কু-অভ্যাসের সামগ্রী সরবরাহ করে না। গণিকালয়কে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না, তার ছাড়পত্রও দিই না। চোরকে চুরি করার প্রবণতায় ইন্ধন জোগাই না। চুরি বা পতিতাবৃত্তির

চেয়ে মদ্যপানকে আমি অনেক বেশি অভিশাপযোগ্য মনে করি। মদের নেশাই কি বেশির ভাগ সময়ে ও-দুটির জনক নয়?[৪৭]

মদ্যপান কুঅভ্যাসের চেয়ে বেশি। এ এক রোগ। বহু লোকের কথা জানি, যারা পারলে মদ ছাড়ত। অনেকেই বলেছে প্রলোভনটা তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক। তাদের কথামতো মদ সরিয়ে নেবার পরেও তারা চুরি করে মদ খেয়েছে... রোগগ্রস্তকে তার নিজের হাত থেকে বাঁচাতেই সাহায্য দরকার।[৪৮]

সুরা এবং মাদকদ্রব্য অনেক দিক থেকেই ম্যালেরিয়া ও ওই জাতীয় রোগের চাইতে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি অনিষ্টকর। কারণ রোগ কেবল দেহের ক্ষতি করে কিন্তু কু-অভ্যাস দেহ ও আত্মা উভয়কেই ঝাঁঝরা করে দেয়।[৪৯]

নিঃস্বকরণ

আমাদের মধ্যে হাজার হাজার মাতাল থাকার চাইতে আমি বরং চাইব ভারত কাঙাল হয়ে যাক। শিক্ষায় বঞ্চিত রাখার মূল্যেও যদি দেশ থেকে মদ দূর করা যায়, তাহলে আমি তা-ই চাইব।[৫০]

যে জাতি সুরাসক্ত তার দিকে সর্বনাশের তির্যক দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সুরাসক্তির জন্য সম্রাটরা ধ্বংস হয়ে গেছে। ভারতে নজির আছে, শ্রীকৃষ্ণ যে মহান সম্প্রদায়ের মানুষ সেটি সুরাসক্তির জন্যই ধ্বংস হয়। রোমের পতনে নিঃসন্দেহে এই পৈশাচিক পাপের অবদান ছিল।[৫১]

পানাসক্তি মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে, তাকে পশুতে পরিণত করার দিকে নিয়ে যায়। সে তখন স্ত্রী, মা ও বোনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। সুরার প্রভাবে এ-ব্যবধান ভুলে গেছে এমন মানুষ আমি দেখেছি।[৫২]

সুরা হতভাগ্য মাতালদের নৈতিক ও আর্থিক সম্বল নিঃশেষ করে দেয়। মদ্যপান নিষিদ্ধ করলে সরকারের অর্থাগম কমে যাবে। তবে এ-থেকে তারা যা লাভবান হবে, তাতে সে ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। আর, সামরিক বাহিনীর বোঝা বহনের সপক্ষে এযাবৎ যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, তা আবগারি কর আদায়ের জন্য দরকার। এই যুক্তি নতুন ভারতে টিকবে না। কারণ ওই বোঝা তখন থাকবে না। তাই অবিলম্বে আবগারি কর বিসর্জন দিতে হবে বিনা দ্বিধায়। এই প্রয়োজনীয় সংস্কারকার্যের অগ্রগতিতে এই কর বিলোপের আর্থিক ক্ষতির চিন্তা যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে...

মদ নিষিদ্ধকরণের ইতিবাচক দিকটিকে নেতিবাচক দিকের পাশপাশি চলতে হবে। সেই ইতিবাচক দিক হল, মদ্যপায়ীকে স্বাস্থ্যদান ও নির্দোষ প্রমোদের মাধ্যমে উলটো-আকর্ষণ দিতে হবে।[৫৩]

।। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ।।

শুধু আমার ও অপরের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েই আমি ওপরে উঠতে পারি।

আমি ঈশ্বরের, তথা মানবতার নিশ্চিত একত্বে বিশ্বাসী। আমাদের বহু দেহ, তাতে কী? আত্মা তো একই। প্রতিসরণের মাধ্যমে সূর্যকিরণ অসংখ্য। কিন্তু তাদের উৎস একটাই। তাই সবচেয়ে দুরাচারী আত্মা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না, (তেমনই আবার পবিত্রতম আত্মার সঙ্গে আত্মীকরণে উপেক্ষিত হতে পারি না।) আমার সদৃশ সকলকে আমার পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করব। পারি না-পারি। পরীক্ষা না হলে আমার চলে না। জীবন, পরীক্ষানিরীক্ষার এক অন্তহীন ধারাবাহিকতা।[৫৪]

।। পতাকা ।।

সকল জাতির পক্ষেই পতাকা প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ-জন্য মৃত্যুবরণ করেছে। নিঃসন্দেহে এটি একধরনের মূর্তিপূজা, যা ধ্বংস করা পাপ হবে। পতাকা এক আদর্শের প্রতিনিধি। গোটানো 'ইউনিয়ন জ্যাক' ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে— ইংরেজের হৃদয়ে এই দৃশ্য যে ভাবাবেগ জাগায় তার শক্তি পরিমাপ করা কঠিন। 'দি স্টার অ্যাণ্ড স্ট্রাইপ্‌স', আমেরিকানদের কাছে বিশ্ব-প্রতিম। ইসলামের শ্রেষ্ঠ শৌর্যবীর্যকে আহ্বান জানায় 'দি স্টারস অ্যান্ড দি ক্রেসেন্ট'।

হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান, ইহুদী, পার্সী ও অন্যান্যরা—যাদের কাছে ভারত স্বদেশ, তাদের সকলেরই দরকার হবে একটি পতাকা,—যার জন্য বাঁচব ও মরব।[৫৫]

।। ক্ষমাশীলতা ।।

ক্ষমা সাহসীর গুণ, কাপুরুষের নয়। বিরাট-রাজার প্রাসাদে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসকালে যখন এক পাণ্ডব ভ্রাতা আকস্মিক আহত হন, কি হয়েছে তাই শুধু লুকালেন না ভাইরা, এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়লে আশ্রয়দাতার ক্ষতি হবে আশঙ্কা ক'রে তাঁরা এক স্বর্ণপাত্রের সাহায্যে সে ক্ষতির পথ বন্ধ করলেন। হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান, পার্সী বা শিখ, যা-ই হোক-না-কেন, আমি চাই প্রতিটি ভারতীয় যেন ওই রকম সহ্যশক্তি ও সাহসের অধিকারী হয়।[৫৬]

।। ভালোত্ব ।।

বলা হয়, "আপ আচ্ছা তো দুনিয়া আচ্ছা।" ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য। তবে ভালোত্ব তখনই শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যখন তা পাপের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। ভালোত্বের বদলে ভালোত্ব, সে এক দরমাপামাপি, তার কোনও গুণ নেই। তবে অন্যায়ের বদলে যদি ভালোত্ব ফিরে দাও, তা হয় মহনীয় শক্তি। অন্যায় থেমে যায়। এ-ভালোত্ব তুষার গোলকের মতো আয়তনে ও গতিতে বাড়তে বাড়তে হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য।[৫৭]

।। মহত্ত্ব ।।

রাজা সোলন, কোনও মানুষের জীবদ্দশায় তাকে সুখী বলতে পারতেন না। তাহলে কোনও মানুষের মহত্ত্ব নিরূপণ করা না জানি আরও কতো কঠিন। পৃথিবীতে যথার্থ মহত্ত্ব পর্বতচূড়ায় বসানো থাকে না যে পাঁচজন দেখতে পাবে। ঠিক তার উলটো। আমার সত্তর বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে যথার্থ মহান তারাই, যাদের জীবদ্দশায় দুনিয়া কিছুই জানতে পারে না তাদের বা তাদের মহত্ত্ব বিষয়ে। একা ঈশ্বর যথার্থ মহত্ত্বের নিরূপক। কেননা তিনি মানব-হৃদয় জানেন।[৫৮]

।। গুরু ।।

আমি হিন্দু ধর্মের গুরু-তত্ত্বে, এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এ-তত্ত্বের গুরুত্বকে বিশ্বাস করি। গুরু বিনা সত্য জ্ঞান সম্ভব না, এ-নির্দেশে অনেক সত্যতা আছে বলে মনে করি। জাগতিক ব্যাপারে এক ত্রুটিপূর্ণ আচার্য চলতে পারে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নয়। এক পরম জ্ঞানীকেই গুরুর সিংহাসনে বসানো যায়।[৫৯]

আমার যদি গুরু থাকতেন, তাহলে তাঁকে দেহমন সমর্পণ করতাম। তাঁকে খুঁজে চলেছি, কিন্তু এ-অবিশ্বাসের যুগে যথার্থ গুরুর সন্ধান মেলা কঠিন। তার পরিবর্তে যে-কেউ, অকেজোর চেয়েও অপদার্থ—প্রায়শ নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক হবে। তাই, ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিদের গুরু বলে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি। যে "জানে না যে সে অজ্ঞ" তার হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার চেয়ে আঁধারে হাতড়ে, লক্ষ লক্ষ ভুল করতে করতে সত্যের উদ্দেশে যাত্রা অনেক শ্রেয়। গলায় পাথর বেঁধে কেউ কোনওদিন সাঁতার শিখেছে?[৬০]

গুরু সম্বন্ধে সাধারণ যে ধারণা তার সঙ্গে আমার ধারণার বোধহয় মিল নেই। পূর্ণতা ছাড়া আর কিছুতে তৃপ্ত হব না আমি। আমি এমন একজনকে খুঁজছি, যে রক্তমাংসেরই মানুষ, দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, বাসনা-আবেগে অবিচল থাকে, বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব-মুক্ত, সত্য ও অহিংসা তার মধ্যে মূর্ত, সে কাউকে ভয় পায় না, কেউ তাকে ভয় করে না।[৬১]

তিনটি মহান প্রভাব

তিনজন আধুনিক মানুষ আমার জীবনে গভীর ছাপ ফেলে গেছেন ও আমার চিত্তহরণ করেছেন: রায়চাঁদভাই তাঁর জীবন্ত সংস্পর্শের মাধ্যমে, "দি কিংডাম অফ গড ইজ উইদিন ইউ" পুস্তকের মাধ্যমে তলস্তয়; আর "আনটু দিস লাস্ট" দ্বারা রাসকিন।[৬২]

রাসকিনের এই মহান পুস্তকের মধ্যে আমার কিছু গভীরতম প্রত্যয়ের প্রতিফলন পেয়েছি। তাই ওটি আমাকে মোহিত করে। বাধ্য করে আমার জীবনধারা পালটাতে। "আনটু দিস লাস্ট"-এর শিক্ষা আমি এ রকম বুঝি:

১. সর্বজনের হিতের মধ্যেই ব্যক্তির হিত রয়েছে।

২. এক আইনজীবীর কাজ ও এক নাপিতের কাজ তুল্যমূল্য, কেননা সকলেরই নিজ কাজ থেকে জীবিকা-অর্জনের সমান অধিকার আছে।

৩. শ্রমের জীবন,—যথা চাষীর জীবন বা হস্তশিল্পীর জীবন হল যাপন-যোগ্য জীবন।

প্রথমটি আমি জানতাম। দ্বিতীয়টি আবছা উপলব্ধি করেছিলাম। তৃতীয়টি কখনও জাগেনি মনে। দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টি যে প্রথমটিতেই নিহিত আছে, "আনটু দিস লাস্ট" আমার কাছে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দিল।[৬৩]

আমার রাজনৈতিক "গুরু"

গোখলে-কে বলি আমার রাজনৈতিক "গুরু"। তবে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এখনও কাউকে খুঁজে পাইনি যাঁর কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে পারি, সন্দেহাতীতভাবে যাঁর মতামত আমি বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে পারি, রাজনীতিতে গোখলের মতামত যেমন মেনে নিতাম। হয়তো আমি আধ্যাত্মিক গুরুলাভের মতো তৈরি হইনি। আমি বিশ্বাস করি, আধ্যাত্মিক গুরু নিজেই আসেন তোমার কাছে। সত্যি বলতে কি, তুমি যখন প্রস্তুত, তিনি নিজেই খুঁজে নেন তোমাকে।

ওই ছোট সিংহাসনটি খালি রয়ে গেছে প্রয়াত রাজাচন্দ্রের পর। তলস্তয় ওই তিন আধুনিকের একজন, যিনি আমার জীবনে গভীরতম আধ্যাত্মিক প্রভাব ফেলেছেন। তৃতীয় জন রাসকিন। চল্লিশ বছর আগে নাস্তিক্যবাদ ও সন্দেহের এক বিষম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, হাতে এসে পড়ল "দি কিংডাম অফ গড ইজ্ উইদিন ইউ" এবং আমি গভীর অভিভূত হলাম। সে সময়ে আমি হিংসায় বিশ্বাসী। এই বই পাঠ করে নাস্তিক্যবাদ থেকে মুক্ত হলাম। এ-বই আমাকে অহিংসায় দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলল। তলস্তয়ের জীবনে যা আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করে, তা হল, যা বলতেন, তদনুরূপ আচরণ করতেন। সত্যসন্ধানে কোনও মূল্যকেই বেশি মনে করতেন না।[৬৪]

আমার কোনও শিষ্য নেই। নিজেই শিষ্যত্বের অভিলাষী, গুরুর সন্ধানে নিরত।[৬৫]

॥ সুখ ॥

সুখ...মানে মানবিক মর্যাদার এক আলোকপ্রাপ্ত উপলব্ধি, মানুষের স্বাধীনতার জন্য এক পিপাসা,—যা সামান্য ব্যক্তিগত আরাম-আয়েস ও সম্পদ-কামনার স্বার্থপর তুষ্টির অনেক ওপরে,—যা আত্মসংরক্ষণের জন্য এ-সব নিমেষে, সানন্দে উৎসর্গ করতে পারে।[৬৬]

এটা প্রতি মানবের মধ্যে বিরাজিত এবং পূর্ণতা ও সত্য সন্ধানী..."সকল মানুষই কী পূর্ণতা সন্ধানের ক্ষমতা রাখে?" হ্যাঁ, এই ক্ষমতা তাদের মধ্যেই আছে।[৬৭]

॥ স্বাস্থ্য ॥

স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যপ্রণালীর নিয়মবিধিকে অবহেলা এবং অজ্ঞতাই যে মানুষের অধিকাংশ রোগের জন্য প্রধানত দায়ী তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। আমাদের মধ্যে মৃত্যুর হার যে

উচ্চ, সন্দেহ নেই তার অনেকটাই আমাদের চরম দারিদ্রের কারণে। তবে এটা প্রশমিত করা যেত যদি মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সম্যক শিক্ষা দেওয়া যেত।

"সুস্থ মনে সুস্থ দেহ" বোধ হয় মানবজাতির জন্য প্রথম আইন। এক সুস্থ দেহে সুস্থ মন স্বতঃপ্রমাণিত সত্য। মন ও শরীরের মধ্যে এক অমোঘ সংযোগ আছে। আমরা যদি সুস্থ মনের অধিকারী হতাম, সব হিংসা বর্জন করতাম, তাহলে স্বাভাবিকভাবে স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে বিনা চেষ্টাতেই সুস্থ দেহ পেতাম।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যপ্রণালীর মূল আইনগুলি অতি সরল, সহজে শেখা যায়। মুশকিল হল তা মেনে চলা। এখানে কয়েকটি বলছি:

বিশুদ্ধ চিন্তা করো। সকল অলস ও অশুদ্ধ চিন্তাকে নির্বাসন দাও।

দিবারাত্র সবচেয়ে নির্মল বাতাসে নিশ্বাস নাও।

কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে ভারসাম্য গড়ে তোল।

ঋজু হয়ে দাঁড়াও, ঋজু হয়ে বসো, প্রতিটি কাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও। এগুলোই তোমার অভ্যন্তরীণ অবস্থার বহিঃপ্রকাশ হোক।

সাথী-মানুষদের সেবা করবে, তাই বাঁচার জন্য খাও। নিজেকে প্রশ্রয় দেবার জন্য জীবনধারণ ক'রো না। তোমার আহার হোক দেহ ও মনকে সচল রাখার মতো পর্যাপ্ত। মানুষ যা খায়, তা-ই হয়ে যায়।

তোমার জল, খাদ্য ও বাতাস যেন পরিষ্কার থাকে। শুধু ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতায় সন্তুষ্ট থাকবে না। নিজের জন্য যেমন চাও, তেমন তিন দফা পরিচ্ছন্নতা দিয়ে তোমার পরিবেশকে প্রভাবিত করো।[৬৮]

আমরা অসুস্থ হলেও নিজেদের যত্নের ব্যাপারে "উদ্বিগ্ন" হব না। এটা নিশ্চয়ই বিধির নির্বন্ধের মধ্যে পড়ে না। অসুখে পড়ার চেয়েও বড় অপরাধ রোগ বিষয়ে উদাসীন থাকা। গতকালের চেয়ে আজ আরও ভালো থাকার চেষ্টা করার অন্ত নেই। আমাদের "উদ্বিগ্ন" হতে হবে এবং দেখতে হবে কেন আমরা অসুস্থ, কেন আমরা অসুস্থ হলাম। প্রকৃতির আইন স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য নয়। যদি অসুস্থ হতে না-চাই বা অসুস্থ হলেও সুস্থ হতে চাই, তাহলে এসো, প্রকৃতির আইন বিষয়ে চিন্তা করি, তাকে মেনে, চলি।[৬৯]

দেহ ও আত্মা

আমার বিশ্বাস, সুস্থ আত্মার বাস সুস্থ দেহে। অতএব ওই আত্মা যতখানি স্বাস্থ্য রূপে বৃদ্ধি পায় এবং কামনা আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, দেহও ততখানি বৃদ্ধি পেয়ে সেই অবস্থায় পৌঁছে যায়। তার মানে এই নয়, এক সুস্থ দেহকে বলশালী হতেই হবে। প্রায়ই এক শীর্ণ দেহেও সাহসী আত্মা বাস করে। একটা স্তরের পর, আত্মার বৃদ্ধির অনুপাতে দেহ ক্ষয় পায়।

সম্পূর্ণ সুস্থ এক শরীর খুব শীর্ণকায় হতে পারে। এক পেশল দেহ অনেক বিপদ ডেকে আনে। দৃশ্যত তা রোগমুক্ত হলেও সংক্রমণ, ছোঁয়াচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনাক্রম্য নয়। উল্টোদিকে, এক নিখুঁত সুস্থ শরীর এগুলির বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম। দূষণ-অযোগ্য

রক্তের সকল রকম ছোঁয়াচ প্রতিরোধ করবার জন্মগত ক্ষমতা আছে।

এমন এক ভারসাম্য আয়ত্ত করা সত্যই কঠিন। নইলে আমি তা পারতাম। আমার আত্মাই সাক্ষী যে, ওই পূর্ণ অবস্থা আয়ত্ত করার জন্য কোনও কষ্টেই আমি কাতর হতাম না। আমার এবং ওই অবস্থার মধ্যে, বাইরের কোনও বাধা দাঁড়াতে পারে না।

কিন্তু সকলের পক্ষে, অন্তত আমার পক্ষে অতীতের সংস্কার মুছে ফেলা সহজ নয়। তবে বিলম্বে আমি কখনও হতাশ হইনি।৺কেননা ওই পূর্ণাবস্থার এক মানসিক চিত্র আমার আছে। আমি তার আবছা ঝলকও দেখি। যতটা এগোন গেছে তা আমাকে হতাশ করে না, আশায় ভরে দেয়। তবে সে আশা পূর্ণ হবার আগেও যদি দেহ ত্যাগ করি, মনে করব না আমি ব্যর্থ হয়েছি। কেননা আমার বর্তমান শরীরের অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাস করি, তেমনি বিশ্বাস করি পুনর্জন্মে। তাই জানি, ক্ষুদ্র চেষ্টাও কখনও বিফলে যায় না।[৭০]

।। সততা ।।

কঠিন হলেও কঠোর সততার সঙ্গে ব্যবসায় করা অসম্ভব নয়। ঘটনা এই, ব্যবসায় যত সততাপূর্ণ, তা সফলও হবে ততটা। তাই ব্যবসায়ীরা এই প্রবাদ রচনা করেছে, "সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি"। ...আসল কথা হল, বিশাল সম্পত্তি সঞ্চয় এবং সততা, এই দুটো খাপ খায় না। "সত্য সত্যই ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।" এক ব্যবসায়ীর সম্পদের ওপর সততা এমন কিছু দাবি করে না যা সাধ্যের অতীত।[৭১]

।। আদর্শ ।।

আদর্শের গুণ তার অসীমত্বের মধ্যেই নিহিত। তবে, ধর্মীয় আদর্শ চারিত্র্যগুণের জন্যই অপূর্ণ মানব দ্বারা অনায়ত্ত থেকে যায়—ওই আদর্শ আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের থেকেও কাছে থাকা সত্ত্বেও, অসীমতার কারণে, যত কাছেই যাই তা ততই দূরে সরে যায়। কেননা আমাদের শরীরী সত্তার চেয়েও ওগুলির বাস্তবতা ও সত্যতা বিষয়ে আমরা বেশি নিশ্চিত। একমাত্র স্ব-আদর্শে এই বিশ্বাসই হল প্রকৃত জীবন, মানুষের সর্বস্ব।[৭২]

আমরা হোঁচট খেতে পারি, পড়ে যেতে পারি, কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াব। রণে ভঙ্গ না দিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে।[৭৩]

।। অমরত্ব ।।

আত্মার অমরত্বে আমি বিশ্বাসী। মহাসাগরের উপমা দিতে চাই। মহাসাগর বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে তৈরি। প্রতি বিন্দু স্বয়ংসম্পূর্ণ, আবার এক সমগ্রের অংশ, "এক ও বহু।" জীবন-মহাসাগরে আমরা ছোট ছোট বিন্দু।

আমার মতবাদের অর্থ: আমাকে জীবনের সঙ্গে, যা-কিছু প্রাণবন্ত তার সঙ্গে একাত্ম

হতে হবে। ঈশ্বরের সামনে আমি জীবনের মহিমার ভাগ নেব। এ জীবনের যোগফল ঈশ্বর।[৭৪]

।। ব্যক্তি ।।

আমার কাছে ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচারই সব—সে ব্যক্তি যত দীনই হোক। আর সবই তার পরে।[৭৫]

।। বীমা ।।

...ভেবেছিলাম জীবনবীমার সঙ্গে ভয় ও ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাব জড়িত...নিজের জীবন বীমা করে আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে তাদের আত্মনির্ভরতা কেড়ে নিয়েছি। পৃথিবীর অগণিত গরিবদের পরিবারের কী হল? তারা নিজের বিষয়ে সাবধান হবে এটা কেন আশা করা হবে না? নিজেকে কেন তাদের মধ্যে ধরব না? মৃত্যু আমাকে অন্যদের আগে নিয়ে যাবে ধরে নেবার কী যুক্তি ছিল আমার? হাজার হলেও (আমার পরিবারের) প্রকৃত রক্ষাকর্তা আমি বা আমার ভাই নয়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।[৭৬]

।। সাংবাদিকতা ।।

সাংবাদিকতার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেবাকার্য। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান এক বিশাল শক্তি। কিন্তু শৃঙ্খলহীন জলস্রোত যেমন দেশ ভাসায়, শস্য হানি করে, তেমনই অসংযত কলম ধ্বংসের কাজ করে। নিয়ন্ত্রণের অভাবের চেয়ে বাইরে থেকে চাপানো নিয়ন্ত্রণ বেশি ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত। যখন নিয়ন্ত্রণ আসবে ভিতর থেকে তখন এটা লাভজনক হবে। যুক্তির এই ধারা যদি সঠিক হয় তাহলে পৃথিবীর কতজন সাংবাদিক এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে? কিন্তু বিচার করবে কে? ভালো ও মন্দের মতো, দরকারি এবং অকেজো সাধারণত পাশাপাশিই চলে। মানুষকেই বিচার করে নিতে হবে।[৭৭]

সাংবাদিকতার প্রকৃত কাজ, জনমানসকে শিক্ষা দান। বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত খবর দিয়ে জনসাধারণের মনকে বোঝাই করা সাংবাদিকতা নয়।

সাংবাদিককে তাই স্বীয় সতর্ক বিচক্ষণতা ব্যবহার করে দেখতে হবে কী বার্তা দেবে, কখন দেবে। সাংবাদিকরা এমনিতে, নিছক ঘটনা লিখেই সন্তুষ্ট থাকে না। সাংবাদিকতা "ঘটনাবলীর বুদ্ধি-নির্ভর অনুমানের" শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৭৮]

আধুনিক সংবাদিকতা

আজ আধুনিক সাংবাদিকতায় যে কৃত্রিমতা, পক্ষপাতিত্ব, ভুল, এমনকি অসততা ঢুকে পড়েছে, তা নিরন্তর বিভ্রান্ত করছে সৎ মানুষদের—যারা ন্যায়বিচার ছাড়া কিছুই দেখতে চায় না।[৭৯]

আমার সামনে কাগজ থেকে বাছাই করা কিছু ভয়ংকর বস্তু রয়েছে। সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি, ভয়ানক ভুল বর্ণনা, রাজনীতিক হিংসায় প্ররোচনা, যা হত্যার কাছাকাছি। সরকারের পক্ষে অবশ্য আদালতে অভিযোগ আনা বা দমনমূলক অর্ডিনান্স জারি করা সোজা। এগুলি উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়। সফল হলেও তা ক্ষণস্থায়ী। আর এ-সব তো লেখকদের বদলাতে পারে না। যখন প্রেসের মুক্ত-মঞ্চ তাদের সামনে রুদ্ধ হয়ে যায়, তারা প্রায়ই গোপন প্রচারাভিযান চালায়।

যথার্থ সমাধান হল সুস্থ জনমত, যা বিষাক্ত পত্রপত্রিকাকে সমর্থন করবে না...সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এক দুর্মূল্য প্রাপ্তি, যা কোনও দেশই ছাড়তে পারে না। আইনী নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। কিন্তু তা যদি নামে-মাত্র হয় তাহলে, আমি যা বলেছি সেই রকম ভিতর থেকে খুঁটিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়। তাতে আপত্তি করাও উচিত নয়।[৮০]

বিজ্ঞাপন

আমি মনে করি নীতিবিগর্হিত বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সংবাদপত্র চালানো অন্যায়। বিশ্বাস করি, বিজ্ঞাপন যদি নিতেই হয়, কাগজমালিক ও সম্পাদকদের এক কঠোর সেন্সার-ব্যবস্থা চালু করা উচিত, এবং একমাত্র সুস্থ বিজ্ঞাপনই নেওয়া উচিত।

এমনকি সবচেয়ে সম্মানিত বলে আখ্যাত সংবাদপত্র ও পত্রিকাকেও নীতিবিগর্হিত বিজ্ঞাপনের পাপ গ্রাস করছে। এ পাপের বিরুদ্ধে লড়তে হবে সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদকদের বিবেককে শাণিত করে তুলে। আমার মতো এক অপেশাদার সম্পাদকের প্রভাবে সে সূক্ষ্ম শালীনতাবোধ আসতে পারে না। এটা আসবে, যখন তাদের নিজ-বিবেক জাগ্রত হয়ে এই ক্রমবর্ধমান পাপকে দেখবে। অথবা, যখন জনতার নীতির বিষয়ে সচেতন, জনগণের প্রতিনিধি এক সরকার সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেবে।[৮১]

সংবাদপত্র ও সত্য

পশ্চিমের মতো পুবেও সংবাদপত্র অতি দ্রুত জনতার বাইবেল, কোরান, জেন্দ্-আভেস্তা, ভাগবদ্গীতার এক সমাহারে পরিণত হচ্ছে। কাগজে যা বেরোয় তাকেই ঈশ্বরের সত্য হিসেবে দেখা হয়।[৮২]

সংবাদপত্র থেকে মতামত ধার করার অভ্যাসের আমি নিন্দা করি। ঘটনা জানার জন্য সংবাদপত্র—এটাই হওয়া উচিত। স্বাধীনচিন্তার অভ্যাস হত্যা করার অধিকার সংবাদপত্রকে দেওয়া যায় না।[৮৩]

আমি মনে করি খবরের কাগজের লোকদের, তথ্য পরিবেশন ছাড়া আর কিছুই উচিত নয়।[৮৪]

প্রেসের শক্তি

প্রেসকে "ফোর্থ এস্টেট" বলা হয়। নিশ্চয় এ-একটা শক্তি। কিন্তু সে-শক্তির অপব্যবহার

অপরাধ। আমি নিজেও এক সাংবাদিক এবং সাথী-সাংবাদিকদের কাছে আবেদন, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব বুঝুন। সত্য প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোনও ধারণা না নিয়ে তাদের কাজ করে চলুন।[৮৫]

খবরের কাগজের প্রভাব খুবই শক্তিশালী। কোনও মিথ্যা সংবাদ, বা মানুষকে উত্তেজিত করতে পারে এমন কোনও সংবাদ তাদের কাগজে যাতে প্রকাশিত না হয়, এটা দেখা সম্পাদকদের কর্তব্য...

সম্পাদক ও তাঁর সহকারীরা যে খবর দেন, তা যেভাবে পরিবেশন করেন, সে-বিষয়ে বেশি সতর্ক হতে হবে।

স্বাধীনতার অবস্থায়, সরকার সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করবে—তা কার্যত অসম্ভব। জনগণের কর্তব্য, সংবাদপত্রের ওপর কড়া নজর রাখা এবং তাদের ঠিক পথে চালানো। আলোকপ্রাপ্ত জনগণ প্ররোচনামূলক বা অশ্লীল সংবাদপত্র সমর্থন করবে না।[৮৬]

তাদের (জনতার) কাছে ছাপা কাগজ হল ধর্মীয় সত্য। এই ঘটনা সম্পাদক ও সাংবাদিকদের ওপর বিশাল দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়।[৮৭]

আমি নিজে কখনও সংবাদপত্রের খবর নিঃশেষে বিশ্বাস করি না। পাঠকদের সতর্ক করব, যে তারা যেন কাগজে প্রকাশিত কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত না হয়। শ্রেষ্ঠ কাগজগুলিও অতিকথন বা অলংকরণ-মুক্ত নয়।[৮৮]

॥ জুরির বিচার ॥

বিচারকের বিচারের চেয়ে জুরির বিচারের সুবিধা বিষয়ে আমি প্রত্যয়ী নই...এমনকি ইংল্যাণ্ডেও দেখা গেছে আসল কাজের সময় জুরিরা ব্যর্থ হন। যখন আবেগ জাগ্রত হয় জুরিরা তার দ্বারা প্রভাবিত হয় ও অন্যায় রায় দেয়। এ-কথা ধরে নেবারও দরকার নেই যে তারা সর্বদা দয়াপরবশ। আমি জানি, সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে জুরিরা বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, এবং বিচারক এর বিপক্ষে রায় দিয়েছেন।

আমরা দাসমনোভাব নিয়ে ইংরেজের সবই যেন অনুকরণ না করি। যে-সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্থিতধী, সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণে সুদক্ষ ও লোক-চরিত্র বিশ্লেষণে পারঙ্গম ব্যক্তি আবশ্যক, সেখানে কোনওমতে জোগাড় করে আনা আনকোরা লোকদের, ঝানু বিচারকদের আসনে বসানো উচিত নয়। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, একেবারে নিচে থেকে এক দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও যোগ্য বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা।[৮৯]

॥ আইনজীবী ॥

আমরা যদি আইনজীবী ও আদালতের মোহে বশীভূত না হতাম, কোনও দালাল যদি আমাদের নীচ আসক্তির কাছে আবেদন ক'রে আমাদের আদালতের পঙ্ককুণ্ডের দিকে প্রলুব্ধ না করত, তাহলে জীবন অনেক সুখের হতো। যারা আদালতে ঘোরে, তাদের

মধ্যে উত্তমজনেরাও সাক্ষ্য দেবে যে ওখানকার আবহাওয়া দূষিত। মিথ্যা সাক্ষ্য নিয়ে সাক্ষীরা দুদিকেই দণ্ডায়মান, টাকা বা বন্ধুত্বের খাতিরে তাদের আত্মাকেও বেচতে রাজি।[১০]

আমি আইনের যথার্থ ব্যবহার শিখেছিলাম। মানবস্বভাবের ভালো দিকটি খুঁজতে শিখে, মানব হৃদয়ে প্রবেশ করতে শিখেছিলাম। বুঝেছিলাম, আইনজীবীর যথার্থ কাজ হল, বিবদমান দুই দলকে মিলিত করে দেওয়া। এ-শিক্ষা হৃদয়ে অনপনেয়ভাবে দেগে দেওয়া হয়েছিল। আইনজীবী হিসেবে বিশ বছর কাজের মধ্যে অধিকাংশ সময়টাই গেছে শত শত মামলার ব্যক্তিগত পর্যায়ে মিটমাট ও আপস করাতে। কিছুই হারাইনি তাতে। টাকা তো নয়ই, স্বীয় আত্মাও নয়।[১১]

আইন ও সত্য

সত্যের সঙ্গে আপস না করে আইনজীবিকা চালানো অসম্ভব নয়, এই প্রত্যয় আমার ছিল। তবে এই জীবিকার মৌলিক ত্রুটি, যা একে বিষাক্ত করেছে, সততাও তা দূর করতে পারে না, এ-কথা মনে রাখা উচিত।[১২]

ব্যবহারজীবী হিসেবে আমার কর্মজীবনে একবারও আমি সুকঠিন সত্য ও সততা থেকে বিচ্যুত হইনি।[১৩]

...যদি আইনজীবিকাকে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করতে চাও, তা হলে সবার আগে সর্বদা এই কথা মনে রাখবে, স্বীয় জীবিকাকে তোমার টাকার থলির স্বার্থের বশম্বদ করবে না। দুর্ভাগাবশত বর্তমানে এরই প্রাদুর্ভাব। স্বদেশসেবার জন্য তোমার জীবিকাকে ব্যবহার করবে। সকল দেশেই সম্মানিত আইনজীবীদের দৃষ্টান্ত আছে, যাঁরা আত্মত্যাগী জীবন যাপন করেছেন,—তাঁদের চমৎকার আইনী প্রতিভাকে তাঁদের দেশের সেবায় নিযুক্ত করেছেন,—যদিও এ জন্য তাঁদের প্রায় নিঃস্ব হতে হয়েছে...

আইনজীবীর কর্তব্য

..."আনটু দিস লাস্ট" থেকে রাসকিনের নীতি অনুসরণ করতে পারো। তিনি বলেছেন, "একজন ছুতোরমিস্ত্রি তার কাজের জন্য যেখানে পনেরো শিলিং পেতে গলদঘর্ম হয়ে যায়, সেখানে একজন আইনজীবী কেন তার কাজের জন্য পনেরো পাউণ্ড চাইবে?" আইনজীবীদের 'ফী' সর্বত্রই অযৌক্তিক...ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা...প্রায় সর্বত্র। দেখেছি, জীবিকার জন্য কাজের সময় আইনজীবীরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মক্কেলের স্বার্থে অসত্যের মধ্যে চলে যায়। এক প্রখ্যাত আইনজীবী এমনও বলেছেন, একজন আইনজীবীর তেমন মক্কেলের সপক্ষেও লড়া কর্তব্য, যাকে তিনি অপরাধী বলে জানেন। এ-আমি মানি না। আইনজীবীর কর্তব্য বিচারকের সামনে সব উপস্থাপন করা। তাঁদের সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করা। অপরাধীকে নিরপরাধ প্রমাণ করা নয়।[১৪]

॥ নেতৃত্ব ॥

আমার বিশ্বাস, শুধু নিজ মত জাহির ও জনমতের কাছে আত্মসমর্পণ যথেষ্ট তো নয়ই, উপরন্তু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে, জনমত যদি নেতাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে না হয় তাহলে তাঁরা জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করবেন।[৯৫]

এক ভীরু ও নাস্তিক আইনজীবীর চেয়ে, এক সাহসী ও আস্তিক তাঁতি বা মুচি আমাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে এ-আমি বেশ ভাবতে পারি। হিসাব করে চলা, কূটনীতি, ঘৃণা ও অবিশ্বাসের ওপর নয়, আইনী দক্ষতার সাফল্য নির্ভর করে সাহস, ত্যাগ প্রেম ও বিশ্বাসের ওপর।[৯৬]

যাঁরা সবাই সমান, তাঁদের মধ্যে প্রথম জনই মাত্র নেতা। কাউকে-না-কাউকে প্রথমে রাখতেই হবে, তবে তার শিকলের দুর্বলতম জোড়টির চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়া ঠিক হবে না। নির্বাচন করার পর আমরা তাকে অনুসরণ করব, নচেৎ শিকল ছিঁড়ে যাবে। সব পণ্ড হয়ে যাবে।[৯৭]

যে নেতা স্ববিবেকবিরোধী কাজ করে সে অপদার্থ। তার চারপাশে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন অনেক মানুষ তো থাকবেই। নোঙরহীন জাহাজের মতোই সে ভেসে যাবে, যদি তাকে শক্ত হাতে ধরে রেখে পরিচালনা করার জন্য অন্তরের কণ্ঠস্বর না-থাকে।[৯৮]

নেতাকে তৈরি করে অনুগামীরাই। জনগণের মধ্যে যে আশা সুপ্ত থাকে, নেতা তা স্পষ্টতরভাবে প্রতিফলিত করে।[৯৯]

॥ উপায় ও লক্ষ্য ॥

কথায় বলে, "উপায় শেষ অবধি উপায়" ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বলি, "উপায়ই শেষ অবধি সব কিছু।" উপায় যেমন, লক্ষ্যও তেমন হবে। হিংসার উপায় আনবে হিংসার স্বরাজ। তা পৃথিবী ও ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক হবে...উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে কোনও পাঁচিল নেই। স্রষ্টা, উপায়ের ওপর আমাদের (অত্যন্ত সীমিত) নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন, লক্ষ্যের ওপর নয়। লক্ষ্যের উপলব্ধি, উপায়ের সঠিক অনুপাতে হবে। এ এমন এক প্রস্তাব, যার কোনও অন্যথা হয় না। এমন বিশ্বাস রেখে আমি চেষ্টা করছি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে দেশ যেন চলে।[১০০]

আমার জীবনদর্শনে উপায় ও লক্ষ্য সমার্থক।[১০১]

॥ চিকিৎসা ॥

আমি পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিরুদ্ধে বলেছি। যাকে আমি মনে করি অশুভ পরাবিদ্যার সারাৎসার। আমার মতামত অহিংসা-জাত, কেননা আমার আত্মা জীবন্ত প্রাণীব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে... আমার কথা হল, যে-নিষ্ঠুর আচরণ নিজের ওপর করব না, কেন তা মনুষ্যেতর প্রাণীদের ওপর করব।

তবে সব চিকিৎসাপদ্ধতিকে আমি ঘৃণা করি না। জানি, নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশুর যত্ন বিষয়ে পশ্চিমের কাছে অনেক শেখার আছে। আমাদের শিশুরা অবহেলায় জন্মায়। আর আমাদের মেয়েদের অধিকাংশ শিশুপালন-বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ। এ-ক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমের কাছে অনেক শিখতে পারি।

তবে মানুষের পার্থিব অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত করার ওপরে পাশ্চাত্য বাড়াবাড়ি রকম গুরুত্ব আরোপ করে। পৃথিবীতে মানুষের শেষ মুহূর্ত অবধি তোমরা ইনজেকশান দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখো। যুদ্ধে যেমন বেপরোয়াভাবে তারা জীবন বিসর্জন দেয়, তার সঙ্গে এ ব্যাপারটা অসংগতিপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।[১০২]

।। টাকা ।।

সৌভ্রাত্রের অনুভূতি, সদয় কথা, সদয় মুখচ্ছবি যত দূর যেতে পারে, টাকা তা পারে না। এ-আমার অভিজ্ঞতা। সম্পদে আগ্রহী কোনও লোক যদি অন্যের কাছ থেকে প্রার্থিত সম্পদ পায়, অথচ সহানুভূতি না পায়, সে তাকে শেষ অবধি ত্যাগ করে যাবে। অপর পক্ষে, যাকে ভালবাসা দিয়ে জিতে নেওয়া হয়, সেই সহৃদয়তার বিনিময়ে সে যে-কোনও বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকবে।[১০৩]

অন্তরাত্মার ব্যাপারে টাকার ভূমিকা সামান্যই—এ আমার অভিজ্ঞতানির্ভর দৃঢ় প্রত্যয়।[১০৪]

।। নৈতিকতা ।।

নিজেদের জন্য সত্য পথ খুঁজে নিয়ে নির্ভয়ে সে-পথে চলার মধ্যে সত্য নৈতিকতা আছে, বাঁধা পথে চলার মধ্যে নেই।[১০৫]

যে কাজ স্বেচ্ছায় করা হয় না, তাকে নৈতিক বলা যায় না। যতদিন যান্ত্রিকভাবে কাজ করে যাব, নৈতিকতার প্রশ্নই আসবে না। কোনও কাজকে নৈতিক বলতে হলে তা সচেতনভাবে, কর্তব্য হিসেবে করতে হবে।[১০৬]

আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করলে নৈতিক কর্তৃত্ব ধরে রাখা যায় না। না-চাইতে তা আসে, বিনা চেষ্টায় বজায় থাকে।[১০৭]

শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের মোহে নয়, আমাদের সিদ্ধান্ত পরিচালিত হবে ন্যায়বোধে।[১০৮]

।। অভিভাবক ।।

আমি এমন একজন পুত্রের কথাও জানি না যে তার বয়োবৃদ্ধা মা-কে শ্রীহীনা মনে করে। খাঁটি সোনাকে গিল্টি করার কথা বরং ভাবা যায়, কিন্তু পিতা-মাতাকে কলঙ্ক দেবে এমন পুত্র এখনও জন্মাতে বাকি আছে।[১০৯]

।। পুরোহিত ।।

ধর্মের যথার্থ তত্ত্বাবধায়ক হওয়া উচিত ছিল পুরোহিতদেরই। কিন্তু তারাই তাদের কাছে গচ্ছিত ধর্মের ধ্বংসসাধনের কারণ হয়েছে। এ অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা, তবু ঐতিহাসিক সত্য।[১১০]

।। জনকল্যাণ তহবিল ।।

যে পাই-পয়সা পাই, তার হিসাব যদি ঠিকমত না-রাখি, সেই টাকার ন্যায্য ব্যবহার না-করি, জনজীবন থেকে মুছে যাওয়ার যোগ্য হব আমরা।[১১১]

কোনও সম্পত্তি রাখিনি যাকে নিজের বলতে পারি। ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে, দান বা দানের অংশ ব্যবহারের... আমি কী অধিকারী? সমগ্র কর্মজীবনে, এ-কাজ কখনও করিনি। এবং সর্বদা বন্ধুদের বলেছি অনুরূপ করতে। যাদের ওপর মানুষের আস্থা আছে, যাদের হাতে তারা দান তুলে দেয়, এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করে যে, নিজেরা খরচ করার চাইতে এই অর্থ তারা অনেক বেশি বিচক্ষণতা ও যত্নসহকারে ব্যয় করবে, তাদের সামনে এ-ছাড়া অন্য পথ খোলা নেই বলে মনে করি। যাকে বিশ্বাস করা হল, সে যদি সেই বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে, অপব্যবহার করে, তা এক ভয়ংকর ব্যাপার হবে। তেমন কাজের ধ্বংসাত্মক পরিণতি বর্ণনা করার চেয়ে কল্পনা করা ভালো। জনগণের কাজ হবে সীজারের পত্নীর মতো, সন্দেহের ঊর্ধ্বে।[১১২]

...বেশ কিছু জনপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, স্থায়ী তহবিল থেকে জনপ্রতিষ্ঠান চালানো ঠিক নয়। স্থায়ী তহবিলের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির নৈতিক অধঃপতনের বীজ নিহিত আছে। জনপ্রতিষ্ঠান মানে জনসাধারণের সমর্থনে, তাদের প্রদত্ত টাকায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। তেমন প্রতিষ্ঠান যখন জনসমর্থন হারায়, তার টিকে থাকার অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়।[১১৩]

।। জনপ্রতিষ্ঠান ।।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনও কল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান সমর্থনের অভাবে কখনও মরে না। যে-সব প্রতিষ্ঠান উঠে গেছে, তার কারণ, হয় তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা জনসাধারণের কাছে প্রশংসনীয় মনে হয়, কিংবা যারা চালাচ্ছিল তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে,—অথবা, একই কথা, প্রাণশক্তি হারিয়েছে। তাই অমন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের বলব...অবস্থা মন্দা দেখে হাল না ছেড়ে দিতে। সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার সময় এটা।[১১৪]

।। জনজীবন ।।

আমি বারংবার বলেছি, কোনও বিশেষ চিন্তাধারাই সঠিক বিচারের মৌরসিপাট্টা দাবি

করতে পারে না। আমরা সবাই ভুল করি। প্রায়ই বাধ্য হই বিচার বদলাতে। এমন এক বিশাল দেশে নানা সৎ-চিন্তাধারার জায়গা থাকতেই হবে। প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে চেষ্টা করা, তা গ্রহণ করতে না পারলেও সে যেমন আমাদের শ্রদ্ধা করবে বলে আশা করি, তেমনিভাবে তাকে শ্রদ্ধা করা—এই ন্যূনতম কর্তব্য আমাদের পালন করা উচিত। সুস্থ জনজীবনের ক্ষেত্রে, স্বরাজ-যোগ্যতার ক্ষেত্রে, এ-এক অপরিহার্য পরীক্ষা।

যদি উদারতা বা সহিষ্ণুতা না থাকে,—আমরা কখনও আমাদের মতপার্থক্য আপসে মেটাতে পারব না। ফলে সবসময়ে এক তৃতীয় পক্ষের,—বিদেশী আধিপত্যের মধ্যস্থতার কাছে মাথা নোয়াব।[১১৫]

আমি মনে করি, জনকর্মীর কখনও দামী উপহার নেওয়া উচিত নয়।[১১৬]

।। সরকারি কর্মী ।।

এক প্রশাসনিক যন্ত্রের এক ইউনিট হিসাবে একজন সরকারি কর্মী যদি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে, তাহলে তার চরিত্রকে উপেক্ষা করে চলার প্রবণতা আধুনিক জনজীবনে এসে গিয়েছে। বলা হয়, প্রত্যেকের চরিত্র তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। জানি প্রায়ই এ-কথা বলা হয়, তবু আমি কখনও এর কদর করতে, বা একে মেনে নিতে পারিনি। যে-সব সংগঠন ব্যক্তিগত চরিত্রকে কোনও চিন্তার বিষয় বলে মনে করেনি, সেগুলির গুরুতর পরিণাম ঘটেছে।[১১৭]

।। সময়ানুবর্তিতা ।।

আমি অনেক সময়ে বন্ধুদের বলেছি, নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার ক্ষমতার ব্যাপারে ইংরেজরা আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। জাতীয় ব্যাপারস্যাপার যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক, ইংরেজরা খাওয়ার সময়, মনোরঞ্জনের সময়, ঘড়ির কাঁটা ধরে মেনে চলে। বিপদ বা আসন্ন দুর্যোগের মুখে তারা কখনও বিচলিত হয় না। একে, 'গীতা'র প্রেরণায় কর্ম বলা যায়। ভারতে রাজনীতি-কর্মীদের মধ্যে খুব অল্পই ইংরেজদের স্তরে উঠতে পেরেছেন....

নেতা ও কর্মীরা কঠোরভাবে সময় মেনে চললে জাতীয় লক্ষ্যপথে তা এক বিশিষ্ট প্রাপ্তি বলে গণ্য হতো...তার সাধ্যের অতিরিক্ত তার কাছে আশা করা হচ্ছে না। দিনান্তে যদি দেখা যায় বাড়তি কাজ বাকি থেকে গেছে, অথবা, একবারের আহার বাদ না দিয়ে, বা ঘুম বা মনোরঞ্জনের সময় কাজে না লাগালে কাজটি শেষ করতে পারবে না, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও শৃঙ্খলাচ্যুতি ঘটেছে। আমার সন্দেহ নেই যে আমরা যদি সময়ানুবর্তিতা অভ্যাস করি, কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ করি, তাহলে জাতীয় দক্ষতার মান বেড়ে যাবে। লক্ষ্যের প্রতি অগ্রগতি দ্রুত হবে। কর্মীরা সুস্থতর ও দীর্ঘায়ু হবে।[১১৮]

॥ ঘোড়দৌড় ॥

ঘোড়দৌড় বিষয়ে কিছুই জানি না। এর সঙ্গে যা কিছু জড়িত তার কারণে আমি বরাবর এটাকে ভয় পাই। জানি, ঘোড়দৌড়ের মাঠে বহু লোকের সর্বনাশ হয়ে গেছে।[১১৯]

রেসের মাঠে জুয়া বিষয়ে যতদূর জানি, অনেক কিছুর মতো এটাও পশ্চিম থেকে আমদানি করা। রেসের মাঠে জুয়া যতটা আইনী সুরক্ষা পায়, আমার ক্ষমতা থাকলে তা প্রত্যাহার করে নিতাম...এ যুক্তি শুনেছি যে ভালো ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি করার জন্য ঘোড়দৌড় দরকার। এতে হয়তো সত্য আছে। জুয়া বাদ দিয়ে ঘোড়দৌড় কি সম্ভব নয়? অথবা জুয়া কি ঘোড়ার উত্তম প্রজননের সহায়ক?[১২০]

ঘোড়া-প্রেমের জন্য ঘোড়দৌড় এবং আনুষঙ্গিক উত্তেজনা সম্পূর্ণ অবান্তর। ঘোড়দৌড় মানুষের বদভ্যাসে মদত দেয়। এর মানে, ভালো, কর্ষণযোগ্য জমি ও টাকার অপচয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়ার কারণে ভালো ভালো মানুষের সর্বনাশ হতে আমার মতো সবাই দেখেছে। পশ্চিমের কদভ্যাস বর্জন করে তাদের শ্রেষ্ঠ যা-আছে তা নেবার চেষ্টা করার সময় হয়েছে।[১২১]

॥ পুনর্দেহধারণ ॥

আমি গতজন্ম ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। আমাদের সম্পর্কগুলি গত জন্ম থেকে নিয়ে আসা সংস্কারের পরিণতি। ঈশ্বরের আইন অজ্ঞেয় এবং অন্তহীন গবেষণার বিষয়। কেউ তার গভীরতা মাপতে পারে না।[১২২]

॥ নদী ॥

দুটির বাইরেও আমাদের আরও গঙ্গা ও যমুনা আছে। ...যে-দেশে বাস করি তার জন্য যে ত্যাগ আমাদের করতে হবে, নদীরা সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। নদীগুলি যেমন নিরন্তর বহমান...ওরা আমাদের তেমনই মনে করিয়ে দেয় আমাদের সে-ভাবে শুদ্ধিকরণের ভিতর দিয়ে নিরন্তর যেতে হবে। আজকের আধুনিক অস্থির ধাবমানতায়, নদীকে আমরা প্রধানত ব্যবহার করি নর্দমার নোংরা ঢালতে ও মালবাহী জাহাজ বইতে। এবং এ কাজ করতে গিয়ে নদীকে আরও নোংরা করি। নদীর ধারে বেড়াতে যাবার সময় আমাদের নেই...সময় নেই, কী বার্তা নদীমর্মর আমাদের বলছে তা শোনবার।[১২৩]

॥ গোপনীয়তা ॥

সমস্ত পাপ অনুষ্ঠিত হয় গোপনে। যে মুহূর্তে উপলব্ধি করব, ঈশ্বরের কাছে আমাদের চিন্তাও গোপন নেই, আমরা মুক্তি পাব।[১২৪]

গোপনীয়তাকে আমি পাপ মনে করি, বিশেষত, রাজনীতিতে। আমরা যা বলি ও করি, ঈশ্বরের উপস্থিতি সেখানে বিরাজমান এটা উপলব্ধি করলে পৃথিবীতে কারও কাছে গোপন করার কিছু থাকত না আমাদের। আমাদের স্রষ্টার সামনে কোনও কলুষিত চিন্তা

করতাম না। বলতামও না। কলুষই খোঁজে গোপনীয়তা ও অন্ধকার। মানবস্বভাবের প্রবণতা হল নোংরা লুকোন। নোংরা জিনিস আমরা দেখতে বা ছুঁতে চাইনা। সেগুলি চোখের আড়ালে রাখি। আমাদের কথার ব্যাপারেও তা-ই হবে নিশ্চয়। আমি বলি, তেমন চিন্তা পরিহার করা উচিত, যা পৃথিবীর কাছে লুকোতে চাই।[১২৫]

আমি নির্ভেজাল অহিংস কাজের এবং প্রকাশ্যে উপায়ের সপক্ষে। গোপনীয়তা আমি ঘৃণা করি।[১২৬]

সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে কাজ না করলে কোনও সংগঠন তার জীবন বা ধর্ম বাঁচাতে পারে না।[১২৭]

।। আত্মশুদ্ধিকরণ ।।

আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে সকল জীবিত প্রাণের সঙ্গে আত্মীকরণ সম্ভব নয়। যে শুদ্ধচিত্ত নয় তার কাছে অহিংসানীতি অনুসরণ এক অপূর্ণ স্বপ্ন থেকে যায়। তার দ্বারা ঈশ্বর উপলব্ধি অসম্ভব। আত্মশুদ্ধি তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধিকরণ। যেহেতু এটি সংক্রামক, তাই এক-এর শুদ্ধিকরণ নিয়ে যায় তার পরিপার্শ্বের শুদ্ধিকরণের দিকে। সম্পূর্ণ শুদ্ধি আয়ত্ত করতে হলে চিন্তা, কথা ও কাজে সম্পূর্ণ লালসাবেগ বর্জিত হতে হবে, ভালবাসা ও ঘৃণা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, এই বিপ্রতীপ স্রোতের সংঘর্ষের ওপরে উঠতে হবে। নিরন্তর ক্লান্তিহীন প্রয়াস চালাবার পরেও আমার মধ্যে ওই তিন শুদ্ধতা নেই, আমি জানি। তাই তো বিশ্বের প্রশংসা আমাকে বিচলিত করতে পারে না। সত্যি বলতে কি, তা প্রায়ই আমাকে দংশন করে। সূক্ষ্ম আবেগ জয় করা, অস্ত্রশক্তি দ্বারা পৃথিবী বিজয়ের চেয়ে অনেক কঠিন।[১২৮]

।। সরল জীবনযাত্রা ।।

পৃথিবীতে সবাই যথাসাধ্য শ্রম ক'রে যথাসম্ভব উচ্চমানের জীবন যাপন করবে এটা আশা করা, আর সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের নির্গমন আশা করা একইরকম উদ্ভট কল্পনা। ...বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রা...সমগ্রভাবে যে কোনও সমাজের ক্ষেত্রেই এক অসম্ভব ধারণা। যখন বিলাসের কোনও মাত্রা নেই। কোথায় থামব আমরা? পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থ তো উল্টোটাই শেখায়। আমাদের সামনে যে আদর্শ রাখা হয়েছে, তা হল, "সরল জীবনযাত্রা, উচ্চ চিন্তা।" অধিকাংশ লোক এর সত্যতা বোঝে, কিন্তু মানুষী দুর্বলতার কারণে সেখানে পৌঁছতে পারে না।

তবে তেমন এক অস্তিত্ব কল্পনা করা খুবই সম্ভব...যে মুহূর্তে আমরা দৈনন্দিন চাহিদা বাড়াবো, সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হব। ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[১২৯]

বিশ্বজনীনতার সার হল সরলতা।[১৩০]

(জীবনের সরলীকরণ ব্যতীত) আর কোনও ভাবেই মানব-ব্যক্তিত্বকে বাঁচানো যায় না। "আনটু দিস লাস্ট" উক্তিতে যা ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমি সেই মতে চলি।

ওই বই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পৃথিবী আমাদের দিয়ে যা করাতে চায়, আমরা শেষ অবধি তাই করে যাব।[১৩১]

।। পাপ ও পাপী ।।

স্বকৃত পাপের পরিণাম থেকে উদ্ধার চাই না। পাপ, বা পাপের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাই। যতদিন তা না হচ্ছে, অস্থির থেকেই তৃপ্ত হব।[১৩২]

গোঁড়া ধারণা হল, পরজন্মে পাপ থেকে ত্রাণ। আমি তোমাদের বলতে চাই যে ত্রাণ...এখানে, এখনই আমাদের পাবার প্রতিশ্রুতি আছে, যদি আমরা আবশ্যিক শর্ত পূরণ করি। প্রথম শর্ত, আত্মশুদ্ধি। দ্বিতীয়টি, আইন মেনে চলা। এ-জীবনে আমরা পাপের ভার মাথায় নিয়ে চলব, আর পরজন্মে আমাদের উদ্ধার ক'রে ঈশ্বর তাঁর ত্রাতা নাম সার্থক করবেন— এমন আশা করা বৃথা ও অনৈতিক। যে ব্যবসায়ী তার সরলমনা অজ্ঞ ক্রেতাদের ঠকায় ও মিথ্যা কথা বলে, সে উদ্ধার পাবার আশা করতে পারে না।[১৩৩]

স্বীকারোক্তি

ভুল স্বীকার করা এক সম্মার্জনীর মতো,—যা আবর্জনা ঝাঁট দেয় এবং আগের চেয়েও পরিষ্কার করে মেঝেকে।[১৩৪]

সব চেয়ে বিশুদ্ধ অনুশোচনা হল, যার তা শোনার অধিকার আছে তার সামনে পরিষ্কার স্বীকারোক্তি, সেই সঙ্গে পুনরায় পাপ না করার প্রতিশ্রুতি।[১৩৫]

যে লোক অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, নিজেকে সে অন্য মানুষ বলে মনে করে। অতীতের অন্যায় স্বীকার করতে সে লজ্জা পায় না। কেননা সেসব অন্যায় তাকে ছুঁতে পারে না।[১৩৬]

কোনও রোগীর পক্ষে তার রোগ লুকোন ঠিক নয়। তা করলে সে নিজেরই শত্রু হবে।[১৩৭]

ঈশ্বরের চোখে পাপী ও সন্ত দুই-ই সমান। দুজনেই সমান ন্যায়বিচার পাবে। এগোবার বা পেছোবার সমান সুযোগ পাবে। দুজনেই তাঁর সন্তান। তাঁর সৃষ্টি। যে সন্ত নিজেকে এক পাপীর চেয়ে শ্রেয় মনে করেন, তিনি তাঁর সন্তত্ব খোয়ান, এবং পাপীর চেয়েও মন্দ হয়ে যান। পাপী তো ওই অহঙ্কারী সন্তের মতো নয়। সে জানে না সে কী করছে।[১৩৮]

আমি আমার বহু পাপের অকপট স্বীকারোক্তি করেছি। তবে সেগুলির বোঝা কাঁধে বহে নিয়ে চলি না। যেমন অনুভব করি, তেমনিভাবেই যদি ঈশ্বর অভিমুখে চলি তাহলে সব ঠিক আছে। কেননা তাঁর উপস্থিতির রৌদ্রতাপ আমি টের পাই। আমাকে ভালো করার জন্য যদি এগুলির ওপর নির্ভর করি, তবে আমার কৃচ্ছ্রসাধন, অনশন ও প্রার্থনার কোনও দামই নেই, তা জানি। আবার এক অমূল্য দাম আছে যদি সেগুলি, আমি

যেমন আশা করি তেমনই, স্রষ্টার কোলে ক্লান্ত মাথা রাখবার জন্য এক আকুল আত্মার প্রয়াস হয়ে ওঠে।[১৩৯]

মানুষমাত্রেই ভুল করে। স্বীকারোক্তি দ্বারা ভুলগুলিকে আমরা অগ্রগতির সোপানে রূপান্তরিত করি। আবার বিপরীত দিকে, যে তার ভুল ঢাকতে চায়, সে এক জীবন্ত তঞ্চকে পরিণত হয় এবং অতলে তলিয়ে যায়। মানুষ পশুও নয়, ঈশ্বরও নয়। সে ঈশ্বরসৃষ্ট এক প্রাণী যে নিজের স্বর্গীয়ত্ব উপলব্ধি করার প্রয়াস করছে। অনুশোচনা ও আত্মশুদ্ধি হল উপায়। যে মুহূর্তে অনুতাপ করি, বিচ্যুতির জন্য ঈশ্বরের কাছ ক্ষমা চাই, আমরা পাপমুক্ত হই এবং এক নতুন জীবন শুরু হয় আমাদের। যথার্থ অনুতাপ, প্রার্থনার এক আবশ্যিক অঙ্গ।[১৪০]

শুধু মুখের কথায় পাপের নিন্দা করলে কোনও পাপ মুছে ফেলা যায় না।[১৪১]

পাপ বা ভুল আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে তা স্বীকার করলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়।[১৪২]

॥ কুৎসা ॥

যারা জনতার মধ্যে কাজ করে, কুৎসা ও ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া চিরকাল তাদের নিয়তি। বিরোধীকে জয় করার উপায় হল প্রতিরোধ না করা...আমার পরামর্শ, ভিত্তিহীন, অভিসন্ধিমূলক নিন্দা গায়ে মেখো না। নিন্দাকারীকে করুণা করো। সর্বদা আশা ও প্রার্থনা করো যে শেষে তার হৃদ্‌পরিবর্তন ঘটবে...

নিজের কাছে খাঁটি থাকাই যথেষ্ট। তাহলে অনায়াসে "গুজবের নোংরা স্রোতকে বহে" যেতে দেওয়া যায়।[১৪৩]

॥ ধূমপান ॥

তামাক মানবসমাজকে ছারখার করে দিয়েছে। একবার এর ফাঁদে ধরা পড়লে তা কেটে কেউ বেরিয়েছে এমন কমই দেখা যায়...তলস্তয় একে সকল মাদকের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ বলেছেন...

ভারতে মানুষ তামাক ব্যবহার করে ধূমপান, নস্যি ও চিবোবার জন্য...স্বাস্থ্যপ্রেমী, (বা স্বাস্থ্য সন্ধানীরা) যদি এ-সব বদভ্যাসের কোনওটির দাস হয়ে থাকে, তারা দৃঢ়চিত্তে সে দাসত্ববন্ধন কাটাবে। বহু লোক এর একটি, দুটি, বা তিনটিরই নেশাগ্রস্ত। তামাক তাদের কাছে ঘৃণ্য মনে হয় না। যদি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবি, দেখতে পাব, ধোঁয়া ছাড়া, বা সারাদিন মুখে পানজর্দা গুঁজে রাখা বা নস্যির কৌটো খুলে বারবার নস্যি নেওয়া, এতে ভালো কিছু নেই। তিনটেই অতি নোংরা অভ্যাস।[১৪৪]

মদে যেমন, ধূম্রপানেও আমার তেমন ভয়। ধূমপানকে তো কদভ্যাস বলেই মনে করি। এতে বিবেক অসাড় হয়ে যায়। অলক্ষ্যে কাজ করে বলে এটি প্রায়ই মদ্যপানের চেয়েও খারাপ। একবার অভ্যস্ত হলে, এর অভ্যাস ছাড়া কঠিন। এটি ব্যয়সাধ্য কদভ্যাসও বটে। নিশ্বাসকে দুর্গন্ধযুক্ত করে, দাঁতে ছোপ ফেলে, কখনও ক্যানসারও ঘটায়। এ-এক নোংরা নেশা।[১৪৫]

ধূমপান একদিকে মদ্যপানের চেয়েও বড় অভিশাপ। যে এর শিকার, সে সময় থাকতে এর ক্ষতি বোঝে না। একে বর্বরতার চিহ্ন বলে মনে করা হয় না। সভ্য মানুষরা এর তারিফও করে। আমি শুধু বলতে পারি, যে পারে সে ছেড়ে দিক। একটা দৃষ্টান্ত রাখুক।[১৪৬]

।। সমাজসংস্কার ।।

রাজনীতিক সংস্কারের চেয়ে সামাজিক সংস্কার কঠিনতর কাজ—এ আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস। পরিবেশ পূর্বোক্তর জন্য প্রস্তুত, মানুষ এতে আগ্রহী,—আর বিদেশে এক ধারণা আছে যে আত্মশুদ্ধি ব্যতীতই এ কাজ সম্ভব। অন্যদিকে, সমাজসংস্কারে মানুষের আগ্রহ সামান্যই, বিক্ষোভের ফল তেমন চোখে পড়বার মতো নয়, অভিনন্দন ও বক্তৃতার কোনও জায়গা নেই। সমাজসংস্কারকদের তাই কিছুকাল খাটতে হবে, নিজেদের শান্ত রাখবে তারা, এবং দৃশ্যত সামান্য ফল নিয়েই খুশি থাকতে হবে।[১৪৭]

আমার মতে সংস্কারকের অভিযান চালাবার জন্য যা দরকার তার মধ্যে টাকা হল সবার শেষে। তার সামান্য প্রয়োজনের সঠিক অনুপাতে টাকা না-চাইতেই এসে যায়। যে সংস্কারকরা তাদের বিফলতার জন্য আর্থিক সাহায্যের অভাবকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করেছে, সর্বদা তাদের অবিশ্বাস করেছি।

যেখানে উদ্দীপনা, পর্যাপ্ত জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস আছে, আর্থিক সাহায্য সর্বদা এসেছে।[১৪৮]

যাকে নিছক রাজনীতিক কাজ বলা হয়, তাব চেয়ে সমাজ সংস্কারের বা আত্মশুদ্ধির কাজ... আমার কাছে শতগুণে প্রিয়।[১৪৯]

।। পরলোকচর্চা ।।

মৃতদের আত্মার কাছ থেকে কোনও সংবাহন আমি কখনও পাইনি। এমত সংবাহনের সম্ভাবনায় অবিশ্বাস করার কোনও প্রমাণ আমার কাছে নেই। তবে, তেমন যোগাযোগ করা বা করার চেষ্টাকে আমি একেবারেই অনুমোদন করি না। এগুলো প্রবঞ্চনামূলক, এবং কল্পনার ফসল।

এমন সংবাহন-সম্ভাব্যতা ধরে নিলেও, এই কাজ মিডিয়াম ও আত্মা, দুইয়ের পক্ষেই হানিকর। যে আত্মাকে ডাকা হয়, তার পৃথিবী থেকে নিজেকে মুক্ত করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করা উচিত। অথচ তাকে পৃথিবীতে আকর্ষণ করে পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়। আত্মা বিদেহী বলে সব সময়ে শুদ্ধতর নয়। পৃথিবীতে তার যা-যা দুর্বলতা ছিল, তা সে সঙ্গে নিয়ে যায়। তার দেওয়া খবর বা পরামর্শ সত্য বা খাঁটি হবেই এমন কোনও কথা নেই।

পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আত্মা যোগাযোগ করতে চায়, এ কোনও আনন্দের বিষয় নয়। উলটো দিকে, এমন অবৈধ আকর্ষণ থেকে তাকে বিরত করা দরকার। আত্মার ক্ষতিসাধন বিষয়ে এ-টুকুই করা যেতে পারে।

মিডিয়ামের ব্যাপারে আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার অভিজ্ঞতা যাদের বিষয়ে

হয়েছে, তারা পাগল বা দুর্বলমস্তিষ্ক এবং কাজের কাজ করতে অক্ষম। অথচ তেমন যোগাযোগ করে চলে বা ভাবে যে যোগাযোগ করছে। এমন কোনও বন্ধুর কথা মনে করতে পারি না যে অমন যোগাযোগের ফলে কিছুমাত্র উপকার পেয়েছে।[১৫০]

।। ভোটাধিকার ।।

...প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সঙ্গে আমার দঢ়বন্ধন।...একাধিক কারণে এ অধিকার প্রয়োজন। একটি নিয়ামক কারণ হল, এটা আমাকে সকলের যুক্তিসম্মত প্রত্যাশা পূর্ণ করার তৃপ্তি দেয়। শুধু মুসলিমের নয়, তথাকথিত অস্পৃশ্যাদের, ক্রিশ্চানদের, শ্রমিকদের সকল শ্রেণীর। এ আমি ভাবতেও পারি না, যার চরিত্র আছে কিন্তু সম্পদ বা সাক্ষরতা নেই, তার ভোট থাকবে না। যে দিনের পর দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটে, গরিব হবার অপরাধে তার ভোট থাকবে না।[১৫১]

।। কুসংস্কার ।।

আমরা সঠিক জীবনযাপন করতে শুরু করলেই কুসংস্কার ও অন্যান্য অপ্রিয় জিনিস চলে যাবে। আমি বিশ্বাস নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। আমার চিন্তা সঠিক কাজটি করতে বলা নিয়ে। যে-ই সঠিক কাজ করবে তাদের বিশ্বাসও ঠিক হয়ে যাবে।[১৫২]

"প্রাচীন" নাম নিয়ে যা-কিছু চলে আমি তার নির্বিচার, কুসংস্কারগ্রস্ত পূজারী নই। যত প্রাচীনই হোক, যা পাপ বা অনৈতিক তাকে নাকচ করতে কখনও দ্বিধা করিনি। তবে একটু বাধা আছে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ভক্ত। আজ যা আধুনিক তার সব কিছুর জন্যে মানুষের যে পাগলা-দৌড়, তাতে মানুষ তাদের সকল প্রাচীন ঐতিহ্যকে ঘৃণা করে, জীবনে সেগুলি উপেক্ষা করে। এতে আমি আঘাত পাই।[১৫৩]

বিশ্বাস করি, আমার কোনও কুসংস্কার নেই। শুধু প্রাচীন বলেই সত্য, সত্য নয়। প্রাচীন বলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখা প্রয়োজনীয় নয়। জীবনের কিছু মৌল জিনিস আছে যা নিজ-জীবনে প্রয়োগ করা কঠিন বলেই বাতিল করা চলে না।[১৫৪]

।। চিন্তাশক্তি ।।

শুদ্ধ জীবনাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকে আমার কাছে জানুক যে, অপবিত্র কাজের মতো, দেহকে ক্ষয় করতে অপবিত্র চিন্তাও সমান শক্তি ধরে।[১৫৫]

প্রায়ই মানুষ নিজেকে যা ব'লে বিশ্বাস করে, তাই হয়ে দাঁড়ায়। যদি নিজেকে ব'লে চলি, একটি বিশেষ কাজ আমি করতে পারব না, খুবই সম্ভব যে, পরিণামে আমি সে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ব। উলটো দিকে, যদি বিশ্বাস থাকে যে কাজটা আমি করতে পারব, শুরুতে সে ক্ষমতা না থাকলেও নিশ্চয় কাজটা করার ক্ষমতা আমি আয়ত্ত করব।[১৫৬]

যা ভাববে, তাই হবে তুমি। চিন্তা কখনও সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তা কাজের মধ্যে প্রকাশ পায়। কাজ তোমার চিন্তাকে সীমিত করে। দুটির মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি হলে জীবন পূর্ণ ও স্বাভাবিক হয়।[১৫৭]

॥ তরুণ ॥

দেশের তরুণরাই আমার সব আশা ভরসা। ওদের মধ্যে যারা বদভ্যাসের শিকার...তারা স্বভাবগতভাবে বদ নয়। অসহায়ভাবে, কোনও চিন্তা না ক'রে ওরা সেদিকে আকর্ষিত হয়। এতে নিজেদের এবং সমাজের কী ক্ষতি করা হচ্ছে তা ওদের উপলব্ধি করা উচিত। ওদের এটাও বোঝা উচিত, দেশকে আমূল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এক কঠোর নিয়মানুবর্তী জীবন, আর কিছু নয়।[১৫৮]

যথেষ্ট উদ্বেগে আমি লক্ষ্য করছি, ফ্যাশনের উন্মাদনা কীভাবে উচ্চশ্রেণীর তরুণদের গ্রাস করেছে। পশ্চিমের এই সম্মোহনী চমকের দাস হয়ে ওরা দরিদ্রতম দেশবাসী, যারা এ সব ফ্যাশান কোনওদিন করতে পারবে না, তাদের থেকে নিজেদের কীভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তা ওরা সামান্যই জানে। সহজসরলতার বিনিময়ে এই রাংতার চাকচিক্য কেনা...সে হবে এক বিরাট জাতীয় সর্বনাশ...এক বিশাল জাতীয় ট্র্যাজিডি...একথা আমি মনে না করে পারি না।[১৫৯]

সূত্র-সংকেত
সূত্র-নির্দেশ
জীবনপঞ্জী
শব্দসূচী
নির্দেশিকা

সূত্র-সংকেত

অ M.K. Gandhi, *An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth.* গুজরাতি থেকে মহাদেব দেশাই-কৃত অনুবাদ। আহমেদাবাদ: নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ১৯২৭ ও ১৯২৯। দু-খণ্ডে। ১৯৫৯-র সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

অবাপ *Amrita Bazar Patrika.* কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা।

আঅঅ্যা M.K. Gandhi, *Ashram Observances in Action.* গুজরাতি থেকে ভি.জি. দেশাই-কৃত অনুবাদ। আহমেদাবাদ: নবজীবন, ১৯৫৫।

অ্যাগ্রে Dilip Kumar Roy. *Among The Great.* সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-এর ভূমিকা সহ। বোম্বাই: নালন্দা পাবলিকেশনস্, ১৯৪৫। জয়কো পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯৫০-এ প্রকাশিত সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইই *Young India, 1919-32.* গান্ধীজির তত্ত্বাবধানে ৭মে ১৯১৯-এ বোম্বাই থেকে ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে, পরে ৮ অকটোবর ১৯১৯ গান্ধীজির সম্পাদনায় আহমেদাবাদ থেকে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়।

ইকেস্ব W.P. Kabadi, Ed., *India's Case For Swaraj.* বোম্বাই: যশোদানন্দন অ্যাণ্ড কোং, ১৯৩২।

এফা Pyarelal, *The Epic Fast.* আহমেদাবাদ : মোহনলাল মগনলাল ভাট, ১৯৩২।

উগাসি Mahadev Desai, Ed. *With Gandhiji in Ceylon.* মাদ্রাজ : এস, গণেশন, ১৯২৮।

এআ *Asia and the Americas.* নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা।

এরি Mahatma Gandhi, *Ethical Religion.* হিন্দি থেকে বি. রামা আয়ার-কৃত অনুবাদ। মাদ্রাজ: এস. গণেশন, ১৯৩০।

কপ্র M.K. Gandhi, *Constructive Programme: Its Meaning and Place. আহমেদাবাদ: নবজীবন, ১৯৪১। ১৯৪৮-এর সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।*

কিহে — *M.K. Gandhi, Key to Health.* আহ্‌মেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৪৮।

করেস — *Gandhiji's Correspondence with the Government, 1942-44.* আহ্‌মেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৪৫।

কংগ্রেস — *Report of the Commission Appointed by the Punjab Sub-Committee of the Indian National Congress.* লাহোর : কে. সান্তানাম, ১৯২০।

গাইভি — Mahadev Desai, *Gandhiji in Indian Villages.* মাদ্রাজ : এস. গণেশন, ১৯২৭।

গান্ধী — J.J. Doke, *M.K. Gandhi: An Indian Patriot in South Africa.* লর্ড অ্যামপ্টহিল-এর ভূমিকা। লণ্ডন : দি লণ্ডন ইনডিয়ান ক্রনিকল, ১৯০৯।

টাই — *The Times of India.* বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র।

টুইন — Pyarelal, *Towards New Horizons.* 'মহাত্মা গান্ধী : দ লাস্ট ফেজ' থেকে পুনর্মুদ্রণ। আহ্‌মেদাবাদ ; নবজীবন, ১৯৫৯।

নব — *Navajiban. 1919 1931.* গান্ধীজি-সম্পাদিত আহ্‌মেদাবাদ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক গুজরাতি পত্রিকা, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৯-এ প্রথম সংখ্যা।

নভা — M.K. Gandhi, *Non-Violent Way to World Peace*, Comp. by R.K. Prabhu. আহ্‌মেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৫৯।

বক্র — *The Bombay Chronicle.* বোম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

মই — M.K. Gandhi, *Medium of Instructions.* ভারতন্ কুমারাপ্পা-সম্পাদিত। আহ্‌মেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৫৪।

মগাই — C.F. Andrews, *Mahatma Gandhi's Ideas.* লণ্ডন : জর্জ অ্যালেন, ১৯২৯।

মন্দির — M.K. Gandhi, *From Yeravada Mandir: Ashram Observances.* ভি. জি. দেশাই-কৃত অনুবাদ। আহ্‌মেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৩৩। ১৯৫৭-র সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

মরি — *Modern Review* রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)-সম্পাদিত কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা।

মহাত্মা — D.G. Tendulkar, *Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi.* বোম্বাই : বিট্ঠলভাই মাভেরি ও ডি.জি. তেন্ডুলকর, ১৯৫১-৫৪। ৮ খণ্ডে।

মানভা	M.K. Gandhi, *My Non-Violence.* শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। আহমেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৬০।

মাসো	M.K. Gandhi, *My Socialism.* আর. কে. প্রভু-সংকলিত। আহমেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৫৯।

লাফে	Pyarelal, *Mahatma Gandhi: The Last Phase.* আহমেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৫৬ ও ১৯৫৮। দু-খণ্ডে।

লিডার	The Leader, এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

সসা	M.K. Gandhi, *Satyagraha in South Africa.* ভি.জি. দেশাই-অনূদিত। আহমেদাবাদ : নবজীবন, ১৯২৮। ১৯৫০-এর সংস্করণ ব্যবহৃত।

সলি	*Satyagraha Leaflets.* বোম্বাই থেকে ১৯১৯-এর মার্চ-মে সময়কালে প্রকাশিত ইস্তেহার।

সবর	*Sabarmati:* ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশপস্-এর বার্ষিক সভার রিপোর্ট, ১৯২৯।

স্পিরা	*Speeches and Writings of Mahatma Gandhi.* মাদ্রাজ : জি. এ. নাটেশন অ্যাণ্ড কোং, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৩৩।

স্পেক	The Spectator: লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।

হরি	*Harijan* (1933-56). পুনের হরিজন সেবক সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত, গান্ধীজি প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৯৪২ থেকে নবজীবন ট্রাস্ট ছিল পত্রিকার প্রকাশক। ১৯৪০-এ 'সত্যাগ্রহ'-র সময়ে বন্ধ হয়ে যায়, পরে ১৯৪২ থেকে ফের শুরু হয়। কিন্তু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় বন্ধ থাকে। ১৯৪৬ থেকে পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে।

হিন্দু	*The Hindu,* মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

হিস্ব	M.K. Gandhi, *Hind Swaraj or Indian Home Rule.* আহমেদাবাদ : নবজীবন, ১৯৩৮। ১৯৫৮-র সংস্করণ ব্যবহৃত।

হিস্ট্যা	*The Hindusthan Standard.* কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

সূত্র-নির্দেশ

১. নিজের প্রসঙ্গে

॥ ১. না সন্ত, না পাপী ॥

১. ইই, ১২.৫.১৯২০, পৃ ২
২.—, ২০.১.১৯২৭, পৃ ২১
৩. —, ১৪.৮.১৯২৪, পৃ ২৬৭
৪. অ, পৃ ৩৩৬
৫. হরি, ৯.৮.১৯৪২, পৃ ২৬৪
৬. —, ১০.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৭২
৭. —, ১৫.৪.১৯৩৯, পৃ ৮৬
৮. ইই, ১.১০.১৯২৫, পৃ ৩৩৮
৯. —, ৯.৭.১৯৩১, পৃ ১৭৫
১০. হরি, ২.১১.১৯৩৪, পৃ ৩০৩
১১. —, ৩.১০.১৯৩৬, পৃ ২৬৮
১২. ইই, ১.১০. ১৯২৫, পৃ ৩৩৮
১৩. হরি, ৩.১০.১৯৩৬, পৃ ২৬৮-৯
১৪. অ. পৃ ৩৭১
১৫. ইই, ৩.৯.১৯২৬, পৃ ৩৩৬
১৬. —, ১৬.১০.১৯৩০, পৃ ২
১৭.—, ১২.৩.১৯৩১, পৃ ৩২
১৮. —, ৭.৫.১৯২৫, পৃ ১৬৩
১৯. হরি, ৯.৭.১৯৩৮, পৃ ১৭৬
২০. অ, পৃ ২২০
২১. ইকেম্ব, পৃ ২৪৫
২২. অ, পৃ ১১০
২৩. হরি, ১১.৫.১৯৩৫, পৃ ৯৯
২৪. ইই, ৩.৪.১৯২৪, পৃ ১১৪
২৫. হরি, ২.৩.১৯৩৪, পৃ ২৪
২৬. ইই, ২৭.৫.১৯২৬, পৃ ১৯৩
২৭.—, ১৩.৬.১৯২৯, পৃ ১৯৩
২৮. ইই, ২৫.৯.১৯২৪, পৃ ৩১৩
২৯. ইই, , ৩.১২.১৯২৫, পৃ ৪২২
৩০. এফা, পৃ ১৩২
৩১. হরি, ১৭.১১.১৯৩৩, পৃ ৬
৩২. —, ১.৭.১৯৩৯, পৃ ১৮১
৩৩. ইই, ৬.৫.১৯২৬, পৃ ১৬৪
৩৪. এফা, পৃ ১৩৩
৩৫. হরি, ১৮.৪.১৯৩৬, পৃ ৭৭
৩৬. ইই, ১০.২.১৯২৭, পৃ ৪৪
৩৭. —, ১০.৩.১৯২৭, পৃ ৮০
৩৮. —, ১২.৩.১৯৩০, পৃ ৮৯-৯০
৩৯. হরি, ১১.৩.১৯৩৯, পৃ ৪৭
৪০. ইই, ১৭.৩.১৯২৭,পৃ ৮২
৪১. তদেব, পৃ ৮৬
৪২. —, ১২.৩.১৯৩০, পৃ ৯৩
৪৩. হরি, ১৭.১১.১৯৩৩, পৃ ৪

॥ ২. আমার মহাত্মাপর্ব ॥

৪৪. ইই ২৭.১০.১৯২১, পৃ ৩৪২
৪৫. অ, পৃ (চোদ্দ)
৪৬. ইই ২৫.২.১৯২৬, পৃ ৭৮-৭৯
৪৭. —, ২৬.৪.১৯২৮ পৃ ১৩০
৪৮.—, ১.১১.১৯২৮ পৃ ৩৬১
৪৯. —, ২.৩.১৯২২, পৃ ১৩৫
৫০. —, ২১.৫.১৯২৫ পৃ ১৭৬
৫১.—,১৭.৩.১৯২৭, পৃ ৮৬
৫২. ইই, ১২.৬.১৯২৪, পৃ .১৯৭
৫৩. হরি, ১১.২.১৯৩৯, পৃ ১
৫৪. ইই, ১৩.৭.১৯২১ পৃ ২২৪
৫৫.—, ১৬.২.১৯২২, পৃ ১০২
৫৬. —, ১১.২.১৯২৪,পৃ ১৯৮

৫৭. ইই, ৬.৫.১৯২৬, পৃ ১৬৪
৫৮. —, ৩.৪.১৯২৪, পৃ ১১৪
৫৯. হরি, ৩.১০.১৯৩৬, পৃ ২৬৯
৬০. —, ৮.১০.১৯৩৮ পৃ ২৮৫
৬১. ইই, ২৩.৬.১৯২০, পৃ ৩
৬২.—, ১৩.১১.১৯২৪ পৃ ৩৭৮
৬৩. হরি ১৫.৪.১৯৩৯, পৃ ৮৬
৬৪. ইই, ২.৩.১৯২২, পৃ ১৩৫
৬৫. মগাই, পৃ ২৪১
৬৬. ইই, ২৬.১.১৯২২, পৃ ৪৯
৬৭. —, ২৬.৩.১৯২৫, পৃ ১১২
৬৮. —, ২৭.১০.১৯২১, পৃ ৩৪২
৬৯. এফা, পৃ ১১৪
৭০. ইই, ২.৪.১৯৩১, পৃ ৫৪-৫৫
৭১. তদেব, পৃ ৬০
৭২. হরি, ২৬.৬.১৯৩৪, পৃ ১৫৬
৭৩. —, ১১.৩.১৯৩৯, পৃ ৪৪
৭৪. বক্র, ৯.৮.১৯৪২
৭৫. হরি ৯.৬.১৯৪৬, পৃ ১৭০
৭৬. লাফে : ১ম, পৃ ৫৬২
৭৭. হরি, ২৭.৪.১৯৪৭, পৃ ১২৭
৭৮. ইই, ১৫.৯.১৯২০, পৃ ৬
৭৯. —,২.৩.১৯২২, পৃ ১৪০
৮০. হরি, ১১.৫.১৯৩৫, পৃ ৯৮
৮১. ইই, ১৮.৮.১৯২১, পৃ ২৩৮
৮২. —, ১৩.৮.১৯২৫, পৃ ২৭৯-৮০
৮৩. হরি, ২৫.৭.১৯৩৬, পৃ ১৮৫

॥ ৩. পথ আমি চিনি ॥
৮৪. ইই, ১৭.৬.১৯২৬, পৃ ২১৫
৮৫. —, ১৭.১১.১৯২১, পৃ ৩৬৮
৮৬. তদেব, পৃ ৩৭৭
৮৭. —, ৪.১২.১৯২৪, পৃ ৩৯৮
৮৮. হিন্দু, ১৮.২.১৯৩৩, পৃ ৪
৮৯. —, ১৪.৫.১৯৩৮, পৃ ১১০
৯০. —, ১০.১০.১৯৪০, পৃ ৩৩০
৯১. ইই, ১১.১২.১৯২৪, পৃ ৪০৬
৯২. —, ১৯.৩.১৯৩১, পৃ ৪৩
৯৩. —, ৯.৪.১৯২৪, পৃ ১২৬
৯৪. —, ৩.১০.১৯২৫, পৃ ৩৪৪
৯৫. —,২১.৪.১৯২৭, পৃ ১২৮
৯৬. স্পিরা, পৃ ৫৩১
৯৭. তদেব, পৃ ৫৩২
৯৮. মানভা, পৃ ২০১-২
৯৯. ইই, ৩.৭.১৯২৪, পৃ ২১৮
১০০. হরি, ২৫.১.১৯৩৫, পৃ ৩৯৯
১০১ ইই, ২৬.১২.১৯২৪, পৃ ৪৩০
১০২. —,৪.৬.১৯২৫, পৃ ১৯৩
১০৩. হরি, ১১.৩.১৯৩৯, পৃ ৪৬
১০৪. —, ২২.৪.১৯৩৯, পৃ ১০০
১০৫. ইই, ১.১.১৯২৫, পৃ ৮
১০৬. —, ১৩.২.১৯৩০, পৃ ৫২
১০৭. হরি, ২৩.৭.১৯৩৮, পৃ ১৯৩
১০৮. —, ৭.৯.১৯৩৫,পৃ ২৩৪
১০৯. হিস্ট্যা, ৬.৮.১৯৪৪
১১০. ইই, ৪.৪.১৯২৯, পৃ ১০৭

॥ ৪. আমার জীবনব্রত ॥
১১১. ইই, ১১.৮.১৯২০, পৃ ৩
১১২. —, ৯.২.১৯২২, পৃ ৮৫
১১৩. —, ২৩.৩.১৯২২, পৃ ১৬৬
১১৪. —, ২০.১১.১৯২৪, পৃ ৩৮২
১১৫. —, ২.৭.১৯২৫, পৃ ২৩২
১১৬. —,৪.৬.১৯২৫, পৃ ১৯১
১১৭. —,২১.১০.১৯২৬, পৃ ৩৬৪
১১৮. হরি, ২.৩.১৯৪০, পৃ ২৩
১১৯. —,১.৫.১৯৩৭, পৃ ৯৪
১২০. —,২৮.৬.১৯৪২, পৃ ২০১
১২১. —, ২১.৭.১৯৪০, পৃ ২১১
১২২. ইই, ২৫.৮.১৯২১, পৃ ২৬৭
১২৩. —,২.১২.১৯২৬, পৃ ৪১৯
১২৪. হরি, ২৮.৩.১৯৩৬, পৃ ৪৯

১২৫. হরি, ১৭.১২,১৯৩৮, পৃ ৩৮৫
১২৬. —, ১৩.৫.১৯৩৯, পৃ ১২১
১২৭. তদেব, পৃ ১২২
১২৮. হরি, ১৫.৭.১৯৩৯, পৃ ১৯৭
১২৯ —,২.৩.১৯৪০, পৃ ২৩
১৩০ —,২.১১.১৯৪৭, পৃ ৩৮৯
১৩১. ইই, ১১.৮.১৯২০, পৃ ৩-৪
১৩২. —, ১৭.৯.১৯২৫, পৃ ৩২০
১৩৩.—,৪.৪.১৯২৯, পৃ ১০৭
১৩৪. হরি, ২৬.১.১৯৩৪, পৃ ৮
১৩৫. —,২৩.৭.১৯৩৮, পৃ ১৯৩
১৩৬. বক্র, ৯.৮.১৯৪২
১৩৭. ইই, ২০.১১.১৯২৪, পৃ ৩৮২
১৩৮. হরি, ২৫.১.১৯২৪, পৃ ১৫
১৩৯. ইই, ১৫.১২.১৯২৭, পৃ ৪২৪
১৪০. হরি, ১১.২.১৯৩৯, পৃ ৮
১৪১. মহাত্মা, পৃ ৪১৭
১৪২. ইই ২.৭.১৯২৫, পৃ ২৩২
১৪৩. মহাত্মা, ৮. পৃ ২৩

॥ ৫. অন্তরের আহ্বান ॥
১৪৪. লিডার, ২৫.১২.১৯১৬
১৪৫. ইই, ৪.৮.১৯২০, পৃ ৩
১৪৬. এফা, পৃ ৩৪
১৪৭. ইই, ৩.১২.১৯২৫, পৃ ৪২২
১৪৮. —,২.৪.১৯৩১, পৃ ৬০
১৪৯. বক্র, ১৮.১১.১৯৩২
১৫০. মহাত্মা, ৩, পৃ ২২৯
১৫১. হরি, ১৮.৩.১৯৩৩, পৃ ৮
১৫২. —,৬.৫.১৯৩৩, পৃ ৪
১৫৩. —,৮.৭.১৯৩৩, পৃ ৪
১৫৪. —, ১১.৩.১৯৩৯, পৃ ৪৬

॥ ৬. আমার উপবাস ॥
১৫৫. ইই, ২৫.৯.১৯২৪, পৃ ৩১৯
১৫৬. —, ৩.১২.১৯২৫, পৃ ৪২২
১৫৭. হরি, ২৪.৮.১৯৩৪, পৃ ২২৩
১৫৮. —, ১৫.৬.১৯৪৭, পৃ ১৯৪
১৫৯. ইই, ২৪.৩.১৯২০, পৃ ১
১৬০. হরি, ১৬.২.১৯৩৩, পৃ ২
১৬১. —,১৫.৪.১৯৩৩, পৃ ৪
১৬২. —, ১১.৪.১৯৩৯, পৃ ৪৬
১৬৩. ইই, ১৬.২.১৯২২, পৃ ১০৩
১৬৪. —,২৩.১০.১৯২৪, পৃ ৩৫৪
১৬৫. হরি, ২.১১.১৯৩৫, পৃ ২৯৯
১৬৬. —, ১০.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৭৩
১৬৭. ইই, ১৭.১২.১৯২৫, পৃ ৪৪২
১৬৮. —, ১.৫.১৯২৪, পৃ ১৪৫
১৬৯. হরি, ৯.৯.১৯৩৩, পৃ ৫
১৭০. হরি, ১১.৩.১৯৩৯, পৃ ৪৬

॥ ৭. আমার অসঙ্গতি ॥
১৭১. ইই, ২১.৭.১৯২১, পৃ ২২৮
১৭২. —, ১৩.২.১৯৩০, পৃ ৫২
১৭৩. —, ১৬.৪.১৯৩১, পৃ ৭৭
১৭৪. হরি, ২৯.৪.১৯৩৩, পৃ ২
১৭৫. —, ২৮.৯.১৯৩৪, পৃ ২৬০
১৭৬. —, ৩০.৯.১৯৩৯, পৃ ২৮৮
১৭৭. ইই, ১২.৩.১৯২৫, পৃ ৯১
১৭৮. হরি, ৮.১২.১৯৩৩, পৃ ৮
১৭৯. ইই, ১৪.৭.১৯২০, পৃ ৪
১৮০. অ. ১০৭
১৮১. হরি, ৫.৯.১৯৩৬, পৃ ২৩৭
১৮২. তদেব, পৃ ২৩৮

॥ ৮. আমার লেখালেখি ॥
১৮৩. অ, পৃ ৪৫
১৮৪. তদেব, পৃ ২১১

১৮৫. সলি, ৫ সংখ্যা,১৭.৯.১৯১৯
১৮৬. ইই, ২.৭.১৯২৫, পৃ ২৩২
১৮৭. অ, পৃ ২০৬
১৮৮. হরি, ১৮.৮.১৯৪৬, পৃ ২৭০
১৮৯. —, ১.৫.১৯৪৭, পৃ ৯৩

২. সত্য

॥ ৯. সত্য সুসমাচার ॥

১. ইই, ৩১.১২.১৯৩১, পৃ ৪২৮
২. —, ১৮.৮.১৯২৭, পৃ ২৬৫
৩. অ, পৃ (পনেরো)
৪. তদেব, পৃ ১৫৯
৫. তদেব, পৃ ১৮৪
৬. তদেব, পৃ ২৪৫-৫৫
৭. তদেব, পৃ ৩৭০-৭১
৮. ইই, ৭.২.১৯২৯, পৃ ৪২
৯. তদেব
১০. হরি, ২৪.১১.১৯৩৩, পৃ ৬
১১. তদেব
১২. হরি, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৭০
১৩. —, ২.৬.১৯৪৬, পৃ ১৬৭
১৪. ইই, ২০.৮.১৯২৫, পৃ ২৮৫-৮৬
১৫. অ, পৃ (পনেরো)
১৬. তদেব, পৃ (ষোল)
১৭. এফা, পৃ ৭১
১৮. হরি, ২৫.৫.১৯৩৫, পৃ ১১৫
১৯. —, ১৫.৪.১৯৩৯, পৃ ৮৭
২০. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৭০
২১. ইই, ২১.৪.১৯২৭, পৃ ১২৮
২২. —, ১১.৮.১৯২৭, পৃ ২৫০
২৩. —, ৩.১.১৯২৯, পৃ ৬
২৪. তদেব
২৫. হরি, ১০.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৮৯
২৬. —, ২২.৬.১৯৩৫, পৃ ১৪৫
২৭. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৪৩
২৮. —, ২৫.৮.১৯৪৬, পৃ ২৮৪
২৯. —, ২২.৯.১৯৪৬,পৃ ৩২২
৩০. হরি, ২১.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৭৩

॥ ১০. সত্যই ঈশ্বর ॥

৩১ ইই, ১১.১০.১৯২৮, পৃ ৩৪০-৪১
৩২ —,২৩.২.১৯২২. পৃ ১১২
৩৩. —,৯.১০.১৯২৪, পৃ ৩২৯
৩৪. অ, পৃ ২০৬
৩৫. হরি, ১৪.৫.১৯৩৮, পৃ ১০৯
৩৬. ইই, ২৫.৫.১৯২১, পৃ ১৬১-৬২
৩৭. হরি, ৮.১০.১৯৩৮, পৃ ২৮৫
৩৮. ইই, ৫.৩.১৯২৫, পৃ ৮১
৩৯. স্পিরা, পৃ ১০৬৯
৪০. ইই, ৩১.১২.১৯৩১, পৃ ৪২৭-২৮
৪১. হরি, ২৫.৫.১৯৩৫,পৃ ১১৫
৪২. —, ১৪.১১.১৯৩৬, পৃ ৩১৪
৪৩. ইই, ৬.৮.১৯২৫, পৃ ২৭৫
৪৪. —, ৩.১২.২৫, পৃ ৪২২
৪৫. —,৪.৮.১৯২৭, পৃ ২৪৭-৪৮
৪৬. হরি, ২৯.৮.১৯৩৬, পৃ ২২৬
৪৭. —, ১১.৩.১৯৩৯, পৃ ৪৪
৪৮. ইই, ৩.৯.১৯৩১, পৃ ২৪৭
৪৯. —, ১৯.১১.১৯৩১, পৃ ৩৬১
৫০. হরি, ১.৬.১৯৩৫, পৃ ১২৩
৫১. —, ১০.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৭৩
৫২. —, ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৯৫
৫৩. ইই, ১৭.১১.১৯২১, পৃ ৩৬৮
৫৪. অ, পৃ (চোদ্দ)
৫৫. তদেব, পৃ (ষোলো)
৫৬. হরি, ১৩.৬.১৯৩৬, পৃ ১৪০-৪১

॥ ১১. সত্য ও সৌন্দর্য ॥

৫৭. ইই, ১৩.১১.১৯২৪, পৃ ৩৭৭
৫৮. তদেব

৫৯. তদেব
৬০. হরি, ২০.১১.১৯২৪, পৃ ৩৬৮
৬১. তদেব
৬২. হরি, ১৪.১১.১৯৩৬, পৃ ৩১৫
৬৩. ইই, ২৭.৫.১৯২৬, পৃ ১৯৬
৬৪. —, ১৪.৩.১৯২৯, পৃ ৮৬
৬৫. —, ১১.৮.১৯২১, পৃ ২৫৩
৬৬. অ, পৃ ২২৮
৬৭. অ্যাগ্রে, পৃ ৬৫-৬৬
৬৮. হরি, ১৯.২.১৯৩৮, পৃ ১০
৬৯. ইই, ১৩.১১.১৯২৪, পৃ ৩৭৭
৭০. তদেব
৭১. তদেব
৭২. হরি, ১৩.১১.১৯২৪, পৃ ৩৭৮
৭৩. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৬৭

৩. ভয়হীনতা

॥ ১২. নির্ভীকতা সুসমাচার ॥
১. ইই, ১৩.১০.১৯২১, পৃ ৩২৩
২. —, ২.৯.১৯২৬, পৃ ৩০৮
৩ —, ১১.৯.১৯৩০, পৃ ১-২
৪. তদেব, পৃ ২
৫. তদেব
৬. স্পিরা, পৃ ১৩০
৭. হরি, ২.৬.১৯৪৬, পৃ ১৬০
৮. —, ৩.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৮৮
৯. —,৫.১.১৯৪৭.পৃ ৪৭৭
১০ ইই, ২০.১০.১৯২১, পৃ ৩৩৫
১১. স্পিরা, পৃ ৩০৩
১২. ইই, ২.৪.১৯৩১, পৃ ৫৪
১৩. তদেব, পৃ ৫৮
১৪. হরি, ১৫.১০.১৯৩৮, পৃ ২৯১
১৫. —, ২৬.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৮২

৪.বিশ্বাস

॥ ১৩. বিশ্বাস-বিষয়ক সুসমাচার ॥
১. ইই, ২৪.৯.১৯২৫, পৃ ৩৩১
২. —, ১৪.৪.১৯২৭, পৃ ১২০
৩. হরি, ২৬.১.১৯৩৪, পৃ ৮
৪. ইই, ১৪.১০.১৯২৬, পৃ ৩৫৯
৫. তদেব
৬. ইই, ২৬.৯.১৯২৯, পৃ ৩১৬
৭. হরি, ৬.৩.১৯৩৭, পৃ ২৬
৮. ইই, ১২.৫.১৯২০, পৃ ২
৯. গান্ধী, পৃ ৭
১০. ইই, ১১.৮.১৯২০, পৃ ৪
১১. —, ১.৬.১৯২১, পৃ ১৭১
১২. —, ২৩.২.১৯২২, পৃ ১২৩
১৩. স্পিরা, পৃ ৩৭৭-৭৮
১৪. ইই, ২৭.১১.১৯২৪, পৃ ৩৯১
১৫. হরি, ১.৩.১৯৩৫, পৃ ২৪
১৬. —, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৯৭
১৭ —, ৯.৩.১৯৩৪, পৃ ২৯
১৮. —, ১২.৯.১৯৩৬, পৃ ২৪৭
১৯. —, ২৯.৩.১৯৩৫, পৃ ৫১
২০ —, ২৩.১২.১৯৩৯, পৃ ৩৭৮
২১. হিন্দু, ৪৯
২২. তদেব, পৃ ৫০
২৩. ইই, ৩১.৭.১৯২৪, পৃ ২৫৪
২৪. ইই, ২৫.৯.১৯২৪, পৃ ৩১৮
২৫. —,২২.৯.১৯২৭, পৃ ৩১৯
২৬. —, ২২.১২.১৯২৭, পৃ ৪২৫
২৭—, ১৯.১.১৯২৮, পৃ ২২
২৮. হরি, ২.২.১৯৩৪, পৃ ৮
২৯. —, ১৬.২.১৯৩৪, পৃ ৫-৬
৩০. —, ৮.৬.১৯৪০, পৃ ১৫৭
৩১. ইই, ১৯.১.১৯২১, পৃ ২২
৩২. —, ৬.১০.১৯২১, পৃ ৩১৭
৩৩. —, ২৭.৮.১৯২৫, পৃ ২৯৩

৩৪. **ইই,** ২২.১২.১৯২৭, পৃ ৪২৬
৩৫. তদেব
৩৬. **হরি,** ২২.১২.১৯৩৩, পৃ ৩
৩৭. —, ১৪.৩.১৯৩৬, পৃ ৩৬
৩৮. **ইই,** ২৫.৮.১৯২৭, পৃ ২৭২
৩৯. **হরি,** ২৩.৩.১৯৪৭, পৃ ৭৬
৪০ **ইই,** ৬.১২.১৯২৮, পৃ ৪০৬

॥ ১৪. **ঈশ্বর কী** ॥

৪১. **হরি,** ১৪.৪.১৯৪৬, পৃ ৮০
৪২. তদেব
৪৩. **হরি,** ২৩.৩.১৯৪০, পৃ ৫৫
৪৪. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৩
৪৫. —,৩.৮.১৯৪৭, পৃ ২৬২
৪৬. —,২৪.৮.১৯৪৭, পৃ ২৮৫
৪৭. —, ২৩.১১.১৯৪৭, পৃ ৪৩২
৪৮. —, ২৫.১.১৯৪৮, পৃ ৫৩৫
৪৯. —, ১৬.৬.১৯৪৬.পৃ ১৮৩
৫০. —, ৪.৮:১৯৪৬, পৃ ২৪৯
৫১. —,৭.৪.১৯৪৬,পৃ ৭০
৫২. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১০৯
৫৩. —,৩.৮.১৯৪৭, পৃ ২৬২
৫৪. —, ২৩.৬.১৯৪৬, পৃ ১৮৬-৭
৫৫. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১১৮
৫৬. —, ৯.১১.১৯৪৭, পৃ ৪০৬
৫৭. তদেব
৫৮. **হরি,** ৭.৯.১৯৩৫, পৃ ২৩৩
৫৯. **ইই,** ১১.১০.১৯২৮, পৃ ৩৪১
৬০. **হরি,** ২০.২.১৯৩৭, পৃ ৯
৬১. —, ২৪.২.১৯৪৬.পৃ ২৪
৬২. —, ২২৮.৬.১৯৪৬, পৃ ১১১
৬৩. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৭৫-৭৬
৬৪. —, ১৯.৫.১৯৪৬, পৃ ১৩৬
৬৫. —, ১০.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৮৯
৬৬. **ইই,** ৬.৮.১৯৩১, পৃ ২০৬
৬৭. —, ১৪.৪.১৯২৭, পৃ ১২০
৬৮. **অ,** ৩১৭
৬৯. **হরি,** ১৬.২.১৯৩৪, পৃ ৪
৭০. —, ১৭.৪.১৯৪৭, পৃ ৮৭
৭১. **হরি,** ২.২.১৯৩৪, পৃ ১
৭২. **তদেব,** পৃ ৫
৭৩. **হরি,** ৮.৬.১৯৩৫, পৃ ১৩২
৭৪. **ইই,** ২৪.৯.১৯২৫, পৃ ৩৩১
৭৫. —, ২১.১.১৯২৬, পৃ ৩০
৭৬. **হরি,** ১৮.৮.১৯৪৬, পৃ ২৬৭

॥ ১৫. রামনাম ॥

৭৭. **হরি,** ১৮.৩.১৯৩৩, পৃ ৬
৭৮. —, ১৭.৮.১৯৩৪, পৃ ২১৩
৭৯. —,২৪.৩.১৯৪৬, পৃ ৫৬
৮০. —, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১১১
৮১. —,২.৬.১৯৪৬, পৃ ১৫৮
৮২. —, ১৯.৫.১৯৪৬, পৃ ১৪৮
৮৩. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৬৯
৮৪. তদেব
৮৫. **হরি,** ৯.৬.১৯৪৬, পৃ ১৭১
৮৬. —, ১.৯.১৯৪৬, পৃ ২৮৬
৮৭. —, ২৩.৬.১৯৪৬, পৃ ১৮৬

॥ ১৬. **আমার আত্মার অন্নজল প্রার্থনা**

৮৮. **ইই,** ৮.১২.১৯২৭, পৃ ৪১৩
৮৯. —, ২৫.৯.১৯২৪, পৃ ৩১৩
৯০. **হরি,** ১০.৪.১৯৪৭,পৃ ১১৮
৯১. **ইই,** ২৪.৯.১৯৩১, পৃ ২৭৪
৯২. —,৪.৪.১৯২৯, পৃ ১১১
৯৩. **হরি,** ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৯৫
৯৪. **অ,** পৃ ৫১.৫২
৯৫. **ইই,** ২৩.১.১৯৩০, পৃ ২৫
৯৬. **হরি,** ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১১২
৯৭. **ইই,** ২০.১২.১৯২৮, পৃ ৪২০
৯৮. **হরি** ১৪,৪.১৯৪৬, পৃ ৮০
৯৯. —, ৫.৫.১৯৫৬, পৃ ১১৩

১০০. ইই, ১৫.১২.১৯২৭, পৃ ৪২৪
১০১. হরি, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১০৯
১০২. ইই, ২৩.১১.১৯৩০, পৃ ২৫
১০৩. তদেব
১০৪. হরি, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১০৯
১০৫. —, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১১৩
১০৬. —, ২৮.৪.১৯৪৬,পৃ ১১১
১০৭. —, ১৮.৮.১৯৪৬, পৃ ২৬৫
১০৮. তদেব পৃ ২৬৭
১০৯. ইই, ৬.৮.১৯২৫,
পৃ ২৭৪-৭৫
১১০. অ, পৃ ৪৫
১১১ হরি, ২৪.৬.১৯৩৩, পৃ ৫
১১২. —, ১০.১২.১৯৩৮,
পৃ ৩২৩-২৪
১১৩. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১১৮
১১৪. ইই, ২২.৯.১৯২৭, পৃ ৩২১
১১৫. —, ২০.১২.১৯২৯, পৃ ৪২০
১১৬. তদেব
১১৭. ইই, ২৩.১.১৯৩০, পৃ ২৬
১১৮. হরি, ১৪.৪.১৯৪৬, পৃ ৮০
১১৯ —, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১০৯
১২০ —, ২৯.৬.১৯৪৬, পৃ ২০৯
১২১. তদেব, পৃ ২১৫

॥ ১৭. আমার হিন্দুধর্ম, আমার একার নয় ॥

১২২. স্পিরা, পৃ ৩২৯
১২৩. ইই, ৬.১০.১৯২১,পৃ ৩১৮
১২৪. তদেব
১২৫. ইই, ২.৭.১৯২৬, পৃ ৩০৮
১২৬. ইই, ২২.১২.১৯২৭, পৃ ৪২৬
১২৭. হরি ২৬.১২.১৯৩৬, পৃ ৩৬৫
১২৮. —, ৩০.৪.১৯৩৮, পৃ ৯৯
১২৯. ইই, ১৯.১.১৯২৮,পৃ ২২
১৩০. হরি, ২৪.৩.১৯২৯, পৃ ৯৫
১৩১. ইই, ২৫.৮.১৯২০, পৃ ২
১৩২. —, ৬.৮.১৯২৫, পৃ ২৭৪
১৩৩. —, ১৩.১১.১৯৩০, পৃ ১
১৩৪. হরি, ২৪.৮.১৯৩৪, পৃ ২২২
১৩৫. ইই, ২৪.১১.১৯২৭, পৃ ৩৯২-৯৩
১৩৬. তদেব, পৃ ৩৯৩
১৩৭. ইই, ৮.৯.১৯২০, পৃ ২-৩
১৩৮. হরি, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০৫
১৩৯. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১১৬
১৪০. —,৭.৯.১৯৪৭, পৃ ৩১৫
১৪১. ইই, ৩১.৭.১৯২৪, পৃ ২৫৪
১৪২. —, ৩১.১২.১৯৩১, পৃ ৪২৯
১৪৩. হরি, ৬.৩.১৯৩৭, পৃ ২৫
১৪৪. —, ৭.১.১৯৩৯, পৃ ৪১৭
১৪৫. মরি, অকটোবর ১৯৪১, পৃ ৪০৬-৭
১৪৬. তদেব
১৪৭. তদেব
১৪৮. হরি, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০৫
১৪৯. তদেব
১৫০. তদেব
১৫১. তদেব
১৫২. ইই, ২০.১.১৯২৭, পৃ ২১
১৫৩. —, ২১.৩.১৯২৯, পৃ ৯৫
১৫৪. —, ২৯.৯.১৯২১, পৃ ৩০৭
১৫৫. —, ২০.১.১৯২৭, পৃ ২১
১৫৬. হরি, ২৮.১০.১৯৩৯, পৃ ৩১৭
১৫৭. —, ১৩.৭.১৯৪০, পৃ ২০৭
১৫৮. তদেব পৃ ১৯৩

॥ ১৮. ধর্ম ও রাজনীতি ॥

১৫৯. ইই ২.৩.১৯২২, পৃ ১৩১
১৬০. হরি, ৩০.৩.১৯৪৭, পৃ ৮৫
১৬১. ইই, ১২.৫.১৯২০, পৃ ২
১৬২. অ, পৃ ৩৭০-৭১
১৬৩. হরি, ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৯৩
১৬৪. —, ৬.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৪১

১৬৫. ইই, ১৮.৬.১৯২৫, পৃ ২৪১
১৬৬. —, ১.১০.১৯৩১, পৃ ২৮১
১৬৭. হরি, ২.৩.১৯৩৪, পৃ ২৩
১৬৮. —, ১০.২.১৯৪০, পৃ ৪৪৫
১৬৯. —, ১৭.৮.১৯৪৭, পৃ ২৮১
১৭০. ইই, ২৩,২,১৯২২, পৃ ১২৩
১৭১ হরি, ২৯.৬.১৯৪৭, পৃ ২১৫

॥ ১৯. মন্দির ও মূর্তিপূজা ॥

১৭২. ইই, ৬.১০.১৯২১, পৃ ৩১৮
১৭৩. —, ২৮.৮.১৯২৪, পৃ ২৮৪
১৭৪. —, ২৬.৯.১৯২৯, পৃ ৩২০
১৭৫. তদেব
১৭৬. হরি, ১৩.৩.১৯৩৭, পৃ ৩৯
১৭৭. ইই, ৫.১১.১৯২৫, পৃ ৩৭৮
১৭৮. —, ৪.১১.১৯২৬, পৃ ৩৮৬
১৭৯. হরি, ১১.৩.১৯৩৩, পৃ ৫
১৮০. —, ১৮.৩.১৯৩৩, পৃ ৬
১৮১. —, ২৯.৬.১৯৪৬, পৃ ২০৯
১৮২.—, ৪.১.১৯৪৮, পৃ ৪৯৮

॥ ২০. অস্পৃশ্যতার অভিশাপ ॥

১৮৩. ইই, ৪.৫.১৯২১, পৃ ১৪৪
১৮৪. —, ৫.১১.১৯৩১, পৃ ৩৪১
১৮৫. হরি, ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৯৩
১৮৬. ইস, ২৫.৫.১৯২১,পৃ ১৬৫
১৮৭. —, ১১.৩.১৯২৬, পৃ ৯৫
১৮৮. —, ৬.১.১৯২৭, পৃ ২
১৮৯. হরি, ২৮.৯.১৯৪৭, পৃ ৩৪৯
১৯০. ইই, ২৬.১১.১৯৩১, পৃ ৩৭২
১৯১. হরি, ২৫.৩.১৯৩৩, পৃ ৩
১৯২. —, ১১.২.১৯৩৩, পৃ ৩
১৯৩. ইই, ২৭.১০.১৯২৭, পৃ ৩৫৭
১৯৪. —, ৪.৬.১৯৩১, পৃ ১২৯
১৯৫. হরি, ২৫.৩.১৯৩৩, পৃ ৩
১৯৬. মরি, অকটোবর ১৯৩৫, পৃ ৪১৩
১৯৭. হরি, ১৬.১১.১৯৩৫, পৃ ৩১৬
১৯৮. ইই, ৮.১২.১৯২০, পৃ ৩
১৯৯. —, ৫.১.১৯২১, পৃ ২
২০০. —, ৪.৬.১৯৩১ পৃ ১২৯
২০১. হিন্দু, ১৯.৯.১৯৪৫

৫.অহিংসা ॥

॥ ২১. অহিংসার সুসমাচার ॥

১. ইই, ১১.৮.১৯২০, পৃ ৩
২. —, ১১.১০.১৯২৮, পৃ ৩৪২
৩. —, ২০.২.১৯৩০, পৃ ৬১
৪. হরি, ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৪২
৫. —, ২৮.৬.১৯৪২, পৃ ২০১
৬. —, ১১.১.১৯৪৮, পৃ ৫০৪
৭. —, ৫.৯.১৯৩৬, পৃ ২৩৬
৮. হরি, ২.৪.১৯৩৮, পৃ ৬৪
৯. —, ২৭,১০.১৯৪৬, পৃ ৩৬৯
১০. —, ১৮.৬.১৯৩৮, পৃ ১৫২
১১. —, ১২.১১.১৯৩৮, পৃ ৩২৬
১২. —, ২৮.৬.১৯৪২, পৃ ২০১
১৩. —, ২৯.৬.১৯৪৭, পৃ ২০৯
১৪. ইই, ২৯.৫.১৯২৪, পৃ ১৭৫
১৫. হরি, ৩০.৩.১৯৪৭,পৃ ৮৬
১৬. ইই, ২০.১০.১৯২৭, পৃ ৩৫২
১৭. হরি, ২৭.৪.১৯৪৭, পৃ ১২৬
১৮. ইই, ১৪.৫.১৯১৯; কমুনাল ইউনিটি-তে উদ্ধৃত, পৃ ৯৮৫
১৯. হরি, ৭.১০.১৯৩৯, পৃ ২৯৬
২০. ইই, ৬.৯.১৯২৮, পৃ ৩০০-০১
২১. —, ২০.২.১৯৩০, পৃ ৬১
২২. মন্দির, পৃ ১২-১৩
২৩. হরি, ২৩.৬.১৯৪৬, পৃ ১৯৯
২৪. ইই, ২৮.৫.১৯২৪, পৃ ১৭৮
২৫. —, ১২.৮.১৯২৬, পৃ ২৮৫
২৬. হরি, ৪.৮.১৯৪৬, পৃ ২৪৮-৪৯

২৭. —, ১৭-১১ ১৯৪৬, পৃ ৪০৪
২৮. —, ১.৬.১৯৪৭, পৃ ১৭৫
২৯. —, ২৮.১.১৯৩৯, পৃ ৪৪২
৩০. —, ৬.৫.১৯৩৯, পৃ ১১৩

॥ ২২. অহিংসার ক্ষমতা ॥
৩১. ইই, ১.৮.১৯২০,পৃ ৩
৩২. —, ৮.১০.১৯২৫, পৃ ৩৪৬
৩৩. —, ৬.৫.১৯২৬, পৃ ১৬৪
৩৪. হরি, ২০.৭.১৯৩৫,
পৃ ১৮০-৮১
৩৫. —, ১২.১১.১৯৩৮, পৃ ৩২৭
৩৬. হরি, ১৯.১১.১৯৩৮,
পৃ ৩৪১-৪২
৩৭. তদেব পৃ ৩৪৩
৩৮. হরি, ১২.৫.১৯৪৬, পৃ ১২৮
৩৯. —, ৭.১.১৯৩৯, পৃ ৪১৭
৪০. —, ২১.৩.১৯৩৯, পৃ ৪৩৩
৪১. —, ৬.৫.১৯৩৯, পৃ ১১৩
৪২. —, ১৩,৫,১৯৩৯, পৃ ১২১
৪৩. —, ১.৬.১৯৪৭, পৃ ১৭২
৪৪. অ, পৃ ২০৩
৪৫. তদেব
৪৬. ইই, ১৭.৩.১৯২৭, পৃ ৮৫
৪৭. হরি, ১২,১১.১৯৩৮, পৃ ৩২৭
৪৮. —, ১৩.৫.১৯৩৯, পৃ ১২১
৪৯. —, ১৬.১১.১৯৪৭, পৃ ৪১২

॥ ২৩. অহিংসার প্রশিক্ষণ ॥
৫০. হরি, ১৪.৩.১৯৩৬, পৃ ৩৯
৫১. —, ১.৯.১৯৪০, পৃ ২৬৮
৫২. —, ৮.৯.১৯৪৬, পৃ ২৯৬
৫৩. —, ১৪.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৬৮

॥ ২৪. অহিংসার প্রয়োগ ॥
৫৪. হরি, ২৮.১.১৯৩৯,
পৃ ৪৪১-৪২
৫৫. —, ১২.১০.১৯৩৫, পৃ ৩৭৬
৫৬. —, ১২.১০.১৯৩৮, পৃ ৩২৮
৫৭. —, ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৯৩
৫৮. —, ২৮.১.১৯৩৯, পৃ ৪৪৩
৫৯. কয়েস, পৃ ৪২-৪৪,
পৃ ১৭০-৭১
৬০. হরি, ২৬.৭.১৯৪২, পৃ ২৪৮
৬১. —, ৮.৯.১৯৪৬, পৃ ২৯৬
৬২. —, ৬.৭.১৯৪০, পৃ ১৮৫-৮৬
৬৩. হরি, ২৯.৬.১৯৪৭, পৃ ২০৯

॥ ২৫. অহিংস সমাজ ॥
৬৪. হরি, ৭.১.১৯৩৯, পৃ ৪১৭
৬৫. —, ১১.২.১৯৩৯, পৃ ৮
৬৬. —, ১৩.১.১৯৪০, পৃ ৪১০-১১
৬৭. —, ৯.৩.১৯৪০, পৃ ৩১
৬৮. —, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩০৯
৬৯. —, ১৫.১০.১৯৩৮, পৃ ২৯০
৭০. —, ১২.১১.১৯৩৮, পৃ ৩২৮
৭১. —, ১১.২.১৯৩৯, পৃ ৮
৭২. টুনিহ, ১১.২.১৯৩৯, পৃ ৮

॥ ২৬. অহিংস রাষ্ট্র ॥
৭৩. ইই, ২.১.১৯৩০, পৃ ৪
৭৪. —, ২.৭.১৯৩১, পৃ ৪১২
৭৫. মরি, অকটোবর ১৯৩৫, পৃ ৪১২
৭৬. হরি, ২৫.৩.১৯৩৯, পৃ ৬৪
৭৭. তদেব, পৃ ৬৫
৭৮. হরি, ৩০.১২.১৯৩৯, পৃ ৩৯১
৭৯. —, ১৮.১.১৯৪২, পৃ ৫
৮০. —, ১২.৫.১৯৪৬, পৃ ১২৮

॥ ২৭. হিংসা ও সন্ত্রাসবাদ ॥
৮১. ইই, ২৮.৪.১৯২০, পৃ ৮
৮২. —, ২৪.১১.১৯২১, পৃ ৩৮২
৮৩. —, ২৪.৪.১৯৩০, পৃ ১৪০

৪৫. ইই, ২৩.৯.১৯২৬, পৃ ৩৩২
৪৬. সবার, পৃ ৩১৯
৪৭. ইই, ১৮.৪.১৯২৯, পৃ ১২৬
৪৮. সপ্তা, পৃ (চোদ্দ)
৪৯. ইই, ১২.২.১৯২৫, পৃ ৬০
৫০. হরি, ৮.৯.১৯৪০, পৃ ২৭৭
৫১. —, ২১.৭.১৯৪৬, পৃ ২২৭
৫২. ইই, ৩.১১.১৯২৭, পৃ ৩৬৯
৫৩. —, ২২.৯.১৯২৭, পৃ ৩১৭
৫৪. হরি, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৬৪
৫৫. —, ১৭.৩.১৯৪৬, পৃ ৪৫-৪৬
৫৬. ইই, ২৮.৪.১৯২০, পৃ ৭-৮
৫৭. —, ২.২.১৯২১, পৃ ৩৩
৫৮. শিরা পৃ ৪৭৪
৫৯. তদেব, পৃ ৪৭৬
৬০. ইই, ১২.১২.১৯২৫, পৃ ৬০
৬১. —, ২.৪.১৯৩১, পৃ ৫৮

॥ ৩৫. অসহযোগ ॥

৬২. ইই, ১.১২.১৯২০, পৃ ৩
৬৩. —, ১.৬.১৯২১, পৃ ১৭২
৬৪. —, ২৫.৮.১৯২০, পৃ ৩২২
৬৫. —, ৪.৮.১৯২০, পৃ ৪
৬৬. হরি, ১২.১১.১৯৩৮, পৃ ৩২৭
৬৭. —, ২৯.৪.১৯৩৯, পৃ ১০১
৬৮. ইই, ২.৬.১৯২০, পৃ ৩
৬৯. —, ৩০.৬.১৯২০ পৃ ৩
৭০. —, ১.৬.১৯২১, পৃ ১৭৩
৭১. —, ১১.২.১৯২৬, পৃ ৫৯
৭২. —, ২০.৪.১৯২০, পৃ ৯৭
৭৩. —, ১৯.১.১৯২১, পৃ ১৯
৭৪. —, ৪.৬.১৯২৫, পৃ ১৯৩
৭৫. —, ১৮.৬.১৯২৫, পৃ ২১৩
৭৬. —, ৬.৮.১৯২৫, পৃ ২৭২
৭৭. —, ১৩.৮.১৯২৫, পৃ ২৭৭
৭৮. —, ১২.৯.১৯২৯, পৃ ৩১০
৭৯. —, ২৬.১১.১৯৩১, পৃ ৩৬৯
৮০. প্রকা, পৃ ৮৪

॥ ৩৬.অনশন ও সত্যাগ্রহ ॥

৮১. হরি, ১৮.৩.১৯৩৯, পৃ ৫৬
৮২. —, ১৩.১০.১৯৪০, পৃ ৩২২
৮৩. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৫
৮৪. —, ১৮.৮.১৯৪৬, পৃ ২৬২
৮৫. —, ২৭.১০.১৯৪৬, পৃ ২৭২
৮৬. হরি, ৯.৯.১৯৩৩, পৃ ৫
৮৭. —, ১৭.৩.১৯৪৬, পৃ ৪৩
৮৮. —, ২১.৪.১৯৪৬, পৃ ৯৩
৮৯. —, ২১.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৭৬

৭. অপরিগ্রহ

॥ ৩৭.অপরিগ্রহ বিষয়ক সুসমাচার ॥

১. শিরা, পৃ ১০৬৬-৬৭
২. ইই, ৩০.৪.১৯২৫, পৃ ১৪৯
৩. —, ২৩.২.১৯২১, পৃ ৫৯
৪. মন্দির, পৃ ২৩-২৬
৫. ইই, ৩.৭.১৯২৪, পৃ ২২১
৬. —, ৫.২.১৯২৫, পৃ ৪৮
৭. —, ২৪.৬.১৯২৬, পৃ ২২৬
৮. মরি, অকটোবর ১৯৩৫, পৃ ৪১২
৯. শিরা, পৃ ৩৫৩
১০. অ, পৃ ১৬৮
১১. আত্মঅ্যা, পৃ ৫৮
১২. হরি, ৬.৩.১৯৩৭, পৃ ২৭
১৩. —, ১০.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৭১
১৪. —, ২৪.২.১৯৪৬, পৃ ১৯
১৫. —, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১১১

॥ ৩৮. দারিদ্র ও সম্পদ ॥

১৬. ইই, ৭.১০.১৯২৬, পৃ ৩৪৮
১৭. শিরা, পৃ ৩৫৩-৫৪

১৮. ইই, ২৮.৪.১৯২৭, পৃ ১৩৭
১৯. হরি, ১.২.১৯৪২, পৃ ২০
২০. —, ২২.২.১৯৪২, পৃ ৪৯
২১. অ, পৃ ৩২০
২২. ইই, ১৩.৮.১৯২৫, পৃ ২৮২
২৩. —, ১৩.১০. ১৯২১, পৃ ৩২৫
২৪. তদেব
২৫. হরি,১১.৫.১৯৩৫, পৃ ৯৯
২৬. —, ১০.৩.১৯৪৬, পৃ ৪০

॥ ৩৯. দরিদ্রনারায়ণ ॥
২৭.ইই, ৪.৪.১৯২৯, পৃ ১১০
২৮. —, ৫.৫.১৯২৭. পৃ ১৪২
২৯. —, ১৫.৯.১৯২৭, পৃ ৩১৩
৩০. —, ২৬.৩.১৯৩১, পৃ ৫৩
৩১. —, ১৫.১০.১৯৩১, পৃ ৩১০
৩২. হরি, ১১.৩.১৯৩৯, পৃ ৪৪

৮. শ্রম

॥ ৪০. উদরান্নের জন্য শ্রমের সুসমাচার ॥
১. ইই, ১৩.১০.১৯২১, পৃ ৩২৫
২. —, ১১.৪.১৯২৯, পৃ ১১৪-১৫
৩. মন্দির, পৃ ৩৫
৪. তদেব, পৃ ৩৫-৩৬
৫. আত্মজ্ঞা, পৃ ৬২-৬৩
৬. ইই, ২৬.৩.১৯৩১, পৃ ৪৯
৭. হরি, ১.৬.১৯৩৫, পৃ ১২৫
৮. —, ২৯.৬.১৯৩৫, পৃ ১৫৬
৯. —, ২.৩.১৯৪৭, পৃ ৪৭
১০. মন্দির,পৃ ৩৬-৩৭
১১. হরি, ২৯.৬.১৯৩৫, পৃ ১৫৬
১২. —, ২৩.৩.১৯৪৭, পৃ ৭৮
১৩. —, ৭.৯.১৯৪৭, পৃ ৩১৬
১৪. —, ২.৩.১৯৪৭, পৃ ৪৬
১৫. ইই, ২০.১০.১৯২১, পৃ ৩২৯
১৬. —, ২৫.১১.১৯২৬, পৃ ৪১৪
১৭. —, ২০.৯.১৯২৮, পৃ ৩২০
১৮. হরি, ২৯.৬.১৯৩৫, পৃ ১৫৬
১৯. —, ২.১১.১৯৩৫, পৃ ২৯৮
২০. —, ১৬.৫.১৯৩৬, পৃ ১১১
২১. ইই, ৬.১০,১৯২১, পৃ ৩১৪
২২. হরি, ১৯.১২.১৯৩৬, পৃ ৩৫৬
২৩. —, ১১.১.১৯৪৮, পৃ ৫০৭
২৪. ইই, ১৫.১০.১৯২৫, পৃ ৩৫৫-৫৬
২৫. হরি, ২৯.৬.১৯৩৫, পৃ ১৫৬
২৬. —, ২৩.২.১৯৪৭, পৃ ৩৬
২৭. —, ১৮.১.১৯৪৮, পৃ ৫২০

॥ ৪১. শ্রমিক ও পুঁজি ॥
২৮. ইই, ২০.৮.১৯২৫, পৃ ২৮৫
২৯. —, ৭.১০.১৯২৬, পৃ ৩৪৮
৩০. —, ২৬.৩.১৯৩১, পৃ ৪৯
৩১. হরি, ২৮.৭.১৯৪০, পৃ ২১৯
৩২. স্পিরা, পৃ ১০৪৬
৩৩. ইই, ৪.৮.১৯২৭, পৃ ২৪৮
৩৪. —, ১৪.১.১৯৩২, পৃ ১৭-১৮
৩৫. হরি, ১৯.১০.১৯৩৫ পৃ ২৮৫
৩৬. —, ৩.৭.১৯৩৭, পৃ ১৬১
৩৭. ইই, ১৭.৩.১৯২৭, পৃ ৮৬
৩৮. হরি, ১.৩.১৯৩৫, পৃ ২৩
৩৯. ইই, ৪.৮.১৯২৭, পৃ ২৪৮
৪০. —, ২৬.১১.১৯৩১, পৃ ৩৬৯
৪১. অবাপ, ৩.৮.১৯৩৪
৪২. হরি, ২৮.৯.১৯৪৭, পৃ ৩৫০
৪৩. —, ৩০.১১.১৯৪৭, পৃ ৪৪৮

॥ ৪২. ধর্মঘট: সঙ্গত ও অসঙ্গত ॥
৪৪. ইই, ৫.৫.১৯২০, পৃ ৬
৪৫. —, ১৬.২.১৯২১, পৃ ৫২-৫৩

৪৬. হরি, ১১.৮.১৯৪৬, পৃ ২৫৬
৪৭. ইই, ১৮.১১.১৯২৬, পৃ ৪০০
৪৮. হরি, ২.৬.১৯৪৬, পৃ ১৫৮
৪৯. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৭
৫০. —, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৬০
৫১. ইই, ২২.৯.১৯২১. পৃ ২৯৮
৫২. হরি, ৭.১১.১৯৩৬, পৃ ৩১১
৫৩. —, ২২.৯.১৯৪৬, পৃ ৩২১

॥ ৪৩. যে জমি চাষ করে ॥

৫৪. ইই, ৫.১২.১৯২৯, পৃ ৩৯৬
৫৫. —, ২১.১১.১৯২৯, পৃ ৩৮৪
৫৬. অবাপ, ৩.৮.১৯৩৪
৫৭. হরি, ৫.১২.১৯৩৬, পৃ ৩৩৮-৩৯
৫৮. —, ৭.৬.১৯৪২, পৃ ১৮৪
৫৯. বক্র, ২৮.১০.১৯৪৪
৬০. —, ১২.১.১৯৪৫
৬১. হরি, ২৫.৮.১৯৪৬, পৃ ২৮১

॥ ৪৪. শ্রমিক কোন পথ বেছে নেবে ॥

৬২. ইই, ১১.২.১৯২০, পৃ ৭-৮

৯. সর্বোদয়

॥ ৪৫. সর্বোদয় সুসমাচার ॥

১. ইই, ৪.১২.১৯২৪, পৃ ৩৯৮
২. —, ৩.৯.১৯২৫, পৃ ৩০৪
৩. মন্দির, পৃ ৪৭
৪. ইই, ২০.১০.১৯২১, পৃ ৩২৯
৫. ইই, ২০.১২.১৯২৮, পৃ ৪২০
৬. মন্দির, পৃ ২
৭. ইই, ৪.৯.১৯৩০, পৃ ১
৮. হরি, ২৯.৮.১৯৩৬, পৃ ২২৬
৯. —, ৮.৫.১৯৩৭, পৃ ৯৯
১০. ইই, ২৪.৯.১৯২৫, পৃ ৩৩১-৩২
১১. —, ১০.২.১৯২৭, পৃ ৪৩-৪৪
১২. হরি, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০৪
১৩. অ, পৃ ৩৭১
১৪. ইই, ২৬.১২.১৯২৪, পৃ ৪২৪
১৫. হিস্ব, পৃ ৭১
১৬. ইই, ১৭.৭.১৯২৪, পৃ ২৩৬-৩৭
১৭. হরি, ৬.৫.১৯৩৯, পৃ ১১২
১৮. ইই, ৮.১.১৯২৫, পৃ ১৫-১৫
১৯. হরি, ২৭.৫.১৯৩৯, পৃ ১৪৩
২০. —, ৬.৭.১৯৪৭, পৃ ২১৭

॥ ৪৬. যন্ত্রের দর্শন ॥

২১. মন্দির, পৃ ৫৩-৫৬
২২. তদেব, ৫৭-৬০

॥ ৪৭. শয়তানের সভ্যতা ॥

২৩. ইই, ৮.৯.১৯২০, পৃ ২-৩
২৪. —, ২৬.১.১৯২১, পৃ ২৭
২৫. —, ১৩.১০.১৯২১, পৃ ৩২৫
২৬. স্পিরা, পৃ ৩৫৪-৫৫
২৭. হিস্ব, পৃ ৩৬-৩৭
২৮. ইই, ২১.১.১৯২৬. পৃ ৩১
২৯. —, ১৭.৩.১৯২৭, পৃ ৮৫
৩০. —, ৭.১০.১৯২৬, পৃ ৩৪৮
৩১. —, ৮.১২.১৯২৭, পৃ ৪১৪
৩২. ইই, ১৭.৩.১৯২৭, পৃ ৮৫
৩৩. —, ১১.৮.১৯২৭, পৃ ২৫৩

॥ ৪৮. মানুষ বনাম যন্ত্র ॥

৩৪. ইই, ১৯.১.১৯২১, পৃ ২১
৩৫. —, ১৩.১১.১৯২৪, পৃ ৩৭৮
৩৬. হরি, ৩০.১১.১৯৩৫, পৃ ৩২৯
৩৭. —, ২৯.৮.১৯৩৬, পৃ ২২৮
৩৮. ইই, ২০.১১.১৯২৪ পৃ ৩৮৬
৩৯. হিস্ব, পৃ ৯৬
৪০. ইই, ১৩.১১.১৯২৪, পৃ ৩৭৮
৪১. হরি, ২২.৬.১৯৩৫. পৃ ১৪৬

৪২. —, ১৬.১১.১৯৩৪, পৃ ৩১৬
৪৩. —, ১৬.৫.১৯৩৬, পৃ ১১১
৪৪, —, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩১০
৪৫. ইই, ১৭.৬.১৯২৬, পৃ ১৮
৪৬. —, ২.৭.১৯৩১, পৃ ১৬১
৪৭. হরি, ২.১১.১৯৩৪. পৃ ৩০১
৪৮. তদেব, পৃ ৩০১, ৩০২
৪৯. ইই, ১৩.১১.১৯২৪, পৃ ৩৭৮
৫০. —, ১৭.৯.১৯২৫, পৃ ৩২১
৫১. হরি, ১৪.৯.১৯৩৫, পৃ ২৪৪
৫২. —, ২.১১.১৯৩৪, পৃ ৩০২
৫৩. ইই, ২৪.৭.১৯২৪. পৃ ২৪৬
৫৪. —, ২৭.৯.১৯২৫, পৃ ৩২১
৫৫. —, ২২.১০.১৯৩১, পৃ ৩১৮
৫৬. —, ৫.১.১৯২৫, পৃ ৩৭৭
৫৭. হরি, ২২.৬.১৯৩৫, পৃ ১৪৬
৫৮. —, ২৫.৮.১৯৪৬, পৃ ২৮১
৫৯. —, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০৫

॥ ৪৯. শিল্পায়নের অভিশাপ ॥
৬০. ইই, ৬.৮.১৯২৫, পৃ ২৭৩
৬১. —, ১২.১১.১৯৩১, পৃ ৩৫৫
৬২. —, ১২.১১.১৯৩১, পৃ ৩৫৫
৬৩. হরি, ২৮.১.১৯৩৯, পৃ ৪৩৮
৬৪. ইই, ২০.১২.১৯২৮, পৃ ৪৪২
৬৫. —, ১২.১১.১৯৩১, পৃ ৩৫৫
৬৬. হরি, ১.৯.১৯৪৬, পৃ ২৮৫
৬৭. —, ৪.১.১৯৩৫, পৃ ৩৭২
৬৮. —, ২৮.৯.১৯৪৬, পৃ ২২৬
৬৯. —, ২৩.৩.১৯৪৭, পৃ ৭৯

॥ ৫০. সমাজতন্ত্র ॥
৭০. হরি, ২.১.১৯৩৭, পৃ ৩৭৫
৭১. —, ২০.৪.১৯৪০, পৃ ৯৭
৭২. অবাপ, ৩.৮.১৯৩৪
৭৩. হরি, ২০.২.১৯৩৭, পৃ ১২
৭৪. —, ২০.৪.১৯৪০, পৃ ৯৭
৭৫. —, ৪.৮.১৯৪৬, পৃ ২৪৬
৭৬. —, ১৩.৭.১৯৪৭, পৃ ২৩২
৭৭. —, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৬৪
৭৮. —, ২০.৪.১৯৪০, পৃ ৯৭
৭৯. —, ২০.৭.১৯৪৭, পৃ ২৪০
৮০. মাসো, পৃ ১০
৮১. তদেব, পৃ ১২
৮২. তদেব, পৃ ১৩

॥ ৫১. সমাজের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ ।
৮৩. হরি, ২৭.১.১৯৪০, পৃ ৪২৮
৮৪. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৬
৮৫. তদেব

॥ ৫২. সাম্যবাদী মতবাদ ॥
৮৬. ইই, ১১. ১২. ১৯২৪, পৃ ৪০৬
৮৭. —, ১৫.১১.১৯২৮, পৃ ৩৮১
৮৮. অবাপ, ২. ৮. ১৯৩৪
৮৯. হরি, ১৩. ২. ১৯৩৭, পৃ ৬
৯০. —, ১৩. ৩. ১৯৩৭, পৃ ৮০
৯১. —, ৮. ৬. ১৯৪০, পৃ ১৫৯
৯২. —, ১৭. ২. ১৯৪৬, পৃ ১০

১০. অছিরক্ষণ

॥ ৫৩. অছিরক্ষণের সুসমাচার ॥
১. কপ্র, পৃ ২০-২১
২. তদেব, পৃ ২১
৩. ইই, ২৬. ৩. ১৯৩১, পৃ ৪৯
৪. —, ২৬. ১১. ১৯৩১, পৃ ৩৬৯
৫. হরি, ৩. ১২. ১৯৩৮, পৃ ৩৫৮
৬. —, ৩. ৬. ১৯৩৯, পৃ ১৪৫
৭. —, ১৬. ১২. ১৯৩৯, পৃ ৬৭
৮. মরি, অকটোবর, ১৯৩৫, পৃ ৪১২
৯. হরি, ৮. ৩. ১৯৪২, পৃ ৬৭

১০. —, ১২. ৪. ১৯৪২, পৃ ১১৬
১১. —, ৩১. ৩. ১৯৪৬, পৃ ৬৩-৬৪
১২. —, ৪. ৫. ১৯৪৭, পৃ ১৩৪
১৩. —, ২১. ৯. ১৯৪৭ , পৃ ৩৩২
১৪. —, ২৫. ১০. ১৯৫২, পৃ ৩০১
অনুমান, অধ্যাপক এম. এল. দণ্ডওয়ালা, নথিটির খশড়া করেন।

॥ ৫৪. অহিংস অর্থনীতি ॥
১৫. ইই, ১৩. ১০. ১৯২১, পৃ ৩২৫
১৬. —, ২৭. ১০. ১৯২১, পৃ ৩৪৪
১৭. —, ২৬. ১০. ১৯২৪, পৃ ৪২১
১৮. —, ১৫. ১১. ১৯২৮, পৃ ৩৮১
১৯. হরি, ৯. ১০. ১৯৩৭, পৃ ২৯২
২০. স্পিরা, পৃ ৩৫৫
২১. হরি, ১. ৯. ১৯৪০, পৃ ২৭১-৭২

॥ ৫৫. অর্থনৈতিক সমতা ॥
২২. ইই, ২৬. ৩. ১৯৩১, পৃ ৪৯
২৩. —, ২৬. ১১. ১৯৩১, পৃ ৩৬৮
২৪. হরি, ১৫. ১. ১৯৩৮, পৃ ৪১৬
২৫. —, ৩১. ৩. ১৯৪৬, পৃ ৬৩
২৬. —, ১৭. ১১. ১৯৪৬, পৃ ৪০৪
২৭. —, ১৬. ২. ১৯৪৭, পৃ ২৫
২৮. —, ১. ৬. ১৯৪৭, পৃ ১৭২
২৯. ইই, ২৮. ৭. ১৯২০, পৃ ৫
৩০. —, ২৩. ৩. ১৯২১, পৃ ৯৩
৩১. —, ১৭. ৩. ১৯২৭, পৃ ৮৬
৩২. হরি, ২৫. ৮. ১৯৪০, পৃ ২৬০-৬১

১১. ব্রহ্মচর্য

॥ ৫৬. ব্রহ্মচর্যের সুসমাচার ॥
১. ইই, ১৬. ৯. ১৯২৬, পৃ ৩২৪
২. উগাসি, পৃ ৮৪
৩. ইই, ২৭. ৯. ১৯২৮, পৃ ৩২৪
৪. অ, পৃ ২৩৪
৫. ইই, ১৩. ১০. ১৯২০, পৃ ৩
৬. হরি, ২৫. ৪. ১৯৩৬, পৃ ৮৪
৭. —, ২২. ৬. ১৯৪৭, পৃ ২০০
৮. ইই, ৫. ৬. ১৯২৪, পৃ ১৮৬
৯. হরি, ৮. ৬. ১৯৪৭, পৃ ১৮০
১০. অ পৃ ১৫৩
১১. মন্দির, পৃ ১২-১৩
১২. হরি, ১৫.৬.১৯৪৭, পৃ ১৯২
১৩. মন্দির, পৃ ১৩-১৪
১৪. হরি, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১১০-১১
১৫. অ, পৃ ২৩৪
১৬. হরি, ২৩.৭.১৯৩৮, পৃ ১৯৩
১৭. হরি, ৪.১১.১৯৩৯, পৃ ৩২৬
১৮. তদেব

॥ ৫৭. বিবাহের আদর্শ ॥
১৯. ইই, ২১.৫.১৯৩১, পৃ ১১৫
২০. হরি, ৭.৯.১৯৩৫, পৃ ২৩৪
২১. —, ৫.৬.১৯৩৭, পৃ ১৩৪
২২. —, ২২.৩.১৯৪২, পৃ ৩৮
২৩. —, ২৪.৪.১৯৩৭, পৃ ৮২
২৪. তদেব, পৃ ৮৩
২৫. হরি, ৫.৬.১৯৩৭, পৃ ১৩৪
২৬. —, ১৯.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৭৪
২৭. —, ১৯.৫.১৯৪৬, পৃ ১৩৩
২৮. —, ৭.৭.১৯৪৬, পৃ ২১৪
২৯. তদেব
৩০. অ, পৃ ১৮
৩১. ইই, ২১.১০.১৯২৬, পৃ ৩৬৫
৩২. তদেব, পৃ ৩৬৪
৩৩. ইই, ২.২.১৯২৮, পৃ ৩৫
৩৪. হরি, ৯.৩.১৯৪০, পৃ ৩০
৩৫. —, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩১১-১২
৩৬. —, ১৬.৩.১৯৪৭, পৃ ৬৮

॥ ৫৮. শিশুসন্তান ॥

৩৭. **ইই**, ৩.১২.১৯২৫, পৃ ৪২২
৩৮. অ, পৃ ২৩০
৩৯. তদেব, পৃ ২৫২
৪০. **ইই**, ১৭.১০.১৯২৯, পৃ ৩৪০
৪১. —, ১৯.১১.১৯৩১, পৃ ৩৬১

॥ ৫৯. জন্মনিয়ন্ত্রণ ॥

৪২. অ, পৃ ১৪৮
৪৩. **ইই**, ১২.৩.১৯২৫, পৃ ৮৮
৪৪. **হরি**, ২১.৩.১৯৩৬, পৃ ৪৮
৪৫. —, ২৮.৩.১৯৩৬, পৃ ৫৩
৪৬. —, ৪.৪.১৯৩৬, পৃ ৬১
৪৭. **ইই**, ১২.৩.১৯৩৫, পৃ ৮৮-৮৯
৪৮. —, ২.৪.১৯২৫, পৃ ১১৮
৪৯. **হরি**, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৬৬
৫০. —, ১.২.১৯৩৫, পৃ ৪১০
৫১. **ইই**, ২.৪.১৯২৫, পৃ ১১৮
৫২. **হরি**, ১৪.৯.১৯৩৫, পৃ ২৪৪
৫৩. —, ৭.৯.১৯৩৫, পৃ ২৩৪
৫৪. —, ২৮.৩.১৯৩৬, পৃ ৫৩
৫৫. —, ১৭.৪.১৯৩৭, পৃ ৮৪
৫৬. —, ২৮.৩.১৯৩৬, পৃ ৫৩
৫৭. **ইই**, ২.৪.১৯৩৫, পৃ ১১৮
৫৮. **হরি**, ২.৫.১৯৩৬, পৃ ৯২
৫৯. তদেব, পৃ ৯৩
৬০. **হরি**, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১১৮
৬১. —, ১২.৯.১৯৩৬, পৃ ২৪৪
৬২. **ইই**, ২৭.৯.১৯২৫, পৃ ৩২৪
৬৩. অবাপ, ১২.১.১৯৩৫
৬৪. এআ, নভেম্বর, ১৯৩৫
৬৫. **হরি**, ২.৫.১৯৩৬, পৃ ৯৩
৬৬. **ইই**, ১৯.৮.১৯২৬, পৃ ২৮৯
৬৭. **হরি**, ৩০.৫.১৯৩৬, পৃ ১২৬
৬৮. অবাপ, ১২.১.১৯৩৫

॥ ৬০. নারী : সমাজে তার স্থান ও ভূমিকা ॥

৬৯. **ইই**, ১৫.৯.১৯২১, পৃ. ২৯২
৭০. —, ২১.৭.১৯২১, পৃ ২২৯
৭১. —, ৮.১২.১৯২৭, পৃ ৪০৬
৭২. —, ১০.৪.১৯৩০, পৃ ১২১
৭৩. —,৭.৫.১৯৩১, পৃ ৯৬
৭৪. —, ১৪.১.১৯৩২, পৃ ১৯
৭৫. **স্পিরা**, পৃ ৪২৫
৭৬. **ইই**, ১৬.৮.১৯২৫, পৃ ১৩৩
৭৭. —, ১৭.১০.১৯২৯, পৃ ৩৪০
৭৮. **হরি**, ২৫.১.১৯৩৬, পৃ ৩৯৬
৭৯. —, ২.৫.১৯৩৬, পৃ ৯৩
৮০. —, ২৭.২.১৯৩৭, পৃ ১৯
৮১. —, ২.৫.১৯৩৬, পৃ ৯৩
৮২. —, ৩১.১২.১৯৩৮, পৃ ৪০৯
৮৩. —, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩১২
৮৪. —, ২৫.৩.১৯৩৩, পৃ ২
৮৫. —, ১২.১০.১৯৩৪, পৃ ২৭৬-৭৭
৮৬. —, ২৪.২.১৯৪০, পৃ ১৩
৮৭. —, ৫.১১.১৯৩৮, পৃ ৩১৭
৮৮. —, ২৪.২.১৯৪০, পৃ ১৩
৮৯. তদেব, পৃ ১৩-১৪
৯০. তদেব, পৃ ১৩
৯১. **হরি**, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১১৮
৯২. —, ১৮.৫.১৯৪৭, পৃ ১৫৫
৯৩. **হরি**, ১৭.১০.১৯২৯, পৃ ৩৪০
৯৪. —, ২.১২.১৯৩৯, পৃ ৩৫৯
৯৫. **স্পিরা**, পৃ ৪২৪
৯৬. **হরি**, ৫.১.১৯৪৭, পৃ ৪৭৮
৯৭. —, ২১.৪.১৯৪৬, পৃ ৯৬
৯৮. —, ২৩.৩.১৯৪৭, পৃ ৮০
৯৯. —, ১১.১.১৯৪৮, পৃ ৫০৯
১০০. **ইই**, ২৫.১১.১৯২৬, পৃ ৪১৫
১০১. —, ৩.২.১৯২৭, পৃ ৩৭
১০২. **হরি**, ২৩.৫.১৯৩৬, পৃ ১১৭
১০৩. **ইই**, ২১.৬.১৯২৯, পৃ ২০৯

১০৪. —, ৫.৮.১৯২৬, পৃ ২৭৬
১০৫. —, ৮.১০.১৯২৫, পৃ ৩৪৬

॥ ৬১. যৌনশিক্ষা ॥

১০৬. হরি, ২১.১১.১৯৩৬, পৃ ৩২২

॥ ৬২. নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ ॥

১০৭. হরি, ১.৯.১৯৪০, পৃ ২৬৬
১০৮. —, ১.৩.১৯৪২, পৃ ৬০
১০৯. —, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩১২
১১০. —, ৫.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৪৫
১১১. ইই, ২৮.৫.১৯২৫, পৃ ১৮৭
১১২. হরি, ৪.৯.১৯৩৭, পৃ ২৩৩
১১৩. —, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩১০

॥ ৬৩. আশ্রম শপথ ॥

১১৪. ১৯১৬-র ১৬ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের ওয়াই. এম. সি. এ অডিটোরিয়াম-এ প্রদত্ত ভাষণ; স্পিরা, পৃ ৩৭৭-৯০

১২. স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

॥ ৬৪. স্বাধীনতার শপথবাণী ॥

১. ইই, ৯.৩.১৯২২, পৃ ১৪৮
২. —, ৬.৬.১৯২৯, পৃ ১৮৮
৩. —, ১৬.১.১৯৩০, পৃ ১৭
৪. —, ১২.৩.১৯৩১, পৃ ৩১
৫. —, ১৫.১০.১৯৩১, পৃ ৩০৫
৬. হরি, ২১.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৭৭
৭. ইকেস্ব, পৃ ২০৯
৮. হরি, ২৭.৫.১৯৩৯, পৃ ১৪৪
৯. —, ১.২.১৯৪২, পৃ ২৭
১০. —, ৭.৬.১৯৪২, পৃ ১৮৩
১১. —, ২.৮.১৯৪২, পৃ ২৪৯
১২. ইই, ৯.৬.১৯২০, পৃ ৩
১৩. —, ৩০.৬.১৯২০, পৃ ৩
১৪. হরি, ২৪. ২.১৯৪৬, পৃ ১৮
১৫. ইই, ১৫.১২.১৯২১, পৃ ৪১৮
১৬. —, ৫.১.১৯২২, পৃ ৫
১৭. হরি, ১১.১.১৯৩৬, পৃ ৩৮০
১৮. —, ১০.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৬৮
১৯. ইই, ২৬.১২.১৯২৯, পৃ ৪২১
২০. —, ১০.৯.১৯৩১, পৃ ২৫৫
২১. —, ১.১০.১৯৩১, পৃ ২৭৮
২২. হরি, ১৩.৪.১৯৪৭, পৃ ১০৬
২৩. হিস্ট্যা, ১.৪.১৯৪০
২৪. হরি, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১১৬
২৫. ইই, ৪.৭.১৯২৯, পৃ ২১৮
২৬. ইকেস্ব, পৃ ২০৯
২৭. ইই, ১.১০.১৯৩১, পৃ ২৮১
২৮. —, ৩.১২.১৯৩১, পৃ ৩৮০
২৯. ইই, ১৭.৯.১৯২৫, পৃ ৩২২
৩০. —, ১২.১.১৯২৮, পৃ ১৩
৩১. —, ৩০.১.১৯৩০, পৃ ৩৭
৩২. —, ১২.১১.১৯৩১, পৃ ৩৫৩
৩৩. বক্র, ৯.৮.১৯৪২
৩৪. —, ১৮.৪.১৯৪৫

॥ ৬৫. স্বরাজ আমার কাছে কী ॥

৩৫. ইই, ১২.৬.১৯২৪, পৃ ১৯৫
৩৬. —, ২৯.১.১৯২৫, পৃ ৪১
৩৭. —, ৬.৮.১৯২৫, পৃ ২৭৬
৩৮. —, ১৯.৩.১৯৩১, পৃ ১৩৮
৩৯. —, ১.৫.১৯৩০, পৃ ১৪৯
৪০. —, ২৬.৩.১৯৩১, পৃ ৪৬
৪১. —, ১৮.৬.১৯৩১, পৃ ১৪৭
৪২. হরি, ৩.৩.১৯৪৬, পৃ ৩১
৪৩. ইই, ১৬.৪.১৯৩১, পৃ ৭৮
৪৪. হরি, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১১১
৪৫. ইই, ১৭.৪.১৯২৪, পৃ ১৭০
৪৬. হরি, ২৯.৯.১৯৪০, পৃ ৩০৬
৪৭. ইই, ২৫.৫.১৯২১, পৃ ১৬৪

৪৮. —, ১৩.১০.১৯২১, পৃ ৩২৬
৪৯. —, ৫.১.১৯২২, পৃ ৪
৫০. —, ২৭.৮.১৯২৫, পৃ ২৯৭
৫১.—, ২২.৯.১৯২০, পৃ ১
৫২. —, ২১.৫.১৯২৫, পৃ ১৭৮
৫৩. স্পিরা, পৃ ৪১৬
৫৪. ইই, ২৮.৭.১৯২১, পৃ ২৩৮
৫৫. —, ২৭.৮.১৯২৫, পৃ ২৯৭
৫৬. —, ২৪.৬.১৯২৬, পৃ ২২৬
৫৭. হরি, ২৫.৩.১৯৩৯, পৃ ৬৪
৫৮. —, ১৮.১.১৯৪২, পৃ ৪
৫৯. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৭০
৬০. ইই, ২৬.৬.১৯২৪, পৃ ২১০
৬১. —, ২৩.১.১৯৩০, পৃ ২৬

॥ ৬৬.আমি বৃটিশবিরোধী নই ॥

৬২. ইই, ৭.১.১৯২০, পৃ ২
৬৩. —, ৫.৫.১৯২০, পৃ ৪
৬৪. স্পিরা, পৃ ৫২৩
৬৫. ইই, ৬.৩.১৯৩০, পৃ ৮০
৬৬. —, ১৫.১০.১৯৩১, পৃ ৩০৯
৬৭. তদেব, পৃ ৩১০
৬৮. বক্র, ৯.৮.১৯৪২,
৬৯. ইই, ২৭.১০.১৯২০, পৃ ১
৭০. হরি, ১৭.২.১৯৪৬, পৃ ১২
৭১. —, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৬০
৭২. তদেব, পৃ ৬১
৭৩. হরি, ১৪.৪.১৯৪৬, পৃ ৯০
৭৪. ইই, ৫.১.১৯২২, পৃ ৪
৭৫. হরি, ১৪.৪.১৯৪৬, পৃ ৯১

॥ ৬৭. রামরাজ্য ॥

৭৬. ইই, ১৯.৯.১৯২৯, পৃ ৩০৫
৭৭. অবাপ, ২.৮.১৯৩৪
৭৮. হরি, ২.১.১৯৩৭, পৃ ৩৪৭
৭৯. —, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১১৬
৮০. তদেব
৮১. হরি, ১.৬.১৯৪৭, পৃ ১৭২
৮২. —, ৩.৮.১৯৪৭, পৃ ২৬২
৮৩. —, ১৯.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৭৮
৮৪. —, ২৬.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৮৭

॥ ৬৮.কাশ্মীর ॥

৮৫. হরি, ৯.১১.১৯৪৭, পৃ ৪০৬
৮৬. —, ১২.১.১৯৪৮, পৃ ৫০৯

॥ ৬৯. ভারতে বিদেশী উপনিবেশ ॥

৮৭. হরি, ৩০.৬.১৯৪৬, পৃ ২০৮
৮৮. —, ১১.৮.১৯৪৬,পৃ ২৬০
৮৯. —, ৮.৯.১৯৪৬, পৃ ৩০৫
৯০. —, ৩০.৬.১৯৪৬, পৃ ২০৮
৯১. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৫
৯২. —, ১১.৮.১৯৪৬, পৃ ২৬০
৯৩. —, ১.৯.১৯৪৬, পৃ ২৮৬
৯৪. —, ৮.৯.১৯৪৬, পৃ ৩০৫
৯৫. —, ২৪.৮.১৯৪৭, পৃ ২৯৫
৯৬. —, ৩১.৮.১৯৪৭, পৃ ২৯৮
৯৭. —, ১৬.১১.১৯৪৭, পৃ ৪১৬

॥ ৭০. ভারত ও পাকিস্তান ॥

৯৮. হরি, ৬.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৩৯
৯৯. —, ১১.১১.১৯৩৯, পৃ ৩৩৬
১০০. —, ৬.৪.১৯৪০, পৃ ৭৬
১০১. —, ৯.১১.১৯৪৭, পৃ ৪০০
১০২. —, ১৩.৪.১৯৪০, পৃ ৯২
১০৩. —, ৪.৫.১৯৪০, পৃ ১১৫
১০৪. তদেব, পৃ ১১৭
১০৫. হরি, ৫.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৫৫
১০৬. —, ১৩.৭.১৯৪৭, পৃ ২৩৬
১০৭. —, ২৭.৪.১৯৪৭, পৃ ১২৩
১০৮. —, ১৪.৯.১৯৪৭, পৃ ৩২৩
১০৯. —, ১১.৫.১৯৪৭, পৃ ১৪৬

১১০. —, ২৮.৯.১৯৪৭, পৃ ৩৫২
১১১. হরি, ৫.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৬৩
১১২. —, ২৮.৯.১৯৪৭, পৃ ৩৪৯
১১৩. তদেব, পৃ ৩৩৯
১১৪. হরি, ৫.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৫৬

॥ ৭১. ভারতের লক্ষ্যপথ ॥

১১৫. স্পিরা, পৃ ৪০৫
১১৬. ইই, ২২.৬.১৯২১, পৃ ১৯৯
১১৭. —, ৩.৪.১৯২৪, পৃ ১০৯
১১৮. —, ৭.১০.১৯২৬, পৃ ৩৪৮
১১৯. —, ১২.১০.১৯৩৫, পৃ ২৭৬
১২০. —, ১৯.৫.১৯৪৬, পৃ ১৩৪
১২১. ইই, ৫.২.১৯২৫, পৃ ৪৫
১২২. —, ২১.২.১৯২৯, পৃ ৬০
১২৩. —, ১.৬.১৯২১, পৃ ১৭৩
১২৪. —, ১৩.১০.১৯২১, পৃ ৩২৬
১২৫. —, ২৬.১২.১৯২৪, পৃ ৪২১
১২৬. —, ১২.৩.১৯২৫, পৃ ৮৮
১২৭. —, ১৭.৯.১৯২৫, পৃ ৩২১
১২৮. —, ১১.৮.১৯২৭, পৃ ২৫৩
১২৯. হরি, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০৪
১৩০. —, ৫.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৫৪
১৩১. —, ১৬.১১.১৯৪৭, পৃ ৪১১
১৩২. —, ২৩.৩.১৯৪৭, পৃ ৭৮
১৩৩. —, ৫.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৫৪
১৩৪. —, ২৬.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৮৮

॥ ৭২. গণতন্ত্রের মূল উপাদান ॥

১৩৫. ইই, ৮.১২.১৯২০, পৃ ৩
১৩৬. হরি, ২৭.৫.১৯৩৯, পৃ ১৪৩
১৩৭. ইই, ৩.৬.১৯২৬, পৃ ২০৩
১৩৮. ইই, ৩০.৭.১৯৩১, পৃ ১৯৯
১৩৯. হরি, ১৪.৭.১৯৪৬, পৃ ২২০
১৪০. —, ২৮.৯.১৯৪৭, পৃ ৩৫০
১৪১. ইই, ১.৮.১৯২০, পৃ ৪
১৪২. বক্র, ১৮.৯.১৯৩৪
১৪৩. হরি, ২৭.৫.১৯৩৯, পৃ ১৩৬
১৪৪. —, ১৬.১১.১৯৪৭, পৃ ৪০৯
১৪৫. —, ২৮.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৮৮
১৪৬. অ, পৃ ৩৬৯
১৪৭. বক্র, ১৮.৯.১৯৩৪
১৪৮. হরি, ২২.৪.১৯৩৯. পৃ ৯৯
১৪৯. —, ১৮.১.১৯৪৮, পৃ ৫১৯
১৫০. তদেব,পৃ ৫১৮
১৫১. হরি, ২৯.৯.১৯৪৬, পৃ ৩৩২
১৫২. —, ১৪.৯.১৯৪৭, পৃ ৩২১
১৫৩. —, ২৬.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৮২
১৫৪. —, ১৪.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৭১
১৫৫. —, ২৮.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৮৬
১৫৬. ইই, ৪.৮.১৯২০, পৃ ৪
১৫৭. —, ৮.১২.১৯২১, পৃ ৪০৩
১৫৮. —, ২৬.১.১৯২২, পৃ ৫৪
১৫৯. —, ২.৩.১৯২২, পৃ ১২৯
১৬০. —, ১৬.৩.১৯২২, পৃ ১৬১
১৬১. —, ২.২.১৯২১, পৃ ৩৩
১৬২. —, ১৭.৪.১৯২৪, পৃ ১৩০
১৬৩. হরি, ১৪.৮.১৯৩৭, পৃ ২০৯
১৬৪. —, ৩১.৫.১৯৪২, পৃ ১৭২
১৬৫. ইই, ৩০.৪.১৯২৫, পৃ ১৫২
১৬৬. ইই, ১৩.৮.১৯২৫, পৃ ২৭৮
১৬৭. তদেব,পৃ ২৭৯
১৬৮. ইই, ২.৭.১৯৩১, পৃ ১৬২
১৬৯. ইই, ১.১২.১৯২০, পৃ ৪
১৭০. হরি, ৩০.৭.১৯৩১, পৃ ১৯৯
১৭১. —, ১৩.১১.১৯৩৭, পৃ ৩৩২
১৭২. —, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১২৪
১৭৩. —, ২৯.৯.১৯৪৬, পৃ ৩৩৪
১৭৪. ইই, ৭.৫.১৯৩১, পৃ ১০৩
১৭৫. হরি, ৭.৯.১৯৪৭, পৃ ৩১৬
১৭৬. ইই, ২৯.৯.১৯২১, পৃ ২০৮

১৭৭. **হরি,** ১৬.৬.১৯৪৬, পৃ ১৮১
১৭৮. —, ৬.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৪১
১৭৯. **ইই,** ১৩.১০.১৯২১, পৃ ৩২৭
১৮০. —, ১১.৯.১৯২৪, পৃ ৩০১
১৮১. —, ৮.১.১৯২৫, পৃ ১৫
১৮২. —, ২.৭.১৯৩১, পৃ ১৬২
১৮৩. **হরি,** ৪.৯.১৯৩৭, পৃ ২৩৩
১৮৪. **ইই,** ১.১২.১৯২৭, পৃ ৪০৪
১৮৫. —, ৭.৫.১৯৩১, পৃ ৯৯
১৮৬. **হরি,** ১১.১.১৯৩৬, পৃ ৩৮০
১৮৭. —, ৬.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৪১
১৮৮. —, ১৪.৯.১৯৪৭, পৃ ৩২০
১৮৯. **ইই,** ২৮.৭.১৯২০, পৃ ৩
১৯০. —, ৮.৯.১৯২০, পৃ ৫
১৯১. —, ২২.৯.১৯২০, পৃ ৩
১৯২. **হরি,** ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৬৬
১৯৩. —, ১২.১.১৯৪৭,
পৃ ৪৮৮-৮৯
১৯৪. ১৩.৭.১৯৪৭, পৃ ২৩৩
১৯৫. **ইই,** ২৩.২.১৯২১, পৃ ৫৯
১৯৬. **হরি,** ১২.১১.১৯৩৮, পৃ ৩২৮
১৯৭. —, ১৫.৪.১৯৩৯, পৃ ৯০
১৯৮. —, ২৭.৫.১৯৩৯, পৃ ১৪৩
১৯৯. —, ১৮.৫.১৯৪০, পৃ ১২৯
২০০. **করেস,** ১৯৪২-৪৪, পৃ ১৪৩
২০১. **হরি,** ২.৩.১৯৪৭, পৃ ৪৪
২০২. **সংবাদ প্রতিবেদন,**
১৭.৯.১৯৩৪
২০৩. **হরি,** ৩.৯.১৯৩৮, পৃ ২৪
২০৪. —, ১৮.৫.১৯৪০, পৃ ১২৯

॥ ৭৩. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ॥

২০৫. **হরি,** ১৮.৬.১৮৩৮, পৃ ১৪৯
২০৬. —, ২২.১০.১৯৩৮, পৃ ২৯৯
২০৭. —, ২৮.১.১৯৩৯, পৃ ৪৪৪
২০৮. —, ২৯.৭.১৯৩৯, পৃ ২১৮
২০৯. —, ৬.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৩৮
২১০. —, ১৮.১.১৯৪২, পৃ ৪
২১১. —, ৬.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৩৮
২১২. —, ১.৬.১৯৪৭, পৃ ১৭৬
২১৩. **তদেব,** পৃ ১৭৫
২১৪. **হরি,** ১.২.১৯৪৮, পৃ ৪
২১৫. —, ১৫.২.১৯৪৮, পৃ ৩২

॥ ৭৪. জনপ্রিয় বিভিন্ন মন্তব্য ॥

২১৬. **হরি,** ৭.৮.১৯৩৭ , পৃ ২০৮
২১৭. —, ২৩.৪.১৯৩৮, , পৃ ৮৮
২১৮. —, ১৬.৭.১৮৩৮, , পৃ ১৮৪
২১৯. —, ১৭.৭.১৯৩৭, পৃ ১৮০
২২০. —, ২৩.৪.১৯৩৮, পৃ ৮৮
২২১. —, ৩.৯.১৯৩৮, পৃ ২৪২
২২২. —, ২৯.৯.১৯৪৬, পৃ ৩৩৩
২২৩. —, ২১.৯.১৯৪৭, পৃ ৩২৫
২২৪. —, ১৬.১১.১৯৪৭, পৃ ৪০৯
২২৫. —, ১৪.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৬৭
২২৬. —, ৪.১.১৯৪৮, পৃ ৪৯৫
২২৭. **হরি,** ১৭.২.১৯৪৬ , পৃ ১৩
২২৮. —, ৮.৯.১৯৪৬, পৃ ২৯৩

॥ ৭৫. আমার স্বপ্নের ভারত ॥

২২৯. **ইই,** ৬.১০.১৯২০ , পৃ ৪
২৩০. —, ১৯.১১.১৯২৫, পৃ ৪০০
২৩১. **হরি,** ৮.৬.১৯৪৭ , পৃ ১৭৭
২৩২. **তদেব,** পৃ ১৮১
২৩৩. **হরি,** ৭.১২.১৯৪৭ , পৃ ৪৫৩
২৩৪. —, ১৮.১.১৯৪৮, পৃ ৫২৬

॥ ৭৬. গ্রামে প্রত্যাবর্তন ॥

২৩৫. **হরি,** ৪.৪.১৯৩৬ , পৃ ৬৩
২৩৬. **ইই,** ১৭.৪.১৯২৪ , পৃ ১৩০
২৩৭. —, ৩০.৪.১৯৩১, পৃ ৯৪
২৩৮. **হরি,** ৪.৪.১৯৩৬, পৃ ৬৩-৬৪

২৩৯. —, ২৮.১.১৯৩৯, পৃ ৪৩৯
২৪০. প্যিরা, পৃ ৩২৩
২৪১. হরি, ৯.১০.১৯৩৭ , পৃ ২৯৩
২৪২. —, ২৩.৬.১৯৪৬, পৃ ১৯৮
২৪৩. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৬
২৪৪. —, ৩.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৮১
২৪৫. ইই, ১১.৯.১৯২৪, পৃ ৩০০
২৪৬. হরি, ১.৩.১৯৩৫, পৃ ২১
২৪৭. —, ১৬.৫.১৯৩৬, পৃ ১১২
২৪৮. —, ১১.৪.১৯৩৬, পৃ ৬৮
২৪৯. —, ৪.৮.১৯৪৬, পৃ ১৫১, ২৫২
২৫০. —, ২৫.৮.১৯৪৬, পৃ ২৮২

॥ ৭৭. সর্বতোভাবে গ্রামের সেবা ॥
২৫১. হরি, ২৭.৪.১৯৪৭ , পৃ ১২২
২৫২. —, ১৬.৫.১৯৩৬, পৃ ১১১-১২
২৫৩. —, ২০.২.১৯৩৭, পৃ ১৬
২৫৪. —, ১৭.৩.১৯৪৬, পৃ ৪২
২৫৫. —, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১০৪
২৫৬. —, ১০.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৯৪
২৫৭. —, ২৬.১০.১৯৩৪, পৃ ২৯২
২৫৮. —, ২৯.৮.১৯৩৬, পৃ ২২৬
২৫৯. —, ৪.১১.১৯৩৯, পৃ ৩৩১
২৬০. —, ২০.১.১৯৪০, পৃ ৪২৩
২৬১. —, ১৫.২.১৯৩৫, পৃ ১
২৬২. —, ২২.৬.১৯৩৫, পৃ ১৪৬
২৬৩. —, ১০.৩.১৯৪৬, পৃ ৩৪

॥ ৭৮. পঞ্চায়েত রাজ ॥
২৬৪. হরি, ৪.৮.১৯৪০, পৃ ২৪০
২৬৫. —, ১৮.১.১৯২২, পৃ ৪
২৬৬. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৬
২৬৭. —, ৪.৮.১৯৪০, পৃ ২৩৫
২৬৮. —, ৩০.৭.১৯৩৮, পৃ ২০০
২৬৯. —, ২৬.৭.১৯৪২, পৃ ২৩৮
২৭০. —, ১.৬.১৯৪৭, পৃ ১৭২
২৭১. —, ১৫.৬.১৯৪৭, পৃ ১৯৩
২৭২. —, ৭.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৫৮ ,
২৭৩. —, ২১.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৭৩
২৭৪. —, ৪.১.১৯৪৮, পৃ ৫০০
২৭৫. —, ১৮.১.১৯৪৮, পৃ ৫১৭

॥ ৭৯. শিক্ষা ॥
২৭৬. হরি, ১০.৩.১৯৪৬ , পৃ ৩৮
২৭৭. —, ১.৯.১৯৪৬, পৃ ২৮৬
২৭৮. —, ৮.৯.১৯৪৬, পৃ ৩০৬
২৭৯. হরি, ১৯.১.১৯৪৭ , পৃ ৪৯৪
২৮০. —, ২.২.১৯৪৭, পৃ ৩
২৮১. —, ২.৩.১৯৪৭, পৃ ৪৬
২৮২. ইই, ১.৯.১৯২১ , পৃ ২৭৭
২৮৩. হরি, ৮.৩.১৯৩৫ , পৃ ২৮
২৮৪. —, ৮.৫.১৯৩৭, পৃ ১০৪
২৮৫. তদেব
২৮৬. হরি, ৩১.৭.১৯৩৭ , পৃ ১৯৭
২৮৭. —, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১২০
২৮৮. —, ৮.৯.১৯৪৬, পৃ ৩০৬
২৮৯. —, ২৫.৮.১৯৪৬, পৃ ২৮৩
২৯০. —, ১০.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৯৪
২৯১. —, ২.৩.১৯৪৭, পৃ ৪৮
২৯২. —, ১১.৫.১৯৪৭, পৃ ১৪৭
২৯৩. তদেব, পৃ ১৪৫
২৯৪. হরি, ৯.১১.১৯৪৭ , পৃ ৪০১
২৯৫. —, ২১.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৮০
২৯৬. —, ২৫.৮.১৯৪৬, পৃ ২৮৩
২৯৭. —, ৫.৮.১৯৫০, পৃ ১৯৫
ভি.জি. দেশাই-অনূদিত আশ্রম অ্যাকটিভিটিস
২৯৮. —, ৮.৯.১৯৪৬, পৃ ৩০৮
২৯৯. —, ৭.৯.১৯৪৭, পৃ ৩১২
৩০০. তদেব, পৃ ৩১৪
৩০১. হরি, ৯.৭.১৯৩৮,
পৃ ১৭৭-৭৮
৩০২. মিই, পৃ ৮

৩০৩. হরি, ২১.৯.১৯৪৭, পৃ ৩৩২
৩০৪. —, ১.২.১৯৪৮, পৃ ১৪
৩০৫. ইই, ২.২.১৯২১, পৃ ৩৪
৩০৬. —, ২৭.৪.১৯২১, পৃ ১৩০
৩০৭. হরি, ২৫.৮.১৯৪৬, পৃ ২৮৪
৩০৮. —, ৯.৭.১৯৩৮, পৃ ১৭৭

॥ ৮০. ভাষাভিত্তিক প্রদেশ ॥

৩০৯. হরি, ২৯.৩.১৯৪২, পৃ ৯৭
৩১০. —, ১৯.৪.১৯৪২, পৃ ১১৮
৩১১. —, ২.১১.১৯৪৭, পৃ ৩৯২
৩১২. —, ৩০.১১.১৯৪৭, পৃ ৪৩৬
৩১৩. —, ৭.৯.১৯৪৭, পৃ ৩১১
৩১৪. —, ২১.৯.১৯৪৭, পৃ ৩৩৩
৩১৫. —, ১.২.১৯৪৮, পৃ ১৪

॥ ৮১. গো-রক্ষা ॥

৩১৬. ইই, ৬.১০.১৯২১, পৃ ৩৬
৩১৭. —, ২৬.৬.১৯২৪, পৃ ২১৪
৩১৮. —, ১.১.১৯২৫, পৃ ৮
৩১৯. হরি, ১৫.৯.১৯৪০, পৃ ২৮১
৩২০. ইই, ৬.১০.১৯২১, পৃ ৩৬
৩২১. —, ১৮.৫.১৯২১, পৃ ১৫৬
৩২২. —, ২৯.১.১৯২৫, পৃ ৩৮
৩২৩. হরি, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩১০
৩২৪. ইই, ২৯.১.১৯২৫, পৃ ৩৮
৩২৫. —, ৭.৫.১৯২৫, পৃ ১৬০
৩২৬. —, ৭.৭.১৯২৭, পৃ ২১৯
৩২৭. হরি, ১৭.২.১৯৪৬, পৃ ১১
৩২৮. —, ৩১.৮.১৯৪৭, পৃ ৩০০

॥ ৮২. গবাদি পশু সমবায় ॥

৩২৯. হরি, ৫.২.১৯৪২, পৃ ৩৯

॥ ৮৩. প্রকৃতি চিকিৎসায় আরোগ্য ॥

৩৩০. অ, পৃ ১৯৯
৩৩১. হরি, ২৬.৫.১৯৪৬, পৃ ১৫৩
৩৩২. তদেব
৩৩৩. হরি, ২.৬.১৯৪৬, পৃ ১৬৫
৩৩৪. তাদেব
৩৩৫. হরি, ১.৯.১৯৪৬, পৃ ২৮৫-৮৬
৩৩৬. —, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩১১
৩৩৭. —, ১১.৮.১৯৪৬, পৃ ২৫৯
৩৩৮. তদেব, পৃ ২৬০
৩৩৯. হরি, ১.৯.১৯৪৬, পৃ ২৮৬
৩৪০. —, ১৫.৬.১৯৪৭, পৃ ১৮৪-৮৫

॥ ৮৪. যৌথ স্বাস্থ্যব্যবস্থা ॥

৩৪১. হরি, ১১.২.১৯৩৩, পৃ ৮
৩৪২. ইই, ২৬.১১.১৯২৫, পৃ ৪১৬
৩৪৩. হরি, ১৮.২.১৯৩৯, পৃ ৪১৬
৩৪৪. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৬৯
৩৪৫. কপ্র পৃ ১৫

॥ ৮৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ॥

৩৪৬. ইই, ১১.৫.১৯২১, পৃ ১৪৮
৩৪৭. —, ২৫.৯.১৯২৪, পৃ ৩১৪
৩৪৮. —, ১৩.৮.১৯২১, পৃ ২১৫
৩৪৯. হরি, ৩০.৪.১৯৩৮, পৃ ৯৯
৩৫০. ইই, ২৫.২.১৯২০, পৃ ৩
৩৫১. —, ১১.৫.১৯২১, পৃ ১৪৮
৩৫২. —, ২০.১০.১৯২১, পৃ ৩৩৩
৩৫৩. হরি, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০২
৩৫৪. —, ১৫.৯.১৯৪০, পৃ ২৮৪
৩৫৫. —, ১৪.৭.১৯৪৬, পৃ ২১৯
৩৫৬. —, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০৮
৩৫৭. ইই, ২৯.৮.১৯২৪, পৃ ১৮১
৩৫৮. হরি, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৭৪
৩৫৯. —, ৫.১.১৯৪৭, পৃ ৪৭৮
৩৬০. ইই, ৭.৫.১৯১৯

৩৬১. —, ২৯.৫.১৯২৪, পৃ ১৮০
৩৬২. —, ২৫.৯.১৯২৪, পৃ ৩১৩
৩৬৩. হরি, ৪.১.১৯৪৮, পৃ ৪৯৭
৩৬৪. উগাসি, পৃ ১৩১
৩৬৫. হরি, ২৮.৪.১৯৪৭, পৃ ৩৪৯
৩৬৬. ইই, ৩০.১২.১৯২৬, পৃ ৪৫৮
৩৬৭. —, ২১.৩.১৯২৯, পৃ ৯৫
৩৬৮. হরি, ২২.৮.১৯৪০, পৃ ২৯৪
৩৬৯. ইই, ১১.৫.১৯২১, পৃ ১৪৮
৩৭০. —, ৬.১.১৯২৭, পৃ ১
৩৭১. —, ২৯.৯.১৯২১, পৃ ১৪৮
৩৭২. —, ২৯.৯.১৯২৪, পৃ ১৭৬
৩৭৩. তদেব, পৃ ১৮২
৩৭৪. হরি, ২৪.৫.১৯৪২, পৃ ১৬৬
৩৭৫. ইই, ২৫.২.১৯২০, পৃ ৩
৩৭৬. —, ৫.৬.১৯২৪, পৃ ১৮৮
৩৭৭. —, ১৮.৯.১৯২৪, পৃ ৩১২
৩৭৮. তদেব, পৃ ৩১১
৩৭৯. ইই, ২৯.১.১৯২৫ পৃ ৩৮
৩৮০. হরি, ১.২.১৯৪২, পৃ ২৭
৩৮১. ইই, ২৯.৫.১৯২৪, পৃ ১৮২
৩৮২. হরি, ২৭.৭.১৯৪৭, পৃ ২৫০
৩৮৩. ইই, ১১.৫.১৯২১, পৃ ১৪৮
৩৮৪. হরি, ৩.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৮৩
৩৮৫. ইই, ২৬.১.১৯২২, পৃ ৬২
৩৮৬. হরি, ৩১.৮.১৯৪৭, পৃ ২৯৭
৩৮৭. —, ৭.৯.১৯৪৭, পৃ ৩১০
৩৮৮. —, ৩১.৮.১৯৪৭, পৃ ২৯৮
৩৮৯. —, ২৬,১০.১৯৪৭, পৃ ৩৮৩
৩৯০. তদেব, পৃ ৩৮৭
৩৯১. হরি, ১৪.৯.১৯৪৭, পৃ ৩২৩
৩৯২. —, ২৫.১.১৯৪০, পৃ ৫৩৬

১৩. স্বদেশী

॥ ৮৬. চরকা সুসমাচার ॥

১. ইই, ২০.৫.১৯২৬, পৃ ১৮৭
২. হরি, ১৩.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৪৫
৩. ইই, ২১.৫.১৯২৫, পৃ ১৭৬-৭৭
৪. —, ৮.১২.১৯২১, পৃ ৪০৬
৫. —, ১৭.৯.১৯২৫, পৃ ৩২১
৬. —, ২.২.১৯২৮, পৃ ৩৪
৭. হরি, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০৪
৮. ইই, ২১.৭.১৯২১, পৃ ২২৮-২৯
৯. —, ৮.১.১৯২৫, পৃ ১৮
১০. হরি, ২৭.৪.১৯৪৭, পৃ ১২২
১১. —, ৩.৮.১৯৪৭, পৃ ২৬৬
১২. —, ১৮.৮.১৯৪৬, পৃ ২৬৩
১৩. —, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৫৮
১৪. ইই, ২৮.৫.১৯২৫, পৃ ১৮২
১৫. হরি, ৮.৫.১৯৩৭, পৃ ৯৯
১৬. —, ১৪.৪.১৯৪৬, পৃ ৮৮
১৭. —, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৫৯
১৮. —, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১০৪
১৯. —, ২২.৯.১৯৪৬, পৃ ৩২০
২০. কগ্র, পৃ ১২
২১. ইই, ২১.৭.১৯২০, পৃ ৪
২২. —, ৮.১২.১৯২১, পৃ ৪০৬
২৩. হরি, ১৯.২.১৯৩৮, পৃ ১১
২৪. —, ১৩.৪.১৯৪০, পৃ ৮৫
২৫. —, ১৭.৩.১৯৪৬, পৃ ৪২
২৬. —, ২১.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩১
২৭. —, ২০.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৬৩-৬৪
২৮. ইই, ১৬.২.১৯২১, পৃ ৫০-৫১
২৯. —, ২৪.২.১৯২৭, পৃ ৫৮
৩০. —, ৪.৮.১৯২৭, পৃ ২৪৮

॥ ৮৭. স্বদেশীর অর্থ ॥

৩১. স্পিরা, পৃ ৩৩৬-৪৪

৩২. **ইই**, ১২.৩.১৯২৫, পৃ ৮৮
৩৩. **মন্দির**, পৃ ৬২-৬৩
৩৪. **হরি**, ২৩.৭.১৯৪৭, পৃ ৭৯
৩৫. **শিপরা**, পৃ ৩৪৪
৩৬. **ইই**, ১৭.৬.১৯২৬, পৃ ২১৮
৩৭. **মন্দির**, পৃ ৬৬

১৪. সৌভ্রাত্র

॥ ৮৮. প্রেমের সুসমাচার ॥

১. **হিন্দ**, পৃ ৭৭-৭৯
২. **ইই**, ৫.৫.১৯২০, পৃ ৭
৩. —, ১২.১১.১৯৩১, পৃ ৩৫৫
৪. **সসা**, পৃ ১৮৮
৫. **ইই**, ১.১০.১৯৩১, পৃ ২৮৬
৬. **হরি**, ২৬.৯.১৯৩৬, পৃ ২৬০
৭. —, ৩.৭.১৯৩৭, পৃ ১৬৫
৮. **সসা**, পৃ ৩৬০
৯. **ইই**, ৯.৭.১৯২৫, পৃ ২৪
১০. —, ৮.১২.১৯২৭, পৃ ৪০৭
১১. —, ১২.৩.১৯২৫, পৃ ৯১
১২. —, ১১.৮.১৯২৭, পৃ ২৫৩
১৩. **হরি**, ১৫.১২.১৯৩৩, পৃ ৩
১৪. —, ২৫.৫.১৯৪৭, পৃ ১৬৫
১৫. **অ**, পৃ ২০৪
১৬. **ইই**, ২৭.৬.১৯২৯, পৃ ২১৪
১৭. **হরি**, ৩০.৫.১৯৩৬, পৃ ১২৬
১৮. **ইই**, ১.১.১৯২৫, পৃ ৮
১৯. —, ২৩.৯.১৯২৬, পৃ ৩৩৪
২০. —, ১২.১.১৯২৮, পৃ ১১
২১. —, ২.৪.১৯৩১, পৃ ৫৯
২২. —, ৪.৮.১৯২০, পৃ ৫
২৩. **স্পেক**, ৬.৩.১৯৪২
২৪. **হরি**, ৩.৩.১৯৪৬, পৃ ২৮
২৫. **ইই**, ১৯.১১.১৯৩১, পৃ ৩৬১
২৬. **অ**, পৃ ৩২৬
২৭. **তদেব**, পৃ ৩৩১
২৮. **ইই**, ২.৪.১৯৩১, পৃ ৫৪
২৯. —, ১৯.১১.১৯৩১, পৃ ৩৬১
৩০. **হরি**, ১২.১.১৯৩৪, পৃ ৮
৩১. **বক্র**, ৯.৯.১৯৪২
৩২. **ইই**, ১০.৩.১৯২০, পৃ ৫
৩৩. **হরি**, ২৬.১.১৯৩৪, পৃ ৮

॥ ৮৯. সকল জীবনই এক ॥

৩৪. **ইই**, ৮.৭.১৯২৬, পৃ ২৪৪
৩৫. —, ২১.১০.১৯২৬, পৃ ৩৬৪
৩৬. —, ৪.১০.১৯২৮, পৃ ৩৩১
৩৭. —, ১.১১.১৯২৮, পৃ ৩৬১
৩৮. —, ১৭.১২.১৯২৬, পৃ ৪৪০
৩৯. **হরি**, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১২১
৪০. **ইই**, ১৮.১১.১৯২৬, পৃ ৩৯৬
৪১. —, ১৮.৫.১৯২১, পৃ ১৫৬
৪২. **অ**, পৃ ১৭২
৪৩. **ইই**, ১৪.৪.১৯২৭, পৃ ১২১
৪৪. —, ১৭.৭.১৯২৭, পৃ ২২২
৪৫. **হরি**, ৯.১.১৯৩৭, পৃ ৩৮২
৪৬. —, ৯.৬.১৯৪৬, পৃ ১৭২
৪৭. —, ৫.৫.১৯৪৬, পৃ ১২৩
৪৮. —, ৭.৭.১৯৪৬, পৃ ২১৩

॥ ৯০. আমার জন্য কোনও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা নয় ॥

৪৯. **ইই**, ১.৬.১৯২১, পৃ ১৭০
৫০. —, ১.৯.১৯২১, পৃ ২৭৭
৫১. —, ১৭.১১.১৯২০, পৃ ৬
৫২. —, ৩০.৪.১৯৩১, পৃ ৮৮
৫৩. **হরি**, ৯.৫.১৯৩৬, পৃ ১০০-১
৫৪. —, ২.১১.১৯৪৭, পৃ ৩৯২
৫৫. **ইই**, ৫.৭.১৯২৮, পৃ ২২৪
৫৬. —, ৩০.৪.১৯৩১, পৃ ৩৮
৫৭. **হরি**, ২৫.৫.১৯৪৭, পৃ ১৬৬

৫৮. —, ২.১১.১৯৪৭, পৃ ৩৯২
৫৯. —, ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৪০৪
৬০. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১০৯
৬১. —, ১১.৫.১৯৪৭, পৃ ১৪৮
৬২. —, ২৬.৫.১৯৪৬, পৃ ১৫৪
৬৩. —, ২৭.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৭৫
৬৪. —, ১৩.৭.১৯৪৭, পৃ ২৩৫
৬৫. —, ১৬.১১.১৯৪৭, পৃ ৪১২-১৩

॥ ৯১. জাতীয়তা বনাম আন্তর্জাতিকতা ॥

৬৬. গাইভি, পৃ ১৭১
৬৭. ইই, ১৬.৪.১৯৩১, পৃ ৭৯
৬৮. —, ১৬.৩.১৯২১, পৃ ৮১
৬৯. —, ১৬.৬.১৯২৫, পৃ ২১১
৭০. —, ১৭.৯.১৯২৫, পৃ ৩২৯
৭১. তদেব, পৃ ৩২২
৭২. ইই, ৪.৪.১৯২৯, পৃ ১০৭
৭৩. হরি, ১৭.১১.১৯৩৩, পৃ ৫-৬
৭৪. ইই, ১৭.৭.১৯২২৪, পৃ ২৩৬
৭৫. —, ১৬.১২.১৯২৪, পৃ ৪২৫
৭৬. —, ২১.৩.১৯২৯, পৃ ৯৩
৭৭. —,২৫.৪.১৯২৯, পৃ ১৩৫
৭৮. হরি, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৫৯
৭৯. —, ১৪.১২.১৯৪৭, পৃ ৪৬৫
৮০. এরি, পৃ ৫৫
৮১. তদেব, ৫৭
৮২. ইই, পৃ ৪.১২.১৯২৪
৮৩. হরি, ২৩.৩.১৯৪৭, পৃ ৭৮

॥ ৯২. জাতিবর্ণ বিদ্বেষ ॥

৮৪. ইই, ২৭.১.১৯২৭, পৃ ৩১
৮৫. —, ২০.২.১৯২০, পৃ ৬১
৮৬. হরি, ২৪.৩.১৯৪৬, পৃ ৫২
৮৭. তদেব
৮৮. হরি, ৩০.৬.১৯৪৬, পৃ ২০৪
৮৯. —, ১৯.৫.১৯৪৬, পৃ ১৩৪
৯০. তদেব
৯১. হরি, ২.৬.১৯৪৬, পৃ ১৫৭
৯২. —, ৩০.৬.১৯৪৬, পৃ ২০৪
৯৩. —, ২৬.১০.১৯৪৭, পৃ ৩৮৫

॥ ৯৩. যুদ্ধ ও শান্তি ॥

৯৪. ইই, ১৩.৯.১৯২৮, পৃ ৩০৮
৯৫. তদেব
৯৬. ইই, ১০.১.১৯২৯, পৃ ১০
৯৭. —, ১৩.৯.১৯২৮, পৃ ৩০৮
৯৮. —, ৩০.১.১৯৩০, পৃ ৩৭
৯৯. —, ৩১.১২.১৯৩১, পৃ ৪২৬
১০০. অ, পৃ ২৫৮
১০১. ইই, ৭.২.১৯২৯, পৃ ৪৬
১০২. —, ৯.৫.১৯২৯, পৃ ১৪৮
১০৩. —, ৩১.১২.১৯৩১, পৃ ৪২৭
১০৪. হরি, ১১.২.১৯৩৯, পৃ ৮
১০৫. —, ১৫.২.১৯৪২, পৃ ৪০
১০৬. —, ২৪.২.১৯৪৬, পৃ ২০

॥ ৯৪. পারমাণবিক যুদ্ধ ॥

১০৭. হরি, ১০.২.১৯৪৬, পৃ ৮
১০৮. —,১০.৩.১৯৪৬, পৃ ৩৬
১০৯. —, ৭.৭.১৯৪৬ পৃ ২১২
১১০. —, ২৩.৭.১৯৪৬, পৃ ১৯৭
১১১. —, ২৯.৯.১৯৪৬, পৃ ৩৩৫
১১২. —, ১০.১১.১৯৪৬, পৃ ৩৮৯
১১৩. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১১৬-১৭
১১৪. —, ১.৬.১৯৪৭, পৃ ১৭২

॥ ৯৫. শান্তির পথ ॥

১১৫. ইই, ৮.১০.১৯২৫, প ৩৪৫
১১৬. —, ১৯.১১.১৯২৫, পৃ ৩৯৭
১১৭. তদেব
১১৮. ইই, ৩১.১২.১৯৩১, পৃ ৪২৭
১১৯. হরি, ১২.১১.১৯৩৮, পৃ ৩২৮

১২০. —, ১০.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৭২
১২১. —, ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৯৪
১২২. —, ২৫.৮.১৯৪০, পৃ ২৬১
১২৩. **ইই**, ২৩.৬.১৯১৯, পৃ ৫০
১২৪. **তদেব**, পৃ ৫১
১২৫. **কসমোপলিটন**-এর উদ্দেশে বাণী, হরি-তে ১৬.৫.১৯৩৬-এ উদ্ধৃত, এছাড়াও হরি, ১৮.৬.১৯৩৮, পৃ ১৫৩-৪
১২৬. **হরি**, ২৪.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৯৫
১২৭. **বক্র**, ৯.৮.১৯৪২
১২৮. **ইই**, ১৫.১২.১৯২৭, পৃ ৪২১
১২৯. **হরি**, ৩.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৫৮
১৩০. **বক্র**, ১৮.৪.১৯৪৫
১৩১. **হরি**, ৩০.৩.১৯৪৭, পৃ ৮৬
১৩২. —, ২০.৭.১৯৪৭, পৃ ২৪৩
১৩৩. —, ১৫.৪.১৯৩৯, পৃ ৯০
১৩৪. —, ১৫.৩.১৯৪২, পৃ ৭৩

॥ ৯৬. আগামীদিনের বিশ্ব ॥
১৩৫. **নভা**, পৃ ৪৮-৫১
১৩৬. **করেস**, ১৯৪২-৪৪, পৃ ১৪৩

১৫. প্রাসঙ্গিক সন্তব্য

১. **সসা**, পৃ ১৮৬
২. **ইই**, ১২.৩.১৯৩০, পৃ ৯৫
৩. **হরি**, ১৫.১.১৯৩৮, পৃ ৪১৪
৪. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১১৭
৫. **তদেব**, পৃ ১২০
৬. **হরি**, ৩০.১১.১৯৪৭, পৃ ৪৩৭
৭. —, ২৫.১.১৯৪৮, পৃ ৫২৯
৮. —, ৩১.৭.১৯৩৭, পৃ ১৯৭
৯. —, ৮.৩.১৯৪২, পৃ ৬৭
১০. —, ১.২.১৯৪২, পৃ ২৭
১১. —, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৩
১২. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১০৯
১৩. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৭১-৭২
১৪. **তদেব**, পৃ ৭২
১৫. **হরি**, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১১১
১৬. —, ২৯.৯.১৯৪৬, পৃ ৩৩৬
১৭. **ইই**, ৭.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৪৭
১৮. **অ**, পৃ ২৩৭
১৯. **হরি**, ৫.৮.১৯৩৩, পৃ ৪
২০. **ইই**, ৬.১০.১৯২১, পৃ ৩১৮
২১. **অ**, পৃ ১৮০
২২. **ইই**, ৭.১০.১৯২৬, পৃ ৩৪৭
২৩. **ইকেম্ব**, পৃ ৪০২-৩
২৪. **কিহে**, পৃ ১৪-১৬
২৫. **অ**, পৃ ২০০
২৬. **ইই**, ১৮.৭.১৯২৯, পৃ ২৩৬
২৭. —, ৮.৮.১৯২৯, পৃ ২৬১
২৮. —, ১৫.৮.১৯২৯, পৃ ২৬৫
২৯. **হরি**, ২০.২.১৯৪৯, প ৪৩০-১
৩০. **ইই**, ৬.৯.১৯২৮, পৃ ৩০০-১
৩১. **হরি**, ১৫.৯.১৯৪০, পৃ ২৮৫
৩২. **ইই**, ২৫.৬.১৯২৫, পৃ ২২০
৩৩. —, ৩.৬.১৯২৬, পৃ ২০৩
৩৪. —, ২৪.৬.১৯২৬, পৃ ২২৬
৩৫. —, ১৯.৫.১৯২৭, পৃ ১৬০
৩৬. **হরি**, ১৮.৮.১৯৪৬, পৃ ২৬৪
৩৭. —, ১১.১.১৯৪৮, পৃ ৫০৭
৩৮. —, ৩১.৩.১৯৪৬, পৃ ৬১
৩৯. **হিস্ব**, পৃ ৫৯
৪০. **ইই**, ১১.৬.১৯২৫, পৃ ২০৫
৪১. —, ২৯.৯.১৯২৭, পৃ ৩২৭
৪২. —, ৮.৮.১৯২৯, পৃ ২৬১
৪৩. **হরি**, ১০.২.১৯৪৬, পৃ ৮
৪৪. —, ২.৬.১৯৪৬, পৃ ১৫৮
৪৫. **ইই**, ৬.৬.১৯২৯, পৃ ১৯২
৪৬. **স্পিরা**, পৃ ৩৯৩-৪
৪৭. **ইই**, ৮.৬.১৯২১, পৃ ১৮১

৪৮. —, ৬.৭.১৯২১, পৃ ২৪০
৪৯ —, ৩.৩.১৯২৭, পৃ ৬৮
৫০. —, ১৫.৯.১৯২৭, পৃ ৩০৬
৫১.—, ১১.৪.১৯২৯, পৃ ১১৫
৫২. হরি, ৯.৩.১৯৩৪, পৃ ৩০
৫৩. —, ১৫.৯.১৯৪৬, পৃ ৩১৩
৫৪. ইই, ২৫.৯.১৯২৪, পৃ ৩১৩
৫৫. —, ১৩.৪.১৯২১, পৃ ১১৬
৫৬. হরি, ৩০.৩.১৯৪৭, পৃ ৮৬
৫৭. —, ২.৬.১৯৪৬, পৃ ১১৬
৫৮. —, ১০.১২.১৯৩৮, পৃ ৩৭৭
৫৯. অ, পৃ ৬৪-৬৫
৬০. ইই, ৩.১২.১৯২৫, পৃ ৪২২
৬১. —, ১৭.৬.১৯২৬, পৃ ২১৫
৬২. অ, পৃ ৬৫
৬৩. তদেব, পৃ ২২০-১
৬৪. ইই, ২০.৯.১৯২৮, পৃ ৩১৯
৬৫. হরি, ১৯.১২.১৯৩৬, পৃ ৩৬২
৬৬. ইই, ৫.৩.১৯৩১, পৃ ১
৬৭. ইকেম্ব, পৃ ২৭৪
৬৮. কপ্র, পৃ ১৮-৯
৬৯. হরি, ২৮.৭.১৯৪৭, পৃ ২৩৩
৭০. ইই, ৫.৬.১৯২৪, পৃ ১৮৭
৭১. হরি, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৩
৭২. ইই, ২২.১১.১৯২৮, পৃ ৩৯১
৭৩. নবজীবন, ৭.৯.১৯১৯
৭৪. ইকেম্ব, পৃ ২৪৫
৭৫. ইই, ১৭.৯.১৯১৯, পৃ ১৪৯-৫০
৭৬. অ, পৃ ১৯৩
৭৭. তদেব, পৃ ২১১
৭৮. হরি, ২৯.৯.১৯৪৬, পৃ ৩৩৪
৭৯. ইই, ১২.৫.১৯২০, প ৪
৮০. —, ২৮.৫.১৯৩১, পৃ ১২১
৮১. —, ২৫.৩.১৯২৬, পৃ ১১৪
৮২. হরি, ২৮.৪.১৯৪৬, পৃ ১০১
৮৩. —, ২৬.৫.১৯৪৬, পৃ ১৫৪
৮৪. —, ৯.২.১৯৪৭, পৃ ১৯
৮৫. —, ২৭.৪.১৯৪৭, পৃ ১২৮
৮৬. —, ১৯.১০১৯৪৭, পৃ ৩৭৮
৮৭. —, ২.১১.১৯৪৭, পৃ ৩৯১
৮৮. —, ৩০.১১.১৯৪৭, পৃ ৪৪৭
৮৯. ইই, ২৭.৮.১৯৩১, পৃ ২৪০
৯০. —, ৬.১০.১৯২০, পৃ ২-৩
৯১. অ, পৃ ৯৭
৯২. তদেব, পৃ ২৬৯
৯৩. ইই, ২২.১২.১৯২৭, পৃ ৪২১
৯৪. তদেব, পৃ ৪২৭-৮
৯৫. ইই, ১৪.৭.১৯২০, পৃ ৪
৯৬. —, ২৫,৮,১৯২১, পৃ ২৬৬
৯৭. —, ৮.১২.১৯২১, পৃ ৪০২
৯৮. —, ২৩.২.১৯২২, পৃ ১১২
৯৯. হরি, ২.২.১৯৪৭, পৃ ৩
১০০. ইই, ১৭.৭.১৯২৪, পৃ ২৩৬-৭
১০১. —, ২৬.১২.১৯২৪, পৃ ৩
১০২. হরি, ৩৭.১৯৩৭, পৃ ১৬৫
১০৩. সসা পৃ ২২২
১০৪. হরি, ২৬.১২.১৯৩৬, পৃ ৩৬৮
১০৫. এরি, পৃ ৩৬
১০৬. এফা, পৃ ৪৩
১০৭. ইই, ২৯.১.১৯২৫, পৃ ৪০
১০৮. হরি, ২৮.৭.১৯৪৬, পৃ ২৩৩
১০৯. —, ৩.৮.১৯৪৭, পৃ ২৬০
১১০. ইই, ২০.১০.১৯২৭, পৃ ৩৫৩
১১১. —, ৬.৭.১৯২১, পৃ ২০৯
১১২. হরি, ২৪.২.১৯৪৬, পৃ ২৩
১১৩. অ, পৃ ১৪৪
১১৪. ইই, ১৫.১০.১৯২৫, পৃ ৩৫১
১১৫. —, ১৭.৪.১৯২৪, পৃ ১৩০
১১৬. অ, পৃ ১৬১
১১৭. হরি, ৭.১১.১৯৩৬, পৃ ৩০৮
১১৮. —, ২৪.৯.১৯৩৮, পৃ ২৬৬
১১৯. ইই, ২৭.৪.১৯২১, পৃ ১৩২

১২০. হরি, ৪.৯.১৯৩৭, পৃ ২৩৩-৪
১২১. —, ১৮.১.১৯৪৮, পৃ ৫১৫
১২২. —, ১৮.৮.১৯৪০, পৃ ২৫৪
১২৩. ইই, ২৩.১২.১৯২৬, পৃ ৪৪৬
১২৪. ইই, ৫.৬.১৯২৪, পৃ ১৬৮
১২৫. —, ২২.২.১৯২০, পৃ ৩
১২৬. হরি, ১০.৩.১৯৪৬, পৃ ৩৭
১২৭. —, ২০.৪.১৯৪৭, পৃ ১২০
১২৮. অ, পৃ ৩৭১
১২৯. হরি, ১.২.১৯৪২, পৃ ২৭
১৩০. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৬৯
১৩১. —, ১৭.১১.১৯৪৬, পৃ ৪০৪
১৩২. অ, পৃ ৯০
১৩৩. হরি, ২.৬.১৯৯৪৬, পৃ ১৬৬
১৩৪. ইই, ১৬.২.১৯২২, পৃ ১০২
১৩৫. অ, পৃ ২০-২১
১৩৬. ইই, ৬.১০.১৯২৭, পৃ ১০২
১৩৭. —, ২.২.১৯২৪, পৃ ৩৭
১৩৮. হরি, ১৪.১০.১৯৩৩, পৃ ৫
১৩৯. —, ১৮.৪.১৯৩৬, পৃ ৭৭
১৪০. —, ২১.৪.১৯৪৬, পৃ ৯৪
১৪১. —, ২৩.৬.১৯৪৬, পৃ ২০০
১৪২. —, ২০.১০.১৯৪৬, পৃ ৩৬৭
১৪৩. ইই, ৬.১২.১৯২৪, পৃ ৪০৫
১৪৪. কিছে, পৃ ৩৯-৪২
১৪৫. ইই, ১২.১.১৯২১, পৃ ১১
১৪৬. —, ৪.২.১৯২৬, পৃ ৪৬
১৪৭. —, ৬.৯.১৯২৮, পৃ ৩০১-২
১৪৮. —, ১৪.১১.১৯২৯, পৃ ৩৬৯
১৪৯. —, ৬.৮.১৯৩১, পৃ ২০৩
১৫০. —, ১২.৯.১৯২৯, পৃ ৩০২
১৫১. —, ৮.১০.১৯৩১, পৃ ২৯৭
১৫২. —, ১১.৮.১৯২৭, পৃ ২৫১
১৫৩. উগাসি, পৃ ১০৭
১৫৪. হরি, ১৪.৩.১৯৩৬, পৃ ৩৬
১৫৫. ইই, ২৫.৮.১৯২৭, পৃ ১৭৮
১৫৬. হরি, ১.৯.১৯৪০, পৃ ২৬৮
১৫৭. —, ৭.৪.১৯৪৬, পৃ ৭২
১৫৮. ইই, ৯.৭.১৯২৫, পৃ ২৩৯
১৫৯. —, ৮.১২.১৯২৭, পৃ ৪১৬

জীবনপঞ্জী

১৮৬৯ : **২রা অক্টোবর** পোরবন্দর কাথিওয়াড়ে এক বানিয়া (বৈশ্য বা ব্যবসায়ী) পরিবারে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয়; তিনি করমচাঁদ। ওরফে কাবা গান্ধীর তিন ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠ; তাঁর পিতা পোরবন্দর, রাজকোট ও ভাংকানার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। গান্ধী তাঁর পিতার চতুর্থ স্ত্রী পুতলিবাঈয়ের পুত্র।

১৮৭৬ : পিতামাতার সঙ্গে রাজকোট যান; বারো বছর বয়স অবধি সেখানে প্রাইমারি স্কুলে পাঠ; ব্যবসায়ী গোকুলদাস মাকনজীর কন্যা কস্তুরবা-র সঙ্গে বাগদত্ত হন।

১৮৮১ : রাজকোটে হাইস্কুলে গমন।

১৮৮৩ : কস্তুরবাকে বিবাহ।

১৮৮৪—৮৫ : গোপনে মাংসভক্ষণ; পিতামাতাকে ছলনা এড়াবার জন্য একবছর বাদে মাংস ত্যাগ। ৬৩ বৎসর বয়সে পিতাব মৃত্যু।

১৮৮৭ : ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস; ভাবনগরে (কাথিওয়াড়) সামালদাস কলেজে যোগদান; প্রথম টার্মের পর কলেজ ছাড়েন।

১৮৮৮ : **৪ঠা সেপ্টেম্বর** জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা। **২৮শে অক্টোবর** লণ্ডন পৌঁছন। নিরামিষ আহার। ভদ্রলোক হতে গেলে আবশ্যাক বিবেচনায় কিছুকাল নৃত্য ও সঙ্গীতে পাঠ-গ্রহণ।

১৮৮৯ : সাদাসিধা জীবনযাত্রা বিষয়ে বই পড়েন ও খরচ অর্ধেকে নামাবার সিদ্ধান্ত নেন; ধর্মসাহিত্য পাঠ; প্রথম 'গীতা' পাঠে গভীরভাবে অভিভূত।

১৮৯০ : শাকাহারী আন্দোলনের সঙ্গে যোগস্থাপন; কিছুকাল শাকাহারী ক্লাব চালান। **জুনমাসে** লণ্ডনে ম্যাট্রিক পাস করেন। **সেপ্টেম্বরে** শাকাহারী সোসাইটিতে যোগদান।

১৮৯১ : **১০ই জুন** বার-এ ডাক পান। **১২ই জুন** ভারত যাত্রা। **জুলাইয়ে** বম্বে পৌঁছন। **নভেম্বরে** বম্বে হাইকোর্টে যোগদানের আবেদন দাখিল।

১৮৯২ : রাজকোট ও বম্বেতে আইনজীবী হওয়ার প্রচেষ্টা; পরে 'লীগাল ড্রাফ্টসম্যান' হিসেবে রাজকোটে বসতিস্থাপন।

১৮৯৩ : আইনী কাজের জন্য এক মুসলিম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন **এপ্রিল মাসে**। **মে-জুন** নানা ধরনের বর্ণবিদ্বেষের অভিজ্ঞতা; বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

১৮৯৪ : **২২শে আগস্ট** নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। **সেপ্টেম্বরে** নেটাল সুপ্রীম কোর্টে প্রথম ভারতীয় অ্যাডভোকেট। বাইবেল ও কোরান সহ ধর্মসাহিত্য অধ্যয়ন, তলস্তয়ের 'দি কংডম অফ গড ইজ উইদিন ইউ' পাঠ।

১৮৯৫ : দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যায় আরও দায়বদ্ধ হওয়া; প্রকাশ করেন, 'দি ইণ্ডিয়ান ফ্র্যানচাইজ: অ্যান অ্যাপীল টু এভরি ব্রিটন ইন সাউথ আফ্রিকা।'

১৮৯৬ : **জুলাইয়ে** ভারতে প্রত্যাবর্তন; দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের হয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু। **১৪ই আগস্ট** রাজকোট 'দি গ্রীণ প্যাম্‌ফ্লেট' প্রকাশ; দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভিযোগ বিষয়ে ভারতীয়দের জানাবার জন্য বম্বে, মাদ্রাজ, পুনে ও কলকাতা ভ্রমণ; **৩০ শে নভেম্বর।** স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা।

১৮৯৭ : **১৩ই জানুয়ারি** ডারবান বন্দরে পৌঁছবার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক সম্পর্কে তাঁর ভাষণের খবর পেয়ে মারমুখী জনতার আক্রমণ। **২০শে জানুয়ারি** আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে প্রত্যাখ্যান। **৬ই এপ্রিল** উপরোক্ত ঘটনা ও তার পটভূমি সম্পর্কে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর কলোনিজ, চেম্বারলেনকে দীর্ঘ স্মারকপত্র প্রেরণ। পক্ষপাতদুষ্ট আইনাবলী বিষয়ে স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষদের কাছে আবেদন প্রেরণ, এবং ব্রিটিশ ও ভারতীয় জননেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়া।

১৮৯৮—৯৯ : ভারতীয়দের ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকারসমূহের স্থান ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষর কাছে প্রতিনিধিত্ব।

১৮৯৯ : বুয়র যুদ্ধে ভারতীয় অ্যামবুলেন্স বাহিনী গঠন ও কাজে অংশগ্রহণ এবং সরকারী বার্তায় উল্লেখিত হয়; ওয়ার মেডেল পান।

১৯০০ : কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা বিষয়ে খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ দাদাভাই নওরোজীকে।

১৯০১ : **১৮ই অক্টোবর** ভারত যাত্রা। **১৪ই ডিসেম্বর** পোরবন্দর হয়ে রাজকোট পৌঁছন। **২৭শে ডিসেম্বর** দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ে কংগ্রেসে প্রস্তাব আনয়ন।

১৯০২ : **২৮শে জানুয়ারি-১লা ফেব্রুয়ারি** রেঙ্গুন গমন। গোখলের সঙ্গে কলকাতায় একমাস বাস। বাজকোট প্রত্যাবর্তন ও আইনজীবিকা শুরু। **জুলাইয়ে** বোম্বাই গিয়ে আইনব্যবসা। **নভেম্বর,** ট্রান্সভালে এশীয়-বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমস্যার প্রবক্তা হওয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার আহ্বান। **ডিসেম্বরে** ডারবান পৌঁছন; চেম্বারলেনের কাছে প্রতিনিধিদের নিয়ে যান।

১৯০৩ : ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্টে আইনজীবী; ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। পবিস্থিতি বিষয়ে দাদাভাই নওরোজীকে সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেরণ। **জুনে** 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রকাশ।

১৯০৪ : রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পাঠ; ডারবান (নেটাল) সন্নিকটে ফিনিক্সে বসতি স্থাপন; জোহানেসবার্গে প্লেগ দেখা দিলে হাসপাতাল সংগঠন; পথ্য ও খাদ্যবিধি বিষয়ে গুজরাটীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখা। এগুলি পরে ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে 'গাইড টু হেল্‌থ' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ : বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ; ব্রিটিশ পণ্য-বয়কট সমর্থন; ব্রিটেনে গোখলে-লাজপত

রায় ডেপুটেশান কালে ঔপনিবেশিক রাজপুরুষদের প্রতি ভারতকে 'সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' হিসেবে বিবেচনা করার আবেদন। ট্রান্সভাল-এর ব্রিটিশ হাইকমিশনার লর্ড সেলবোর্নের কাছে ট্রান্সভাল ভারতীয়দের সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশনে নেতৃত্বদান।

১৯০৬ : **১২ই মে** 'ন্যায়বিচারের নামে, মানবতার কল্যাণের জন্য ভারতে হোম রুল' সমর্থন। **২৭শে মে** পার্থিব বিষয়সম্পদ বিষয়ে অনাগ্রহের কথা ভ্রাতা লক্ষ্মীদাসকে লেখেন। **জুন-জুলাই,** জুলু বিদ্রোহ কালে ভারতীয় স্ট্রেচারবাহক বাহিনী গঠন; আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের শপথ গ্রহণ। **১১ই সেপ্টেম্বর,** জোহানেসবার্গে ভারতীয় জনসভায় ভাষণদান; নব ঘোষিত ট্রান্সভাল এশিয়াটিক ল অ্যামেণ্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিরোধের শপথ গৃহীত হয় সভাতে। **২১শে অক্টোবর** থেকে **৩০শে নভেম্বর,** ভারতের সমস্যা উপনিবেশিক সচিবের কাছে পেশ করার জন্য ডেপুটেশনে ইংলণ্ড গমন। **১৮ই ডিসেম্বর** দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাবর্তন।

১৯০৭ : **জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি** গুজরাটীতে 'এথিকাল রিলিজিয়ন' নামে আটটি প্রবন্ধ লেখেন; 'ইণ্ডিয়া ওপিনিয়ান'-এ প্রকাশিত; বই হিসেবে পরে প্রকাশিত। **মার্চে** ট্রান্সভালে এশিয়াটিক রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট পার্লামেন্টে পাস; ভারতীয়রা বিক্ষোভ সভা করে। **এপ্রিল :** প্রিটোরিয়ায় স্মাট্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ; জনসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে তাঁকে অবগত করান। 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট'-এর বিরোধিতা করবার সংকল্প প্রকাশ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান'-এ। **মে :** 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' সম্রাটের অনুমোদন পায়। **জুলাই :** 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বিরোধী জনসভায় ভাষণ। সংশোধন প্রস্তাব করে, রেজিস্ট্রেশান অ্যাক্টের সমালোচনা ক'রে লেখেন স্মাট্‌সকে **আগস্টে।** পরোক্ষ প্রতিরোধ, পারমিট অফিসে পিকেটিং; আদালতে পরোক্ষ প্রতিরোধীদের সপক্ষে সওয়াল। **ডিসেম্বর :** স্মাট্‌স গান্ধীজির বিরুদ্ধে আইনীব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯০৮ : **৮ই জানুয়ারি** সরকারকে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট মুলতবি রাখতে বলেন ও স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন প্রস্তাব দেন। **১০ই জানুয়ারি :** 'প্যাসিভ রেজিসটেন্স' (পরোক্ষ প্রতিরোধ) স্থলে 'সত্যাগ্রহ' শব্দ নির্বাচন। ট্রান্সভাল ত্যাগ না করার জন্য দুই মাসের কারাদণ্ড **২১শে জানুয়ারি :** 'রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' প্রত্যাহৃত হলে স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে, মিটমাট করতে রাজি হন। **৩০শে জানুয়ারি :** প্রিটোরিয়ায় জেনারেল স্মাট্‌স-এর সমন পেয়ে সাক্ষাতে গমন এবং আপস হলে মুক্তি পান। **১০ই ফেব্রুয়ারি :** ওই আপসমতে স্বেচ্ছায় ভারতীয়রা টিপসহি দেবার ব্যাপারটিকে ভারতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা-জ্ঞানে পাঠানরা গান্ধীজিকে প্রায় মেরে ফেলে : আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়নে অস্বীকার। **মার্চ-জুন :** ওই অ্যাক্ট প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য স্মাট্‌সের সঙ্গে যোগাযোগ; স্মাট্‌স প্রত্যাখ্যান করেন। **জুলাই :** স্মাট্‌সকে লেখা পত্রাবলী প্রকাশিত; ভারতীয়রা গণসমাবেশে ঠিক করে টিপসহি দেবে

না, এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পুড়িয়ে দেয়। **আগস্ট:** ঘোষণা করেন, হিংসার পদ্ধতি "ক্ষতিকর ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূলোচ্ছেদে অকার্যকর"। 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' প্রত্যাহারে স্মাট্‌সকে আবেদন। জনসভায় রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পোড়ানো চলে; সত্যাগ্রহ আবার শুরু হয়। **সেপ্টেম্বর:** রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট সংশোধনে সম্রাটের সম্মতি। মিটমাটের জন্য ভারতীয়দের শর্ত স্মাট্‌স প্রত্যাখ্যান করেন। **১৫ই অক্টোবর:** বন্দী ও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। **১২ই ডিসেম্বর:** ভোক্‌সরাস্ট জেল হতে মুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ভারতীয়দের প্রতি কঠোর, অবমাননাকর, নিষ্ঠুর আচরণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে হানিকর, এই মর্মে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯০৯: **১৬ই জানুয়ারি:** রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেখাতে না পারার জন্য ভোক্‌সরাস্টে গ্রেপ্তার; নির্বাসনদণ্ড; প্রত্যাগমন; আবার গ্রেপ্তার; জামিনে খালাস। **২০শে জানুয়ারি:** সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের জন্য ভারতীয়দের প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়ে প্রেসে বিজ্ঞপ্তি। **২৫শে ফেব্রুয়ারি:** ভোক্‌সরাস্টে গ্রেপ্তার; তিন মাসের কারাদণ্ড। **২রা মে:** প্রিটোরিয়া সেন্ট্রাল জেলে আনীত। **২৪শে মে:** মুক্তি প্রাপ্তি। **২১শে জুন:** ভারতীয় সমস্যা জানাবার জন্য হাজী হবিবের সঙ্গে ডেপুটেশনে ইংলণ্ড গমন। **জুলাই ১০:** লণ্ডন পৌঁছন। লর্ড অ্যামপ্টহিলের সহায়তায় প্রভাবশালী ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ ও জনগণকে জানাবার ও সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষদের হৃদয় স্পর্শ করতে চেষ্টা করেন। **১লা অক্টোবর:** পরোক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন বিষয়ে তলস্তয়কে লেখেন। **৯ই নভেম্বর:** ট্রান্‌সভাল আইনসমূহ বিষয়ে গান্ধী ও সরকারের আলোচনার ব্যর্থতা 'দি টাইম্‌স'-এ প্রকাশিত। **১০ই নভেম্বর:** তলস্তয়কে উত্তর দেন ও ডোক-লিখিত জীবনী তাঁকে পাঠান **১৩ই নভেম্বর:** দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা; জাহাজে 'হিন্দ স্বরাজ' লেখেন। **৩০ নভেম্বর:** দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছন। **ডিসেম্বর ২৯:** দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সংগ্রামকে প্রশংসা করে, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকপ্রথা নিষিদ্ধকরণের উপর জোর দিয়ে লাহোর কংগ্রেসে সিদ্ধান্তগ্রহণ।

১৯১০: **৪ঠা এপ্রিল:** তলস্তয়কে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল'-এর কপি প্রেরণ ও মন্তব্য আহ্বান। **৮ই মে:** তলস্তয়ের উত্তর: পরোক্ষ প্রতিরোধ শুধু ভারত নয়, মানবজাতির পক্ষে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। **৩০শে মে:** 'তলস্তয় ফার্ম' প্রতিষ্ঠা। **৪ঠা ডিসেম্বর:** তলস্তয়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।

১৯১১: **জানুয়ারি:** ইমিগ্রেট্'স রেস্ট্রিকশন বিল সংশোধন বিষয়ে স্মাট্‌সের সঙ্গে পত্রবিনিময়; স্মাট্‌সের আশ্বাস প্রদান: আইনে বর্ণবিদ্বেষ থাকবে না। **২৭শে মার্চ:** কেপটাউনে স্মাট্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। **এপ্রিল ২২:** পরোক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন মুলতবি রাখার প্রত্যুত্তরে ভারতীয়দের দাবিগুলি মেনে নেবার ব্যাপারে স্মাটসের সম্মতি। **৩রা মে:** স্মাটসের সঙ্গে সাক্ষাৎ; এশিয়াটিক রেজিস্ট্রেশন ও ইমিগ্রেন্ট'স রেস্ট্রিকশন অ্যাক্টগুলি প্রত্যাহারে স্মাট্‌সের কথা দেবার ভিত্তিতে সাময়িক মিটমাট। **২৪ জুন:** রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের

শপথ। **৬ই ডিসেম্বর:** গোখলকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমন্ত্রণ।

১৯১২: **১৬ই মার্চ** চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকপ্রথা নিষিদ্ধকরণে গোখলের প্রচেষ্টার প্রশংসা। **১২ই সেপ্টেম্বর:** ফিনিক্স ট্রাস্ট গঠিত। **২২শে অক্টোবর:** দক্ষিণ আফ্রিকা লরেন্‌কো মারকুয়েস, মোজাম্বিক ও জ্যাঞ্জিবার সফরে গোখলের সঙ্গী। ইউরোপীয় পোশাক ও দুগ্ধ ত্যাগ। তাজা ও শুকনো ফল আহারের সিদ্ধান্ত।

১৯১৩: **১৮ই জানুয়ারি:** 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান'-এ উল্লেখ করেন যে বছরের মাঝামাঝি ভারতে ফেরার সম্ভাবনা আছে। **১৪ই মার্চ:** সিয়ার্লের সুপ্রীম কোর্ট রায় দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিবাহ অসিদ্ধ হয়ে যায়। **৩০শে মার্চ:** গণসমাবেশে ভারতীয়রা সিয়ার্লের রায়ের প্রতিবাদ জানায়। **১২ই এপ্রিল:** ১৯১১-এর অস্থায়ী মিটমাটের শর্তপূরণে নতুন ইমিগ্রেশন বিলের ব্যর্থতা বিষয়ে লেখন 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান'-এ। কস্তুরবা পরোক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। **১৯শে মে:** প্রতিশ্রুত সাহায্য দান ব্যর্থ হলে আন্দোলন ফের শুরু হবার নিশ্চয়তা বিষয়ে হুঁশিয়ারি দেন সরকারকে। **৭ই জুন :** বিভেদকারী আইনের কঠোর প্রয়োগ ও সত্যাগ্রহ আবার শুরু করার প্রেক্ষিতে ভারতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে যায়। **২৮ জুন:** আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকার কথা জানান। **১৩ সেপ্টেম্বর:** ঘোষণা করেন আলোচনা "বিফল হয়েছে।" **১৫ই সেপ্টেম্বর:** পরোক্ষ প্রতিরোধ পুনরুজ্জীবিত। **১৬ই সেপ্টেম্বর:** কস্তুরবা গ্রেপ্তার। **১৭ই অক্টোবর:** নিউ কাস্‌ল গমন; ৩ পাউণ্ড কর প্রত্যাহার না করা অবধি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করতে বলেন; ৩০০০ খনি শ্রমিক ধর্মঘট করে। **২৪শে অক্টোবর:** ট্রান্সভালে "মার্চ" ক'রে ঢোকার প্রস্তাব দেন। **২৮শে অক্টোবর:** নিউ কাস্‌ল থেকে "মার্চ" শুরু। **৩০শে অক্টোবর:** চার্লসটাউন পৌঁছন। **৩রা নভেম্বর:** গ্রেপ্তার হবার জন্য ট্রান্সভালে মার্চ করে ঢোকার কথা ঘোষণা। **৫ই নভেম্বর:** ৩ পাউণ্ড কর প্রত্যাহারের জন্য স্মাট্সকে টেলিফোন। **৬ই নভেম্বর:** মহামিছিলে নেতৃত্বদান। পামফোর্ডে গ্রেপ্তার। **৭ই নভেম্বর:** ভোক্সরাস্টে জামিনে খালাস; মিছিলে আবার যোগদান। **৮ই নভেম্বর:** স্ট্যাণ্ডার্টনে গ্রেপ্তার; জামিনে মুক্ত; মার্চ চলে। **৯ই নভেম্বর:** টীক্সওআর্থে গ্রেপ্তারের পর ব্যালফোরে নিয়ে যাওয়া হয়। **১০ই নভেম্বর:** কর প্রত্যাহার না হওয়া অবধি একবার আহার করার শপথ। **১১ই নভেম্বর:** ডাণ্ডিতে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ। **১৩ই নভেম্বর:** ভোক্সরাস্ট জেলে স্থানান্তরিত। **১৪ই নভেম্বর:** ভোক্সরাস্টে আরও ৩ মাসের দণ্ডাদেশ। **১৮ই ডিসেম্বর:** নিঃশর্ত মুক্তিদান; মুক্তিকাল থেকে নিষ্পত্তি হওয়া অবধি একবার আহার ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের পোশাক পরিধান।

১৯১৪: **১৩-১৬ই জানুয়ারি:** স্মাট্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রস্তাবপেশ। **২২ জানুয়ারি:** স্মাট্সের সঙ্গে শর্তের ফলে সত্যাগ্রহ মুলতবি। 'তলস্তয় ফার্মের' সদস্যদের নৈতিক বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চৌদ্দ দিন অনশন। **জুন:** ইণ্ডিয়ান রিলিফ অ্যাক্ট পাস। **১৮ই জুলাই:** ভারত হয়ে ইংলণ্ডযাত্রা। **৪ঠা আগস্ট:** ইংলণ্ড

পৌঁছন। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন। **অক্টোবর:** উক্ত বাহিনী কর্তব্যরত। বাহিনীর কাজে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ফলে সত্যাগ্রহ প্রস্তাব। **১৯ ডিসেম্বর:** ভারতযাত্রা।

১৯১৫: ৯ই জানুয়ারি: ভারত পৌঁছন। অ্যামবুলেন্স সার্ভিসের জন্য কাইজার-ই-হিন্দ্ স্বর্ণপদক লাভ। **২০শে মে:** আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রম (সবরমতী নদীর নামানুসারে পরে সবরমতী আশ্রম) প্রতিষ্ঠা।

১৯১৫-১৬: রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভারত ও বর্মা ভ্রমণ।

১৯১৭: চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় অভিবাসী প্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সফল; চরকা ব্যবহার দ্বারা বৃহৎ পর্যায়ে হাতে-কাটা-কাপড় তৈরির ধারণা মনে দৃঢ়মূল হয়। **এপ্রিল:** নীলচাষী শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তে বিহারে চম্পারণ গমন; গ্রেপ্তার ও পরে খালাস; রায়তদের অভিযোগ বিষয়ে তদন্তকারী কমিটির সদস্য হিসেবে বিহার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত।

১৯১৮: জানুয়ারি-মার্চ: আমেদাবাদের টেক্সটাইল শ্রমিকদের জন্য কাজ এবং সন্তোষজনক ভাবে বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য অনশন; শস্যহানিক্ষেত্রে খাজনা ধার্য মূলতবির জন্য বম্বের কয়রা জেলায় সত্যাগ্রহ-সূচনা। **২৭শে এপ্রিল:** দিল্লিতে বড়লাটের ওয়ার কনফারেন্সে যোগদান ও হিন্দুস্থানিতে ভাষণদান; সেনাবাহিনীর জন্য রংরুট জোগাড়ে কয়রা জেলা ভ্রমণ।

১৯১৯: ২৮শে ফেব্রুয়ারি: রাওলাট বিল প্রত্যাহার করার জন্য সত্যাগ্রহ শপথে সই। **৬ই এপ্রিল:** সর্ব-ভারতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন উদ্বোধন; দেশ জুড়ে হরতাল। **৮-১১ই এপ্রিল:** পঞ্জাব প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দিল্লি যাবার পথে গ্রেপ্তার; বম্বেতে ফিরিয়ে আনা; বহু শহরে হিংসাত্মক কাণ্ড। **১৩ই এপ্রিল:** অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড; নিরস্ত্র জনতার ওপর সৈন্যদের গুলিবর্ষণ ও ৪০০-র অধিক নিহত। সবরমতী আশ্রমের কাছে জনসভায় ভাষণদান ও তিনদিনের অনুশোচনামূলক অনশন। **১৪ই এপ্রিল:** সত্যাগ্রহ বিষয়ে তাঁর "হিমালয়সমান ভ্রান্তি" স্বীকার করেন নাদিয়াদে। পঞ্জাবে সামরিক আইন। **১৮ই এপ্রিল:** সত্যাগ্রহ মুলতবি। **সেপ্টেম্বর:** গুজরাটী মাসিকপত্র 'নবজীবন' সম্পাদনা শুরু, পরে তা হিন্দী সাপ্তাহিক হিসেবেও প্রকাশ হয়। **অক্টোবর:** ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনাভার গ্রহণ; পঞ্জাবে সরকারী বাড়াবাড়ি বিষয়ক বেসরকারী তদন্ত কমিটিতে যোগদান। **২৪শে নভেম্বর:** দিল্লিতে অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্স-এ সভাপতি। **ডিসেম্বর:** অমৃতসর কংগ্রেসে মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার মেনে নেবার পরামর্শদান।

১৯২০: জানুয়ারি: ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তুর্কীর সুলতানের (যিনি মুসলিমদের খলিফা), ইসলামের পবিত্র স্থানগুলির উপর আধিপত্য থেকে বঞ্চিত না করার দাবি নিয়ে বড়লাটের কাছে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব। **১লা আগস্ট:** কাইজার-ই-হিন্দ্ পদক, জুলু যুদ্ধ পদক ও বুয়র যুদ্ধ পদক প্রত্যর্পণপূর্বক বড়লাটকে চিঠি। **সেপ্টেম্বর:** পঞ্জাব ও খিলাফতের অন্যায়গুলির প্রতিকারের জন্য তাঁর কর্মসূচী,

কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত। **নভেম্বর:** আমেদাবাদে গুজরাট বিদ্যাপীঠ স্থাপন। **ডিসেম্বর:** সকল আইনী ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের মাধ্যমে ভারতের মানুষ দ্বারা স্বরাজ অর্জনই কংগ্রেসের লক্ষ্য, তাঁর এই ঘোষিত সিদ্ধান্ত নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত।

১৯২১: এপ্রিল: জাতীয় সংগঠনধর্মী আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য কংগ্রেসে এক কোটি সদস্য করার, তিলক স্বরাজ ফাণ্ডে এক কোটি টাকা তোলার এবং দেশে ২০ লক্ষ চরকা প্রবর্তন করার কর্মসূচী গ্রহণ। **অগাস্ট:** বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণ বয়কটের প্রচারাভিযান শুরু এবং বম্বেতে বিশাল বিদেশী কাপড়ের স্তূপে অগ্নিসংযোগ।

১৯২২: ১লা ফেব্রুয়ারি: বারদোলিতে (গুজরাট) সত্যাগ্রহ প্রচারাভিযান চালাবার উদ্দেশ্য বিষয়ে বড়লাটকে নোটিস প্রদান। **৫ই ফেব্রুয়ারি;** চৌরিচৌরার (ইউ.পি.) ট্রাজিডিতে জনতা কর্তৃক এক সাব-ইন্‌স্পেক্টর সহ ২১ জন কনস্টেবলকে অগ্নিদগ্ধ করার পর পাঁচদিন উপবাস এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিকল্পনা ত্যাগ। **১০ই মার্চ:** সম্রাটের বিরুদ্ধে অপরাধের কারণে সবরমতীতে গ্রেপ্তার এবং **১৮ই মার্চ:** ছয় বৎসরের কারাদণ্ডাদেশ।

১৯২৪: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি: ১২ই জানুয়ারি পুনেতে সাসুন হাসপাতালে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন ও **৫ই ফেব্রুয়ারি** ছাড়া পান। **এপ্রিল:** 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এবং 'নবজীবন'-এর সম্পাদনাভার পুনর্গ্রহণ। **১৮ই সেপ্টেম্বর:** হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য ২১দিন অনশন শুরু। **ডিসেম্বর:** বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯২৫: সেপ্টেম্বর: অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। **নভেম্বর:** আশ্রম সদস্যদের দুষ্কার্যের জন্য তাদের পরিবর্তে নিজের সাতদিন অনশন। স্বীয় আত্মজীবনী 'দি স্টোরি অফ মাই এক্‌সপেরিমেন্ট্‌স উইথ ট্রুথ' রচনা শুরু।

১৯২৭: নভেম্বর: সিলোন গমন।

১৯২৮: ডিসেম্বর: ১৯২৯ সালের মধ্যে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার না দিলে স্বাধীনতার সপক্ষে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব আনয়ন।

১৯২৯: ডিসেম্বর: তাঁর কথায় লাহোর কংগ্রেস অধিবেশন ঘোষণা করে যে, কংগ্রেসের বিশ্বাসমতে স্বরাজের অর্থ হবে পূর্ণ স্বরাজ (সম্পূর্ণ স্বাধীনতা)।

১৯৩০: ফেব্রুয়ারি: আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য এ.আই.সি.সি. কর্তৃক কংগ্রেসী একনায়ক নির্বাচিত। **২রা মার্চ:** কংগ্রেসের দাবি মেনে না নিলে লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বড়লাটকে পত্রে জ্ঞাপন। **১২ই মার্চ:** ডাণ্ডি সমুদ্রোপকূলে অভিযান শুরু। সেখানে **৬ই এপ্রিল** আনুষ্ঠানিকভাবে লবণ কুড়ান। **৫ই মে:** গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক; ভারতব্যাপী হরতাল; বৎসর শেষ হবার আগে ১০০,০০০-র বেশি কারাবরণ।

১৯৩১: ২৬শে জানুয়ারি: কারাগার থেকে নিঃশর্ত মুক্তি। **ফেব্রুয়ারি-মার্চ:** বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা, যা আরউইন-গান্ধী চুক্তিতে পরিণত হয়। **২৯শে অগাস্ট:**

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে একমাত্র কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে বিলাতযাত্রা। **সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর :** বৈঠকে যোগদান। **৫ই ডিসেম্বর :** ভারতযাত্রা। **২৮শে ডিসেম্বর** বোম্বে পৌছন।

১৯৩২ : **৪ঠা জানুয়ারি :** গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক। **২০শে সেপ্টেম্বর :** সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে হরিজনদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকার নিষিদ্ধকরণ আদায়ের জন্য জেলে 'আমরণ অনশন' শুরু। **২৬শে সেপ্টেম্বর :** হরিজনদের বিষয়ে তাঁর দাবি ভারত সরকার মেনে নিলে অনশন ভঙ্গ।

১৯৩৩ : **১১ই ফেব্রুয়ারি :** ইংরেজি ও হিন্দীতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হরিজন' পত্রিকা শুরু। **৮ই মে :** আত্মশুদ্ধির জন্য দ্বিপ্রহরে ২১দিন অনশন শুরু; রাত ৯-টায় নিঃশর্ত মুক্তিদান। **৯ই মে :** ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন মুলতবি ঘোষণা ও সরকারকে অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করতে বলা। **২৯শে মে :** অনশন ভঙ্গ। **২৬শে জুলাই :** সত্যাগ্রহ আশ্রম তুলে দেন। **৩০শে জুলাই :** বম্বে সরকারকে জ্ঞাপন যে, আইন অমান্য আন্দোলন পুনর্বার শুরু করার জন্য ৩৩ জন অনুগামীসহ আমেদাবাদ থেকে রাস-এ যাবেন। **৩১শে জুলাই :** গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক। **৪ঠা অগাস্ট :** মুক্তিদান এবং দমনমূলক আদেশ ভঙ্গের জন্য পুনর্বার গ্রেপ্তার। **১৬ই অগাস্ট :** অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ প্রচারাভিযান চালাবার সুযোগসুবিধা উপেক্ষিত হলে অনশন শুরু। **২৩শে অগাস্ট :** নিঃশর্ত মুক্তিলাভ। **৭ই নভেম্বর :** হরিজন-উন্নয়ন সফর শুরু।

১৯৩৪ : **১৭ই সেপ্টেম্বর :** বুনিয়াদী শিল্পমাধ্যমে শিক্ষা, হরিজন-সেবা ও গ্রামীণ শিল্পোন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য ১লা অক্টোবর থেকে রাজনীতি থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা। **২৬শে অক্টোবর :** অল-ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইণ্ডাসট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন উদ্বোধন।

১৯৩৬ : **৩০শে এপ্রিল :** মধ্য প্রদেশে ওয়ার্ধা সন্নিকটে সেবাগ্রামে বসবাস শুরু এবং তাকে নিজের সদর দপ্তরে পরিণত করা।

১৯৩৭ : **২২শে অক্টোবর :** ওয়ার্ধায় শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং বুনিয়াদী শিল্পমাধ্যমে শিক্ষাবিষয়ে স্ব-পরিকল্পনার রূপরেখা ব্যাখ্যা।

১৯৩৯ : **৩রা মার্চ :** প্রশাসন সংস্কারে শাসক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য রাজকোটে 'আমরণ অনশন' শুরু। **৭ই মার্চ,** বড়লাটের হস্তক্ষেপে অনশন ত্যাগ।

১৯৪০ : **জুলাই ও সেপ্টেম্বর :** যুদ্ধপরিস্থিতি সম্পর্কে আমন্ত্রণ পেয়ে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ। **অক্টোবর :** ব্যক্তিক আইন অমান্যে অনুমোদন দান : সত্যাগ্রহ বিষয়ে 'হরিজন'-এ রিপোর্ট ও লেখা আগাম সেন্সর করবার সরকারি দাবিতে 'হরিজন' ও সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিকগুলি প্রকাশ মুলতবি রাখেন।

১৯৪১ : **৩০শে ডিসেম্বর :** তাঁর অনুরোধে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক তাঁকে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে রেহাই দান।

১৯৪২ : **১৮ই জানুয়ারি :** 'হরিজন' ও সংশ্লিষ্ট সকল সাপ্তাহিক আবার শুরু করেন। **২৭শে মার্চ** নয়া দিল্লিতে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ক্রিপ্স

প্রস্তাবকে "অনেক পরের তারিখ দেওয়া চেক" বলে অভিহিত করেন। **মে:** ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগের আবেদন। **৮ই অগাস্ট:** 'ভারত ছাড়ো' সিদ্ধান্তের নিহিতার্থ বিষয়ে বম্বের এ. আই. সি.সি., অধিবেশনে বলেন। **৯ই অগাস্ট:** গ্রেপ্তার ও পুনেতে আগা খাঁ প্যালেসে অন্তরীণ। **১৫ই অগাস্ট:** গান্ধীজির একান্তসচিব মহাদেব দেশাইয়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আগা খাঁ প্যালেসে মৃত্যু। **অগাস্ট-ডিসেম্বর:** হাঙ্গামা বিষয়ে বড়লাট ও ভারত সরকারের সঙ্গে পত্র-বিনিময়।

১৯৪৩: ১০ই ফেব্রুয়ারি: ২১ দিন অনশন শুরু ও **৩রা মার্চ** অনশন ভঙ্গ।

১৯৪৪: ২২শে ফেব্রুয়ারি: আগা খাঁ প্যালেসে কস্তুরবার মৃত্যু। **৬ই মে:** নিঃশর্ত মুক্তিপ্রদান। **৯-২৭শে সেপ্টেম্বর:** পাকিস্তান বিষয়ে এম.এ. জিন্নার সঙ্গে কথাবার্তা। **২রা অক্টোবর:** গান্ধীজির ৭৫ বছরের জন্মদিনে তাঁকে কস্তুরবা মেমোরিয়ালের জন্য ১১০ লক্ষ টাকা (৮, ২৫, ০০০) পাউণ্ড প্রদান।

১৯৪৫: ১৭ই এপ্রিল: আসন্ন সানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলন উপলক্ষে এক বিবৃতিতে বলেন, ভারতের সাম্য ও স্বাধীনতা ব্যতিরেকে শান্তি অসম্ভব। জার্মানী ও জাপানের ক্ষেত্রে এক ন্যায্য শান্তি দাবি করেন। **১৯শে ডিসেম্বর:** শান্তিনিকেতনে সি.এফ. এণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৯৪৫-৪৬: ডিসেম্বর-জানুয়ারি: বাংলা ও আসাম ভ্রমণ।

১৯৪৬: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি: অস্পৃশ্যতাবিরোধী এবং হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচারাভিযানে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ। **১০ই ফেব্রুয়ারি:** 'হরিজন' ও সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিকগুলির পুনঃপ্রকাশ। **এপ্রিল:** দিল্লিতে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে রাজনীতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ। **৫-১২ই মে:** সিমলায়; সিমলা কনফারেন্স চলছে; আলোচনা নিষ্ফল হয়। **১৬ই মে:** ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা জানায়। **১৮-১৯শে মে:** ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে প্ল্যান আলোচনা। **২৬শে মে:** পরিস্থিতি অনুযায়ী এ-প্ল্যান ব্রিটিশ সরকারের শ্রেষ্ঠ দলিল বলে মনে করেন। **৬ই জুন:** মুসৌরিতে। **৭ই জুন:** দিল্লি ফেরেন। **১০ই জুন:** মিত্রশক্তির জয়ে উল্লসিত হতে নারাজ, কেননা তা "মিথ্যার ওপরে সত্যের জয়" নয়। **১১ই জুন:** বড়লাট ও গান্ধীজির সাক্ষাৎ; কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাব নাকচ ক'রে দেন। **১৬ই জুন:** ক্যাবিনেট মিশনের আলোচনা স্থগিত; বড়লাট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব করেন। **১৮ই জুন:** অন্তবর্তীকালীন সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। **২০-২১শে জুন:** ওয়ার্কিং কমিটি মিটিঙে যান। ক্রিপসের সঙ্গে দেখা। **২৩ই জুন:** ভারতকে শুধু শাসনতন্ত্র গঠনকারী পরিষদে যোগ দিতে এবং অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ না দিতে কংগ্রেসকে উপদেশ। **২৪শে জুন:** ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। **২৮শে জুন:** দিল্লি ত্যাগ ক'রে পুনে যাত্রা; পথে ট্রেন লাইনচ্যুত করার প্রচেষ্টা। **৭ই জুলাই:** বম্বেতে এ. আই. সি. সি. মিটিঙে ভাষণ দান; কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্ল্যান গ্রহণ করে। **৩১শে জুলাই:**

অনশনের সিদ্ধান্ত। **২রা সেপ্টেম্বর :** কলকাতার বাড়িতে জনতার ভিড় ; নোয়াখালি সফর পরিকল্পনা ত্যাগ। শান্তি প্রচেষ্টা জোরদাব। **৪ঠা সেপ্টেম্বর :** অনশন ভঙ্গ। **৭ই সেপ্টেম্বর :** কলকাতা হতে দিল্লি যাত্রা ; দৈনিক দাঙ্গাবিদীর্ণ এলাকায় গমন শুরু। **২৪শে সেপ্টেম্বর :** পাকিস্তানী হানাদাবর্দের কাশ্মীর আক্রমণ। **২৫শে সেপ্টেম্বর :** কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রে চলে আসে। **২৬শে সেপ্টেম্বর :** চার্চিলের বিবৃতি "ভারতে দানবীয় মারণযজ্ঞ"কে সমালোচনা করেন। **১লা নভেম্বর :** ভাবতীয় সৈন্য জুনাগড়ে প্রবেশ করে। **৮ই নভেম্বর :** জুনাগড় ভারতেব অন্তর্ভুক্ত। এ. আই.সি.সি.তে ভাষণদান। **১১ই নভেম্বর :** জুনাগড়ের ভারতে অন্তর্ভুক্তি সমর্থন। **২৫শে ডিসেম্বর :** ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসাব আবেদন। **৩০শে ডিসেম্বর :** ভারত ইউ.এন.-এ কাশ্মীর-বিতর্ক উল্লেখ করে।

১৯৪৮ : ১২ই জানুয়ারি : দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য অনশনেব সিদ্ধান্ত ; মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজিকে নিরস্ত কবতে ব্যর্থ। **১৫ই জানুয়ারি :** 'বিপজ্জনক এলাকায়' প্রবেশ। ভাবতীয় মন্ত্রিসভার, পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে দেবার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জ্ঞাপন। সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে অনশন চলতে থাকে। **১৭ই জানুয়ারি :** ডাক্তারদের সতর্কবাণী, অনশন বন্ধ করতেই হবে। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠিত। 'শান্তি শপথ'-এর সিদ্ধান্ত। **১৮ই জানুয়ারি :** শান্তি কমিটি, 'শান্তি শপথ'-এ সই করে গান্ধীজিকে দেয়। অনশন ভঙ্গ। **২০শে জানুয়ারি :** প্রার্থনা সভায় বোমা বিস্ফোরণ। **২৭শে জানুয়ারি :** মেহরৌলি মুসলিম মেলায় গমন। **২৯শে জানুয়ারি :** ক্রুদ্ধ উদ্বাস্তুরা গান্ধীজিকে হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করতে বলে। **৩০শে জানুয়ারি :** লোকসেবক সংঘে রূপান্তরিত এক কংগ্রেসের সংবিধান খসড়া রচনা। সান্ধ্যপ্রার্থনায় যাবাব সময় আততায়ী কর্তৃক নিহত।

শব্দসূচী

অতিশূদ্র	সামাজিক অবস্থানে চতুর্বর্ণের নিম্নতম শূদ্রের চেয়েও যে নীচে আছে। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সে "অস্পৃশ্য"।
অমানিত্বম	বিনয়নম্রতা।
আগিয়ারি	জরাথুস্ত্রীয় অগ্নি-মন্দির।
কবীর	উত্তর ভারতের পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দের সন্তকবি। তাঁর ভজনে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সম্প্রীতি এবং ঈশ্বরের একত্ব মূল বিষয়।
ঘানি	গ্রামের তেলপেষাই কল।
জ্ঞানদেব	মহারাষ্ট্রের ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দের কিশোর এক সন্তকবি। মারাঠী ভাষায় গীতাভাষ্য "জ্ঞানেশ্বরী" রচয়িতা। (বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইংরাজিতে দ্যাঁনদের, দ্যাঁনেশ্বরী লেখা হয়েছে ও বলা হয়েছে) এঁকে দ্যাঁনেশ্বর বা জ্ঞানেশ্বরও বলা হয়।
জেন্দ্ আভেস্তা	জরাথুস্ত্রীয় উপদেশাবলী।
জরাথুস্ত্র	জরাথুস্ত্রীয় ধর্ম ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা বা ঝেরদুশ্ত নামেও পরিচিত। পারস্য হতে আগত পার্সীরা এঁর অনুগামী।
ডাণ্ডী মার্চ	১৯৩০ সালে ১২ই মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল, গান্ধীজি সবরমতী আশ্রম থেকে পদযাত্রা করে ১০০ মাইল দূরে সমুদ্র উপকূল গ্রাম ডাণ্ডীতে যান। সমুদ্রতীর থেকে প্রকৃতিজ লবণ সংগ্রহ করে লবণ আইন ভঙ্গ করা ছিল উদ্দেশ্য। ডাণ্ডীতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে, দেশ জুড়ে যে আইনঅমান্য আন্দোলন হয়, তা লবণ সত্যাগ্রহ নামে খ্যাত।
ডায়ার	ব্রিটিশ জেনারেল। ইনি ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে এক নিবস্ত্র জনসমাবেশের উপর গুলি চালিয়ে ৪০০০-র বেশি মানুষকে হত্যা করেন।
তুকারাম	১৭শ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের কবি ও সন্ত, ইনি হাজার হাজার ভজন রচনা করেন।
তুলসীদাস	উত্তরভারতের এই হিন্দী কবির সময়কাল ১৬শ শতাব্দী। ইনি অন্যান্য পুস্তক সহ "রামচরিতমানস" (রামের জীবনের পবিত্রগাথা) রচনা করেন। এতে রামের মহান কীর্তিকথা পুনর্বর্ণিত হয়েছে। হিন্দীভাষী হিন্দুদের কাছে বইটি পরম শ্রদ্ধার।
দয়ানন্দ	আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ শাস্ত্রী (১৮২৪-৮৩)
দুব্‌লা	গুজরাটের এক পশ্চাৎপদ শূদ্র সম্প্রদায়।
ধেড়	গুজরাটের এক "অস্পৃশ্য" সম্প্রদায়।
নয়ী তালিম	বুনিয়াদী বা কারিগরী শিক্ষার নাম। আক্ষরিক অর্থে "নব শিক্ষা"।

নানক — শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (জন্ম ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দ, মৃত্যু ১৫৩৮ বা ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ)

পিঁজরাপোল — বৃদ্ধ ও অক্ষম গৃহপালিত পশু রক্ষণাগার।

প্রীতম — ১৬শ খ্রীস্টাব্দের গুজরাটী কবি প্রীতমদাস। ইনি অজস্র ভক্তিগীতি রচনা করেন।

বারদোলি — আইন-অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত গুজরাটের গ্রাম।

ভাঙ্গি — সাফাইকর্মী।

মহাবীর — জৈন ধর্মাচার্যদের ২৪তম তীর্থঙ্কর (জন্ম আনুমানিক ৫৪০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ এবং মৃত্যু আনুমানিক ৪৬৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। এঁর আদিনাম বর্ধমান। মনে করা হয় ইনি জৈনধর্মের মহত্তম আচার্য।

মীরাবাঈ — ১৬শ শতকের এই রাজপুত রাজকন্যা কৃষ্ণের মহান ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণস্তুতিতে রচিত ও গীত এঁর অসংখ্য ভজন ভারতে খুবই লোকপ্রিয়।

রামানুজ — ১২শ শতকের বৈষ্ণব পণ্ডিত, ইনি দ্বৈতবাদ-দর্শন প্রচার করেন।

রায়চাঁদভাই রাজাচন্দ্র — গান্ধীজির সমসাময়িক জৈন সন্ত ও দার্শনিক। গান্ধীজি এঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু বলে মানতেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

শঙ্কর — ৮ম খ্রীস্টাব্দের হিন্দু দার্শনিক, বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদের এক মুখ্য প্রচারক।

সদাব্রত — দানধ্যান।

সনাতনপন্থী — প্রাচীন বৈদিক ধর্মের নিষ্ঠ অনুগামী।

সুরদাস — ১৬শ শতকের উত্তরভারতীয় অন্ধ হিন্দী কবি; এঁর "**সুরসাগর**" কাব্যে কৃষ্ণকাহিনী বর্ণিত হয়েছে, হিন্দীভাষী হিন্দুদের তা পরম প্রিয়।

নির্দেশিকা

Laserset at Meghna Computer Service, Calcutta-700006
and printed at Modern Printers, Delhi-110032